দাম : ৫০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৮

৩ অক্টোবর - ২০১১

স্বস্তিকা • পূজা সংখ্যা - ১৪১৮ • দাম : ৫০ টাকা

সূচীপত্র

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা - ১৪১৮, (যুগাব্দ ঃ ৫১১৩)
৬৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৩ অক্টোবর, ২০১১
১৫ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী শঙ্কর দেবানন্দ ❑ দেবী মহিমা ❑ ৫

উপন্যাস

মানুষ
সুমিত্রা ঘোষ — ৪১

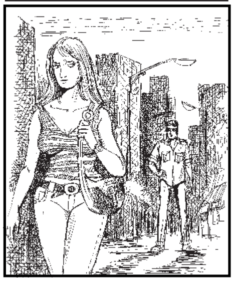

ছিন্নমায়া
নবকুমার বসু- ৯৬

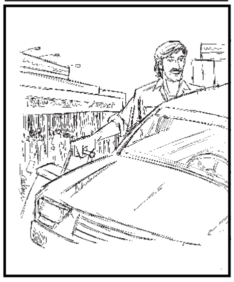

বৃত্তের বাইরে
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত
— ১৩৭

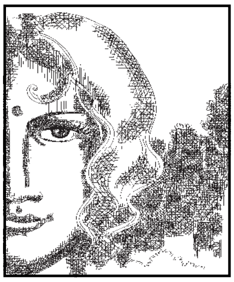

সুন্দরী এক নবাবজাদীর পাপপুণ্য
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
—২০১

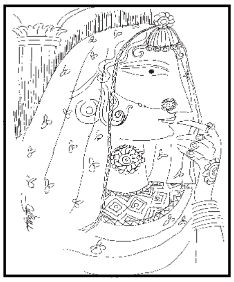

গল্প

শেখর বসু ❑ পরামর্শ ❑ ১৬
গোপালকৃষ্ণ রায় ❑ রয়টার ❑ ২৭
জিষ্ণু বসু ❑ উইসা ❑ ৭২
রমানাথ রায় ❑ চুমকি, ক্ষমা করো ❑ ৭৬
দীপঙ্কর দাস ❑ প্রতিবিম্ব ❑ ৮৫
গোপাল চক্রবর্তী ❑ কালবেলা ❑ ১২৫

রম্যরচনা

চণ্ডী লাহিড়ী ❐ গ্রামনাম এক রহস্যের জগৎ ❐ ১৯৭

প্রবন্ধ

শ্রী রঙ্গা হরি ❐ হিন্দুত্বের বিশেষত্ব ❐ ৭

তথাগত রায় ❐ কেন হিন্দুরা এরকম? ❐ ১২

দেবীপ্রসাদ রায় ❐ সাম্প্রতিক জাপান এবং আমাদের শক্তি ভাবনার পুনর্বিন্যাস ❐ ২২

অমলেশ মিশ্র ❐ বই নিষিদ্ধ করা একটি অপকর্ম ❐ ৩৬

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❐ চার্চিলের গোপন যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে ? ❐ ৬৬

নিখিলেশ গুহ ❐ সখারাম গণেশ দেউস্কর – শতবর্ষ পরে ❐ ৭৯

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❐ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও পশুপাখি ❐ ৯১

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ❐ হরিশ মুখোপাধ্যায় নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতীক ❐ ১২২

ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ ❐ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন জনপদে দেবী দুর্গার সন্ধানে ❐ ১৮৬

হরিপদ ভৌমিক ❐ ডি জি-র রবীন্দ্রনাথ ❐ ২২৩

অর্ণব নাগ ❐ বাঙালির ভাঁড়ারঘরের ইতিবৃত্ত ❐ ২২৯

চরিতকথা

বিজয় আঢ্য ❐ এক স্বয়ংসেবকের কথা : পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ❐ ১৬৬

ভ্রমণ কথা

সৌমেন নিয়োগী ❐ কিষ্কিন্ধ্যার দেশে ❐ ১৯৩

প্রচ্ছদ ঃ অসুরদলনী মা দুর্গা সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। **দাম ৫০ টাকা** ।।

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ।। বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস- ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন ঃ ৯৮৭৪০৮০৩৪২

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।।

আমিই ঈশ্বরী, আমি ধনদাত্রী, আমি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছি, অতএব আমিই যজ্ঞভাগীদিগের প্রধান। আমি সকল স্থানেই সর্বত্রই বর্তমান এবং সমস্ত পদার্থে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া আছি। তাদৃশ আমাকে যজ্ঞকারীরা সর্বত্র আমারই পূজা করিয়া থাকে।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

দেবী মহিমা

স্বামী শঙ্কর দেবানন্দ

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমিশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

দেবতাদের মহেশ্বরী রূপেও দেবীর আবির্ভাব ঘটে।

শুধুমাত্র মনুষ্যসমাজ বা জীবজগতের জন্যই দেবীর আগমন বা বিশেষ প্রকাশ—তাই নয়। পুরাণে আছে—দেবতারা অসুরকুলের দ্বারা অপমানিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত ও কোণঠাসা হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় একমন একপ্রাণ নিয়ে আন্তরিকভাবে দেবীর স্তব করেছিলেন তাঁদের উদ্ধারকল্পে।

সাধারণভাবে আমরা দেখি—ধীর স্থির শান্ত মাতৃরূপের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু দেবী শুধু নারায়ণের পদসেবা করার জন্যই নন। তিনি যে তেজঃময়ী দুর্গতিনাশিনী রূপেও আবির্ভূতা হতে পারেন—সেই তত্ত্ব দেবীপুরাণের মাধ্যমে আমরা জ্ঞাত হই। অতি বড় উগ্রচণ্ডা মহিষাসুর, সদাশিব মহাদেবের বরে ত্রিকালজয়ী হয়েও সীমাহীন অহংকার ঔদ্ধত্য আর মাতৃমূর্তি অবমাননার দায়ে পরাস্ত ও বিনাশপ্রাপ্ত হলেন সেই জাত শান্তময়ী দেবী দুর্গার কাছে।

দেবী বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে। কখনও কালী কখনও তারা, মহাবিদ্যা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মা বগলা রূপে। আবার কখনও দশপ্রহরণধারিণী চণ্ডী অর্থাৎ দেবী দুর্গা রূপে। অসুরকুলকে দমন ও নাশের জন্য এবং শান্ত দেবকুলকে রক্ষা করার জন্য দেবীর এহেন প্রকাশিত রূপ যা অলৌকিক হলেও মনুষ্য সমাজের কাছে লৌকিকতার মূল্য বহন করে।

মনুষ্য সমাজে কোনও কোনও পুরুষ ও নারী অশেষ গুণের অধিকারী। আবার অনেকেই আছে যারা অলসতার জীবনযাপন করে, তামসিকতার পথে এগিয়ে চলে। তমোগুণাশ্রিত এহেন দুর্বিনীত

মানুষের সংখ্যা যখন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং সারাদেশে যখন মানবিক চেতনার বিলুপ্তি ঘটে, সমাজে সর্বতোভাবে অসুরত্ব বা পশুত্বের প্রভাব উপর্যুপরি বৃদ্ধিলাভ করে, তখন সম্মিলিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চেতন বা অবচেতন মনে একমাত্র বিশ্বাসের উপর ভর করেই পরমা প্রকৃতির কাছে, আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে আন্তরিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের আকুতি জানায়। তখনই দেবীশক্তি প্রকটিতা হন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট এই জগৎকে রক্ষার জন্য।

কালিকাপুরাণেও দেখা যায়—অসুর অর্থাৎ কঠিনকে দমন করার জন্য সেই পরাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি মা কঠিন দেহ ধারণ করেছিলেন, যা আমরা কালীমূর্তি রূপে দেখতে পাই। তেজঃদৃপ্ত ভয়ংকরী জিহ্বা ললনাভীষণা মুণ্ডমালাপরিহিতা রক্তবর্ণ বস্ত্রাবৃতা সেই ভয়ংকরী দেবীমূর্তি জীবকুলের সুস্থজীবন রক্ষার্থে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। ভয়াল-ভয়ংকরের মধ্যেও যে সুন্দর সুস্থ জীবনের মহিমা ফুটে ওঠে তা এহেন দেবীমূর্তির মাধ্যমে আমরা জ্ঞাত হই।

এই প্রকাশিত জীবজগৎ মহামায়ার সন্তানরূপী। কোনো মাতাই তাঁর সন্তানের বিনাশ চান না। কিন্তু, যখন সে আদর্শচ্যুত হয় তখনই সে তাঁর মৃত্যুবান নিজেই ডেকে আনে। মা কেবল উপলক্ষ মাত্র। তিনি সুস্থ-সুন্দর ধর্মপ্রাণ মানুষকে, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে সর্বসময় আড়াল করে বাঁচিয়ে রাখেন। আমরা যদি প্রকৃতই মায়ের সন্তান হতে চাই, তাহলে অন্যায়-অশুভ মার্গের চিন্তা থেকে প্রবৃত্তি মার্গের চিন্তা থেকে এবং অমানবিক চিন্তার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতেই হবে। যা কিছু নিম্নগামী চিন্তা, তা জোরালো আর দৃঢ়। আমাদের মন-চেতন আর বিবেককে এই নিম্নগামী চিন্তার থেকে অধিকতর দৃঢ় করতে পারলেই অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটবে। তাই চাই সত্য ও শুভ-এর মনন-চিন্তন, পূজন ও সাধন। মাতৃরূপা সনাতনী সর্বমঙ্গলময়ী চিরন্তনী মা তাঁর সৃষ্ট জীবজগৎকে রক্ষা করার জন্য তাঁর করুণাময়ী রূপে আমাদের কাছে সর্বদাই উন্মোচিত রাখেন। এই দয়াশীলা জননীর যদি প্রকৃত সন্তান আমরা হতে পারি, জীবজগতের সকল জীবের প্রতি যদি একাত্মবুদ্ধি রাখতে পারি তাহলেই সমুদয় হিংসার কবল থেকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া মানসিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবো।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা—তোরা মানুষ হ। প্রকৃত মানুষ এই অনিত্য জগতের কোনও প্রলোভনের দ্বারাই বদ্ধ বা বাধ্য হন না। স্বামীজীর ভাবনাপ্রসূত সেই প্রকৃত মানুষের যে সদা তেজী ভাব, তা প্রকৃত মায়েরই রূপ। চিরমুক্তময়ী মা। তাঁর বসন চতুর্দিক। তিনি জ্ঞাননেত্রের দ্বারা পরিচালিত। তাঁর বিবেক-বুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তিনি এলোকেশী। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁর স্বরূপ। তাই কোনো আবরণই তাঁকে আবরিত করতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে তিনি রূপ বদলান রং বদলান। কোনো রং বা রূপই তাঁর চিরস্থায়ী নয়।

চণ্ডীতে আছে—রূপং রূপং প্রতিরূপং বহু ব।

জীবের কল্যাণের তাগিদে তিনি রূপ থেকে রূপান্তরে যান। তাঁর প্রকৃতস্বরূপ চিরন্তনী। তাই সদা নূতনত্বই তাঁর মহিমা। তাঁর চার হস্ত ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের প্রতীক।

আবার, দেবী দুর্গার দশটি হাত। দশপ্রহরণধারিণী। অর্থাৎ সর্বদিক থেকেই সর্বস্থানেই তিনি বিরাজমানা—এই মহিমা প্রকাশিত হয়।

তিনি সদাপ্রসন্নময়ী—এই দৃশ্য কে দেখতে পান?

যিনি নিরহংকারী বিষয়শূন্য। যিনি জগতের প্রলোভনে প্রলোভিত হন না। আপেক্ষিক ও ইন্দ্রিয়জ জগৎ যার কাছে প্রহসনমাত্র। যিনি জগৎকে নিয়ে খেলছেন। তিনিই দেখেন মায়ের সদাপ্রসন্নময়ী রূপ। মায়ের আনন্দময়ী রূপ।

আনন্দের থেকেই তাঁর সৃষ্টি, আনন্দের মধ্যেই তিনি অবগাহন করেন, আনন্দের মধ্যেই তাঁর রূপের লয় হয়। তাই মা হলেন আনন্দময়ী।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমোহস্তু তে।

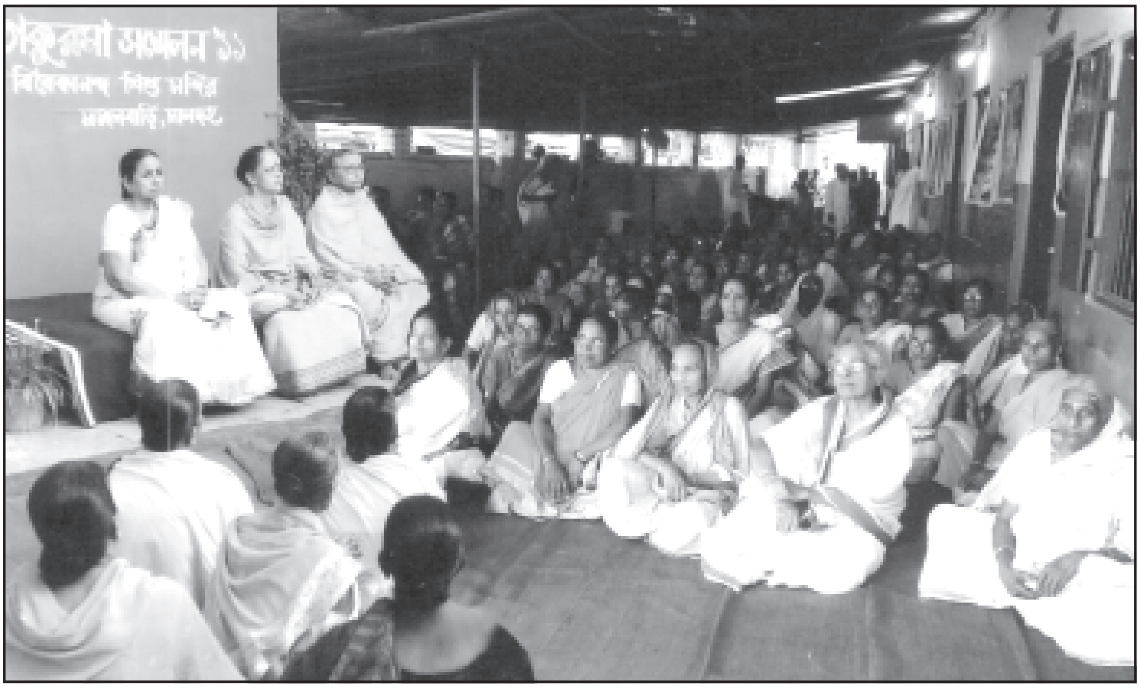

হিন্দুত্বের পরিবার ভাবনা— ঠাকুমা সম্মিলন।

হিন্দুত্বের বিশেষত্ব

শ্রী রঙ্গা হরি

হিন্দুত্ব ও হিন্দুদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটি বুঝতে হলে হিন্দুত্ব শব্দটির বাস্তবিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। হিন্দুত্ব বা "Hinduness" কথাটির অর্থ হলো সামাজিক দিক দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দুদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব। মানুষের উদাহরণ দিয়ে আমরা এই কথাটা বোঝাতে পারি। মানুষের নিজস্ব গঠন ও রূপ আছে। প্রতি মানুষের মধ্যে একই রকমের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। তাই সাধারণভাবে মানুষে মানুষে কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এমনটি হয় না। প্রতি মানুষ অন্যজন থেকে পৃথক। যমজ সন্তানদের অনেক সময় একরকম দেখতে হয়। তাদের মধ্যে এমনই মিল থাকে যে বাবা-মায়েরও আলাদা করে চিনতে ভুল হয়। কিন্তু এই দুই যমজ সন্তান যখন ধীরে ধীরে বড় হয়, তখন তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় এবং যার ফলে তারা পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। মহাভারতের যমজ ভাই নকুল এবং সহদেবের কথা ধরা যাক। যদিও তারা একই পরিবেশে মানুষ হয়েছিল, তবু তারা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। সহদেব হয়েছিলেন অসাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং নকুল হয়েছিলেন পশুপালনশাস্ত্র বিষয়ে পারদর্শী। এটাই হল নির্বিশেষ থেকে বিশেষে উত্তরণ। আসল মানুষের পরিচয় বাহ্যিক আকৃতি দিয়ে নয়, আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে।

ব্যক্তির সম্বন্ধে যা সত্য তা সমাজ ও জাতির সম্বন্ধেও সত্য। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হিন্দুরা সবচেয়ে প্রাচীন। তাদের ভৌগোলিক পরিবেশ, ইতিহাস ইত্যাদির জন্য তাদের আলাদা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। এবং সেটাই হিন্দুত্ব। আমি ইচ্ছে করে ইংরাজী "Hinduism" শব্দটি বলছি না। কারণ এই শব্দটা আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রণোদিত করে— যা কিনা হিন্দুস্থানেই সৃষ্ট হয়েছে। "Hinduness" হলো হিন্দুদের পৃথক ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা। অপর দিকে "Hinduism" হলো হিন্দুদের নানা দর্শন ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সংজ্ঞা। এমন নয় যে "Hinduness" হিন্দু ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসগুলির

সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বা এড়িয়ে যায়। "Hinduness" আসলে সমাজকে আরও বড় পরিধির মধ্যে দেখে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। "Hinduism" এর মধ্যে নাস্তিকদের স্থান নেই। অপর পক্ষে হিন্দুত্ব বা "Hinduness" সমাজের সবরকম চিন্তা, অনুভূতি ও আবেগের আধার। এই "Hinduness" সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনার দরকার।

"Hinduness"-কে বুঝতে গেলে ধর্ম তত্ত্ব বিষয়ে জানা দরকার। ধর্ম এমনই একটা শব্দ যার সঠিক অনুবাদ অন্য কোনও ভাষায় আজও হয়নি। ধর্ম যেন ব্রহ্মাণ্ডের শাশ্বত বিধান। ধর্ম শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো যা ধারণ করে। এখানে প্রশ্ন, কোন বিষয়কে ধারণ করতে হবে?

এর উত্তর হলো সমস্ত সৃষ্টি ও তার নানা রূপ। প্রাচীন ঋষিরা বলেন, মহাবিশ্বের এক শক্তি, নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিল এবং তার ফলে সৃষ্টি হলো বিশ্বের। আর যেহেতু যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে সবই পূর্বের অংশ তাই এদের মধ্যে রয়েছে অখণ্ড অবিভাজ্য বন্ধন। এক শক্তি সমস্ত বিচ্ছিন্ন অংশকে বেঁধে রেখেছে। এরকমই একটি শক্তি হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যা গ্রহদের ধরে রেখেছে। তাই সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে একটি মহাশক্তি ছিল, যা সমস্ত বিচ্ছিন্ন, পৃথক সজীব বা নির্জীব যা কিছু সবাইকে কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে রেখেছে। এই মহাশক্তির কাজ ছিল বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ছন্দোময় বা নিয়মানুবর্তী করা। প্রাচীন ঋষিদের কথায়, এই শক্তির নামই হলো ধর্ম। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন—

"ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা ধর্ম সর্বং
প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি।"
(মহানারায়ণোপনিষদ্, ৩১:৬)

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম বলতে 'রিলিজিয়ন' বোঝেন। কিন্তু রিলিজিয়ন হলো মত বা সম্প্রদায়— ধর্ম নয়। ধর্ম হলো মহাবিশ্বের অপ্রতিহত ধারণকারী শক্তি আর রিলিজিয়ন হলো কোনও নির্দিষ্ট মতে বিশ্বাস ও বিধান— যা আত্মা, মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে সম্পর্কযুক্ত। এটা শুনতে আশ্চর্য মনে হবে। কিন্তু বস্তুত ধর্ম হলো রিলিজিয়ন বা উপাসনা পদ্ধতির ঊর্ধ্বে। ধর্মের বিধান একজন অজ্ঞেয়বাদীর উপরে প্রযোজ্য এবং অজ্ঞেয়বাদীকে এই বিধান মেনে চলতে হবে। যদি এই অজ্ঞেয়বাদী মহাবিশ্বের চিরন্তন নীতিকে মেনে চলে তাহলে সে "Hinduness"-কে মেনে চলছে ধরে নিতে হবে। "Hinduness" অনুসারে ভাল ও মন্দর মধ্যে বিভাজিকা রেখা হলো ধর্ম— রিলিজিয়ন (উপাসনা পদ্ধতি) নয়। সৎ মানুষকে ধার্মিক বলা হয়, আর মন্দ মানুষকে বলা হয় অধার্মিক। লঙ্কার রাজা রাবণ শিবের মহাভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাকে মন্দ বলা হয়েছে, কেননা তিনি মহাবিশ্বের নীতি ও বিধান মেনে চলেননি। অপরপক্ষে দার্শনিক কণাদকে ঋষি বলা হয়েছিল অথচ তিনি ছিলেন ঘোর নাস্তিক। তিনি তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে কখনও আপোষ করেননি।

ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশী উপদেশ। তিনি অধর্মকে দমন করার জন্য জন্মগ্রহণ করবেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা

অবিশ্বাসের কথা বলেননি। মোদ্দা কথা হলো— ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার, ঈশ্বর ও ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে সীমিত।

এখানে নাস্তিক বা আস্তিক ব্যাপারটা অপ্রধান। "Hinduness" বা হিন্দুত্ব বিশ্বনিয়ামক মহাশক্তিকে নিয়ে চিন্তা করে।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের কথা বলছি, যেখানে তামিল, মালয়ালম, কানাড়া ও তেলেগু ভাষা প্রচলিত। এইসব ভাষায় কখনও ধর্ম বলতে রিলিজিয়নকে বোঝায় না। এই সব ভাষাগুলিতে রিলিজিয়ন-এর পৃথক শব্দ আছে। সেটি হল 'মত'। এইসব ভাষাভাষীরা রিলিজিয়ন অর্থে মত বলে। ধর্মকে ধর্মই বলে। বাংলায় কিন্তু রিলিজিয়ন-এর কোনও প্রতিশব্দ নেই।

হিন্দুত্বের দুটি বিশেষত্ব— একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা। এই দুই বৈশিষ্ঠ্যই আমাদের যুগোপযোগী করতে শেখাবে। সভ্যতার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। হিন্দু ধর্মে অবতারের কথা আছে। সেই অবতারের মতো যুগে যুগে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে।'

বিভ্রান্তিটা কখন আসে বলুন তো? যখন ধর্ম শব্দটা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা একটু সতর্ক হই, তাহলে এই বিভ্রান্তিটা এড়ানো যাবে। মূল কথা হলো, বিশ্বচিন্তার ক্ষেত্রে ধর্ম হলো হিন্দুত্ব-এর সবচেয়ে বড় অবদান।

এবার আমি দ্বিতীয় বক্তব্যে আসি। বহুকে দেখা, তাকে শ্রদ্ধা জানানো, তাকে গ্রহণ করা হলো "Hinduness"-এর দ্বিতীয় অবদান। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই বিষয়ে বলেছেন—

''অবিভক্তং বিভক্তেস্তু তদ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।

(গীতা, ১৮/২০)

(বিশুদ্ধ জ্ঞান বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অবিচ্ছিন্নতাকে দেখে)।

এই অনুভবের জন্য হিন্দুরা বহু দেবতার মধ্যে এক ঈশ্বরকে দেখেছেন বা জেনেছেন। এই অনুভবের বলেই তাঁদের ঋষি বলেছেন— ''একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" (ঋক বেদ ৬৪/৪৬) (সত্য এক, কিন্তু জানী ব্যক্তিরা এটিকে নানাভাবে ব্যক্ত করেন)। এই অনুভবের জন্য হিন্দুরা সারা দেশে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির বড় বড় মন্দির একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। আমি ব্রহ্মদেশে (এখন মায়ানমার) দেবীর মন্দির দেখেছিলাম যেখানে পাশাপাশি বুদ্ধেরও মন্দির আছে। অনুরূপভাবে পরিক্রমা মার্গে অবস্থিত বৃহত্তম বুদ্ধমন্দির সুবর্ণ প্যাগোডার পাশাপাশি রাহু কেতু সহ নবগ্রহের পূজা হতে দেখেছি। কিন্তু গোয়ার কথা ভাবুন তো। সেখানে ৪৫০ বছর ধরে যে রোমান ক্যাথলিক সরকার রাজত্ব করেছিল তারা ওই সময়ের মধ্যে পরমতাবলম্বী চার্চ নির্মাণেরও অনুমতি দেয়নি।

হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই। তাদের কাছে সমস্ত একই সত্য বা ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। হিন্দু ধর্মে ঋষিরা তাঁদের মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে একাধিক দেবদেবীকে আহ্বান জানিয়েছেন— ''ন হি দেবো ন মত্যো মহস্তঃ ক্রতুং পরঃ মরুদ্‌ভিগ্ন আগহি" (ঋক বেদ, ১.১৯— ১-৯) (অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি একাধিক দেবতাকে নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য একবাব. নয়, একাধিকবার আহ্বান করেছেন।)

ধরা যাক একজন তীর্থযাত্রী রামেশ্বরম্ থেকে হরিদ্বার যাবেন। পথে তিনি দেখবেন মাদুরাইতে মীনাক্ষী, তিরুপতিতে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর, শ্রীশৈলমে ভগবান শিব, বারানসীতে বিশ্বনাথ এবং কালভৈরব, হনুমানগড়িতে মারুতি এবং শেষপর্যন্ত তিনি যখন হরিদ্বারে এসে পৌঁছাবেন তখন তাঁর মন আনন্দে ভরে যাবে এই ভেবে যে, পরমকারুণিক সর্বশক্তিমান তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। তাহলে আপনি কী করে বলবেন হিন্দুরা বহুঈশ্বরবাদী? বহু দেবতার মধ্যে হিন্দুরা এক ঈশ্বরকে পূজা করে। এখানে ইহুদি প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। ওদের ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন, একাকী। হিন্দুদের অনেক দেবদেবী আছে বটে, কিন্তু তারা এক পরম ঐশী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দুত্ব-এর ধারণা অখণ্ড, বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন একাধিক দেবদেবীর ক্ষেত্রে তেমন হিন্দুত্ব মানব জাতিকেও অখণ্ডভাবে দেখে— বিচ্ছিন্নভাবে নয়। হিন্দুরা খুব ভালোভাবেই জানে যে, এই বিশ্বে বহুজাতির মানুষ বসবাস করে। বিচিত্র তাদের ভাষা, বিচিত্র তাদের আচার-বিচার, বিচিত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গী। তবু সবাইকে সুখ ও শান্তির সঙ্গে একত্রে বাস করতে হবে। হিন্দুত্ব বিশ্বের চারিদিকে এই বৈদিক মন্ত্র প্রচার করেছে—

''জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং

নানাধর্মাণং পৃথিবী য থৌকসম্।"

(অথর্ব বেদ— ১২.১.৮৪)

হিন্দুত্ব মানুষের মধ্যে আদর্শ বিশ্ব নাগরিকত্ব ও বিশ্বপরিবার দেখেছে। হিন্দুত্ব মানব সমাজকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দু'ভাগে ভাগ করে না, বাড়িয়ে তোলে না ছুঁৎমার্গ— যা কিনা ইহুদি প্রভৃতি সেমিটিক মতাবলম্বীদের নীতি।

হিন্দু ধর্মের চোখে বিশ্বপরিবার বলতে শুধু মানুষ ও ঈশ্বরকে বোঝায় না। বোঝায় সমস্ত জীব জগতকে। সেমিটিক মতবাদ সমস্ত সজীব পদার্থের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব দেখেনি, কিন্তু হিন্দুরা দেখেছে।

ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হয়েও তাদের মধ্যে দেবত্ব নেই এমন যুক্তি হিন্দুত্বের প্রবক্তাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। এ যেন চিনি থেকে তৈরি মিষ্টান্নর মধ্যে মিষ্টি না থাকার মতো অসম্ভব কথা।

সেমিটিক তাত্ত্বিকরা নারীর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন। ওঁদের যুক্তি ছিল, মানুষের হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি। এ কেমন যুক্তি? একটি বৈদ্যুতিক তার দু'খণ্ড করলে অন্যটির মধ্যে কি বিদ্যুৎ থাকে না? অথচ আমাদের সেমিটিক বন্ধুরা এই যুক্তি আঁকড়ে থাকবেন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস অন্য রকম। তার বিশ্বাস ঈশ্বরের ডি এন এ-তে এবং ঈশ্বরের সীমাহীন অভিব্যক্তিতে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, (১০-১২) ঈশ্বর সর্বভূতে উপস্থিত। তিনি 'সর্বভূতাশয়স্থিতঃ' (১০/২০, গীতা) শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব হিন্দুত্ব সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টিকে বলেছে— চর ও অচর। প্রতিটি জীবের পৃথিবীতে সম-অধিকার নিয়ে বাঁচার অধিকার রয়েছে।

হিন্দুত্ব আরও শিখিয়েছে, 'ভূমে মাতার্নি দেহি মা ভদ্রায়ে সুপ্রতিষ্ঠিতম্'' (অথর্ব বেদ — ১২/১/৬৩)। অর্থাৎ পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তাঁর সন্তান। সকলে তাঁর সমান স্নেহ ও সুরক্ষা পাবার অধিকারী।

এই বিশ্বাস হিন্দুত্ব-র প্রবক্তাদের মনে পরিবেশ সচেতনতা জাগিয়েছিল। এই বিশ্বাস থেকে বাল্মীকি দেখিয়েছেন যে সীতা হরণের সময় বনের লতাগুল্ম কিভাবে কেঁদেছে, জটায়ু অপহরণকারীকে বাধা দিতে গিয়ে আত্মত্যাগ করেছে। এই বিশ্বাস থেকে কালিদাস ফুটিয়ে তুলেছেন পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার বিরহে হরিণদের ক্রন্দনময় দৃশ্য। এই বিশ্বাস থেকেই ভর্তৃহরি সমস্ত বস্তুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

মার্তমেদিনী, তাত মারুত, সখেতেজঃ, সুবন্ধা জল, ভ্রাতর ব্যোম, নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্য প্রণামাঞ্জলিঃ। যুষ্মদনঙ্গবশোপজাত-সুকৃত স্কারস্ফুরন্নির্মল জ্ঞানাপাস্ত সমস্ত মোহমহিমা লিয়ে পরব্রহ্মাণি।। (বৈরাগ্যশতকং ১০০)

—ও গো জননী পৃথিবী, পিতা বায়ু, সখা অগ্নি, বন্ধু জল, ভ্রাতা আকাশ— তোমাদের আশীর্বাদ পেয়ে আমি পেয়েছি পরম শান্তি।

পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটিকে 'কিন্ডারগার্ডেন' গ্রন্থ বলা যেতে পারে। কেননা সেখানে তুমি পরিবেশ, পরিবার পাবে, যেখানে পশুপাখী, মাছ, মানুষ রয়েছে পাশাপাশি। সেখানে এরা সবাই দৈনন্দিন জীবনের ভাগীদার। আধুনিক যুগের পরিবেশ বন্ধুত্ব হিন্দুত্ব-র ব্যাপ্তির কাছে যৎসামান্য। বিশ্বগ্রাম নয়, বিশ্ব পরিবার —'বসুধৈব গ্রামকম্' নয়, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হিন্দুত্বর লক্ষ্য।

এবার মানুষের প্রসঙ্গে আসা যাক। মানুষের মধ্যে রয়েছে চিন্তা করার অসাধারণ ক্ষমতা। তার রয়েছে বুদ্ধি, যা তাকে অন্য জীব থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির জন্য সে অবাধে মৌলিক চিন্তা করতে পারে। এখানে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ স্মর্তব্য —

''শকুনিনমিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকো যথা পদং দৃশ্যেব তথা জ্ঞানবিদাং গতি।''— মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮১/১১। (বৎস, মহাকাশে পাখীরা যেমন উড়ে যায়, মাছেরা যেমন অসীম সমুদ্রে চলে বেড়ায়, তেমনি জ্ঞানীরা বহু পথের পথিক।

হিন্দুত্ব মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির উপর বা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে দাঁড়ি টেনে দেয় না। হিন্দুত্ব সদাসর্বদা সত্যানুসন্ধানে প্রেরণা যোগায়। বহির্জগতের বিষয়ে অনুসন্ধানকে বলে বিজ্ঞান ও অন্তর্জগত সম্বন্ধে অনুসন্ধানকে বলে দর্শন। এই দুটি একই জিনিস। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মর্তব্য— বৃক্ষের সামগ্রিকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'গাছের শাখাগুলি হলো মাটির উপরের শিকড়।'

অন্যদিকে অনুরূপভাবে বলা যাবে বাহ্য জগৎ থেকে আবিষ্কৃত সত্য হলো বিজ্ঞান, আর অন্তর থেকে অনুভূত সত্য হলো আধ্যাত্মিকতা। তুমি বলো না— আমি সত্যকে পেয়েছি, বলো আমি সত্যের সামান্য অংশ পেয়েছি। এর অর্থ হলো হিন্দুত্বে অনুসন্ধানের শেষ নেই। এর ফলে অনুসন্ধানকারীর চিন্তার গভীরতা ও কর্মের ব্যগ্রতা জন্মায়। এই কারণেই আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য প্রমুখ মনীষীরা সূর্য ও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তৎকালীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলেও ঋষি রূপে পরিগণিত হয়েছেন। তেমনি বুদ্ধ, শঙ্কর, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা সমকালীন আচার, বিচারের বিরুদ্ধাচারণ করেও সাধক হিসাবে পূজিত হয়েছেন। হিন্দুত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে গেলে আমরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, ব্রুনো ভারতে জন্মগ্রহণ করলে ঋষিসভায় স্থান পেতেন। তেমনি যীশুখৃস্টও ক্রুশবিদ্ধ তো হতেনই না, উপরন্তু পরমহংসরূপে বিবেচিত হতেন।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর কেন নির্যাতন হয়? এর কারণ হলো মহান অনুভূতির অভাব। গোঁড়ামি এবং শক্তিমদমত্ততা হলো এর মূল কারণ। এই জিনিসটাই আমরা প্রথম শতাব্দীতে ইহুদীদের বেলায়, চতুর্থ শতাব্দীতে সিরিয়ান খৃস্টানদের বেলায়, অষ্টম শতাব্দীতে পার্শীদের বেলায় দেখেছিলাম। অসহিষ্ণু জাতিদের দ্বারা তারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এখানেও হিন্দুদের উদারতা। হিন্দুদের দেশে এই বিতাড়িত জাতিরা পেয়েছিল আশ্রয়। প্রতিটি গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল তাদের বিশ্বাস, আচারবিচার রক্ষা করার অবাধ স্বাধীনতা। এই ঔদার্যের ব্যাপারে গুজরাট, কোঙ্কন এবং কেরলও পিছিয়ে ছিল না। মোট কথা, কোনও বহিরাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ভারতে নির্যাতিত হয়নি যেমন হয়েছে পাকিস্তানে।

এতক্ষণ আমি হিন্দুত্ব-র বিশেষত্বের কথা বললাম। এখন প্রশ্ন হলো— আজও কি হিন্দুত্বের প্রাসঙ্গিকতা আছে? উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ'। শুধু যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক নয়, আগের চেয়ে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে অনেক সংস্থার আবির্ভাব হয়েছে, যারা হিউম্যান রাইট, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে নানা বক্তব্য রাখে, নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকে। আপনি এই সব বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত ভাল করে ভেবে দেখুন— এগুলি সেই সনাতন হিন্দু ধর্মের বিধানের প্রতিধ্বনি।

আজকের দিনে যখন সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে তখন প্রশ্ন উঠবে— হিন্দুত্ব কি এর মোকাবিলা করতে পারবে? আমার বিশ্বাস

হিন্দুত্ব এই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারবে। কেননা, হিন্দুত্বের উপযোগিতা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুত্ব-র অন্তর্নিহিত একটা শক্তি আছে। দু'দিক দিয়ে এই শক্তি বিচার্য। প্রথমত, আচরণের দিক থেকে, দ্বিতীয়ত, আঙ্গিকের দিক থেকে।

প্রথমত, আচরণগত দিক থেকে হিন্দুত্ব কখনও অচল হয়ে যায় না। এর নিজেকে চিরনতুন করার প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে। সঙ্গীতের বিষয় ধরা যাক। অনেকের মতে, সামবেদ ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস। তারপর যুগ যুগ ধরে এই সঙ্গীত পরিণতি লাভ করেছে। তারপর ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা তাদের বেহালা ও 'অক্টেভ' স্বরলিপি নিয়ে এল। আমাদের ক্লাসিক্যাল শিল্পীরা তা দেখল এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় সঙ্গীতে সপ্তস্বরের মধ্যে তার মেলবন্ধন ঘটাল। আজকের দিনে সারা দেশে কত না বেহালা বাদক আছে, আছে কত না কর্ণাটক সঙ্গীতজ্ঞ, যাদের সঙ্গীতে কোনও কৃত্রিমতা নেই।

এবার দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করছি। মহাভারতের একটি কাহিনী দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। একদা সর্বভূক সমুদ্র সমস্ত নদীদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন। সমুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমরা সবাই আমার অধীন এবং তোমাদের আমাকে উপঢৌকন দেওয়ার কথা। কিন্তু তোমরা আমাকে আকাশচুম্বী গাছ পাঠাচ্ছ। এগুলি চিবানো ও হজম করা খুব কঠিন। বেত্র গাছ খুব নরম, সরু এবং মিষ্টি। তোমরা আমাকে এই বেত্র গাছ এনে দাও না কেন?

নদীরা সভয়ে এর ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। পরে গঙ্গাকে ওদের প্রতিনিধি করে উত্তর দিতে বলল।

গঙ্গা বললেন, 'মহাত্মন্, আমরা যে চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু মজা হলো, গাছগুলি খুব দুষ্টু। ওরা আমাদের একদম সম্মান দেয় না, সবসময় হেয় করে। রেগে আমরা স্ফীত হয়ে ওদের আক্রমণ করি। আঘাত সহ্য করতে না পেরে এই বিরাট দৈত্যসম বৃক্ষগুলি আমাদের স্রোতে তলিয়ে যায়। এই ভেসে যাওয়া গাছগুলি আমরা আপনাকে ভেট দিই।'

গঙ্গার উত্তরে সমুদ্র অসহিষ্ণু হয়ে বললেন— তা তো বুঝলাম, কিন্তু বেত্রগাছ পাঠাও না কেন?

গঙ্গা বললেন, 'প্রভু, বেত্রগাছের কথা আলাদা। এরা খুব দিলখোলা। ওরা আমাদের তীরে জন্মায়, আমাদের সঙ্গে খেলা করে। কখনও আমাদের হেয় করে না। ওরা ঝোপের মধ্যে থাকে। ওদের ছোট বা বড় কাণ্ড নেই। আগাগোড়া এরা এক দণ্ড বিশেষ। আমরা ওদের মূলোৎপাটন করতে পারি না, কেননা ওদের কেন্দ্রীভূত কোনও মূল নেই। কোথায় ওদের আঘাত করব সেটাই হলো সমস্যা। আমরা ওদের ভিতর দিয়ে বয়ে যাই। তারা বাধা দেয় না। ওরা যদি আমাদের স্রোতে ডুবে যায়, তবু ওরা কিছু মনে করে না। তারা মাটি ধরে থাকে। আমরা যখন চলে যাই ওরা আবার উঠে দাঁড়ায়, আরও সতেজ, আরও উজ্জ্বল হয়ে। মিস্টি হেসে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, 'আহা, তোমরা কী চমৎকার! আমাদের চান করিয়ে দিয়েছ। আমাদের শরীর জুড়িয়ে গিয়েছে। দয়া করে কাল আবার কিন্তু এসো।"

বুঝতে পারছেন তো এই গল্পের উপদেশ কি? ব্যাসদেব একে বলেছেন, বেতসবৃত্তি। আঙ্গিকের দিক দিয়ে হিন্দুত্ব এই বেতসবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ। যার মূল কথা বলিষ্ঠতা।

যা বলতে চাইছিলাম— হিন্দুত্বের দুটি বিশেষত্ব— একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা। এই দুই বৈশিষ্ট্যই আমাদের যুগোপযোগী করতে শেখাবে। সভ্যতার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবে। হিন্দু ধর্মে অবতারের কথা আছে। সেই অবতারের মতো হিন্দুত্ব যুগে যুগে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে।'

পুণা-তে বিশ্ব সঙ্ঘ শিবিরে (২০১১) প্রদত্ত ভাষণের
কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী কৃত বঙ্গানুবাদ।

২০০৫ সালে দীপাবলীর রাতেই হিন্দু ধর্মগুরু জয়েন্দ্র সরস্বতী গ্রেপ্তার।

কেন হিন্দুরা এরকম ?

তথাগত রায়

মানুষের চেয়ে অনেক নীচ প্রাণী, একটা সাপ বা বেড়ালের লেজে পা পড়লে সে ফোঁস করে ওঠে। মানুষের মধ্যেও অতি দরিদ্র, আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অরণ্যবাসীরও যদি ঘর ভেঙে দেবার চেষ্টা করা হয়, বা মহিলার দিকে লোভের হাত বাড়ানো হয়, তাহলে সে উল্টে মারতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের যে কোনও মানুষকে যদি কোনওভাবে হেনস্থা করা হয়, তাহলে সে প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করবেই, প্রতিপক্ষ যদি প্রবল হয়, তবুও। এর আধুনিকতম উদাহরণ পাকিস্তানে ওসামা বিন লাদেন নামক নরপশুকে খুঁজে বের করে আমেরিকার তাকে হত্যা। কারণ সে আমেরিকার মাটিতে বহু নিরপরাধ মানুষের হত্যা ঘটিয়েছিল। শুধু একটি ব্যতিক্রম আছে। তার নাম— হিন্দু।

এই ব্যতিক্রমের চেহারাটা কী? সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলা প্রবাদ। কিল খেয়ে কিল চুরি করা। হিন্দুর স্বভাব, অন্তত বহু হিন্দুর স্বভাবের মধ্যে আমরা একটা অদ্ভুত কুকীর্তি গোপন করার চেষ্টা দেখতে পাই— আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সে কুকীর্তি নিজের নয়, অন্যের এবং নিজের বিরুদ্ধে ধাবিত। আমি যদি মানুষ খুন করি, লোকের ঘরে আগুন দিই, নারীহরণ করি, তাহলে সেটা গোপন করার চেষ্টা আমি করবই। সেটা গর্হিত, কিন্তু একই সঙ্গে স্বাভাবিক। অপরপক্ষে আমাকে যদি কেউ খুন করার চেষ্টা করে, আমার ঘরে আগুন দেয়, আমার মা-বোনের হাত ধরে টানাটানি করে তাহলে আমার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হবে? অবশ্যই, যে কোনও আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে, যাকে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— ‘প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা, প্রয়োজন হলে প্রতিশোধ নেওয়া’। কিন্তু যদি উল্টে আমি সেই হত্যাকারী, ঘরপোড়ানে বা কামুকের কাজের সপক্ষে সাফাই দেবার চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে কি বলা হবে? ‘মহান’? ‘ক্ষমাশীল’? ‘উদার’? নাকি বলা হবে ক্লীব, নপুংসক?

কোনটা বলা হবে সেটা মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মূল্যবোধ ঠিক না ভুল সেটা কি করে সাব্যস্ত হবে? সম্ভবত এটাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। মূল্যবোধ সামাজিক অবস্থার উপরে, ক্রমবিকাশের উপরে, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে, এমনকী ভৌগোলিক অবস্থানের উপরেও নির্ভর করে। একটা ছোট উদাহরণ দিই— শীতপ্রধান দেশের মানুষের কাছে রোদ জিনিসটা এত প্রিয়, যে সামান্য রোদ উঠুক বা একেবারে চাঁদিফাটা গরমই পড়ুক, তারা রোদ উপভোগ করার জন্য পাগল হয়ে যায় এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমুদ্রতীরে এসে প্রায় নগ্ন বা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি ভৌগোলিক অবস্থানজনিত এবং আমাদের চোখে বিকট, কিন্তু ওদের জিজ্ঞাসা করলে ওরা আশ্চর্য হয়ে বলবে, এতে আপত্তি করার কি আছে? আমি নগ্ন হয়ে রোদে শুয়ে আছি, আমি তো কারুর কোনও ক্ষতি করছি না। অপরপক্ষে, ধর্মীয় বিশ্বাস এই একই ব্যাপারে মানুষকে এমন উল্টোপথে চালনা করে, যে ভাদ্র মাসের অসহ্য ভ্যাপসা গরমেও রক্ষণশীল মুসলমান মহিলাকে বোরখা নামক তাঁবু পরিধান করে ঘুরতে হয়। সেই মহিলা যে সবসময় ব্যাপারটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেন তা নয়, প্রবল ধর্মবিশ্বাসে চালিত হয়েই হয়ত করেন, এবং কেউ আপত্তি করলে একই উত্তর দিতে পারেন— আমি তো কারুর ক্ষতি করছি না!

সামাজিক অবস্থার উপর মূল্যবোধের ভিত্তিটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ— এই হিন্দু বাঙালি সমাজেই কলকাতার উচ্চবিত্ত পরিবারে ধরা যাক মদ্যপানের বিষয়ে যে মূল্যবোধ বিদ্যমান তা গ্রামের বা মফঃস্বল শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের মূল্যবোধ থেকে অনেকটাই আলাদা। ক্রমবিকাশের উপরেও মূল্যবোধ নির্ভরশীল— একসময় হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ বা নরবলি প্রচলিত ছিল, অনেকে বলেন, (আমার সন্দেহ আছে) বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণও নাকি প্রচলিত ছিল, আজকের দৃষ্টিতে এর প্রথম দুটি ঘৃণ্য, তৃতীয়টিও নিরানব্বই শতাংশের দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। খৃস্টানদের মধ্যে মধ্যযুগে অবিশ্বাসী বা ডাইনি সন্দেহে মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত (যেমন জোয়ান অফ আর্ক-কে হয়েছিল), পোপ দশম লিও ঘুষ নিয়ে লোকের পাপস্খলন করে দিত (যার প্রতিবাদে মার্টিন লুথার, কলভিন ইত্যাদিরা পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন) আজকের খৃস্টান সমাজে নিশ্চয়ই কেউ এসব সমর্থন করবেন না। এই ক্রমবিকাশ ব্যাপারটা কিন্তু থমকে দাঁড়িয়েছে ইসলাম ধর্মে। ইসলামে কোনও প্রশ্ন করার বা সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কোরাণ (অর্থাৎ আল্লাতালার মুখনিঃসৃত বাণী) এবং হাদিস (অর্থাৎ শেষ নবী হজরত মহম্মদ যা বলতেন, করতেন, বা অনুমোদন করতেন)-কে একেবারে অনুভাবে মানতে হবে। যারা তা মানবে না তাদের বলা হবে 'মুনাফেক'। অর্থাৎ মুসলিম মূল্যবোধ পুরোপুরি ধর্মাশ্রয়ী এবং আদৌ ক্রমবিকাশযোগ্য নয়। এমনকী ইসলাম ধর্মে ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই, বলা হয়ে থাকে ব্যাখ্যা বা 'ইজতেহাদ'-এর দরজা খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গেছে।

এত কথা বলা হলো শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে, যে কোনও সমাজের মূল্যবোধ তৈরির নানা উপাদান আছে। সেই উপাদানের ভিত্তিতে মূল্যবোধ তৈরি হয়। কিন্তু যে চারটে উপাদানের কথা বলা হলো, সেগুলো ছাড়া কি মূল্যবোধের কোনও উপাদান আছে! উত্তর, হ্যাঁ আছে, অন্তত ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে আছে। সেই উপাদানের নাম রাজনীতি। এবং আমার এই নিবন্ধে প্রমাণ করার উদ্দেশ্য যে এই পঞ্চম উপাদানটি (অর্থাৎ রাজনীতি) একটি ভয়ঙ্কর উপাদান এবং এটি হিন্দুর মূল্যবোধকে আমূল বিকৃত করেছে। বস্তুত, 'হিন্দুরা কেন এরকম'— এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে এই পঞ্চম উপাদানের মধ্যেই। এবং (আমার মতে) হিন্দুর আসন্ন সর্বনাশের কারণ মূলত এর মধ্যেই নিহিত আছে।

কেন রাজনীতি ভয়ঙ্কর? তা তো আমি বলিনি, রাজনীতি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, রাজনীতিবিহীন শাসনব্যবস্থা হচ্ছে পাকিস্তানে যা চলে। কিন্তু রাজনীতির উপর ভিত্তিকৃত মূল্যবোধ ভয়ঙ্কর। কারণ, রাজনীতির ভিত্তি নীতি নয়, রাজনীতির ভিত্তি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ, সেই স্বার্থের ভিত্তিতে টানাপোড়েন, কিছু দেওয়া, কিছু ছাড়া গোছের মনোবৃত্তি। সাময়িক লাভের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া, ক্ষমতার জন্য নীতিকে বর্জন করা। রাজনীতির মধ্যে নিশ্চয়ই আদর্শের একটা বড় জায়গা আছে, থাকা উচিত। অতীব দুঃখের বিষয়, সে জায়গাটা স্বাধীন ভারতে উত্তরোত্তর ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। এহেন রাজনীতির উপর যদি মূল্যবোধ ভিত্তিকৃত হয় তাহলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয়, আজকের হিন্দু সমাজ এই সর্বনাশের শিকার এবং এই সর্বনাশ আমাদের হিন্দু সমাজকে আরও সমূহ সর্বনাশ অর্থাৎ অস্তিত্ব লোপের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। কি করে, সেটাই দেখা যাক।

এর সূচনা হয়েছিল ১৯২০-র দশকে, খেলাফৎ নামক এক আন্দোলনে হিন্দু সমাজকে সামিল করতে গিয়ে। করতে গিয়েছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) তুরস্ক জার্মানীর পাশে ছিল এবং হেরে যায়। এই যুদ্ধের আগে ইসলামী তীর্থ মক্কা-মদিনা তুরস্কের সুলতানের অধীন ছিল, ফলে সুলতানের অন্যতম উপাধি ছিল খলিফা, অর্থাৎ সমস্ত মুসলিমদের প্রধান। যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতিতে সুলতানের এই খলিফা পদ কেড়ে নেওয়া হয়, এবং তারই প্রতিবাদে খেলাফত আন্দোলন। এটি একটি সম্পূর্ণ পশ্চাদমুখী, মৌলবাদী আন্দোলন, এতে ভারতের মুসলমানের জড়িত থাকার কোনও কারণ নেই। হিন্দুর তো নেই-ই। কিন্তু গান্ধী 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য জোরদার করা'র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনে হিন্দু সমাজকে সামিল করতে চেষ্টা করলেন এবং তারই ফলে সর্বনাশের সূত্রপাত।

গান্ধী অসাধারণ বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে ভারতবাসী ধর্ম ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন, ভারতবাসীর হৃদয় থেকে ধর্মকে উৎখাত করার চেষ্টা গঙ্গাকে সাগর থেকে ঠেলে হিমালয়ে তুলে নতুন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টার তুল্য। গান্ধী তাতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন (যদিও কখনও খোলসা করে তা বলেননি)। সেজন্য তিনি রাজনীতিকের পোষাক না পরে সাধুর পোষাক পরলেন— খালি গা,

হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে বেশিরভাগ হিন্দুর যে মূল্যবোধ, যার মূল কথা হল 'মুসলিমের দোষ দেখা চলবে না, দেখলেও চুপ করে থাকতে হবে'— এর মূল নিহিত আছে রাজনীতিতে। ....এই বিকৃত মূল্যবোধ থেকে যদি হিন্দু সমাজ বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে ভারতে হিন্দু ধর্মের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হেঁটো ধুতি, রামধুন গান সম্বল করলেন। ফলে ভারতবাসীর যে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে মূল্যবোধ তৈরি হবার কথা ছিল, তার ব্যাখ্যা করে দিলেন রাজনীতিক গান্ধী। তিনি ধর্মের মোড়কে রাজনীতিকে দেশবাসীর কাছে এগিয়ে দিলেন। গান্ধী জানতেন, এই জিনিস হিন্দু সমাজ নিয়ে নেবে। এও জানতেন যে ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, ধর্ম এবং রাজনীতি, খোলা তরোয়াল হাতে যুদ্ধ করে এবং শত্রুকে ইসলাম কবুল করা বা শিরশ্ছেদ করার মাধ্যমেই ইসলাম ছড়িয়েছে। এই দুই রাজনীতিকে গান্ধী মেলাবার চেষ্টা করলেন, ভাবলেন এতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তৈরি হবে।

সেরকম কিছু হলো না, কিন্তু তুরস্কেই খেলাফৎ আন্দোলন ঘা খেল, প্রগতিবাদী, ধর্মবিরোধী কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় এসে খেলাফতই তুলে দিলেন, পর্দাপ্রথা ও ফেজটুপি পরা বেআইনী ঘোষণা করলেন এবং তুর্কী ভাষাকে আরবী হরফের বদলে রোমান হরফে লিখবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই খেলাফত আন্দোলন করতে গিয়ে মসজিদে মসজিদে যে অস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল তার কি হবে? সে অস্ত্র এবার প্রয়োগ হল হিন্দুর বিরুদ্ধে। মালাবার অঞ্চলের (বর্তমান কেরল) তথাকথিত মোপলা বিদ্রোহে প্রায় তিন হাজার হিন্দু খুন হলো, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশ) কোহাট শহরেও চলল হিন্দুমেধ যজ্ঞ।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধী কিন্তু নীরব রইলেন। শুধু তাই নয়, খেলাফত আন্দোলনের প্রধান ধ্বজাধারী দুই ভাই, মৌলানা শওকত আলি ও মহম্মদ আলীকে প্রভূত প্রশংসা করতে লাগলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় কিন্তু পাল্টা প্রশংসা করলেন না। এর আর এক ফল হলো, একজন অত্যন্ত পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন মুসলমান ব্যারিস্টার, নাম মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি শুয়োরের মাংস খেতেন এবং নমাজ পড়া জানতেন না। তিনি গান্ধীর রকমসকম দেখে ঠিক করলেন, তিনিও ধর্মাশ্রিত রাজনীতি করবেন এবং তাই করলেন। তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিলেন, কালক্রমে পাকিস্তান দাবি করলেন এবং সেই পাকিস্তান হাসিলও করলেন।

কিন্তু গান্ধী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ছক ছাড়তে পারলেন না। হিন্দু সমর্থন তো তাঁর আছেই, এটা ধরে নিয়ে তিনি মুসলিম সমর্থন জোগাড় করার জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে পাল্লা দিতে মনস্থ করলেন। মুসলিমরাও অংশত তাঁর এই ডাকে সাড়া দেবার ফলে, কংগ্রেসের নীতিই হয়ে গেল যে কোনও মূল্যে মুসলিম সমর্থন জোগাড় করতে এবং ধরে রাখতে হবে, এবং তাহলে কখনোই কোনও অবস্থাতেই কোনও মুসলিমের কাজের নিন্দা করা চলবে না। পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণীত এই নীতি নেহরুও সাগ্রহে মেনে নিলেন, মৌলানা আজাদ তো এর পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই ছিলেন। এর একমাত্র শক্তিশালী বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে রইলেন সর্দার প্যাটেল। এই কঠোর বাস্তববাদী নেতা চিরকালই মনে করে এসেছেন, এই মুসলিম তোষণ অন্যায়, হিন্দু দোষ করলে যেমন তার নিন্দা করতে হবে, মুসলিম দোষ করলেও তাই-ই করতে হবে।

গান্ধীর এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন আর একজন, তাঁর নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। কালক্রমে সাভারকরের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন এক যুগপুরুষ, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ। চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে এরা গান্ধী প্রবর্তিত নীতি 'মুসলিম কোনও দোষ করলে চোখ বুজে থাকতে হবে'— এই নীতির ভিত্তি অনেকটাই টলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জেরে কংগ্রেস নেতারা জেলে গেলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে (১৯৪৫) যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন তখন হিন্দু জনমত তাঁদের সংগ্রামী নেতার মর্যাদা দিয়ে বরণ করে নিল, সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ বেশিরভাগ হিন্দু সমর্থন হারালেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মুসলিম সমর্থন কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লীগের কাছে চলে গিয়েছে। ১৯৪৫-৪৬ নাগাদ যখন ভারতের রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে মেরুকৃত তখনও কিন্তু গান্ধী-নেহরু সেই ঐক্যের গান গেয়ে যাচ্ছেন। এরই বশবর্তী হয়ে তাঁরা কলকাতার দাঙ্গা এবং নোয়াখালির হিন্দু হত্যার সামান্যতম প্রতিবাদও করলেন না, কিন্তু এর পাল্টা বিহারে যখন দাঙ্গা আরম্ভ হল তখন নেহরু বড়লাটকে পরামর্শ দিলেন, বিমান বাহিনী দিয়ে বিহারে হিন্দুদের উপর বোমা ফেলতে।

এইসব করতে করতে পাকিস্তান হয়ে গেল, এবং পূর্ব (ভারতীয়) পাঞ্জাব ও পশ্চিম (পাকিস্তানী) পাঞ্জাব থেকে যথাক্রমে সমস্ত মুসলিম এবং হিন্দু-শিখ বিতাড়িত বা নিহত হল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেও কোনও পক্ষকেই নিরস্ত করা গেল না। কিন্তু

গান্ধী পাঞ্জাবে না গিয়ে কলকাতায় চলে এলেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বেলেঘাটায় এক বাড়িতে প্রার্থনা সভা করে পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ লোক বিনিময় রুখে দিলেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ঘাতক সোহরাওয়ার্দিকেও বাঁচিয়ে দিলেন। পূর্ব-পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে লোক বিনিময় পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলায় কোনও বিনিময় হলো না। তারপর পাকিস্তান সরকার নিজেরা অত্যাচার করে দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুদের পূর্ববাংলা ছাড়া করতে আরম্ভ করল।

শ্যামাপ্রসাদ তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী। ১৯৫০ সালে যখন হিন্দু হত্যা ভয়ানক আকার ধারণ করল, তখন শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে পরামর্শ দিলেন, পাঞ্জাবের মতো বাংলাতেও লোক বিনিময় করতে। নেহরু তখন আবার ঐক্যের স্বপ্নে ভাসছেন। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় কিছু পাল্টা মুসলিম বিতাড়ন হল। নেহরু তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে এক চুক্তি করলেন, যার মূল কথা, দুটি দেশই নিজের নিজের সংখ্যালঘুদের দেখবে, তাদের যত্ন করবে। অর্থাৎ যে ডাকাতরা পূর্ববাংলার হিন্দুর ঘরে আগুন দিয়েছিল, তাদেরই ভার দিয়ে দিলেন সেই হিন্দুদের দেখভাল করার জন্য। ফল যা হবার তাই হলো। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন, কিন্তু নেহরুর ঐক্যের স্বপ্ন টোল খেল না। প্রসঙ্গত, এই ব্যাপারটায় প্যাটেল আগাগোড়া শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু নেহরুর উপর জোর খাটাবার কোনও চেষ্টাই করেননি।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে প্যাটেল মারা গেলেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে এক জঘন্য চক্রান্তে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হলো। নেহরুর উপর কথা বলার কেউ রইল না।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সালে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত নেহরু ভারতের একচ্ছত্র সম্রাটের মতো রাজত্ব করেছেন। নিজের অলীক ঐক্যভাবনা দিয়ে দেশভাগ ঠেকাতে না পারলেও অবশিষ্ট দেশের উপর তা পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। এও আবিষ্কার করেছেন যে, যে মুসলিমরা পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে থেকে গেলেন, তারা কংগ্রেসের বাঁধা ভোটার, এঁদের একটু তৈলমর্দন করলে প্রচুর ফয়দা মিলবে। তার ফলে 'হিন্দু কোড' তৈরি করেছেন, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে পুরুষের বহুবিবাহ বা একতরফা বিচ্ছেদ (তিন তালাক)-এর মতো বিশ্রী প্রথা লোপ করার কোনও উৎসাহ দেখাননি। এবং এইসব সমর্থন করার জন্য সেই 'বহুর মধ্যে ঐক্য' 'সেকুলারবাদ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ্ করে গিয়েছেন।

কালক্রমে নেহরুর পাশে বহু স্তাবক জুটেছে। তার মধ্যে রাজনীতিক থেকে আরম্ভ করে তথাকথিত অধ্যাপক, পণ্ডিতরাও আছেন। তাঁরা বুঝে ফেলেছেন পণ্ডিতজী কী বললে খুশি হন। এঁরা অনেকেই কংগ্রেসী নন, বরং কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন— কিন্তু এই বাবদে কংগ্রেসী কমিউনিস্টে প্রভেদ সামান্যই। তাই তাঁরা ইতিহাস বিকৃত করেছেন। মুসলিম অত্যাচারের কথা, বলপূর্বক ধর্মান্তরণের কথা গোপন করেছেন। বলেছেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের কাছে অত্যাচারিত হয়ে সাম্যের মন্ত্র ইসলাম কবুল করেছেন। তা সত্ত্বেও কেন দেশে এত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ থেকে গেলেন তার কোনও জবাব দেননি। অভীষ্ট ফল ফলেছে, পণ্ডিতজী খুশি হয়েছেন, এঁদের বড় বড় পদ দিয়েছেন, বিদেশ পাঠিয়েছেন। তার ফলে এঁদের ওজন বেড়েছে, এঁদের কথারও ওজন বেড়েছে। এবং কালক্রমে এই সব কথা, গান্ধী-নেহরুর চিন্তাই হিন্দু সমাজের বৃহদংশের মূল্যবোধে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে বেশিরভাগ হিন্দুর যে মূল্যবোধ, যার মূল কথা হল 'মুসলিমের দোষ দেখা চলবে না, দেখলেও চুপ করে থাকতে হবে'— এর মূল নিহিত আছে রাজনীতিতে। রাজনীতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধের বিপদ কোথায় তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। এর সঙ্গে এখন এক নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নামে হু-হু করে সৌদি আরবের টাকা ঢুকছে। সেই টাকার কিছু অংশ যাচ্ছে সাংবাদিকদের পকেটে, কিছু অংশ রাজনীতিকদের পকেটে। ইন্ধন জোগাচ্ছে এই সর্বনাশা মূল্যবোধকে আরও জোরদার করার।

তাই আজকে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গত নয় বছর ধরে ভারতের সফলতম মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে যাচ্ছে। কিন্তু কাশ্মীর থেকে সাড়ে তিন লক্ষ হিন্দু বিতাড়নের ব্যাপারে তারা চুপচাপ। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত পশ্চিমবঙ্গের এক কোটি 'বাঙাল'দের বৃহদংশ পুরনো কথা মনে করতে চান না। তাই তৃণমূলের এম পি হাজি নুরুল ইসলাম এক মারাত্মক অস্ত্রধারী জনতাকে নিয়ে এসে হিন্দু মন্দির ভাঙচুর করে, আর সেটা জানাবার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সাংবাদিক জোটে না। তাই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা-ছাড়া হতে হয়। তাই স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে ইসলামবিরোধী প্রবন্ধ ছাপার জন্য হাজতবাস করতে হয়। কারণ, মূল্যবোধ অনুযায়ী, মুসলমান কোনও অন্যায় করতে পারে না।

এই বিকৃত মূল্যবোধ থেকে যদি হিন্দু সমাজ বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে ভারতে হিন্দু ধর্মের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মুশকিল হচ্ছে, এ সম্বন্ধে ক'জন সজাগ? মূল্যবোধ বদল করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু যদি না করা হয়, তাহলে যা হবার তাই হবে। এখনও সময় আছে।

[redacted]

পরামর্শ

শেখর বসু

ডক্টর শশাঙ্ক সাহা একজন নামকরা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। লোকে বলে তিনি রুগীর দিকে একবার তাকিয়েই তার মনের কথা পড়ে ফেলতে পারেন। শুধু পড়াই নয়, রুগীর মনের কোনও গহন কোণে জটিল রোগ বাসা বেঁধেছে— সে খবরও জেনে যান একটুখানি চেষ্টা চালাবার পরেই। তারপর তাঁর চেষ্টা হয়, রোগটাকে সামনের দিকে টেনে আনা। তার পরের কাজ হল, বিচ্ছিরি ওই রোগটাকে নির্মূল করে ফেলা। এই কাজটা সহজে হয় না, একটু সময় লাগে। তা লাগুক না, রোগ সারাটাই আসল।

ইদানীং টিভি সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়। এবং একটা কথা উনি প্রায়ই বলে থাকেন— মনের মধ্যে বেয়াড়া রোগ রাতারাতি বাসা বাঁধে না। একটু একটু করে ছড়ায়। প্রথম দিকে সেটা অতি তুচ্ছ বা ছেলেমানুষি মনে হতে পারে। দু-চার বার বলে ঠিক আছে। কিন্তু তা যদি বারবার হয়, অবহেলা করবেন না, সোজা একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে চলে

আসুন। গোড়ার দিকে রোগ সারানো সহজ। পৃথিবীর অর্ধেক বিছানা মনোরোগীদের জন্য পাতা। আপনি ওখানে শোবেন না, কাছের মানুষকেও শুতে দেবেন না। শেষের এই কথাটা প্রমিতকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। ও একটা বড় কোম্পানির ম্যানেজার। সময়ের একটু অভাব থাকলেও টাকা-পয়সার অভাব নেই। সুখী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ বলতে যাদের বোঝায় ও তাদের একজন। কিন্তু ছোট্ট একটা কাঁটা ওর মন প্রায়ই খচ্‌খচ্ করে ফোটে। এবং ফুটছে বেশ কিছুকাল ধরেই। ডক্টর সাহার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এক রোববার সকাল সাড়ে ন'টার সময় ও ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এসে হাজির হয়েছিল।

ডক্টর সাহা অত্যন্ত প্রসন্ন চেহারার মানুষ। মধ্যবয়স্ক, কিন্তু সামনের দিকের মাথার চুল অনেকটাই উঠে গিয়েছে। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। কাঁচের আড়ালের চোখদুটো একটু ছোট, কিন্তু অসম্ভব উজ্জ্বল। ডাক্তারবাবুর চেম্বারটাও সুন্দরভাবে সাজানো। মস্ত বড় টেবিলের ওপরে একটা রাইটিং-প্যাড, কলমদানিতে গোটাকয়েক কলম, একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ তাজা ফুল। ফুলের হাল্কা একটা সৌরভ বাতাসে ভাসছিল।

ডাক্তারবাবু ওর নামধাম জেনে নেওয়ার পরে নরম গলায় বললেন, 'বলুন, কী আপনার সমস্যা? একদম সঙ্কোচ করবেন না।'

সঙ্কোচ না করার কথাতেই বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল প্রমিত। একটু বাধো-বাধো গলায় বলল, 'সমস্যাটা আমার নয়, আমার স্ত্রী পারমিতার। অ্যাকচুয়ালি সে অর্থে এটা বোধহয় কঠিন কোনও সমস্যা নয়। কিন্তু এটা নিয়ে আমি অনেকদিন ধরেই কষ্ট পাচ্ছি। স্ত্রীকে বুঝিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বরং মাঝে মাঝে একটু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। দু-চার দিন কথা বলাও বন্ধ থাকে। ভাবি ওই ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করেই থাকব। কিন্তু পারি না। মনের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তেই থাকে। ইদানীং ভয় হয়, এটা যদি ওকে কঠিন কোনও অসুখের দিকে ঠেলে দেয়! কয়েকদিন আগে দেখা আপনার একটা টিভি সাক্ষাৎকার আমাকে খুব স্পর্শ করেছে। ওই যে আপনি বলেছিলেন না— 'ছোটখাটো কোনও গোলমাল যদি বারবার ঘটতে থাকে, তাকে অবহেলা করবেন না। সমস্যা একবার গোড়াতেই নির্মূল করুন। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।'

শেষ কথাটায় প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠেছিল ডাক্তারবাবুর মুখে। মৃদু অথচ ভরাট গলায় বললেন, 'টিভি ইন্টারভিউয়ের দু-চারটে কথা শুনে কখনও সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন না। ওসব কথা দর্শকদের একটুখানি সতর্ক করার জন্য। তবে আপনি এসেছেন যখন আপনাকে আমি অবশ্যই সাহায্য করব। আপনি আপনার, মানে আপনার স্ত্রীর সমস্যাটা একেবারে গোড়া থেকে খুলে বলুন।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখচোখ মুছল প্রমিত, তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আমার সমস্যাটা সত্যিই খুব অদ্ভুত ধরনের। আজ পর্যন্ত কাউকেই বলিনি। যাকে-তাকে বলাও যায় না। আর বললেই যে কোনও কাজ হত তাও নয়। উল্টে সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে উঠত। পারমিতা খুব অভিমানী গোছের মেয়ে, কথাটা আর পাঁচ কান হয়ে ওর কানে পৌঁছলে..। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমদিকে আমার খুব আত্মবিশ্বাস ছিল। ভেবেছিলাম, আমি একাই এই সমস্যাটা দূর করতে পারব। এমনিতে দেখতে গেলে এটা কোনও সমস্যাই নয়, একটা সময় ব্যাপারটাকে আমি সেই ভাবেই দেখতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মনের ওপর খুব চাপ পড়ত। আমি তখন একটু আধটু করে ওকে বোঝাতে শুরু করেছিলাম। ঠাণ্ডা মাথায় বোঝানো। বলতাম— আচ্ছা, ওর জায়গায় যদি তুমি থাকতে, তুমি কীভাবে নিতে ব্যাপারটাকে? তোমার কি খারাপ লাগত না? নিশ্চয়ই লাগত। সামান্য একটা মুখের কথা, মুখের কথা খরচ করলে তো আর মুখে ব্যথা হয় না। উদাহরণ দিয়ে বলতাম— কত নেমন্তন্নবাড়িতে তো আমরা কত খারাপ খাবার খাই, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলি, খুব ভাল রান্না, খুব ভাল খেলাম। বলি না? খারাপ জিনিসকে যখন ভাল বলতে আটকায় না, তখন ভাল জিনিসকে ভাল বলতে পারব না কেন? গোড়ার দিকে আমার এইসব কথা শুনে পারমিতা হাসত, পরে গম্ভীর হয়ে যেত। শেষের দিকে রেগে যেত আচমকা। আমি তখন আর এসব কথা তুলতাম না। কথায় যখন কাজ হয় না, কী দরকার তুলে! মাঝখান থেকে অশান্তির মাত্রা বেড়ে যায় আরও। কিন্তু চুপ করে থাকলেই তো আর কষ্ট দূর হয় না। ভেতরে ভেতরে কষ্ট আমার বেড়ে চলছিল। শেষে একদিন আমিও—'।

তড়বড় করে এতগুলো কথা বলার পরে প্রমিতের বোধহয় একটু হাঁপ ধরে গিয়েছিল। ও একটু থামল, আর সেই ফাঁকে ডাক্তারবাবু জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আকাশটা বেশ মেঘলা হয়ে গেছে। চমৎকার হাওয়াও ছেড়েছে। দূরে কোথাও বুঝি বৃষ্টি নেমেছে। যাবেন নাকি একবার আমার বাগানে? হাঁটতে হাঁটতে আপনার কথা শোনা যাবে।'

বিচিত্র এই প্রস্তাবটা শুনে একটু বুঝি থতমত খেয়ে গিয়েছিল প্রমিত। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা যাওয়া যেতে পারে।'

ডক্টর সাহার চেম্বার বাড়িতে। চেম্বারের লাগোয়া চার কাঠা জমিতে

চমৎকার একটা বাগান। এত সুন্দর বাগান শহরের মধ্যে চট্‌ করে দেখা যায় না। চেম্বার থেকে বেরিয়ে বাগানের রাস্তায় পা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তিন তিনটে ফিল্ম কোম্পানি এই বাগানে শ্যুটিং করতে চেয়েছিল। বলেছিল— আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লিস্টিতে রাখবে। উত্তরে বলেছিলাম— আপনারা যদি এখানে শ্যুটিং না করেন, আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বাগানের গাছপালার কোনও কষ্ট হয়, আমি এমন কাজের মধ্যে থাকতে পারব না।'

জবাবে কিছুই বলতে পারল না প্রমিত, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করেছিল শুধু।

বাগানের মধ্যে তিনটে সরু সরু রাস্তা। তিনটে রাস্তাই কায়দা করে মেশানো। তার ফলে কোনও রাস্তাই ফুরিয়ে যায় না কোথাও। ওই রাস্তা ধরে একবার হাঁটতে শুরু করলেন হেঁটেই যাওয়া যায় একটানা। চমৎকার গাছগাছালি আর ফুলে সাজানো বাগান, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

ডাক্তারবাবুর পাশাপাশি বাগানের ওই পথে হাঁটতে হাঁটতে গম্ভীর মুখে প্রমিত মুখ খুলেছিল আবার— 'আমার বিয়ে হয়েছে ঠিক সাত বছর। কলকাতায় আমাদের বিস্তর আত্মীয়স্বজন ছড়ানো। তা, বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন আমাদের নেমন্তন্ন লেগেই ছিল। আজ এবাড়ি তো কাল ও-বাড়ি। তখনই প্রথম পারমিতার ওই গোলমালটা চোখে পড়ে আমার। পারমিতা এমনিতে বেশ গল্পটল্প করতে পারে, কিন্তু হলে কী হবে, ওই এক দোষ। আত্মীয়-স্বজনরা খুব আদরযত্ন করে খাওয়াল। কত রকমের আইটেম, আর অধিকাংশ জায়গাতেই রান্নাবান্না চমৎকার। আমি খেতে খেতে খাবারদাবারের কত প্রশংসা করেছি, কিন্তু ও একদম চুপ। আচ্ছা, আপনিই বলুন— ব্যাপারটা কেমন বিচ্ছিরি না! একজন এত ভাল ভাল বলছে, আর একজন মুখে তালা এঁটে বসে আছে। লোকে কী ভাবে বলুন তো? বাড়ি ফেরার পথে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, খাবারদাবার কি তোমার ভাল লাগেনি? জবাবে বলত, কেন লাগবে না? বলতাম, ভালোই যখন লেগেছে, বলো না কেন? 'ভাল-ভাল' বললে যারা খাওয়াচ্ছে— তারা কত খুশি হয়। শুধু খেয়ে নয়, খাইয়েও তো তৃপ্তি পায় লোকে। উত্তরে কী বলত জানেন? বলত — একজন বললেই যথেষ্ট। তখন আমি বলতাম— ঠিক আছে, পরের বারের নেমন্তন্নে এই একজন তুমি হবে। আমি চুপ করে থাকব, প্রশংসা করার ব্যাপারটা তুমি সারবে। বলাই সার। দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে এটা সেটা খেল, খাওয়ার পরে মশলাকুচি ফেলল মুখে। কিন্তু কেমন খেল তা নিয়ে একটা কথাও নয়। শেষে আবার মুখ খুলতে হত আমাকেই।'

একনাগাড়ে কথাগুলো বলার পরে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়েছিল প্রমিত, কিন্তু উনি কিছুই বললেন না। একটু দম নিয়ে আবার কথা শুরু করেছিল ও— 'আড়ালে এই নিয়ে ওকে কত বুঝিয়েছি আমি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। রাগারাগি করেছি, কাজ হয়নি। রাগ করে কথা বন্ধ করে দিয়েছি ক'দিন। তাতেও যে কে সেই। ভাল বলতে ওর যে কী কষ্ট হয় ভগবান জানে! আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটা বছর তিনেক আগে সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট হল। কী বিরাট অ্যাচিভমেন্ট বলুন তো? পাড়াশুদ্ধু সবাই খুশি, তবে আমাদের খুশির মাত্রা আরও বেশি, কেন না, প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। একদিন ওদের বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে ঘটনা করে খাওয়ানো হলো। কিন্তু খাওয়ানোটাই কি সব? ছেলেটিকে পারমিতার কনগ্রাচুলেশন্‌স জানানো উচিত ছিল না? জানায়নি, অথচ ওই নিয়েই সেদিন কথা চলেছিল সারাক্ষণ। ছেলেটির ওইরকম দুর্দান্ত ফল করার জন্য পারমিতা কিন্তু খুব খুশি হয়েছিল, তবে মনের কথা মুখে না বললে লোকে জানবে কি করে? শুধু তাই নয়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ওইরকম বেয়াড়া ভাবে চুপ করে থাকলে উল্টো বোঝে অনেকে। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় অনেকে, কেউ কেউ আভাসে ইঙ্গিতে সেটা আবার জানিয়েও দেয়। আমার খারাপ লাগে, পারমিতা আঘাত পায়, কিন্তু আঘাত পেয়েও ও নিজেকে শোধরাবার চেষ্টা করেনি কখনও।'

কথা থামিয়ে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়েছিল প্রমিত, কিন্তু এবারও উনি কিছু বললেন না। ওঁর চোখ বাগানের মস্ত বড় একটা হলুদ গোলাপের দিকে। ডাক্তারবাবুর এই চুপ করে থাকাটা একেবারেই ভাল লাগছিল না প্রমিতের। কিন্তু কিছু করার নেই, এটাই হয়তো ওঁর কেস-হিস্ট্রি শোনার পদ্ধতি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আবার মুখ খুলেছিল প্রমিত— 'ছোটখাটো ব্যাপার, তবে ছোটখাটো জিনিসই জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যায়। এক বন্ধুর বিয়ে, সেই উপলক্ষে বাকি বন্ধুর বউরা হৈহৈ করে বিউটি পার্লারে গেল ফেস-লিফ্‌ট আর হেয়ারডু করতে। তারপর বিয়েবাড়িতে যাওয়ার পথে এ ওর সাজ, সে তার সাজ নিয়ে বিস্তর প্রশংসা জুড়ে দিল। মেয়েরা যেমন করে তাকে আর কি! ইস্‌! তোমার সাজটা খুব ভাল হয়েছে— আমারটা বিচ্ছিরি। এসব কথা হয়তো নিজের প্রশংসা আদায় করার একটা ছল। তাই হবে, না হলে একই কথা সবার মুখে ঘুরত না। সবাইয়ের মধ্যে কিন্তু পারমিতা নেই। ওই একটা বিষয় ছাড়া ও আর সব কিছুর মধ্যে ছিল। রিজার্ভড্‌ মিনিবাসে আমরা সবাই মজা করতে করতে যাচ্ছিলাম। সবার কথা সবারই কানে যাচ্ছিল। একটা মাত্র জায়গায় পারমিতার ওই চুপ করে থাকাটা লক্ষ্য

করেছিলাম আমি। আপনি হয়তো বলবেন, এটা তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এইরকম তুচ্ছ ব্যাপার পরের পর ঘটে গেলে তাকে আর তুচ্ছ বলা যায় না। আমার বন্ধুটির সঙ্গে যে মেয়েটির বিয়ে হল তাকে এককথায় পরমাসুন্দরী বলা যায়। বিয়ের আসরে দেখাচ্ছিলও দুর্ধর্ষ। খুব স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেকেই মেয়েটির রূপের বিস্তর প্রশংসা করেছিল, কিন্তু পারমিতা এব্যাপারে মুখ খুলল না একবারও। কেন খুলল না? এটাকে কি আপনি স্বাভাবিক ঘটনা বলবেন?'

প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বললেন না মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রমিত বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সামান্য উঁচু গলায় বলল, 'কত আর বলব! পুজোর আগে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে গেলে মেয়েদের মধ্যে একটা জিনিস ঘটেই থাকে। তা হলো, নতুন কেনা শাড়ি দেখানো। কিছুক্ষণ ওদের মধ্যে গল্পটল্প চলার পর আলমারির পাল্লা খুলে যায়। তারপর তার ভেতর থেকে একের পর এক শাড়ি বেরিয়ে আসে। কোত্থেকে কেনা, কত দাম, কেমন শাড়ি— এইসবই তো একমাত্র কথা। পারমিতার অবস্থা দেখে তখন আমার দুঃখ হোত। এইভাবে শাড়ি দেখাবার উদ্দেশ্য একটাই, আর দেখার পরে বলার কথাও একটাই। ওমা! কী সুন্দর শাড়ি! তোমায় যা মানাবে না! বেচারা পারমিতা, এসব কথা ওর মুখে আসে না। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! শাড়িগুলো ওর হয়তো সত্যিই দারুণ লেগেছে, কিন্তু 'দারুণ' বলা যে ওর ধাতে নেই। এটা কি আপনি সমস্যা বলবেন না?'

এবারও কোনও জবাব দিলেন না ডক্টর সাহা। পাশের গন্ধরাজ গাছের একটা ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়েছিলেন।

আবারও কথা শুরু করল প্রমিত— 'সমস্যা কি একটা? একটার পর একটা। এর কোনও বিরাম নেই। আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু আছে, এখন মস্ত সাহিত্যিক। বেশ কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছে। কাগজে ওর ছবিও ছাপা হয় প্রায়ই। নতুন কোনও বই বার হলে ও এক কপি পাঠিয়ে দেয় আমাদের কাছে। আমি সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না, কিন্তু পারমিতা গল্পের বইয়ের পোকা। বাড়িতে বই এলেই পড়তে শুরু করে দেয়, আর শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতে চায় না। একটামাত্র ঘটনার কথা আপনাকে বলছি এখন। একবার মাঝরাত্তিরে ঘুম ভাঙতেই দেখি পারমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। কী এমন হয়েছে যে মাঝরাতে এমন কান্না! টেলিফোনে কি কোনও খারাপ খবর এলো? কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই ও কেমন যেন চমকে উঠে চোখ মুছতে শুরু করে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি। যত জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে বলো? ও ততই চুপ করে থাকে। শেষে চাপাচাপি করতে বলল, 'রূপ মারা গেছে।' 'রূপ কে?' 'ওই যে সোনার সঙ্গে যার ভাব ছিল।' 'সোনা কে?' 'ওই তো রূপের সঙ্গে যার—'। বিশ্বাস করুন, সেই রাতে আসল ব্যাপারটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। রূপ আর সোনা হচ্ছে আমার এই সাহিত্যিক বন্ধুর নতুন উপন্যাসের প্রেমিক-প্রেমিকা। যারা স্রেফ লিখে লিখেই এভাবে পাঁচজনকে কাঁদাতে পারে, তাদের সত্যিই কলমের জোর আছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো কোথাও কোথাও ক্ষতিকারক। রাতের পর রাত জেগে সম্পূর্ণ অকারণে এই রকম কান্নাকাটি করলে শরীর ভেঙে পড়বে একদম। ঠিক করলাম, স্বাস্থ্যের কারণে বন্ধুর বই এবাড়িতে আর ঢুকতে দেব না। তারপরেই বুঝতে পারলাম, বই বাড়িতে ঢুকবেই আর পারমিতা সে বই পড়বেই। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে, ওকে বলব— বই পড়তে পড়তে যেখানে দেখবে কান্না-কান্না পাচ্ছে, সেই জায়গাটা তুমি আর পোড়ো না। যাকগে, কথার মধ্যে অন্য কথা এসে গেল। আগের কথায় ফিরে যাচ্ছি আবার। আমার ওই সাহিত্যিক বন্ধুর বই পড়তে পারমিতার নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে, না হলে ও ওভাবে কান্নাকাটি করত না। অথচ অবাক কাণ্ড, ওর ওই ভাল লাগার কথা ও লেখককে জানায় না কখনও। ভাল লেগেছে মানেই তো প্রশংসা করা। পারমিতা প্রশংসা করতে পারে না।'

ডাক্তারবাবু এবার বোধহয় একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রমিতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু ও মুখের মধ্যে জমে থাকা বাকি কথাগুলো বলার জন্য দ্রুত গতিতে বলে উঠল, 'আপনি হয়তো বলবেন, ও অসম্ভব লাজুক প্রকৃতির। থাকে না এক-একজন! কিন্তু না, ও ওরকম মোটেই নয়। যে কারও সঙ্গে গল্প চালিয়ে যেতে পারে দিব্যি। তর্কের খাতিরে ওকে যদি লাজুক হিসেবে ধরেও নিই, আমার কাছে তো আর লজ্জার কিছু নেই। বছরদুয়েক আগে আমরা সিমলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, ভীষণ বরফ পড়েছিল সেবার। চারদিক শুধু সাদা আর সাদা। কিন্তু আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার ছিল। রোদ উঠতেই সে এক অপরূপ দৃশ্য! একবার তাকালে চোখের পলক আর পড়তে চায় না। পারমিতাকে বললাম— দারুণ না! অবাক কাণ্ড, আমার কথায় ও সায় দিয়ে কিছুই বলতে পারল না। আপনি হয়তো বলবেন— অসামান্য দৃশ্য দেখে ও এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, ওর মুখ থেকে কথা সরেনি। কিন্তু না, এটা তো আলাদা কোনও ঘটনা নয়, এইরকম কত যে আছে—। আর আছে বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। তবে সমস্যা এখন আরও ঘোরালো। পারমিতার ওই অসুখটা বোধহয় আমাকেও ধরেছে।'

ডাক্তারবাবু আর একবার তাকালেন প্রমিতের দিকে, তবে এবার ওঁর দৃষ্টি আগের মতো তীক্ষ্ণ ছিল না। কেমন যেন ভেঙে পড়া মানুষের গলায় প্রমিত বলল, 'আপনার চিকিৎসার সুবিধার জন্য পুরো কেস-হিস্ট্রি চান বলেই এত কথা বলছি। 'কোনটা আপনার কাজে লেগে যাবে আমার পক্ষে তো বোঝা সম্ভব নয়। ও হ্যাঁ, পারমিতার একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে হালে। ও তো কারও প্রশংসা করতে পারেনি কখনও। কিন্তু ইদানীং ওর মুখে একটু অন্য ধরনের কথা শুনতে পাচ্ছি। কাউকে কাউকে ও কখনও কখনও বলে বসে— 'এ মা! আপনার চেহারা এমন বিচ্ছিরি হয়ে গেল কী করে? কিংবা 'এ কী! তুমি হঠাৎ এত কালো হয়ে গেলে কেন?' এই কথাগুলো কিসের লক্ষণ ডাক্তারবাবু? ভাল না খারাপ? এগুলোকে কি এক ধরনের প্রশংসা বলা যেতে পারে? যাকে এখন বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে গেছে, তার চেহারা এক সময় নিশ্চয়ই খুব ভাল ছিল। যে এখন খুব কালো হয়ে গিয়েছে, সে একসময় নিশ্চয়ই খুব ফর্সা ছিল। একেবারে প্রশংসা না করতে পারার চাইতে এটা কি ভাল? যাকে বলে মন্দের ভাল। আপনি এবার কিছু বলুন ডাক্তারবাবু। আমি তো তখন থেকে বলে যাচ্ছি। কেস কী রকম মনে হচ্ছে আপনার? খুব জটিল কি?'

আকাশ এখনও মেঘলা। ফুরফুরে হাওয়া বইছে চারদিকে। চারপাশে নানা রকমের ফুল। ফুলের সুগন্ধ বাতাসে। সবুজ ঘাসের ছোট্ট লনটা অপূর্ব। পাশেই নুড়ির ছোট্ট একটা ঢিবি। এই পরিবেশে অসুখ-বিসুখের কথা বুঝি একেবারেই মানায় না। তবে দায়িত্বশীল সাইকিয়াট্রিস্ট প্রমিতের প্রতিটি কথাই মন দিয়ে শুনেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর প্রশ্নটা একটু বুঝি বেখাপ্পা ঠেকল প্রমিতের কাছে। ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কেমন লাগছে আমার বাগানটা আপনার কাছে?'

ঠিক জায়গায় মনের কথা হুড়মুড় করে বলে ফেলতে পারলে মনের ভার তো একটু লাঘব হওয়ার কথা, কিন্তু প্রমিতের তা হয়নি। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও চাপা উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পারমিতার ওই লক্ষণটা খুব খারাপ, তাই না ডক্টর সাহা?'

ডাক্তারবাবুও ওর প্রশ্নের ধারেকাছে গেলেন না, পাশের অর্কিডটা মুগ্ধ চোখে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'বাগানটার জন্য তিনজন মালি আছে, তিনজনেই খুব অভিজ্ঞ, খুব যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করে। কিন্তু আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি না, তাই সময় পেলে নিজেই হাত লাগাই। এটা কী গাছ বলুন তো? প্যান্সি। এখন ফুল নেই, তবে গাছে ফুল ধরলে আপনি চোখ ফেরাতে পারবেন না। ইউরোপের ফুল, তবে যত্নআত্তি পেলে এদেশের মাটিতেও দিব্যি ফোটে।'

প্যান্সির দিকে একবার চোখ ফিরিয়েছিল প্রমিত, কিন্তু গাছটা বোধহয় ওর চোখেই পড়ল না। ডাক্তারবাবুর কথাগুলো ওর কানে ঢোকার আগেই বোধহয় ভেসে গিয়েছিল বাতাসে। আরও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রমিত বলল, 'আপনার কাছে মনে হয় অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল, তাই না?'

ও এতখানি উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু ঠিক আগের ভঙ্গিতেই আগের কথার জের টেনে বললেন, 'আপনার একেবারে সামনের গাছটা সুইট উইলিয়মের। এটাও বিদেশী গাছ, রাশিয়া আর চীনে পাওয়া যায়। আচ্ছা, আমার গোলাপবেড কেমন লাগল আপনার? গোলাপের গ্রাফটিং, কাটিং, লেয়ারিং আমি কিন্তু মালিদের হাতে ছাড়ি না। এত ধরনের গোলাপ আর কোনও বাগানে আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার গোলাপগুলো নিশ্চয়ই আপনার ভাল লেগেছে!'

উদ্বেগ উত্তেজনায় প্রমিতের কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। ও কোনও মতে বলল, 'আপনি আমাদের কথা কিছু বলছেন না কেন ডাক্তারবাবু? আমরা কি আর কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব না?'

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবারও ঠিক আগের গলায় কথা বললেন। বললেন, 'আমার বাগানটা কেমন লেগেছে বলছেন না কেন? ভাল লাগেনি আপনার?'

প্রমিত এবার একেবারে ভেঙে পড়ার গলায় বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনাকে আমি বলছিলাম না— পারমিতার অসুখটা বোধহয় আমাকেও ধরেছে। আমিও আর আগের মতো প্রশংসা করতে পারি না। আপনার বাগানটা সত্যিই —। আপনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সেটা আপনাকে আমার জানানো উচিত ছিল। শুধু তাই নয়, আপনি জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও—।'

ডক্টর সাহা মৃদু হেসে বললেন, 'চলুন, এবার চেম্বারে যাওয়া যাক।'

চেম্বারে ফিরে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নিজের চেয়ারে বসলেন। টেবিলের উল্টোদিকে পাঁচটা চেয়ার, আগে যেখানে বসেছিল, ঠিক সেখানেই বসল প্রমিত।

মৃদু গলায় ডক্টর সাহা কথা বলেন, ওঁর কণ্ঠস্বর একটু ভারীর দিকে। বললেন, 'আপনাদের এই সমস্যাটাকে আমি একটুও ছোট করে দেখছি না। অসুখটা বাজে অসুখ, তবে এটা এখনও তেমন ছড়ায়নি। সারাতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না মনে হয়। এটা আজকাল অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে এটা তেমন ভয়ের নয়। তবে বাড়তে দিলে এর থেকে নানারকম ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়। শেষে অবসাদও আসতে পারে। আপনার মধ্যে একটা খুব ভাল দিক আছে, তা হল

সতর্কতা। না হলে আপনি আমার কাছে আসতেন না।'

অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল প্রমিত। আবার কথা শুরু করলেন সাইকিয়াট্রিস্ট। 'আপনি দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। কাজে নিশ্চয়ই ব্যস্ত থাকেন। আমার প্রথম পরামর্শ— আপনি কাজের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিন। ধরুন, যে ফাইল আগামী কাল ক্লিয়ার করলেও চলে, সেই কাজটা আপনি আজকেই করে ফেলুন। বাড়িতেও নিশ্চয়ই আপনার অনেক কাজ থাকে, তার একটাও ফেলে রাখবেন না। সব একসঙ্গে নয়। একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলুন। তারপর প্রায়রিটি ধরে একটার পর একটা কাজ শেষ করুন। ধরুন, বাড়িতে আপনার লেখাপড়া করার টেবিলটা অগোছালো। সেটা একদিন গুছিয়ে ফেলুন। ড্রয়ারে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্তর জমে গিয়েছে বিস্তর, সেগুলো একটু একটু করে পরিষ্কার করে ফেলুন। ধরুন, আপনার বাড়িতে আপনার খুব প্রিয় একটা ঘড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন, সেটা সারাবার জন্য দোকানে দিন। আপনার বাথরুমের কোনও একটা ট্যাপের হয়তো প্যাঁচ কেটে গিয়েছে একটুখানি, টপটপ করে জল পড়ে— সেটা সারাবার জন্য প্লাম্বার ডাকুন। জানলার গ্রিলের রং হয়তো খানিকটা চটে গিয়েছে, ঠিকঠাক করার জন্য রঙের মিস্ত্রিকে খবর দিন। বাড়ির চারদিকে তাকালে এইরকম খুঁটিনাটি অনেক কাজ দেখতে পাবেন, সেই কাজগুলো সেরে ফেলুন একটার পর একটা।

হতভম্বের মতো ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল প্রমিত। আত্মবিশ্বাসী মানুষের গলায় ডক্টর সাহা বললেন, 'যা বলছি তাই করবেন। মনের অসুখ সারাবার সবচেয়ে বড় উপায় হল ওয়ার্ক থেরাপি। কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা আপনার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না। আপনার এই কাজের প্রভাব কমবেশি আপনার স্ত্রীর ওপরেও পড়বে। এটা তাঁর পক্ষেও ভাল। কে কাকে প্রশংসা করল, কাকে ভাল বলল, সেদিকে একেবারেই তাকাবেন না। কারও কোনও কাজ আপনার নিজের পছন্দ হলে বারবার বলুন। প্রথমদিকে সরাসরি বলতে না পারলে আভাসে ইঙ্গিতে বলুন। কিংবা মোবাইলে এস এম এস করে জানান।'

প্রমিতের হতভম্বর হওয়ার ভাবটা এখন বোধহয় কেটে গেছে খানিকটা। আগ্রহী মানুষের ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো ও শুনছিল। দু-এক মুহূর্ত থেমে থাকার পরে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বললেন, 'প্রতিদিন এমন দুটো কাজ করবেন যা আপনার পছন্দ নয়।'

'পছন্দ নয়!'

'না, পছন্দ নয়। ধরুন, কোনও লোককে আপনি পছন্দ করেন না। পথেঘাটে তার সঙ্গে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। এবার তাকে দেখে একটু হাসবেন।'

'হাসব!'

'হ্যাঁ, এখন হাসি, পরে একটা দুটো কুশল বিনিময়। ধরুন, কোনও পারিবারিক নেমন্তন্নে গেলেন। আপনার স্ত্রী ভালমন্দ খেল, কিন্তু প্রশংসা করল না। আপনি তা নিয়ে মনে কোনও ক্ষোভ রাখবেন না। পরেও ওই ব্যাপারে স্ত্রীকে উপদেশ দিতে যাবেন না। ভাল খাবার খাওয়ার জন্য আপনি একাই প্রশংসা করে যাবেন। পারলে একটু বেশি করে। মনে থাকবে?'

বাধ্য ছেলের মতো একদিকে মাথা কাত করেছিল প্রমিত।

'প্রতিদিন দুটো অপছন্দের কাজ হাসিমুখে করবেন। ডায়েরিতে নোট রাখবেন। কেন জানেন! অপছন্দের কাজ স্বেচ্ছায় করলে সহ্য ক্ষমতা বাড়ে। গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। ছোট বড় ত্রুটি বিচ্যুতিতে তাহলে আর আগের মতো বিব্রত হবেন না। আজ এই পর্যন্তই। পনের দিন বাদে মানে পঁচিশ তারিখ সকাল সাড়ে ন'টায় আবার এখানে আসবেন। দু-তিনটে দিন আপনাকে একাই আসতে হবে, তারপর আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন।'

উঠে পড়েছিল প্রমিত। আকাশের মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে। ঝক্‌ঝকে একফালি রোদ এসে পড়েছিল বাগানে। একটু ইতঃস্তত করে প্রমিত বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার বাগানের ওই অর্কিডটা।'

'ভাল লাগছে তো? লাগবেই। এটা একটা বিরল অর্কিড। সমতলে সাধারণত হয় না। কিন্তু একবার হলে অনেকদিন বেঁচে থাকে। মনে হয়, পরের বার এসেও এটা আপনি দেখতে পাবেন। ওই যে ছিটছিটে বেগুনি রং, ওটা তখন আরও গাঢ় হবে।'

বাগানের গেট পর্যন্ত প্রমিতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু।

সাম্প্রতিক জাপান এবং আমাদের শক্তি-ভাবনার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

দেবীপ্রসাদ রায়

সাম্প্রতিক কালে জাপানে বিশ্বের ভয়াবহতম পরমাণু দুর্ঘটনার পর পরমাণু শক্তি ব্যবহারকারী সব দেশই দুর্ভাবনার সম্মুখীন। প্রযুক্তিগতভাবে পরমাণুচুল্লী দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতা ন্যূনতম করতে পারলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণাতীত। এই প্রেক্ষিতে আমরা ভারতবাসী কী করতে পারি এই আলোচনার অভিমুখ সেই দিকে।

১১ মার্চ ২০১১, পরপর ৯টি ভূমিকম্প রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ৯ ছুঁই ছুঁই, যে সুনামির উদ্ভব ঘটিয়েছিল তার প্রভাবে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস জাপানের ধন-প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অভাবিত ভাবে। ভয়ঙ্করতম এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জাপানের বেশ কিছু পরমাণুচুল্লিকে ধ্বংস করেছে এবং ব্যাপকতম তেজস্ক্রিয় নিঃসরণ ঘটিয়েছে। তাৎক্ষণিক এবং পরবর্তীকালে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, হচ্ছে এবং হতে যাচ্ছে তা সমস্ত অনুমান ও হিসেব অতিক্রম করেছে। আই এ ই এ-র ডিরেক্টর উইকিও আমানো বলেছেন, ...জাপানে যা ঘটেছে তার মতো বিপজ্জনক ঘটনা ভাবা যায় না। তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত জারি করা জরুরি অবস্থা বেশ কয়েকমাস জারি রাখতে হবে। সর্বোচ্চ সতর্কতা মাত্রা ৭ ঘোষণা করা হয়েছে এপ্রিল ২০১১তে।

আমাদের স্মরণে থাকা ভয়াবহ থেকে ভয়ঙ্করতম পরমাণু চুল্লী দুর্ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডে এবং তারপর সোভিয়েত রাশিয়ার চের্নোবিলে। সোভিয়েত রাশিয়ার ইউক্রাইন রাজধানী কিয়েভ থেকে ৯০ কিমি উত্তরে অবস্থিত চের্নোবিল, এখানে ছিল ১০০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী চারটে পরমাণু চুল্লী। চতুর্থ ইউনিটেই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাটিকে চেপে রাখার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়নি। কারণ তা সম্ভব হয় না। ৮ এপ্রিল ১৯৮৬, সকাল ৯টা নাগাদ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমসের ৮০ কিমি উত্তরে ফর্সমার্ক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কম্পিউটার পর্দায় হঠাৎই মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংকেত ধরা পড়ে। উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ তখনই কেন্দ্রের ৬০০ জন কর্মীকে পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের জামাকাপড় থেকে অস্বাভাবিক মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিকরণ হচ্ছে অথচ চুল্লীগুলির কোথাও কোনও ত্রুটি নেই। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের পরমাণু

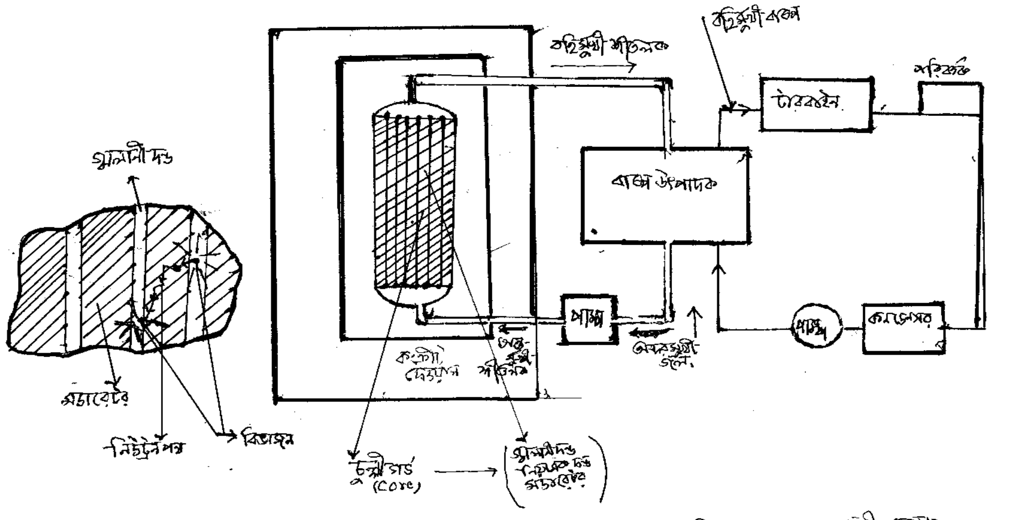

চিত্র-১ মডারেটর

চিত্র-২ [illegible] চুল্লী প্রক্রিয়া

কেন্দ্রগুলিতেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা। সন্দেহ হল কৃষ্ণসাগর থেকে ইউক্রাইন হয়ে আসা বাতাস এই তেজস্ক্রিয়তা বহন করে আনছে কিনা। ওইদিনই রাত ৯টায় চের্নোবিলে পরমাণু দুর্ঘটনার কথা ঘোষিত হল। আমন্ত্রিত মার্কিন বিশেষজ্ঞ রবার্ট গেল জানালেন, তাৎক্ষণিক মৃত্যুর সংখ্যা বাদ দিলেও আগামী দিনে অন্তত এক লক্ষ মানুষ তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্যান্সারে মৃত্যু এড়াতে পারবে না। সোভিয়েত সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা 'মস্কো নিউজ উইকলি' নং ২৩, ১৯৮৬, অবশ্য জানিয়েছেন, তার পরমাণু বিধি বিশেষজ্ঞ লিওনিড ইলিন—এর মাধ্যমে : Incidentally an date of dosimetric Measurements were constantly turned over to the IAEA (International Atomic Energy Agency) where they are carefully analysed by specialists from different countries. Notably as early as May 6 competent experts from the world health organisation (Who) drew the following conclusion : There was no need to carry out special measures among the population (Specifically to appoint for iodine preparations), there were no reasons either imposing an embargo on the export of food products or for restricting the population movements (including international tourism)"। কিন্তু কি প্রতিবেশী দেশসমূহ, কি বাকি বিশ্ব কেউই আশ্বস্ত হতে পারেনি।

এই মুহূর্তে বিশ্বের কিঞ্চিদধিক ৪৫০টি পরমাণুচুল্লী (নির্মীয়মাণ সহ) আছে। এই রকম দুর্ঘটনা ঘটতে থাকলে তা মানব তথা সমগ্রজীব জগতের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন করে তুলবে।

কেন এই রকম দুর্ঘটনা ঘটে ও তা বিভীষিকাময় হয়ে যায়, তা জানতে হলে পরমাণুচুল্লী সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। পরমাণুচুল্লী হল সেই ব্যবস্থা যেখানে জ্বালানী ভারী মৌল যেমন ইউরেনিয়াম ২৩৫, ইউরেনিয়াম ২৩৩ বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (এগুলি আইসোটোপ) প্রক্ষিপ্ত নির্উট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে যায় প্রচুর শক্তি এবং অতিরিক্ত নিউট্রন উৎপন্ন করে। এই নিউট্রনগুলি আবার অন্য জ্বালানী পরমাণুকে ওইভাবেই ভেঙ্গে ফেলে ও দ্রুত ফেলতে থাকে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতিতে একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, অত্যল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। পরমাণুচুল্লীতে এই শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

পরমাণুচুল্লীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল (১) জ্বালানী উপাদান, (২) নিউট্রন গতি নিয়ন্ত্রক ও মডারেটর, (৩) শীতলক, (৪) প্রতিফলক, (৫) নিয়ামক দণ্ড এবং (৬) সুরক্ষা দেওয়াল। জ্বালানী উপাদান দণ্ডের আকৃতিতে থাকে সাধারণত প্রাথমিক নিউট্রন জ্বালানী উপাদান সংঘর্ষের পর পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া চালু রাখতে হলে শ্লথগতি নিউট্রন দরকার। বিভাজনজাত তীব্র গতি নিউট্রনকে শ্লথগতি করার জন্য মাধ্যম বিশেষের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভাজনজাত নিউট্রনকে শ্লথগতি করার এই মাধ্যমকে 'মডারেটর' বলে। এগুলি সাদারণত হয় গ্রাফাইট, ভারী জল, বেরিলিয়াম ইত্যাদি— এগুলি নিউট্রন শোষণ ক্ষমতাবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শীতলক প্রয়োজন হয় চুল্লী গর্ভে বিভাজনজাত মাত্রাতিরিক্ত তাপকে অপসারণের কাজে। শীতলক হয় সাধারণ জল, বাষ্প, বিলিয়াম ইত্যাদি। নল দ্বারা বাহিত জল তাপমাত্রাকে প্রশমিত করে। প্রতিফলক হল একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা উচ্চগতি নিউট্রন যেগুলি বেরিয়ে যেতে চায়, তাকে ভিতরে পাঠিয়ে আটকে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে মডারেটরও প্রতিফলকের কাজ করে। প্রয়োজনে পরমাণু চুল্লীকে বন্ধ করা হতে পারে, তা সম্ভব করা হয় নিউট্রন শোষণ ক্ষমতাসম্পন্ন দণ্ডর চলাচল দ্বারা। দণ্ডগুলি হয় ক্যাডিমিয়াম, বোরন, হাফনিয়াম-এর। এদের কাজ ব্লটিং পেপার দ্বারা অতিরিক্ত কালি শোষণের মতো। জ্বালানী দণ্ড, মডারেটর ও শীতলক মিলে হয় চুল্লীগর্ভ বা কোর।

চের্নোবিলের পরমাণুচুল্লীতে মডারেটর হিসাবে ছিল গ্রাফাইট। দুর্ঘটনার কারণ ছিল এইরকম : যে কোনও কারণে জলপ্রবাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। জ্বালানী দণ্ড উত্তপ্ত হতে থাকে। তাপমাত্রা যখন বেড়ে হয় ৩৫০০° ফারেনহাইট এগুলিকে ধরে রাখা জিরকোনিয়মে চাপনল গলতে শুরু করে। তাপমাত্রা ৫০০০° ফারেনহাইট হলে জ্বালানী দণ্ডগুলি গলতে থাকে। এই অবস্থায় জলপ্রবাহ ফের চালু করতেই মুহূর্তে তা বাষ্পে পরিণত হয়, যা গ্রাফাইট, ইউরেনিয়ামে ও জিরকোনিয়মের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন, মিথেন ও কার্বনডাই অক্সাইড তৈরি হয় এবং বিস্ফোরণ ঘটে। চার নম্বর ইউনিটের ছাদ উড়ে যায়। গ্রাফাইট জ্বলতে থাকে, প্রায় ১ মাইল উপরে তৈরি হয় তেজস্ক্রিয় মেঘ। জ্বলন্ত গ্রাফাইটকে নেভানোর জন্য হেলিকপ্টার থেকে সিসা, বোরন, ভিজে বালি নিক্ষেপ করা হয়। উৎক্ষিপ্ত মেঘ সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দিয়ে বাল্টিক সাগর পার হয়ে চলে যায় স্কানডেপেভিয়ায়— এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া মারাত্মক আইসোটোপগুলি হল স্ট্রংসিয়াম ৯০, ক্রিপটন ৮৫, আইওডিন ১৩১, বেরিয়াম ১৪০— যেগুলি ক্যান্সার সহ অন্য মারাত্মক ব্যাধিতে শরীরের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করে এবং এদের অর্ধায়ু খুব বেশি অর্থাৎ দূর ভবিষ্যতেও এদের মারাত্মক প্রভাব থাকবে। সংশ্লিষ্ট নীপার নদী দিয়েও তেজস্ক্রিয়তা বহুদূর চলে যায়।

মারাত্মক ভূমিকম্পের কারণে জাপানের ফুকুশিমা—দাইচির ছ'টি চুল্লীর মধ্যে চারটিতে বিস্ফোরণ হয়েছে। বাকিগুলিও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এগুলির দায়িত্বে থাকা টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানির (টেপকো) সব চেষ্টা বিফল হয়েছে আগুন নেভানোর।

টেপকোর হিদোহিকো নিশিইয়ামা জানিয়েছেন, মহাসাগরের তীব্র জলস্রোতের কারণে তেজস্ক্রিয়তা দূর দূরান্তে চলে যাচ্ছে, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু জ্বালানী এজেন্সির দুটি দল জাপানে গেছেন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ

মাপতে। খাবারের মধ্যে কতটা ঢুকেছে জানতে। এই পর্যায়ে তেজস্ক্রিয়তা মাপজোপের ব্যাপারটি নিয়ে কিছু আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সাধারণ মানুষের জন্য।

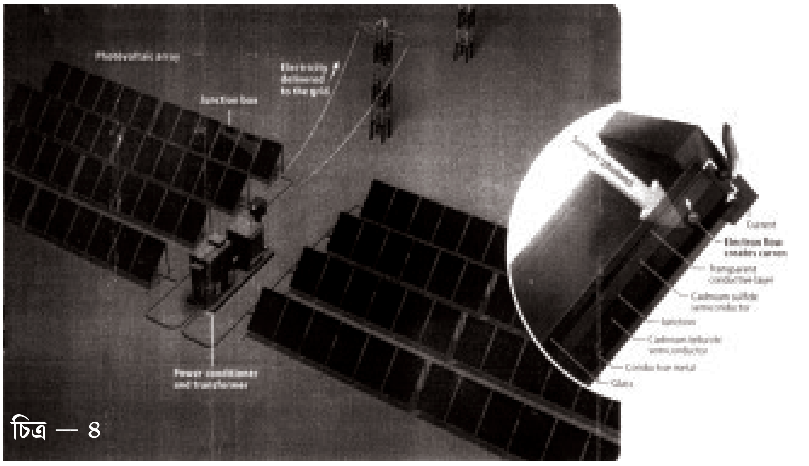

চিত্র — ৪

পরমাণু চুল্লীজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত কণা বা বিকিরণ (আলফা বিটা, গামসে) দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একককে বলে রন্টজেন। এক্সরে খ্যাত বিজ্ঞানী রন্টজেন-এর নামে, রন্টজেন একক মাপের ভিত্তি হল কোন বিকিরণ বাতাসে কতটা পরিমাণ আয়ন উৎপন্ন করতে পারে। (পরমাণু ক্রনিতে আধান নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু কোনও কারণে যদি কক্ষস্থ কোনও ইলেকট্রন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়, পরমাণু তখন আয়ন-এ পরিণত হয়)। যখন আয়ন সৃষ্টিকারী বিকিরণ কোনও মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন একক মাধ্যম ভর দ্বারা শোষিত শক্তির পরিমাণকে জল শোষিত ডোজ বলে। এই ডোজের এক গ্রাম মাধ্যম ১০০ আর্নস শক্তি শোষণ করলে সেই ডোজকে বলা হয় এক র‍্যাড। মানব শরীরের ক্ষেত্রে পূর্ণাবয়ব ডোজ হল শরীরের অধিকাংশ বিশেষ করে মাথা, ধড়, অস্থিমজ্জা যে ডোজ গ্রহণ করে, মানব শরীরের তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব মাপা হয় 'রেম' দিয়ে। বিভিন্ন প্রকার বিকিরণ থেকে আসা একই ডোজ জীবকোষে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া 'রেম' দিয়ে মাপা হয়। এক রেম হচ্ছে সেই ডোজ যা এক রন্টজেন এক্সরে অথবা গামারের বিকিরণের সমতুল জৈবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এক্সরে, গামারে অথবা বিটা বিকিরণসহ বহু বিকিরণের ক্ষেত্রে রেম আর র‍্যাড সংখ্যাগতভাবে সমান। আমরা প্রতিনিয়ত মহাজাগতিক রশ্মি, তেজস্ক্রিয় পদার্থের আকর থেকে আসা বিকিরণ নানাভাবে আমাদের শরীরের ভিতর জমে থাকা কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ বস্তু থেকে আসা বিকিরণের সম্মুখীন হচ্ছি। গড়পড়তা একজন মানুষ বছরে ১ রেম বিকিরণ পায় পরিবেশ থেকে। ৪০০-৫০০ রেম শরীরে ঢুকলে তবেই তা ক্ষতিকর। প্রতিবার এক্সরে থেকে শরীরে ঢোকে ২০ মিলিরেম, ৭-৮ ফুট দূর থেকে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে টিভি দেখলে শরীরে ঢোকে ৮ মিলিরেম। সারণি দেখলে বোঝা যাবে হঠাৎ করে তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হলে কী হতে পারে।

শোষিত বিকিরণ পরিমাণ (রেম)	মৃত্যুর সম্ভাবনা
১০০০-৫০০০	১০০ শতাংশ
৬০০-১০০০	৮০-১০০ শতাংশ
২০০-৬০০	৫০ শতাংশ
১০০-২০০	মৃত্যু তবে তাৎক্ষণিক নয়।

এখন একটি অন্য একককে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ করা হয়। এর নাম সিভারট্‌স। এক সিভারট্‌স হল সেই পরিমাণ যে কোনও বিকিরণ, যা ১ কেজি দৈহিক উপাদন দ্বারা এক মূল এক্সরে/গামারে শোষিত হলে যে জৈবিক প্রতিক্রিয়া হয় তার সমতুল যার অর্থ হল ক্যান্সারে মৃত্যু সম্ভাবনা দাঁড়ায় ২০ জনের মধ্যে একজনের এক সিভারট্‌স ডোজের জন্য অথবা ২০,০০০ জনের মধ্যে একজনের এক মিলি সিভারট্‌স ডোজের জন্য। আতঙ্ক সৃষ্টি যাতে না হয়, তার জন্য ভয়াবহতার পরিমাণ একটু একটু করে বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে জাপান সরকার বা টেপকোর তরফে। প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে ফুকুশিকা থেকে ২২৫ কিমি উত্তরে টোকিওতে গত ৬ বছর ধরে বসবাসকারী কলকাতার এক বাঙালী মহিলা রীণা দে চক্রবর্তীর নাম ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। টোকিওর পানীয় জলে আয়োডিন ১৩১র মাত্রা নিরাপদ মাত্রার দ্বিগুণ হয়েছে, দুধ এবং সব্জীতেও তাই। শিশুদের জন্য তাই জাপান সরকার জলের বোতল সরবরাহ করছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে বিশ্বের পরমাণু শক্তি নির্ভর দেশগুলি এবং পরমাণু নির্ভরতা বাড়িয়ে যেতে থাকা দেশগুলি গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছে। বস্তুতপক্ষে সামগ্রিকভাবে মানুষ আজ হঠাৎ করে তীব্র অস্তিত্ব সংকটের উপলব্ধির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের কথা, ১২২ কোটি ভারতবাসীর কথা ভাবি। কিছুদিন আগেই ভারত মার্কিন পরমাণু চুক্তি হয়েছে। দেশ জুড়ে প্রচণ্ড বাদ-বিতণ্ডা হয়েছে। রাজনীতির জল ঘোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব বাধা বিপত্তি দূর করে নতুন নতুন পরমাণু চুল্লী মাথা তুলে দাঁড়ানোর পথে। প্রযুক্তিগত ভাবে আমাদের পরমাণু চুল্লীগুলি সুরক্ষিতই আছে। জাপান দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভারতে পরমাণু প্রযুক্তির প্রাণপুরুষ ও স্থপতি ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার সতর্ক ও দূরদর্শী পরিকল্পনামত চুল্লীগুলিতে এতদিন পর্যন্ত তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। চুল্লীগুলিকে তীব্র ভূকম্পন ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেওয়ায় থ্রি মাইল আইল্যান্ড (আমেরিকা) অথবা চের্নোবিল-এর মতো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। তাপপরিবাহী জলপ্রবাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে না। সেরকম পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার পরমাণু চুল্লী বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবিত চুল্লীর চাইতে মৃত চুল্লী যে আরও বেশি বিপজ্জনক সে ক্ষেত্রে কী হবে? কারণ, চুল্লী বন্ধ

হলেও আভ্যন্তরীণ বিভাজনজনিত তাপ কমে যাবে না। তারাপুরের চুল্লীগুলি ফুকুশিমা চুল্লীর মতো। তবে আমাদের এখানে শীতলিকরণ ব্যবস্থা আছে অভিকর্ষতাড়িত জলের ওপর নীচ প্রবাহ ৮ ঘন্টা ব্যাপী থাকতে পারে। চাপ সহ ভারী জল পরমাণু চুল্লীগুলিতে জ্বালানী দণ্ডগুলি ২৬০ টন ভারী জল রেস্টির থাকে। এতে ১০ ঘন্টা শীতলিকরণ চলবে। এছাড়াও অতিরিক্ত ভারী জলের পরিখা থাকার ৩০ ঘন্টা অবধি শীতলক কাজ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সময়সীমার মধ্যেও যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত না হয়, তাহলে কী হবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয় কখন কতটা কীভাবে হবে তা মানুষের নিশ্চিত হিসেব নিকেশের বাইরে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর জার্মানির চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল পুরনো বেশ কিছু পরমাণু চুল্লীর কাজের মেয়াদ দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাড়িয়ে দিয়েও ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর ৭টিকে বন্ধ করে দিলেন এবং তার ফল হল কল্যাণমুখী এই সঠিক মানবিক সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তাঁর দলকে নির্বাচনে হারিয়ে দিল। তবুও জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করলেন, ২০২২ সালের মধ্যে জার্মানি সব পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেবে। পাশাপাশি সুইডেন ও ফিনল্যান্ড সরকারও সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশাল জনসংখ্যার বিশাল দেশ ভারত এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, নেওয়া সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পরমাণু প্রকল্প সমূহের বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে ডেকেছেন নিরাপত্তার বিষয়টি আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে। উন্নয়নের যে পাশ্চাত্য সংজ্ঞা নিয়ে আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার সামনে হঠাৎ করে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করা বা যেগুলি নির্মিত হচ্ছে সেগুলি বন্ধ করা খুব মশকিল। যদিও এই মুহূর্তে আমাদের সামগ্রিক বিদ্যুৎ চাহিদার ৪ শতাংশ মাত্র আসে পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে। তবুও ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে সেটুকুও বন্ধ করতে পারি না আমরা। জাপানের এই দুর্ঘটনার পর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের বিরুদ্ধ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে, কিন্তু আমাদের সমস্যাটিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। তাহলে কী করতে পারি আমরা? বিদ্যুতের জন্য এই পরমাণু প্রযুক্তি-নির্ভরতা যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র নিরাপদ বিকল্প হল সৌরশক্তির ব্যবহার। কিন্তু যেটুকু কাজ হয়েছে দেশে এবং বিদেশে তাতে জানা যাচ্ছে যে, সৌরকোষের মাধ্যমে সৌরকিরণ থেকে সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, তার প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। সূর্যালোক সেখানে কাঁচা মাল, যার জন্য কো নও খরচ নেই তাকে শক্তিতে রূপান্তরকরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চল্লিশ মিনিটে যে সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে পড়ে তা সমস্ত পৃথিবীতে এক বছরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সমতুল্য। আমেরিকান সমীক্ষায় বলছে যদি বাতাস, বর্জ্য জৈবপদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ উৎসগুলিকে শক্তি উৎপাদন কাজে লাগানো যায় সৌরশক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি তাহলে দ্বিবিংশ শতাব্দীর মধ্যে আয়ত্তাধীন খরচেই বিদ্যুৎতের চাহিদা মেটানো যাবে তাদের দেশে। আমাদের দেশেও সূর্যালোকের অভাব নেই। সৌরকোষের উন্নত থেকে উন্নততর উৎকর্ষ অর্জনে উপযুক্ত উপাদান-গবেষণায় আমাদের ব্রতী হতে হবে, খরচ করতে হবে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে, তার জন্য উপযুক্ত জ্বালানী আহরণে, তাকে উপযুক্ত মানে নিয়ে যেতে, আনুষঙ্গিক পরিবেশগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যে খরচ হয় তার তুলনাতে সৌরশক্তি গড়ে তোলার খরচকে বৃহত্তর মানবিক স্বার্থে অবশ্যকরণীয় মনে করতে হবে। ফুকুশিমার মতো দুর্ঘটনার কথা জাপান ভাবেনি, কিন্তু শক্তিচাহিদা মেটানোর জন্য দূষণকণ্টকিত পেট্রল নির্ভরতা, দ্রুত ক্ষীয়মান এবং আমদানীকৃত খনিজের উপর নির্ভরতা ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠার জন্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর কথা জাপানও ভাবতে শুরু করেছে। পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। জার্মানী ও ইজরায়েল জাতীয় পরিকল্পনায় একে গুরুত্ব দিয়েছে। আমেরিকা যে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নিয়েছে তার কিছু পর্যালোচনা আমাদের পথ দেখাবে। আমেরিকার বিগত কয়েক বছরে সৌরকোষ গবেষণায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি, উৎপাদনমূল্য হ্রাস ইত্যাদি নিয়ে অগ্রগতি হয়েছে যথেষ্ট এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন সঞ্চয় এবং বৃহৎ মাত্রার ব্যবহারের সম্ভাবনা বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে। আগের তুলনায় কম খরচে ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম আস্তরণ সৌর কোষ এখন লভ্য হয়েছে। গবেষণাগারের উৎকর্ষ ১৬ শতাংশ অবধি নিয়ে যাওয়া যাবে, যদিও ব্যবসায়িক উৎপাদন ওই উৎকর্ষতা এখন পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও শুহিও স্টেটের একটি সংস্থা ২০০5 থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ অবধি উৎকর্ষ অর্জন করেছে, যা ২০১০ সাল নাগাদ ১১.৫ শতাংশে চলে যাবে বলে আশা করা হয়েছিল।

এর সঙ্গে গৃহস্থ অনুকুল বাড়ির ছাদে ব্যবহৃত সৌরকোষের দামও কমতে থাকবে। আমেরিকার পরিকল্পনা মতো ২০৫০ সাল নাগাদ সৌরকোষ প্রযুক্তি ৩০০০ জিগাওয়াট শক্তি যোগাবে, যার জন্য ৩০,০০০ স্কোয়ার মাইল ক্ষেত্র জুড়ে থাকবে সৌরকোষ-সজ্জা। সূর্যকিরণ যখন অলভ্য হবে, যেমন মেঘলা দিনে বা রাত্রের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা হবে চাপ সংক্রামিত বা সংকুচিত বাতাসকে পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ গহ্বরে পুরে দিয়ে অথবা প্রত্যক্ষভাবে সূর্য কিরণের সাহায্যে নলবাহিত প্রবাহী তরলকে উত্তপ্ত করে তা গলিত লবন ভর্তি আধারে নিয়ে গিয়ে। আধারীভূত তাপকে ব্যবহার করে কীভাবে টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ শেষ অবধি গ্রিডে চলে যাচ্ছে তার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আগামী ৪০ বছরে এর জন্য ব্যয় ধরেছে কিঞ্চিদধিক ৪০০ কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে যা ১৬ লক্ষ কোটিরও বেশি। ২০৫০ সাল নাগাদ সূর্য দেবে সমগ্র বিদ্যুৎ চাহিদার ৬৯ শতাংশ এবং সমগ্র শক্তি চাহিদার ৩৫ শতাংশ। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে দেখানো হয়েছে।

ক্যাডমিয়ান টেলুরাইড আস্তরণ ভিত্তিক সৌরকোষ সজ্জা থেকে গ্রিডে কীভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছবে তাও দেখানো হয়েছে। সূর্যালোক থেকে প্রোতিত রশ্মি ক্যাডরিয়াম টেলুরাইড স্তর থেকে হাল্কাবন্ধন ইলেকট্রনগুলিকে ধাক্কা দিয়ে কক্ষ থেকে বের করে দেয়, ইলেকট্রনগুলি সংযোগস্থল পেরিয়ে পরিবাহী স্তরে চলে আসায় বিদ্যুৎ প্রবাহের

সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ব্যবস্থা যেমন ব্যাটারী, ব্যয়বহুল এবং অত্যল্প উৎকর্ষসম্পন্ন। তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সফল বিকল্প হিসেবে চাপ সংনমিত বায়ু শক্তির ধারণা উদ্ভূত হয়েছে। সৌরকোষ সজ্জা থেকে বিদ্যুৎতের সাহায্যে পাম্প চালিয়ে সংকুচিত বায়ুকে চাপ দ্বারা সংনমিত করে ভূগর্ভস্থ কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক ফাঁকা গহ্বরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মতো এই চাপ সংনমিত বায়ুকে মুক্ত করে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। জার্মানির হাস্টার্ফে ১৯৭৮ সাল থেকে বিশ্বস্তভাবে ওই ব্যবস্থা চলছে। শক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে সূর্যকিরণ একটি বিন্যাসক্ষম প্রতিফলকের সাহায্যে পাইপে প্রবাহিত তরল ইথিলিন গ্লাইকলকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত তরলকে একটি গলিত লবণ আধারিত প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সঞ্চিত তাপকে প্রয়োজনমতো তাপ বিনিময়কারী ব্যবস্থার

গড়ে তোলা দরকার। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গেও কৃষির আওতার বাইরে অনেক সূর্যালোক সমৃদ্ধ অঞ্চল আছে যেখানে এইসব প্রকল্প গড়া যায়।

মানব সহ সমগ্র প্রাণীজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৌরশক্তি নির্ভর স্মরণাতীতকাল থেকে এ তথ্য ভারতীয় ঋষিদের জানা ছিল, তাই মানুষকে সচেতন রাখতে সূর্য বন্দনার, নিয়মিত গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণের প্রচলন ছিল। খোদ আমেরিকাতেই এই প্রশ্ন উঠেছে যে, বৃহদায়তন সৌর প্রকল্প চালু রাখতে গিয়ে উপাদান যোগান জনিত সমস্যা দেখা দেবে কিনা। ওখানকার গবেষণাই তার উত্তর দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের উপাদান উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর সৌরকোষে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর, দূর ভবিষ্যতে পুরনো সৌরকোষকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা যাবে। ফুকুশিমা দাইচের দুর্ঘটনা যে সংকটের

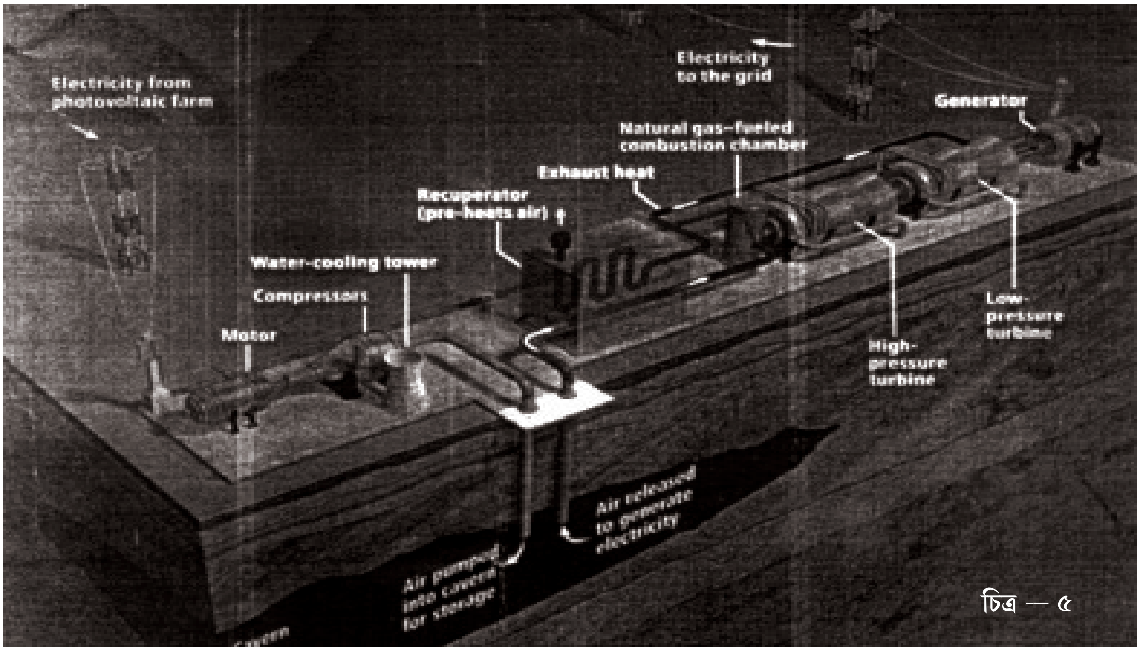

চিত্র — ৫

জলকে উত্তপ্ত করে সৃষ্ট বাষ্পকে দিয়ে টারবাইন চালানো হয়। বিদ্যুৎকে নিয়ে যাওয়া হয় বন্টন গ্রিডে। এই ভাবে সূর্যালোক সংহত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে আমেরিকা ৫টি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট ৩৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সহ। ৭ ঘন্টা ধরে শক্তি সঞ্চয় করে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চলছে স্পেনে। এই সঞ্চয় ১৬ ঘন্টা ধরে হলে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। ক্যালিফোর্নিয়ার মরু অঞ্চল সোজেভ-এ ইজরায়েলী আদর্শে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু আছে ১৯৯৩ সাল থেকে।

আমাদের দেশে অনাগত ওই রকম সম্ভাব্য সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য এখনই ওইসব প্রয়াস শুরু করা উচিত আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, নির্মাণ কার্য, বিজ্ঞানী ও কর্মী পরিপোষণে, জ্বালানী সংগ্রহে ও মানোন্নয়নে, নিরাপত্তা ব্যবস্থায়— দূষণ প্রতিরোধে তার তুলনায় একটু বেশি ভর্তুকি দিয়েও এই সব সূর্য নির্ভর বিকল্প ব্যবস্থা

সৃষ্টি করেছে তা মানুষের নিজের সৃষ্ট এবং এই সংকট তার ঝুঁকিও যন্ত্রণা সহ দীর্ঘস্থায়ী, সুনামিজনিত সংকট তুলনায় সাময়িক। ভোগ্য বস্তুর চাহিদার প্রবৃত্তিকে নিয়ে প্রযুক্তির দাম্ভিক জয়যাত্রার লাগাম টানা দরকার। শ্রীঅরবিন্দর সাবধানবাণী মনে পড়ে— "Man has created a system of civilisation which has become too blg for his mental capacity and understanding and his still more spiritual and moral capacity to utilise and manage a too dangerous servant of his bleendering ego and appetileo"।

তথ্যসূত্র :— (১) চের্নোবিল দুর্ঘটনা ও মানব ভবিষ্যত — ভাবনাচিন্তা ১ আগষ্ট, ১৯৮৬, (২) পরমাণুচর্চা, সাধারণ মানুষ এবং বাস্তব যোজনা, জুন– ২০০১, (৩) সায়েন্টিফিক আমেরিকান ইন্ডিয়া, জানুয়ারি, ২০০৮, (৪) সায়েন্স টুডে - সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

রয়টার

গোপালকৃষ্ণ রায়

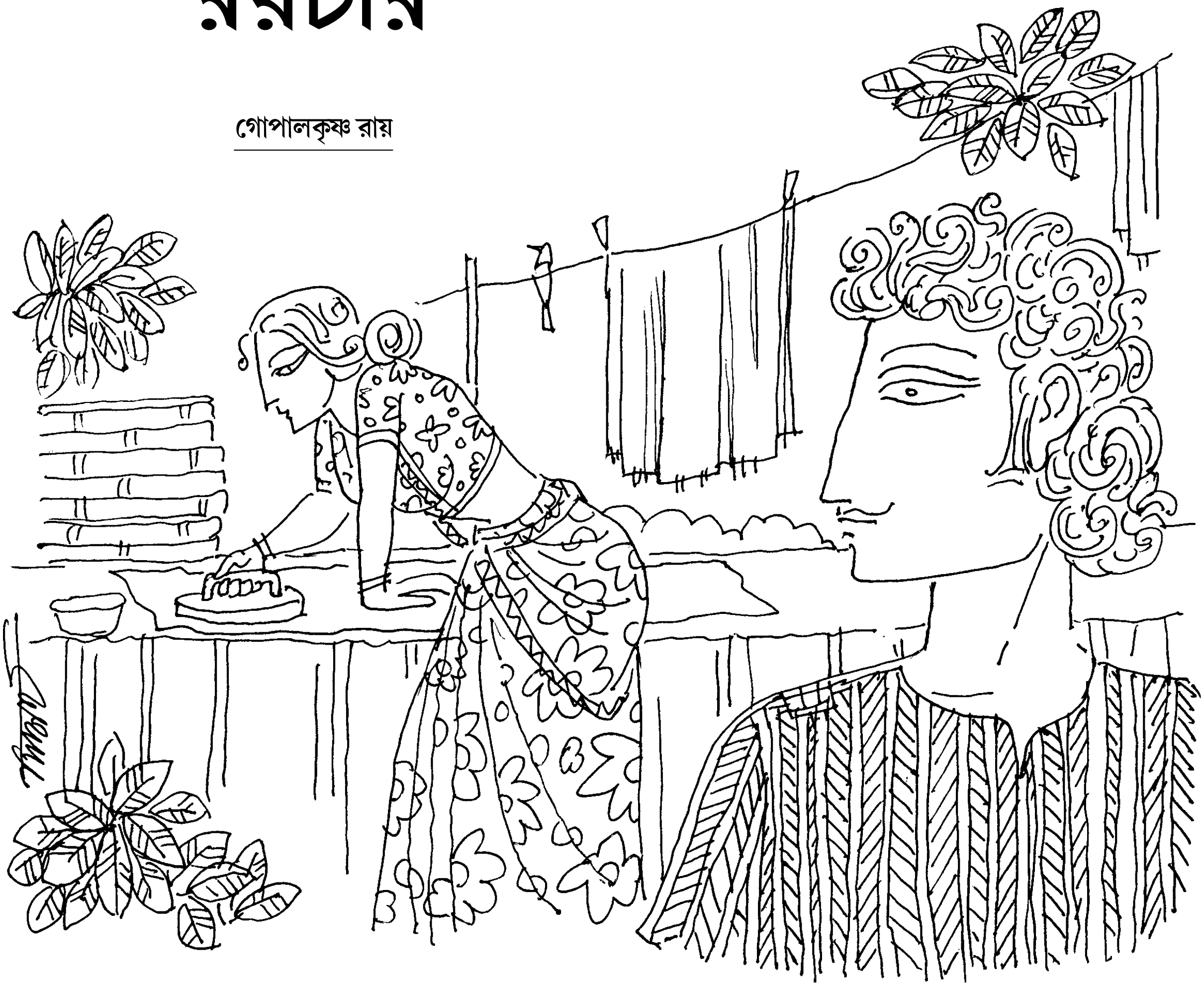

পিতৃদত্ত নাম প্রায় ভুলেই গেছে পঞ্চানন। প্রতিবেশী প্রদত্ত নামেই সে এখন বেশি পরিচিত। শুধু নিজের গ্রাম দাদুপুর নয়, আশপাশের চার-পাঁচটি গ্রাম ডিঙিয়ে পাড়া-প্রদত্ত রয়টার নামটি বেথুয়াডহরি, পাগলাচণ্ডী, দেবগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বাইরে থেকে দাদুপুর এসে কেউ পঞ্চাননের খোঁজ করলে, অনেকেই মাথা চুলকাতে শুরু করবে। অনেক চিন্তাভাবনার পর, কেউ একজন বলবে, ও, আপনি রয়টারকে খুঁজছেন? ওই যে পুকুরের ওপারে ঝাঁকড়া কুলগাছ দেখছেন, ওখানেই রয়টারের বাড়ি। ওই নয়নাজুলির পাশ দিয়ে সোজা চলে যান।

অন্য কেউ একজন বলে উঠবে, এখন গিয়ে কী তাকে বাড়ি পাবেন? সম্ভবত সে এখন বিক্রমপুরের সিংহরায় মহাশয়ের বাড়িতে বসে টি-ভিতে খবর শুনছে। ঘরে ফিরতে রাত ন'টা তো হবেই।

টি-ভিতে বার্তা শোনা এবং তা মাত্রাহীনভাবে পল্লবিত করে গাঁয়ে গাঁয়ে পৌঁছে দেওয়া রয়টারের স্ব-আরোপিত কর্তব্য। ঝড়, জল, প্রাকৃতিক দুর্যোগেও, খবর প্রচারে রয়টারের বাধা হয় না। তার এই বার্তা বাতিকের জন্য সিংহরায় মশায় তার নাম দিয়েছেন রয়টার। কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সংঘর্ষ, দান্তেওয়াড়ার জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময়, স্ত্রী ও দুই শিশুসন্তান হত্যা করে আত্মহত্যা করলেন গৃহকর্তা। স্বরূপগঞ্জে লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার ইত্যাদি খবর টিভিতে শুনে তা স্ব-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ করে গাঁয়ে গাঁয়ে

পৌঁছে দেয়। বাড়ি বাড়ি যেতে হয় না। কয়েকটা নির্দিষ্ট 'সেন্টার' আছে। সেখানে গিয়ে নিজের ভাষায় খবরগুলো উদ্‌গিরণ করে রয়টার।

প্রতিটি খবরের সঙ্গে নিজের মতও জুড়ে দেয়। তাতে শ্রোতারা অখুশি তো হয়-ই না। বরং মাথা নেড়ে তার মতের সঙ্গে একমত হয়।

সিংহরায় মশাই তার নাম রেখেছেন রয়টার। প্রথমে রেখেছিলেন 'বার্তাবাহক'। শব্দটি খটমট বলে পাল্টে রেখেছেন 'রয়টার'। দু-দশক হলো, এ দিকের মানুষ তাকে রয়টার বলেই ডাকে। এখন তো কেউ তাকে পিতৃদত্ত নামে ডাকেই না, চেনেও না। কেউ যদি পঞ্চু বা পঞ্চানন বলে, সে নিজেই বিরক্ত হয়। গম্ভীর গলায় বলে, সিংহরায় মশায় যে নামটি দিয়েছেন, সেটা কি তোমাদের মনে থাকে না? এত নামী মানুষটা কত আদর করে যে নাম রেখেছেন, তোমরা তার অমর্যাদা করো না।

রয়টার ওরফে পঞ্চানন দাদুপুর গ্রামের ধোপা। বিকেলে ধোলাই কাপড়ের বোঁচ্‌কা মাথায় নিয়ে বার হয়। এপাড়া ওপাড়ায় ধোলাই কাপড় দিয়ে, ময়লা জামা-কাপড় পুটলি বেঁধে সন্ধ্যেবেলায় বিক্রমপুরে সিংহরায় মশাইয়ের বাড়ি পৌঁছে যায়। টিভিতে রাত ন'টার খবর শুনে, কাঁচা সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

কোনও একটি বিশেষ খবর সারা পথ তার মনের মধ্যে নড়াচড়া করতে থাকে। নিজের মনের মতো করে খবরটি পরিবেশন না করা পর্যন্ত সে অস্থির বোধ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্দিষ্ট সেন্টারে যেতে না পারলে, ঘরে ফিরে তার বৌদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরটি শোনায়।

আজকাল পঞ্চানন তার বৌদিকে 'বৌদি' বলে না। বলে 'বড়বৌ'। শুধু দাদুপুরের মানুষ নয়, আশপাশের গ্রামের সবাই জানে, পঞ্চানন বৌদির জন্যই বিয়ে করেনি।

পূর্ণর মৃত্যুর বছর খানেক পরেই পঞ্চানন আর সতীকে নিয়ে পাড়ায় অনেক মুখোরোচক কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যকে অস্বীকার করেনি কেউ।

পঞ্চাননের দাদা পূর্ণ বিয়ের পর মাত্র বছর খানেক বেঁচে ছিল। দু'দিনের জ্বরেই যে তাগড়াই মানুষটা মরে যাবে সতী তা ভাবতেই পারেনি। রাতে যখন বাড়াবাড়ি হয়, তখন গরুর গাড়িতে শুইয়ে পাগলাচণ্ডী হেলথ্ সেন্টারে নিয়ে গিয়েছিল পঞ্চানন। পূর্ণর মাথা কোলে নিয়ে দু'কিলোমিটার পথ বোবা হয়ে বসেছিল সতী।

পূর্ণর নাড়ী দেখেই ডাক্তার বলেছিলেন, ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও পঞ্চু, তোমার দাদা আর নেই।

ডাক্তারের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল সতী। পঞ্চুও দু'হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে কান্না রোধ করেছিল।

নাকটা সামান্য চাপা হলেও সতী দেখতে মোটামুটি ভালই। নারীর সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু যা, সতীর দেহের সেই অংশটার দিকে ব্রহ্মচারীরাও না তাকিয়ে থাকতে পারে না।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পর পানশিলা থেকে সতীর বাবা তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীর ভিটা ছেড়ে কোথাও যেতে চায়নি সতী।

।। ২।।

রয়টারদের ঘর বড় না হলেও বাড়ির চৌহদ্দি প্রায় এক বিঘে। ঘরের সামনে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ। দু'মাথায় দু'টি খুঁটির সঙ্গে নাইলনের দড়ি বাঁধা। জামা-কাপড় সেখানেই শুকোয়। অনেক সময় ধুতি, শাড়ি সবুজ ঘাসের ওপর টানটান করে মেলে দেয়। বারান্দায় একটা তক্তাপোশ। সেখানেই সতী কাপড় ইস্ত্রি করে। কাপড় মেলে দিয়ে, ঝাকড়া পেয়ারা গাছের নিচে বসে লক্ষ্য রাখে রয়টার। মাঝে মাঝে দু-চারটে কুকুর কাপড়ের ওপর দিয়ে ছুটে যায়। সেগুলো আবার নতুন করে ধুতে হয়। পাড়ায় দু'চারটে কাপড় খেকো গরুও আছে। চাকলানবিনের গরু দুটো তো পরনের শাড়ি ও ধুতি ধরে টানাটানি করে।

পেয়ারা গাছের নিচে পাহারা দেয় রয়টার। বারান্দায় শুকনো কাপড় ইস্ত্রি করে সতী। মাঝে মাঝে নিজের চোখকে শাসনে রাখতে পারে না রয়টার। ইস্ত্রি করার সময় সতীর বুক থেকে আঁচল সরে যায়। রয়টার লোভী হয়ে ওঠে। লোভ দমন করার সাধনা রয়টার করেনি। সে সতীর কাছে যায়। বলে, অনেকক্ষণ ইস্ত্রি করছো। এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

ঘাড় কাত করে মিষ্টি করে হাসে সতী। সে হাসি দেখতে পায় না রয়টার। সতীর বাঁ দিকের পুরুষ্ট স্তনে তার দৃষ্টি আটকে থাকে। রয়টারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে, বুকের শাড়ি টেনে দেয়।

— ঘরে চল।

সতীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ঘরে টেনে নিয়ে যায় রয়টার।

সতী বলে— ছাড়ো, এখন নয়।

মুখে বললেও রয়টারের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না সতী। দুটি বুভুক্ষু দেহ একসময় পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়।

প্রথমে এপাড়ায় সে পাড়ায় কথা চালাচালি হলেও, এখন ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। বিক্রমপুরের সিংহরায় মশায় বলেছিলেন, রয়টার চল, তোমার ব্যাপারটা নিয়ে পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আসি। তোমাদের বিয়েটা জরুরি।

।। ৩।।

চুপ করে বসে টিভি-র পর্দায় চোখ রেখেছিল রয়টার। আবার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবে। গরীবের কষ্ট বাড়বে। গরীবদের কষ্ট বাড়লে, কার কী এসে যায়! বড়লোকের ক্ষতি না হলেই হলো। যদিও রয়টারকে বড় একটা বাসে উঠতে হয় না, শুধু মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগর যেতে হয়। কোনও কোনও দিন হাঁটতে ইচ্ছা করে না, সেদিন বিক্রমপুর থেকে বাসে দেবগ্রাম যায়। ধনীদরদী এই সরকার, গরীবের সেই বিলাসিতাটুকুও কেড়ে নিল। সতী অবশ্য কোথাও বেরোয় না। মাস ছয়েক আগে একবার বেথুয়াডহরি হেলথ্ সেন্টারে গিয়েছিল।

খবর শুনেই রয়টার উঠে পড়ে। সিংহরায় মশায় বলেন, 'চললে নাকি রয়টার?'

— আজ্ঞে যাই, কর্তা। খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিই।

রয়টার প্রথমে যায় নীলমণি মণ্ডলের বাড়ি। নীলমণির ঘরে তখন আসর জমে উঠেছে। রয়টারকে দেখে সবাই হৈহৈ করে ওঠে।

— তোমার জন্য আমরা বসে আছি, রয়টার। আজকের বড় খবর কী? নিশ্চয়ই বড় খবর আছে?

রয়টার বলে— বড় বলতে বড়! অনেক বড় খবর। আমাদের সকলকে জাঁতাকলে পিষে মারার খবর।

সকলে উদ্বেগ নিয়ে রয়টারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রয়টার বলে— চাল-ডাল-তেলের দাম আরও বাড়বে। কাল-পরশু থেকে হয়তো তিরিশ টাকা হয়ে যাবে।

— তিরিশ টাকা! বল কী? আমার বাড়িতে দু'বেলায় তিন কিলো চাল লাগে। প্রতিদিন নব্বই টাকা লাগবে শুধু চাল কিনতে!

রয়টার বলে, শুধু চাল কেন? ডাল, তেল সব জিনিসের দাম বাড়বে। ট্রেনের ভাড়া বাড়বে, বাসের ভাড়া বাড়বে।

কে একজন বলে ওঠে,— তখনই তো বলেছিলাম, এই পার্টিকে ভোট দিও না। এখন বোঝো ঠ্যালা।

রয়টার বলে — অন্য পার্টিই বা কী করছে? রাস্তায় রাস্তায় শুধু জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করলেই কী জিনিসপত্রের দাম কমে নাকি? ওই তো সিংহরায় মশায় সেদিন বলছিলেন, জিনিসপত্রের দাম আর কোনও দিনই কমবে না। আগামী দু'বছরের মধ্যে চালের দাম পঞ্চাশ টাকা কেজি হবে। আমদানি না করলে গমেও টান পড়বে।

পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব কী বলছিলেন, শুনেছো? শোন, দুর্ভিক্ষ আসছে। কী যেন শব্দটা বললেন, পদ-পদ-নি...

— আরে না, না। পদনি নয়, পদধ্বনি। দুর্ভিক্ষের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই হল। আমরা সে দুর্ভিক্ষ দেখিনি। আমাদের বাবা-জ্যাঠারা দেখেছিলেন। অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। মাঠে ঘাস আর গাছে নাকি পাতাও ছিল না।

কে একজন বলে, আবার কী সেই দুর্ভিক্ষ আসছে?

এক লহমায় সারা ঘরে স্তব্ধতা নেমে আসে। চিন্তায় সবার কপালে ভাঁজ। রয়টার একটা কথা বলে সেই ভাঁজকে আরও খানিকটা গভীর করে দেয়।

বলে, জানো সরকারি অব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ টন চাল-গম পচে গেছে। সেগুলো আর খাওয়া যাবে কিনা কে জানে। চারদিন আগের খবর রয়টার এই সুযোগে কাজে লাগিয়ে দেয়।

— কী গভর্মেন্ট রে বাবা! এত চাল গম পচালি কেন? গরীব মানুষদের বিলিয়ে দে।

রয়টার বলে, যাই দাদুপুরের মানুষ খবর শোনার জন্য বসে আছে। রয়টার বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য দায়ী আমেরিকা। কে বলেছেন জানো? পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব।

।। ৪।।

শ্রোতাদের মধ্যে নিশিকান্ত বারুই বলে, একটা কথা শুনে যাও, পঞ্চুরয়টার।

নিশিকান্ত বারুই বয়োজ্যেষ্ঠ। জীবনের প্রায় আশিটা বছর পিছনে ফেলে, এখনও এগিয়ে চলেছে।

নিশিকান্ত বলে, শোন রয়টার, তুমি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কথা বলছিলে না! আমি সেই দুর্ভিক্ষ দেখেছি। আমার বয়স তখন বারো। কঙ্কালসার অর্ধনগ্ন নারী পুরুষের মিছিলে দেখেছি। গাছের কচি পাতার জন্য হাড় জিরজিরে মানুষগুলোর মারামারি দেখেছি। একটা কচুর ডাঁটার ওপর পাঁচজনকে দাবি জানাতে দেখেছি। উপোস পেটে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে কলেরায় হাজারো মানুষের মৃত্যু দেখেছি।

একসঙ্গে সবাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বারুই বলে, সেই ভয়ঙ্কর দিন বোধহয় আবার ফিরে আসছে। দেখছো না, ভরা ভাদরে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। তৃষিত ভুঁইয়ের দিকে তাকানো যায় না। জল চাই জল! আমার আশি বছর বয়স, এমন কঠিন খরা প্রথম দেখছি। শুধু চাল, ডাল নয়, এবারের দুর্ভিক্ষে জলও পাওয়া যাবে না। নিজেদের অদৃষ্ট ছাড়া কাকে দোষ দেবে?

— যাই বারুই খুড়ো। ভদ্র বাড়িতে খবরটা দিয়ে ঘরে যাব।

ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কা কাঁধে নিয়ে

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায় রয়টার। রয়টারের বাঁ পা পুরো মাটিতে পড়ে না। পাঁচ আঙুলে ভর দিয়ে রয়টার খুঁড়িয়ে হাঁটে।

ভদ্র বাড়িতে এসে রয়টার নতুন খবর শোনায়। শুনেছ ভদ্রদা, এখন আর ডাক্তারের ওপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

— ডাক্তারেরা কী করলো?

— কী আর করবে ওরা? ইস্ট্রাইক। সারা রাজস্থানের ছোট-বড় সব ডাক্তার ইস্ট্রাইক করেছে। চিকিৎসার অভাবে প্রায় শতখানেক রোগী মারাও গেছে। এর মধ্যে চল্লিশটি শিশুও ছিল। চিন্তা কর, হতভাগ্যদের মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি। কী নিষ্ঠুর! বল তো।

ভদ্র বলে, শুধু রাজস্থান, দিল্লী কেন, আমাদের এই কলকাতায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ডাক্তাররা কর্মবিরতি করে। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, তত নিষ্ঠুর অসভ্য হচ্ছি। তোমার দীনবন্ধু ডাক্তারের কথা মনে আছে?

— ও বাবা, ওমন দেবতুল্য মানুষের কথা কেউ কখনও ভুলতে পারে? নাকি ভোলা যায়?

রয়টার বলে, আরও একটা খবর শুনে এলাম। চীন আবার বাঁদরামো শুরু করেছে।

ভদ্রবাবু বলেন, সেটা তো পুরনো কাসুন্দি। যত ঘাঁটবে তত পচা গন্ধ বেরোবে। এবার কী করল?

রয়টার বলে, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ওরা নাকি সৈন্য পাঠিয়েছে। ওখানে ঘাঁটি বানাচ্ছে।

ভদ্রবাবু হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, চীন এই বদরোগে অনেকদিন থেকেই ভুগছে। এ নিয়ে ভাববার লোক আছে রয়টার, তাদের ভাবতে দাও। তবে শুনে রাখ, যুদ্ধ-টুদ্ধ হবে না, যুদ্ধ হলে আমরা মরবো ঠিকই, কিন্তু ওরা কী বেঁচে থাকবে? শোন রয়টার, শোন, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ এই চারটি হলো পৃথিবী ধ্বংসের কারণ। একদিন না একদিন এই পৃথিবী তো ধ্বংস হবেই। মরার আগে মরবো কেন?

রয়টার বলে, অনেক রাত হলো, এবার বাড়ি যেতে হয়।

বাড়ির পথে পা বাড়ায় রয়টার। পথ চলতে চলতে দুর্ভিক্ষের কথাটাই তার বারেবারে মনে পড়ছিল।

— এই যাঃ, মূল খবরটাই তো বলা হল না। ফিরে যাবে কিনা আলের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবে রয়টার। যাক, কাল বললেই হবে। খবরটা মনের মধ্যে পাক খায়। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে খুব বকেছে। লক্ষ লক্ষ কুইন্টাল খাদ্যশস্য অযত্নে পচিয়ে ফেলার জন্য খাদ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেছেন। রয়টার ভাবে, দায়ী করে আর কী লাভ? খাদ্যশস্য তো আর ফিরে আসবে না। তারচেয়ে অযোগ্য মন্ত্রীটাকে তাড়িয়ে দিলে ভালো হোত!

রয়টার উঠোনে পা রাখতেই সতী বলে, পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টারবাবু কাল সকালে দেখা করতে বলেছেন। ধুতি কোঁচাতে আর পাঞ্জাবী গিলে করতে হবে।

ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কা বারান্দায় রেখে রয়টার সতীর পাশে বসে। সতীর আঁচল টেনে নিয়ে ঘষে ঘষে মুখের ঘাম মোছে। সতী বলে, দিলে তো ঘামের দাগ লাগিয়ে! আজই তো সোডা দিয়ে কেচেছি।

রাত ন'টার ঘরে পৌঁছে যায়। রয়টারদের বাড়ি গাঁয়ের এক কোণে। বাড়ির পিছনে ভেরাণ্ডা আর আকন্দ গাছের জঙ্গল। অথচ সামনের উঠোন সবুজ ঘাসে ঢাকা। রয়টার উঠোনে টান টান করে ধুতি শাড়ি মেলে। আজকাল কাপড় কাচাও খুব মুস্কিল। পুকুর পগার, ডোবার জল শুকিয়ে গেছে। কালীবাড়ির পুকুরে সামান্য জল আছে। সেখান কাপড় ধোওয়া বারণ। আর দিন সাতেকের মধ্যে বৃষ্টি না হলে জংলী ডোবার জলও শুকিয়ে যাবে।

রাত ন'টার পর গ্রাম শুনশান হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে লোকজন থাকে না। দু-একজন ব্যবসায়ী বেথুয়াডহরি থেকে সাইকেলে ঘরে ফেরে। তারা মাঝে মাঝেই ঘন্টি বাজায়।

রয়টার দু'হাত দিয়ে সতীকে জড়িয়ে ধরে।

সতী বলে, এখন আর আদর করতে হবে না। যাও হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

মুখে বললেও, সতী রয়টারের বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় না।

রয়টারের কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, এমনি করে আর কতদিন চলবে। এবার তুমি একটা বিয়ে কর, বলেই সতী খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। রয়টার সতীকে বুকে চেপে ধরে।

রয়টার বলে, পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব তো বলেছেন, আমাদের বিয়েতে কোনও বাধা নেই। কাল তো দেখা করতে যাব, তখন সব জেনে আসবো।

— সতী, রয়টারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে এস।

।। ৫ ।।

ধোলাই কাপড়ের বস্তা কাঁধে নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে রয়টার। বাড়ি বাড়ি ধোলাই কাপড় দিয়ে ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কা বাঁধে। পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি যেতে হবে। ছোট ব্যারিস্টারের বিয়ের ধুতি কোঁচাতে হবে। তিন চারটে পাঞ্জাবীও গিলে করতে হবে। একসময় নিজের বিয়ের কথাও তুলবে। ভাবতেই একরাশ লজ্জা তার মনের ওপর ছায়া ফেলে।

বছর তিনেক আগে পূর্ণর সঙ্গে সতীর বিয়ে হয়েছিল। দাদার বিয়ে বলে কথা। বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া, তাদের আদর আপ্যায়ন সবই

পঞ্চাননকে করতে হয়েছে। বৌদিঅন্ত প্রাণ পঞ্চুর। শুধু কাপড় ধোলাই করার আগে পূর্ণকে সাহায্য নয়, ঘরকন্নার কাজে বৌদিকেও সাহায্য করতো।

মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলো কেমন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্মৃতিগুলো দু'পাশে সরিয়ে রেখে পাগলাচণ্ডী ব্যারিস্টারের বাড়ি পৌঁছে যায় রয়টার। ইজিচেয়ারে শুয়ে কাগজপত্র দেখছিলেন ব্যারিস্টার সাহেব। সিঁড়ির এক কোণে ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কাটা রেখে মেঝেতে বসে রয়টার।

ব্যারিস্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ঝুলিতে নতুন কী খবর আছে রয়টার?

রয়টার মাথা চুলকিয়ে বলে, ধর্মদায় একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে কর্তা।

— ধর্মদায় কী খারাপ ঘটনা ঘটলো?

আজ্ঞে দাসপাড়ার বছর বারো বয়সের একটি মেয়েকে তৌফি মিঁয়ার বড় ছেলে রেপ করেছে। এই নিয়ে খুব উত্তেজনা। সারা গাঁয়ে পুলিশের টহল চলছে। ছেলেটি পালিয়ে গেছে।

একটু থেমে কিছু একটা ভাবে রয়টার। বলে, পালিয়ে কি ছেলেটি বাঁচতে পারবে? পারবে না।

ব্যারিস্টার সাহেব চুপ করে শোনেন। চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখেন। তিনি জানেন, রয়টার এখনও ধর্মদার মধ্যেই ডুবে আছে। ধর্মদার সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা এখনও সে বলেনি।

রয়টার বলে, মুখার্জীবাবুর ছোট ছেলে কী বলেছেন, শুনেছেন কর্তা?

— না।

— দাসপাড়ায় গিয়ে বলেছেন, ব্যাপারটা এখানে শেষ করে দিও না। হেস্তনেস্ত না করলে বিপদ আরও বেড়ে যাবে। তৌফিদের হাত আরও লম্বা হবে।

ব্যারিস্টার সাহেব এইবার একটু নড়েচড়ে বসেন। এইবার রয়টারকে থামানো দরকার। নইলে রয়টার রটিয়ে দেবে, দাসপাড়া টগবগ করে ফুটছে। যে কোনও মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। হাঙ্গামা একবার শুরু হলে থামানো বড় কঠিন।

ব্যারিস্টার সাহেব বলেন, তোমার কথা কী যেন বলবে?

রয়টার বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। লোকে নানা ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে। এমনি করে তো আর জীবন কাটে না কর্তা। একটা বিহিত দরকার।

ব্যারিস্টার সাহেব বলেন, তোমার দাদার বিধবাকে বিয়ে করতে পার। শাস্ত্রেও বাধা নেই, আইনেও বাধা নেই। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে কর, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

রয়টারের মন হাল্কা হয়। সে ব্যারিস্টার সাহেবের পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করে।

ব্যারিস্টার সাহেব ধর্মদার ঘটনা আর উল্লেখ করেন না। রয়টার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক কথা বলতে পারে। ধর্মদার ঘটনা খুবই সংবেদনশীল। কৃষ্ণনগরে ফোন করে ডি এম-এর সঙ্গে কথা বলেছেন ব্যারিস্টার সাহেব।

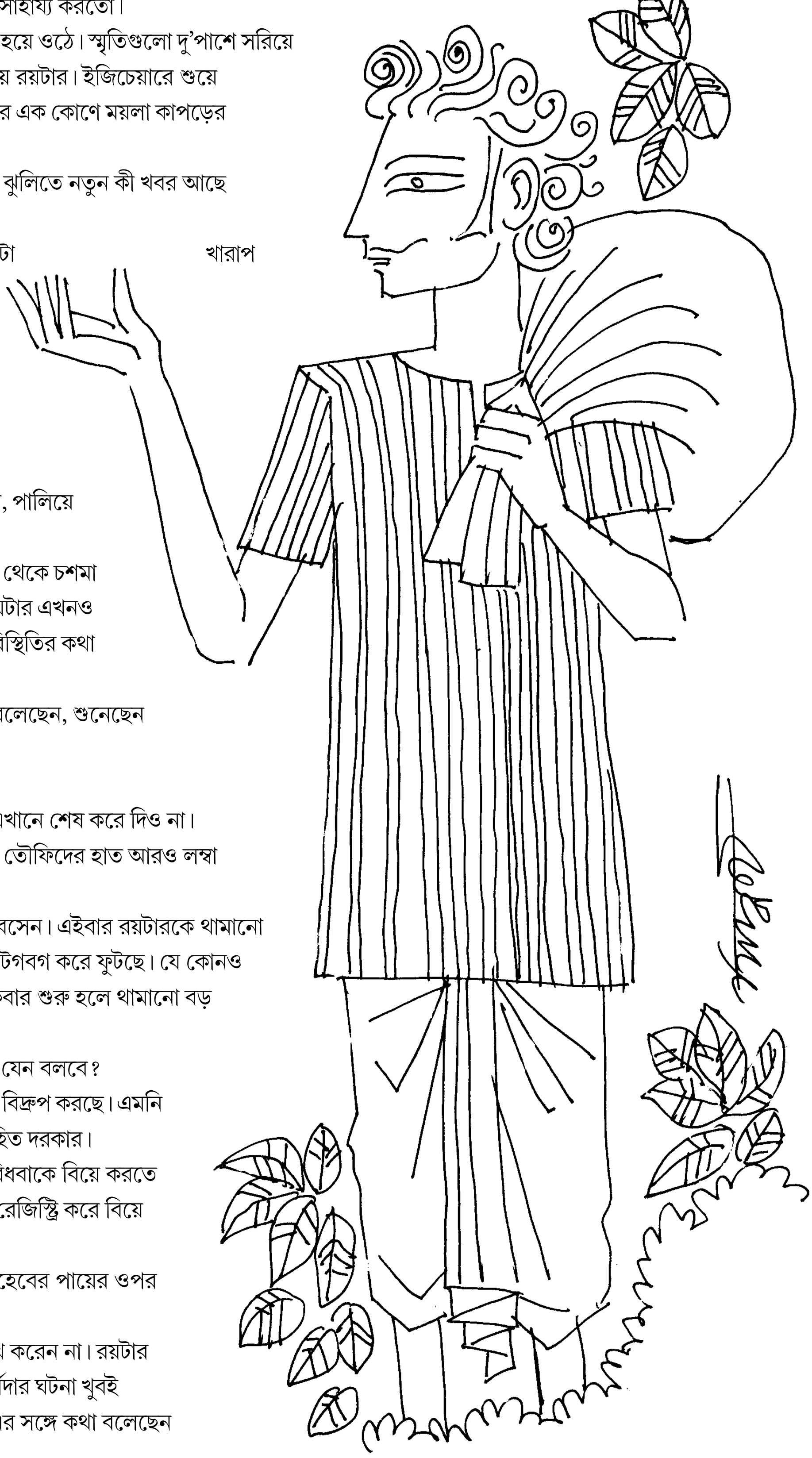

।। ৬।।

খুব ভোরে ওঠে রয়টার। এবার অঘ্রাণের প্রথমেই বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

সতী বলে, এত ভোরে কী খবর ছড়াতে চললে?

মুখে রহস্যের হাসি ঝুলিয়ে একটু রসিকতা করে রয়টার বলে, দারুণ খবর।

সতী বলে, তোমার ওই দারুণ খবর আমাকে একটু শুনিয়ে যাও।

— তুমি তো শুনবেই। তোমাকে তো বলতেই হবে।

সতী বিরক্ত হয়ে বলে, এত ঘুর প্যাঁচের কী আছে? একটু খুলেই বল না।

রয়টার আবার ঘরে ঢোকে। বলে, রেজিস্ট্রি বিয়ের ফরম আনতে যাচ্ছি। এই দেখ, পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব দেবগ্রামের নিমুবাবুকে চিঠি লিখে দিয়েছেন।

সতীর মুখে হাসি ধরা থাকলেও চোখের সামনে পূর্ণর মুখ ভেসে ওঠে। পূর্ণর সঙ্গে প্রথম মিলনের সুখ আবার তার অনুভবে ফিরে আসে। প্রথম রাতে কী গভীর ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। প্রথম রাতের সেই সুখ এখনও তার দেহে তরঙ্গ তোলে। আর চুম্বন! কোনও মেয়েই বাসর রাতের প্রথম চুম্বন ভুলতে পারে না।

রয়টার বলে, এই মাসেই নোটিশ দেব। ব্যারিস্টার সাহেব বলেছেন, তিনিও সাক্ষী থাকবেন।

সতী অবাক হয়ে বলে, ও মা, উনিও কী আমাদের এই বাড়িতে আসবেন নাকি!

— আরে না, না। উনি আসবেন কেন? রেজিস্ট্রি তো সাহেবের বাড়িতেই হবে। তোমাকে যেতে হবে।

— আমাকে? আমাকে ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি যেতে হবে? না, না, আমার ভীষণ লজ্জা করবে।

আলতো করে সতীর গাল টিপে দিয়ে বেরিয়ে যায় রয়টার। অন্য খবরের চেয়ে তার নিজের খবর অত্যন্ত জরুরি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখা কমল ঠাকুরের সঙ্গে, সে বারো নম্বর ডিপ টিউবওয়েলের অপারেটর। এখনও বাঙাল ভাষায় কথা বলে। মানুষটি বড় ভাল সাধাসিধে।

— রয়টার যে, বিহান বেলায় কোথায় যাইতাছ? বড় খবর পাইছো নাকি?

রয়টার হাসতে হাসতে বলে, খবর তো বড় বটে। শুনলে আপনারও ভাল লাগবে।

—তাই!

দু'পা এগিয়ে এসে কমল ঠাকুর বলে, কও, তাড়াতাড়ি কও। ভাল খবর চাইপা রাইখতে নাই। কও।

রয়টারের মুখে চওড়া হাসি। বলে। রেজিস্ট্রি বিয়ের ফরম আনতে দেবগ্রাম যাচ্ছি।

কমল ঠাকুর বলে, কার বিয়া?

রয়টার বলে, পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, রয়টার দুর্নামি বাড়িও না। তুমি পূর্ণর বিধবাকে বিয়ে কর। আইনে কোনও বাধা নেই। কমল ঠাকুর বলে, শাস্ত্রেও বাধা নেই। এতো খুব ভাল খবর। শুধু রেজিস্টিরি কইরলে তো অইবো না, রয়টার। বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান কইরতে লাগবো। আমি শাস্ত্র মতে দুই হাত এক কইরা দিমু।

কমল ঠাকুরের কথা শুনে রয়টারের মন আনন্দে ভরে ওঠে। সে ধপ্ করে কমল ঠাকুরকে প্রণাম করে বলে, একদিন আপনার বাড়ি গিয়ে অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক করে নেব।

।। ৭।।

খোশ মেজাজে বাড়ি ফিরছিল রয়টার। রেজিস্ট্রি হবার পর সামাজিক সংকোচ থেকে দু'জনেই মুক্তি পাবে। তাদের অগোচরে কেউ আর বদনাম দিতে পারবে না।

বড় রাস্তা থেকে নেমে আলপথ ধরতেই ধরণী কর্মকারের সঙ্গে দেখা। কর্মকার বলে, এই যে রয়টার খবরটা শুনেছ? সিংহরায় মশায়ের বাড়িতে দু'দিন টিভি দেখতে যায়নি। নিজের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় টিভি দেখতে যেতে পারেনি। দেশ-গাঁয়ের অনেক খবর শোনা হয়নি।

রয়টার বলে, কোন্ খবরটা বল তো? ঠাকুমা এক মাসের নাতনীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে, সেই খবরটার কথা বলছো?

কর্মকার অবাক হয়ে রয়টারের মুখে দিকে তাকায়।

— ঠাকুমা নাতনীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে! তুমি কী বলছো, রয়টার?

কর্মকার অবাক হয়ে বলে, এও কখনও হয়?

— হয় নয়, হয়েছে। শোন, ঘটনাটি শুনে যাও। কর্মকার খবরটি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়।

রয়টার বলে, ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুরে। মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর গো।

কর্মকার মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

রয়টার বলে, ছেলের বউ পরপর চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় ঠাকুমার মাথা গরম হয়ে যায়। প্রতিবার নাতি চেয়েছিল বুড়ি, কিন্তু ঈশ্বরের কী লীলা দেখ, বউটি প্রতিবারই কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। রাগে, দুঃখে হতাশায় বুড়ি শিশুটিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

কর্মকার হায় হায় করে ওঠে। এক মাসের শিশুকন্যাকে গলা টিপে মেরে ফেললো? কী পাপ! কী পাপ! মারলি কেন? আমাকে দিলেই তো পারতিস। আমি তো একটা মেয়ে চাইছি।

রয়টার বলে, সেদিন সিংহরায় মশায় বলছিলেন, আমাদের দেশে নাকি মেয়ের সংখ্যা সাংঘাতিক ভাবে কমে যাচ্ছে। এটা নাকি সমাজের পক্ষে ভীষণ খারাপ।

কর্মকার বলে, সিংহরায় মশায় ঠিকই বলেছেন। এইভাবে যদি কন্যা সন্তানের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে তিনজন পুরুষের জন্য একটি নারী জুটবে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কর্মকার আবার বলে, বড় খারাপ খবর শোনালে, রয়টার। বুড়িটার ফাঁসি হওয়া উচিত।

দু'জন দু'দিকে চলে যায়। রয়টার ভাবে, প্রথম সন্তান কন্যা হলে নাকি সংসারে লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকে। সে মনে মনে প্রার্থনা করে, সতী যেন প্রথমবার কন্যা সন্তানেরই জন্ম দেয়।

রয়টার বাড়ি ফিরে দেখে, পঞ্জিকা হাতে নিয়ে কমল ঠাকুর বসে আছে। রয়টার বলে, আমার একটু দেরি হয়ে গেল, ঠাকুর মশাই।

— তা হউক, তা হউক। এ বেলা আমার ডিউটি নাই। ধীরে সুস্থে দিন-তারিখ ঠিক করি।

শিশুকন্যা হত্যার ঘটনাটি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না রয়টার। সতী নিশ্চয়ই প্রথমবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেবে। কমল ঠাকুর বলে, সামনের হপ্তায় ভাল দিন আছে। একেবারে মাহেন্দ্রযোগ। এই দিনই তোমাদের দু'হাত এক কইরা দিমু। তার আগে তোমাদের রেজেস্ট্রি করাইতে লাগব।

— সে হয়ে যাবে। পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

দিন তারিখ সময় ঠিক করে কমল ঠাকুর চলে যায়।

।। ৮।।

সতীর স্বর্গীয় স্বামী পূর্ণ দিন কয়েক হল তাকে নতুন করে গ্রাস করেছে। পূর্ণর সঙ্গে ঘর করেছে মাত্র বছর খানেক। প্রতিদিনের অনেক স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করছে। সেইসব স্মৃতির ভিড় ঠেলে বেরোতে পারছে না সতী। কেন যেন সেই মাছের কথা বারবার মনে পড়ছে। তার বিশ্বাস, মাছটার অভিশাপেই পূর্ণ অকালে মারা গেছে।

বর্ষাকালে মাঠঘাট জলে ডুবে যায়। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় ভেলা বা ডিঙ্গিতে যেতে হয়। সকলের ডিঙ্গি থাকে না। তারা কলাগাছের ভেলায় যাতায়াত করে। ঘরে জল ঢুকে গেলে ভেলাতেই সংসার পাতে। পক্ষকাল এমনি করেই গাঁয়ের জীবন কাটে।

সতীদের উঠোনেও এক হাঁটু জল। জামা-কাপড় শুকানো যায় না। ভেলায় বসে পূর্ণ কী একটা কাজ করছিল। বারান্দায় তক্তাপোষের উপর বসে টুকি-টাকি কথা বলছিল সতী।

কারও তাড়া খেয়ে বা ভয়ে কিলোখানেক ওজনের একটা কাতলা মাছ ভেলার ওপর লাফিয়ে পড়ে।

মাছটাকে জাপটে ধরে পূর্ণ বলে, যাক, আজ আর মাছ কিনতে হবে না।

পূর্ণর হাতের মুঠোয় অসহায় মাছটা মুক্তির জন্য ছটফট করছিল।

সতী চেঁচিয়ে বলে, ওটাকে ছেড়ে

দাও।

পূর্ণ হো-হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, ছাড়বো কেন?

সতী বলে, ওতো ভয় পেয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে ভেলায় লাফিয়ে পড়েছে। তুমি ওই অসহায় মাছটাকে খাবে?

পূর্ণ বলে, এখন আর করার কিছু নেই। ওর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

— তুমি ওকে টিপেই মেরে ফেললে? বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে মৃত কাতলা মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে সতী।

পূর্ণ বড় একগুঁয়ে। একবার মাথায় যা ঢুকবে, তা শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষান্তি নেই।

বলা নেই, কওয়া নেই, আচমকা সতীকে কোলে তুলে আদর করতো।

— ছাড়ো ছাড়ো, পড়ে যাব যে!

সতী দু'হাত দিয়ে পূর্ণর গলা জড়িয়ে ধরে। সতীর ওষ্ঠ নিজের ওষ্ঠের মধে টেনে নেয় পূর্ণ। আদরে আদরে সতী বিবশ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বলে, এখন ছাড়ো না গো। এক্ষুণি পঞ্চু এসে পড়বে।

এমন টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে, পূর্ণর একটি বড় মালা গাঁথে সতী। ভাবে, দেহের ক্ষুধা আর মনের ভালবাসা এক নয়। পূর্ণর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সতীর দেহ পঞ্চু দখল নিল কী করে? পূর্ণর ভালবাসা থেকে সতীর দেহের চাহিদা বড় হয়ে উঠেছিল। সেই তাড়নায় পঞ্চুকে নিজের বিছানায় স্থান দিয়েছিল সে।

সতীকে বিয়ে করতে কোনও বাধা নেই। পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেব বলেছিলেন, রয়টার এত দুর্নাম মাথায় নিয়ে থাকবি কেন? তোরা বিয়ে কর। এ বিয়েতে আইনি বাধা নেই। বিক্রমপুরের সিংহরায় মশায়ও একই কথা বলেছেন।

সতীও রাজি। লোকের মুখে রয়টারের রক্ষিতা শুনতে আর ভালো লাগে না। নিজেকে খুব ছোটও মনে হয়। বিয়েটা হয়ে গেলে মানুষের মুখ তো বন্ধ হবে। খুব বেশি হলে লোকে বলবে, সতী দেওরকে বিয়ে করেছে। বলুক। 'রক্ষিতা'— এই শব্দটি তো আর শুনতে হবে না। সতী ভাবে, লোকে আরও অনেক রকম কথা বলতে পারে। নিজের স্বামীকে খেয়ে, রাক্ষসী, সতী এবার দেওরকে ধরেছে। আপন মনেই 'না-না' বলে চেঁচিয়ে ওঠে সতী।

।। ৯।।

বিয়ের তোড়জোড় করতে ব্যস্ত রয়টার। তার মধ্যে সময় করে সিংহরায় মশায়ের বাড়ি টিভি দেখতে যায়। খবর না শুনতে পারলে আর লোককে জানাতে না পারলে তার অস্বস্তি হয়। মনে হয়, দিনের বড় কাজটাই করা হল না।

ধোলাই কাপড়ের বস্তা নিয়ে বেথুয়াডহরির ব্যবসায়ী গড়াই বাড়িতে যায়। বস্তাটা বারান্দায় রাখতেই গড়াইয়ের বড় ছেলে বলে, কী রয়টার! আজকাল কী খবর ঘটছে না?

বিয়ের কাজে ব্যস্ত বলতে গিয়েও বলে না, রয়টার। বলে, খবর? খবরের কী আর শেষ আছে কর্তা? এই তো গতকাল, বিল্বগ্রামে কত বড় খবর ঘটে গেল!

— বিল্বগ্রামে আবার কী ঘটলো?

রয়টার বলে, বিল্বগ্রামের হারান ভুঁইমালি, নিজের দুই ছেলে মেয়ে আর বউকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজে আত্মহত্যা করেছে।

— সে কী! তুমি হারানকে চিনতে?

— না কর্তা। কাল রাতে টিভিতে খবরটি বললো, ছবিও দেখালো। কেন মরলো জানেন?

— কেন?

— ঋণ, ঋণে ঋণে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল।

গড়াই বলে, ওদের বি পি এল কার্ড ছিল না?

রয়টার বলে, সে কথা খবরে উল্লেখ করেনি। তবে বাজারের ষষ্ঠী মজুমদার বললেন, কোনও এক পার্টির নেতা হারানের বি পি এল কার্ড ব্যবহার করে।

গড়াই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রয়টার বলে, আপনি তো শুধু হারান ভুঁইমালির কথা শুনলেন। আমাদের দাদুপুর, অগ্রদ্বীপে এসব ঘটনা ভুরি ভুরি। খাতা-কলমে একশো দিনের কাজ হয়ে যায়। অথচ রাস্তায় মাটি পড়ে না। তাই হারান ভুঁইমালিরা ছেলে-মেয়ে-বউকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করে।

— আজ যাই, কর্তা! আমাকে আবার দেবগ্রাম যেতে হবে।

রয়টারের ভাগ্য ভাল। গড়াইবাবু আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে না।

ময়লা কাপড়ের বোঁচ্‌কা মাথায় নিয়ে মেয়েদের স্কুলের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করে রয়টার। ঠিক এই সময় স্কুলের হেড দিদিমণি বাস থেকে নামলেন।

দিদিমণি বলেন, রয়টার, তুমি যাচ্ছো না কেন? অনেক জামা-কাপড় জমে আছে।

— যাব দিদিমণি। আজ রাতেই যাব।

দেবগ্রামের বাস এসে যায়। রয়টার বাসে উঠতেই কনডাকটার বলে, কী রয়টারদা, বড় খবর কী আছে?

রয়টার বলে, বড় খবর শুনলে, তোমাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

— বল, বল, সেই বড় খবরটাই বল।

রয়টার বলে, শোন গরীব মানুষের পেটে কিল মেরে, নেতারা নিজেদের মাইনে-ভাতা তিনগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। এটা কী নেতারা করতে পারে? জনসাধারণের কাছ থেকে তো কোনও অনুমতি নেয়নি। নির্বাচনের

আগে যে সব কথা বলেছিল, তার মধ্যে নিজেদের মাইনে ভাতা বাড়াবার কথা ছিল না।

কনডাকটর বলে, তুমি ঠিক বলছো রয়টার। নির্বাচনের সময় আমাদের উন্নয়নের কথা বলেছিল। সেই সব প্রতিশ্রুতি শিকেয় তুলে রেখে নিজেদের পেট মোটা করছে। রয়টার বলে, আর ওদিকে দেখ, মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পেরে, মালদায় তিন চাষী আত্মহত্যা করেছে। তবুও আমাদের বলতে হবে, অমুক নেতা জিন্দাবাদ।

।। ১০।।

জ্যোৎস্না প্লাবিত ক্ষেত খামারের আলপথ ধরে ঘরে ফিরছিল রয়টার। বেথুয়াডহরিতে একটা মিছিল দেখেছে। মিছিলের মানুষগুলো জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবি করছিল। প্রায় সত্তর বছর আগে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেই দুর্ভিক্ষের কথা সে শুনেছে।

ভরা ভাদরে আকাশে মেঘ নেই। নদীতে জল নেই। গভীর নলকূপ দিয়ে কাদাজল উঠতে শুরু করেছে। আলের উপর দাঁড়িয়ে সে ফাটা ভুঁই দেখছে। জলের জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার অজান্তেই বেরিয়ে আসে। সে আবার হাঁটতে শুরু করে। বিক্রমপুরের কাছে আসতেই একবার সিংহরায় মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয়। বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে যাবে কি? না, এইভাবে নিমন্ত্রণ করা যায় না। ময়লা কাপড়ের বোঁচ্কা কাঁধে নিয়ে কেউ কখনও নিমন্ত্রণ করতে যায়! নিজের চিন্তা ভাবনাকে একবিন্দুতে আনতে পারছে না রয়টার। কখনও মিছিল, কখনও অনাবৃষ্টি আবার কখনও বা সতী এসে মনের মধ্যে ভিড় করে।

দাদার বিধবা। ক'দিন বাদেই তার দেহ-মনের উপর পুরো দখল নেবে সে। যদিও এখনও মাঝে মাঝে সতীর দেহের অতৃপ্ত স্বাদ পায়। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করে। কিন্তু রেজেস্ট্রি হবার পর সতী হবে তার নিজস্ব সম্পত্তি। সেও হয়ে যাবে সতীর বাধ্য স্বামী।

মাঠের মধ্যেই ইয়াসিন মিঁয়ার সঙ্গে দেখা।

— রয়টার যে! তোমার যে আর দেখাই পাই না। খবর টবর আর শোনাও হয় না। আমাদের বহিরগাছিতে একদিন এস। ভাল খবর নিয়ে এস।

রয়টার কথা বাড়ায় না। মনে মনে ভাবে, ভাল খবর, সুখের খবর আর পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, কালই তো একটা শুনেছে। সে খবর এখনও কাউকে দিয়ে উঠতে পারেনি। কোথাকার কোন বিজ্ঞানী নাকি বলেছে, এবার নাকি সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটবে। কোটি কোটি জ্বলন্ত অঙ্গার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। অঙ্গার বৃষ্টি।

উঠোনে পা রাখতেই সতী বলে, এত দেরি হল কেন?

রয়টার বলে, হ্যাঁ, একটু দেরিই হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করে সতী ঘরে খিল দেয়। রয়টার সামান্য অবাক হয়। সতী তো কখনও এমন করে না। অন্যদিন বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

রয়টার বলে, কী হলো? দরজা বন্ধ করলে যে?

দরজা খুলে সতী বলে, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোনও আদর-টাদর চলবে না। এখন সব মনের মধ্যে জমা করে রাখ। বাসর ঘরে নতুন করে দেখবে। এখন যাও। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।

তবুও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে রয়টার। দরজা ঠেলার চেষ্টা করে। সতী বলে, বিচার-আচার কিছু মানবে না, নাকি?

বলেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়। রয়টার ভাবে, ঠিকই তো, বিয়ে যখন হচ্ছে, তখন বিচার-আচার মানতেই হবে।

পরের দিন ধোলাই কাপড়ের বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রয়টার।

সিংহরায় মশাইয়ের বাড়ি হয়ে পাগলাচণ্ডীর ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি যেতে হবে।

সিংহরায় মশাইয়ের বাড়িতে বেশিক্ষণ বসে না রয়টার। প্রায় দু কিমি পথ যেতে হবে। শরীরটাও তেমন জুত নেই।

বারান্দায় বসে কাগজপত্র দেখছিলেন ব্যারিস্টার সাহেব। পাগলাচণ্ডীও শুকিয়ে এসেছে। একটা ক্ষীণ জলের ধারা বয়ে চলেছে। একটু আগেই পাগলাচণ্ডী ব্রীজের ওপর দিয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার বেরিয়ে গেল।

ব্যারিস্টার সাহেব মুখ তুলে বলেন, এস রয়টার, জরুরি খবর কিছু আছে? ময়লা কাপড়ের বস্তাটা সিঁড়ির পাশে রেখে ব্যারিস্টার সাহেবের সামনে সিঁড়িতে বসে রয়টার।

ব্যারিস্টার সাহেব বলেন, বল, কী খবর?

রয়টার বলে, খুব বড় খবর আছে, কর্তা।

— বল, বল!

রয়টার মুখ নিচু করে বলে, কর্তা, আমার বিয়েটা হলো না।

— কেন? কেন?

গলা খাদে নামিয়ে রয়টার বলে, সতী এ বিয়ে করবে না। সে তার বাবার বাড়ি পানশিলায় চলে গেছে।

বই নিষিদ্ধ করা একটি অপকর্ম

অমলেশ মিশ্র

যোসেফ লেলিভেল্ড মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী-কে নিয়ে বই লিখেছেন। বইটির নাম—গ্রেট সোল মহাত্মা গান্ধী এ্যান্ড হিজ স্ট্রাগ্‌ল্‌ উইথ ইন্ডিয়া।

গুজরাট রাজ্যে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেছে। মহারাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হতে পারে। আরও কোনও কোনও রাজ্যেও হতে পারে। বইটি পড়ার সুযোগ হয়নি আমার। এদিক ওদিক থেকে যেটুকু জানা গেছে যে ওই বইতে গান্ধীকে বাইসেক্সুয়্যাল (উভলিঙ্গ) এবং রেসিস্ট (বর্ণবাদী) বলে নাকি উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক বলেছেন যে ওই রকম বোঝাবার মতো তিনি তেমন কিছু লেখেননি।

এই বইটি গান্ধীজীর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে—গুজরাট সরকারের এইটাই মূল কথা। বইটি নিষিদ্ধ হলো বটে কিন্তু বইটি এখনও ভারতের বাজারে আসেনি। সম্পূর্ণ পুস্তকটি পড়ার সুযোগও সম্ভবত কেউ পাননি।

বইটি আমি যেহেতু পড়িনি তাই এর ভাল মন্দ নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতাও আমার আসে না। আমার মূল প্রশ্ন— একটি পরিণত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দেশে পুস্তক নিষিদ্ধ করার এই প্রবণতা কতটা গণতান্ত্রিক। কোনও কোনও চিত্রকর যখন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেব -দেবীর ছবি অতিশয় বিকৃতভাবে অঙ্কন করে তার সাম্প্রদায়িকতা ও রিরংসা চরিতার্থ করেন আমরা তাকে রেয়াৎ করি এই কথা বলে যে ভারতবর্ষে সংবিধানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কোনও চিত্রকর যদি তার মতামত প্রকাশ করেন তবে তা অসঙ্গত নয়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয় তাহলে ১৯৮৮ সালে সলমন্‌ রুশদির লেখা 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ হয় কোন যুক্তিতে?

২০০৩ সালে তসলিমা নাস্‌রিন-এর লেখা 'দ্বিখন্ডিত' নিষিদ্ধ হ'ল কেন? লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রগতিবাদী বলে যারা নিজেদের বলেন সেই পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারই বইটি নিষিদ্ধ করেন।

হিন্দুদের পূজিত দেব দেবী বা চরিত্রকে যতই বিকৃত ও অশালীন করা হোক তাতে এ সরকার নির্বিকার থাকে। কিন্তু মহম্মদ, গান্ধী, সোনিয়া এবং ইসলাম নিয়ে ঘটনা নির্ভর তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তককে সহজেই নিষিদ্ধ করে।

এটা পরিণত গণতন্ত্র তো অনেক পরে, অপরিণত গণতান্ত্রিক মানসিকতাতেও একাজ করা যায় না। করা যায় না কারণ এতে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ এবং সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বোঝায়। ৫০০ বছর আগে আমাদের শাশুড়িরা বাড়ির দু'তিন বৌমার প্রতি যেমন পক্ষপাতমূলক আচরণ করতেন, কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে যেমন নির্লজ্জ পার্থক্য করা হোত, যা শুনে এবং পড়ে আমরা এখন শিহরিত হই, সেই সব শাশুড়ি ঠাকরুণ ও গৃহস্বামীদের ঘেন্না করি, আজ হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কেও সরকার সেই সব শাশুড়ি ঠাকরুণ ও গৃহস্বামীদের মতো আচরণ করছেন। পার্থক্য হলো এই যে তখনকার ঘটনা পড়ে শুনে শিহরিত হয়েছি, ঘেন্না করেছি, এখন শিহরণ হয় না ঘেন্নাও হয় না।

ইসলাম সম্পর্কে লিখে রুশদি তসলিমা রজপাল প্রমুখের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারী হয়েছিল। রজপালকে হত্যা করা হয়েছিল। রুশদি, তসলিমা দেশ ত্যাগ করেছিলেন— তবে মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়নি। ফতোয়া মকুব হয় না।

মার্টিন স্করসি নামে একজন দি লাস্ট টেম্প্টেশন অফ্ ক্রাইস্ট নামে একটি চলচ্চিত্র করেছিলেন। এতে যিশুর স্বাভাবিক যৌন কামনার বিষয় ছিল। চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটন একটি পুস্তক রচনা করেন— সুফীস্ অফ বীজাপুর (১৩০০-১৭০০ খৃঃ)। এই বইতে ভারতে সুফীরা কী কীর্তি করেছিলেন তার ইতিহাস আছে। ১৯৭৮ সালে প্রিন্সটন থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইতে সুফীদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যেমন সুফীরা খুব উদার চরিত্রের মুসলমান, তারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিল ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্য দিয়ে ভেঙ্গে খান খান করা হয়েছে।

অরবিন্দ ঘোষ এর লেখা 'দি কোরান এ্যান্ড দি কাফির', হাউসটনে প্রকাশিত

২০০৪ সালে জনৈক জেমস্ লিয়ার -এর শিবাজীর উপর লেখা একটি পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ২০১০ সালে জেভিয়ার মোরো নামের এক লেখকের লেখা 'ফিক্শন্যাল বায়োগ্রাফি অফ সনিয়া গান্ধী' বইটি নিষিদ্ধকরণের তালিকায় গেল।

লেডি চ্যাটার্জিস্ লাভার, রঙ্গীলা রসুল প্রভৃতি পুস্তক যে যুগে যে মানসিকতায় নিষিদ্ধ হয়েছিল এত বছর পরে সেই মানসিকতাই বলবৎ আছে অথবা গণতান্ত্রিকতার মত প্রকাশের স্বাধীনতা তত্ত্বটি একই আবহে কাল কাটাচ্ছে? অথবা মত প্রকাশের স্বাধীনতা-— ব্যক্তি, সম্প্রদায় ভিত্তিতে এক এক ভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

চিত্রকর ফিদা হোসেনের ক্ষেত্রে যেটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সলমান রুশদি, তসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে সেটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়? লেলিভেল্ড এবং রঙ্গিল রসুন প্রণেতা রজপাল সেই স্বাধীনতার সুযোগ পাবেন না? জনক নন্দিনী তথা রামের ঘরণী সীতা সম্পর্কে অতিশয় বিকৃত এবং অসম্মানজনক একটি প্রকাশনার প্রতিক্রিয়ায় রঙ্গীলা রসুল লিখিত হয়েছিল। রজপাল কে হত্যা করা হয়েছিল। সলমন রুশদির বিরুদ্ধেও মৃত্যু পরোয়ানা জারী হয়েছিল।

গান্ধী সম্পর্কে যোশেফ লেলিভেল্ড -এর বই নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ এসেছে। শিবাজী সম্পর্কেও একটি বই নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠেছিল।

কিন্তু প্রধানত ইসলাম সম্পর্কে লিখিত হলেই কোন কোন বই অবশ্যই নিষিদ্ধ করা হয়। সল্মন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস, তসলিমা নাসরিনের 'দ্বিখন্ডিত', রজপাল-এর রঙ্গীলা রসুল যে কারণে নিষিদ্ধ, লেলিভেল্ড, জেভিয়ার মোরোর বই সে কারণে নিষিদ্ধ হয়নি।

লেলিভেল্ডের গান্ধী সম্পর্কে লেখা বইটি হয়ত সারা ভারতে নিষিদ্ধ হবে না, কারণ কেন্দ্রের আইন মন্ত্রী বীরাপ্পা মঈলি সেই রকমই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

যে কোনও পুস্তক তা মহম্মদ, গান্ধী, সোনিয়া, শিবাজী যে প্রসঙ্গই হোক তা যদি ঘটনা ভিত্তিক হয় তাকে নিষিদ্ধ করার অর্থই হলো গণতান্ত্রিক মানুষের জানবার অধিকার নস্যাৎ করা এবং মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা অস্বীকার করা। একটি পরিণত গণতান্ত্রিক (Matured Democracy) দেশে এটা হবে কেন? এদেশের সরকার বিকৃত রুচির। অনৈতিকহাসিক ছবিতে আপত্তি করে না, কিন্তু ইতিহাস ও ঘটনা -নির্ভর পুস্তককে নিষিদ্ধ করে।

সত্য বলতে কি, আমার ধারণায় গান্ধী সম্পর্কে ইতিহাস ও বিশ্লেষণমূলক কোন জীবনীর অভাব আছে। গান্ধীর মূল্যায়ণে অনেক ভুল আছে। ভারতবর্ষ গান্ধীর পুনর্মূল্যায়ন না হলে দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগত এমনই ভ্রমাত্মক পথে চলবে, যা এখন চলছে। গান্ধী দর্শন— ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। গান্ধীর পুনর্মূল্যায়ণের সঙ্গে ভারতের পুনর্গঠন সম্পৃক্ত। যাই হোক, একটি পরিণত গণতান্ত্রিক দেশে বই নিষিদ্ধ করা অন্যায়, বিশেষ করে সেই বই যদি ইতিহাস ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়।

হয়েছিল—নিষিদ্ধ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার লেখক কলিন মাইনে লিখেছিলেন— দি ডেড হ্যান্ড অফ ইসলাম। বইটি নিষিদ্ধ হয়। তবে তার লেখা 'দি বাইবেল— হোয়াট ইট সেজ' নিষিদ্ধ হয়নি।

আমাদের দেশে চাঁদমল চোপরার কোরাণ পিটিশন এই প্রসঙ্গে এসে যায়। ১৯৮৫ সালে বিচারপতি বি. সি. বসাক মামলা খারিজ করে দেন এই কথা বলে যে আদালত ধর্মীয় বিশ্বাস ও পবিত্র এবং দৈব চরিত্রদের সম্পর্কে বিচার করার অধিকারী নয়।

চাঁদমল চোপরার মামলায় আবেদন ছিল যে কোরাণ নিষিদ্ধ করা হোক। যুক্তি হিসাবে কোরাণ শাস্ত্র থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ আয়াত তুলে ধরে তাকে তিন ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছিল— এই আয়াতগুলি অমুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ও দ্বেষ ছড়াচ্ছে, এই আয়াতগুলি অমুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করতে বলেছে, এই আয়াতগুলি ধর্ম সম্প্রদায়গুলিকে অসম্মান করেছে ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে পরবর্তীকালে ফিদা হোসেন যখন পবিত্র ও দৈব চরিত্র সীতা এবং সরস্বতীকে নিয়ে অশ্লীল উলঙ্গ ছবি আঁকল, তখন বিচারের এই বাণী শোনা যায়নি। তখন সকলে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছিলেন। চাঁদমল চোপরাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩১ আগস্ট ১৯৮৭। মামলার আরজি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সীতারাম গোয়েল ভূমিকা লিখেছিলেন। দু'জনের বিরুদ্ধেই ক্রিমিন্যাল কন্সপিরেসির অভিযোগ ছিল। বহুদিন তাদের আদালতে এবং হাজতে কাটে।

'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম থ্রু হাদিস' (হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম অনুধাবনের প্রয়াস) নামে একটি পুস্তক আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হলো। লেখক— রামস্বরূপ, ভারতীয়। ইংরাজীতে লেখা বইটি ভারতের বাজারেও কিছুদিন চলল। তারপর বইটির হিন্দী অনুবাদ যখন ছাপিয়ে বেরনোর জন্য প্রস্তুত এবং বাঁধাই হচ্ছে তখন মুসলমানরা বই বাঁধাই দোকানটি ঘেরাও করে। পুলিশ এসে মুদ্রক ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার করে।

১৯৯০ সালে বইটির সম্পর্কে আদালত আপত্তিকর নয় বলে রায় দিলেন। কিন্তু মুসলমানদের চাপ বাড়তে থাকায় দিল্লী প্রশাসন বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল।

রামস্বরূপের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছিল যে এই বইটি নিষিদ্ধ করতে হলে কোরাণ এবং হাদিস শাস্ত্রকেও নিষিদ্ধ করতে হবে, কারণ এই বইতে যা-যা লেখা হয়েছে সবই কোরাণ এবং হাদিস থেকে নেওয়া।

জামাত-ই-ইসলামীদের পত্রিকা র‍্যাডিয়েন্স তার ১৯৯০ সালের ১৭ জুন সংখ্যায় লিখল বইটি কি আপত্তিকর নয়? ওই বই থেকে চারটি উদাহরণও তুলে দিল। সেগুলির মধ্যে একটি হলো— মহম্মদ জয়নবকে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় দেখলেন এবং তার সঙ্গে প্রেমে পড়লেন। রামস্বরূপের বইতে এই উল্লেখ বা প্রসঙ্গ আপত্তিকর হতে পারে কিন্তু এটাতো তিনি নিজে লেখেননি— মুসলিম-এর হাদিস থেকে নিয়েছিলেন। এ যদি আপত্তিকর হয় তাহলে রামস্বরূপ এর বইকে আপত্তিকর বলার আগে মুসলিম এর হাদিসকেই আপত্তিকর বলতে হয়। রামস্বরূপ তার বইতে হাদিস থেকেই ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছিলেন। মন্তব্যগুলি ছিল তার নিজস্ব মার্জিত ভাষায়।

পঞ্চাশের দশকে মুম্বাই-এর প্রকাশনা সংস্থা— ভারতীয় বিদ্যাভবন- মহম্মদ নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিল। পুস্তক প্রণেতার নাম থমাস এ্যান্ড থমাস। বইটিতে মহম্মদ সম্পর্কে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ এবং মহম্মদ সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাস সমূহ তুলে ধরা হয়েছিল (হিস্টোরিক্যাল মহম্মদ, মিথিক্যাল মহম্মদ)। মুসলমানদের আপত্তি শোনা মাত্র— পুস্তকটি নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। লোকে বলে নেহেরু বইটি নিষিদ্ধ করেছিলেন কে. এম. মুন্সীকে অপদস্থ করার জন্য। কে. এম. মুন্সী ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশনা সংস্থার প্রধান।

এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য মামলা হলো— বর্ষা পাবলিকেশন বনাম মহারাষ্ট্র সরকার। ১৯৮৩ সালের মামলা। এই প্রকাশনা সংস্থা একটি লেখা প্রকাশ করেছিল। সেই লেখার বিষয়বস্তু ছিল মক্কার কাবা ইতিহাসগতভাবে একটি শিবমন্দির ছিল। প্রাচীন আরবের হিন্দুরা কালো পাথরটিকে শিবলিঙ্গ জ্ঞানে পূজা করত।

স্বাভাবিক ভাবেই মুম্বাইর মুসলমানেরা এই ঐতিহাসিক গবেষণা নিয়ে আপত্তি করলেন। মহারাষ্ট্র সরকার ওই লেখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন মুসলমানদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে।

প্রকাশনা সংস্থাটি মহারাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে। বিষয়টি ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা লব্ধ জ্ঞান ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে না মিললে, ওই ঐতিহাসিক গবেষণা লব্ধ জ্ঞানকে নিষিদ্ধ করা যায় কি-না। বিচারপতি রায়ে বললেন— ইতিহাসকে হিমঘরে রাখা যাবে না কয়েকজন মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করবে এই অজুহাতে। আদালত ওই নিষিদ্ধকরণ খারিজ করে দিলেন।

১৯৯০ সালে দিল্লীর ভয়েস অফ ইন্ডিয়া নামে প্রকাশনা সংস্থা একটি বই প্রকাশ করল— হিন্দু টেম্প্‌লস্ হোয়াট হ্যাপেনড্ টু দেম— হিন্দু মন্দিরগুলির কী ঘটেছিল। বইটিতে অরুণ শৌরি, হর্ষনারায়ণ, জয় দুবাসী, রামস্বরূপ ও সীতারাম গোয়েল এর প্রবন্ধ ছিল। (পরে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে)। কংগ্রেস দলের রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমতী আলিয়া বইটি নিষিদ্ধ করার দাবী তোলেন। ইতিমধ্যে এই বইতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির অনেকটাই কোনও কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই বইতে ২০০০ হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসসাধন করে মুসলমানদের মসজিদ ইত্যাদি তৈরির একটি তালিকা আছে, ইতিহাসের ভিত্তিতেই।

উত্তর প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পাইওনীয়ার পত্রিকার নভেম্বর ১৮ সংখ্যায় জনৈক বিমল যোগী তিওয়ারী এই বইটির একটি সমালোচনা প্রকাশ করলেন। তিনি এই লেখায় বিশেষ করে ঐতিহাসিকতার উল্লেখ করলেন। বস্তুতঃ ওই বইটিতে কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ ছিল না। অযোধ্যা, বারাণসী ও মথুরায় মন্দিরের মতো অনেক মন্দির ও হিন্দু ধর্মস্থান ধ্বংস করে যে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং ধ্বংস করা মন্দিরের জিনিষপত্র যে ওইসব ইসলামী ধর্মস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তার উল্লেখ আছে। বিমল তিওয়ারী মন্তব্য করলেন যে ধনসম্পদ লুণ্ঠনের জন্য হিন্দু মন্দির লুঠ ও ধ্বংস করা হয়েছে বলে মুসলমান শাসকদের

সম্পর্কে ধর্ম নিরপেক্ষরা যা প্রচার যা প্রচার করে তা সত্য নয়। ধর্ম বিদ্বেষের কারণেই হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির যে বার বার মামুদ আক্রমণ করেছিলেন তা লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ে নয়। মুসলমানেরা বিশ্বাস করত ইসলাম পূর্ব যুগের আরবীয় দেব-দেবীরা ইসলাম অত্যাচারে (মহম্মদের সময়ে) আরব ত্যাগ করে। তাদের মধ্যে লাত্ এবং মানাত গুজরাট উপকূলে সোমনাথ মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই মামুদ অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের থেকে সোমনাথ মন্দিরেই বারবার আক্রমণ করছিলেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে ভারতীয়রা (হিন্দুরা) আরবে যাতায়াত করতো ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে। তাই মক্কায় তারা ধর্মস্থান মহাদেবের মন্দির হিসাবে— যে স্থানটিতে যেত সেখানে ৩৬৫টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। পরে সেগুলি ধ্বংস করে কাবা মসজিদ হয়। ইসলাম পূর্ব যুগের আরবীয়রা ভারতীয়দের মতো দেবদেবীর মূর্তি ও পূজায় বিশ্বাস করত। মহম্মদ এই বুৎপরস্তদের সম্পর্কে কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছিলেন আল-কোরাণের নির্দেশ অনুসারে। বুৎপরস্তি থাকবে না, কেবল খুদা-পরস্তি থাকবে। কাবা আব্রাহাম প্রতিষ্ঠিত বলে যা বলা হয়ে থাকে তা ইতিহাস সম্মত নয়।

বই পুস্তক নিষিদ্ধ করার প্রবণতা এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র। মানুষের জানার অধিকার আছে, মানুষের পড়ার অধিকার আছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। গণতন্ত্র আছে বলেই এগুলি আছে। সমালোচনামূলক কোনও লেখায় কোনও ঐতিহাসিক তথ্য যদি উদ্ভাসিত হয় তা গ্রহণ করাই উচিত। কেউ যদি গ্রহণ না করেন না করতে পারেন, কিন্তু নিষিদ্ধ করতে পারেন না। ইতিহাস ও বিজ্ঞান কোনও নিষিদ্ধকরণের ধার ধারে না। গ্যালিলিওর ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত।

যোশেফ লেলিভেণ্ড তার ওই উল্লিখিত পুস্তকে গান্ধী সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। ২৮ মার্চ ২০১১ তে ইংল্যান্ডের ডেলি মেল সংবাদপত্রে একটি সমালোচনা বেরোয়। বইটি এখনো ভারতে আসেনি। গুজরাট সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেছেন। ওই বইতে জার্মান ব্যায়ামবীর ক্যালেনবাখ এর সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্কের উল্লেখ আছে। চারবছর ওরা জোহানেসবার্গে (দক্ষিণ আফ্রিকা) একসঙ্গে ছিলেন। পরে পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। পত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলার কথা থাকলেও ক্যালেনবাখ পত্রগুলি পোড়াননি। নীলামে বিক্রী করেছেন। লেলিভেল্ড সেই নীলাম সূত্রেই চিঠিগুলি পড়তে পান। তিনি কখনও বলেননি যে গান্ধী সমকামী বা উভলিঙ্গ বা বর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন। চিঠিগুলি পড়ে কেউ যদি এইরকম কিছু অনুমান করে, করতে পারে। তার জন্য পুস্তক নিষিদ্ধ হবে কেন?

মহম্মদ সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাবের মতো গান্ধী সম্পর্কেও এদেশের কিছু মানুষের মনোভাব আছে। গান্ধীর স্তব কবচমালা ব্যতীত তারা আর কিছু জানতে বা পড়তে রাজী নয়। তাই গান্ধী সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ঐতিহাসিক পুস্তকের খুব অভাব। বাংলা ভাষায় রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন একটি পুস্তক রচনা করেছেন অনেক তথ্য সম্বলিত করে। বইটি খুব পরিচিত নয়। কারণ বইটি স্তব কবচমালা নয় (একটি অকপট জীবনী— রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, অমৃতশরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কোলকাতা-১২৬)। 'গান্ধীজীর অপকর্ম' নামে বাংলায় আর একটি বই আছে। লিখেছেন আলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী (এস. আর. পাবলিকেশন, ৮৩ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কোলকাতা-২৯)। প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর লেখা— গান্ধীজীর দ্বিচারিতা। সত্য বলতে কি, আমার ধারণায় গান্ধী সম্পর্কে ইতিহাস ও বিশ্লেষণমূলক কোন জীবনীর অভাব আছে। গান্ধীর মূল্যায়ণে অনেক ভুল আছে। ভারতবর্ষ গান্ধীর পুনর্মূল্যায়ন না হলে দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগত এমনই ভ্রমাত্মক পথে চলবে, যা এখন চলছে। গান্ধী দর্শন— ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। গান্ধীর পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে ভারতের পুনর্গঠন সম্পৃক্ত।

যাই হোক, একটি পরিণত গণতান্ত্রিক দেশে বই নিষিদ্ধ করা অন্যায়, বিশেষ করে সেই বই যদি ইতিহাস ও বিজ্ঞানভিত্তিক হয়।

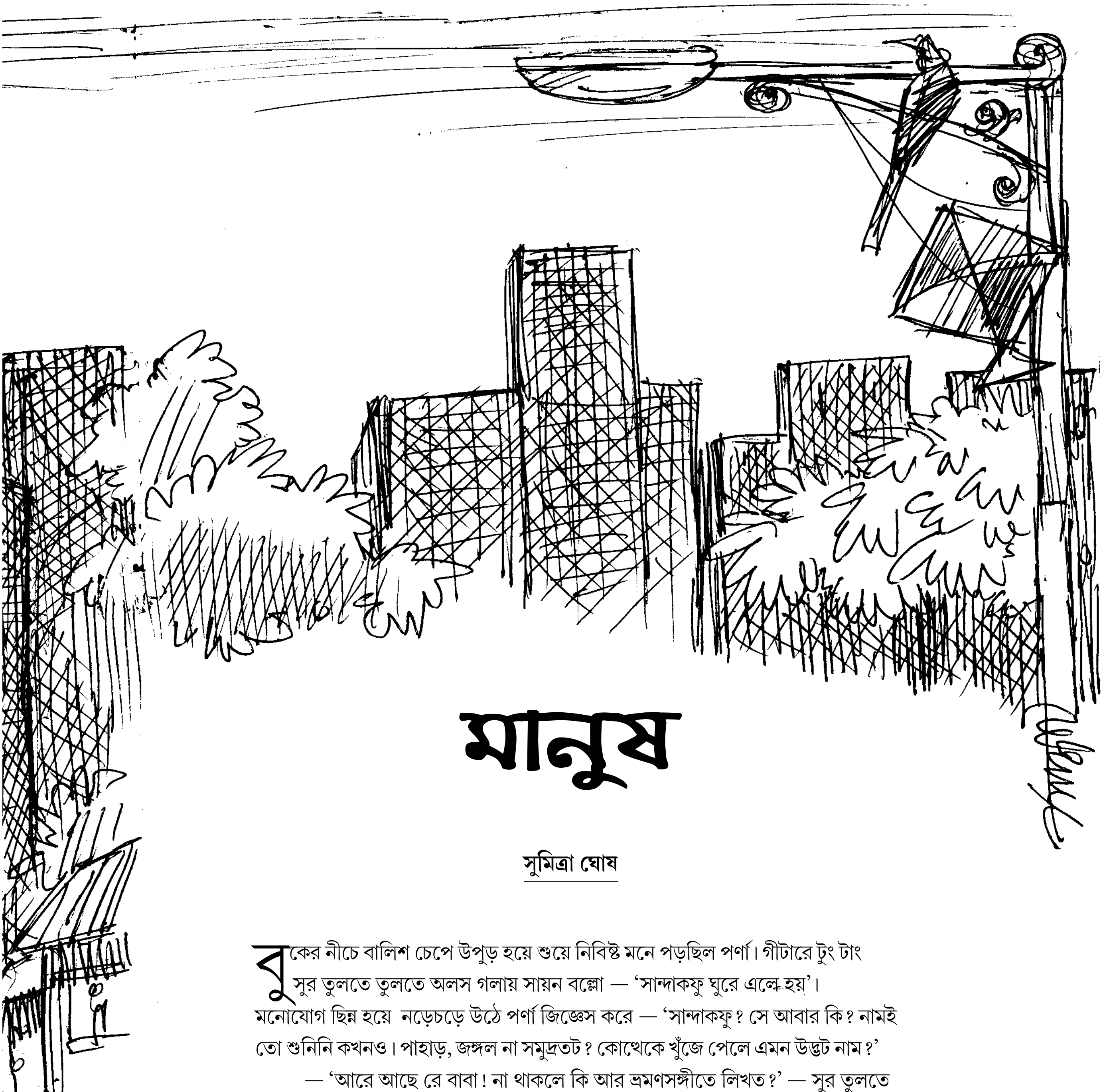

মানুষ

সুমিত্রা ঘোষ

বুকের নীচে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছিল পর্ণা। গীটারে টুং টাং সুর তুলতে তুলতে অলস গলায় সায়ন বল্লো — ‘সান্দাকফু ঘুরে এল্লে হয়’। মনোযোগ ছিন্ন হয়ে নড়েচড়ে উঠে পর্ণা জিজ্ঞেস করে — ‘সান্দাকফু? সে আবার কি? নামই তো শুনিনি কখনও। পাহাড়, জঙ্গল না সমুদ্রতট? কোত্থেকে খুঁজে পেলে এমন উদ্ভট নাম?’

— ‘আরে আছে রে বাবা! না থাকলে কি আর ভ্রমণসঙ্গীতে লিখত?’ — সুর তুলতে ব্যস্ত হয় সায়ন সংক্ষেপে কথা সেরে।

— ‘দূর!’ — বলে বই বন্ধ করে পর্ণা উঠে বসে। — ‘দিলে তো পড়ার বারোটা বাজিয়ে? জায়গাটা কোথায়, কি, কেমন, কিছুই বল্লো না ওমনি —‘ঘুরে এলে হতো!’ মুখ ভেংচে বলে পর্ণা।

— ‘আরে! আমিই কি পুরোটা জানি নাকি যে বলব? লোকাল ট্রেনে একটা লোক পাশে বসে ভ্রমণসঙ্গী পড়ছিল। আমিও দিব্যি পড়ছিলাম ওর সঙ্গে সঙ্গে। লিখেছে যে,

সান্দাকফু থেকে নাকি সেভেনসিস্টার্স একসাথে দেখা যায়। ট্রেকিং করে অনেকে যায় ওখানে। ওইটুকু অব্দি পড়তে না পড়তেই লোকটা বই বন্ধ করে উঠে পড়ল। ওর স্টেশন এসে গিয়েছিল। নামটা অদ্ভুত বলেই আমার যেতে ইচ্ছে করছে। ট্রেকিং করে যখন যাওয়া যায়, আমাদের না যাওয়ার তো কারণ দেখছি না। সেভেনসিস্টার্স ডাকছে মনে হচ্ছে।'

পর্ণা গম্ভীর গলায় 'হুঁম' শব্দটা উচ্চারণ করে বলে— 'ডাকাটাকে আরও ইনটেন্স হতে দাও। সামনে আমার সেমিস্টার আছে। সেভেন সিস্টার্স কেন যোড়শো কোটি গোপিনী ডাকলেও এখন নড়া চলবে না বাবুমশাই। আগে পরীক্ষার পড়া, পরে ট্রেকিং।'

সায়ন বর্মন আর পর্ণা দাশগুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মেধাবী দুই প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রী। পর্ণা অসমের রাজধানী দিসপুরের এক মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের একমাত্র আদুরে কন্যা। আর সায়ন প্রতাপ বর্মন দুর্গাপুরের ছেলে। আদিতে রাজপুত, বর্তমানে বাঙ্গালী হয়ে যাওয়া এক ছোটখাটো শিল্পপতি পরিবারের বড় পুত্র। সায়ন প্রতাপ বর্মন আর পর্ণা দাশগুপ্তর প্রেমের বয়স দু'বছর। আসলে প্রেমের তো কোনও বয়স নেই! মহাকালের যেমন বয়সের ঠিকঠিকানা নেই, তেমনি প্রেমেরও নেই। তাই তো বলা হয় 'চিরন্তন' প্রেম। ওদের দু'জনের দেখা হবে, ভালবাসা হবে—এটাই বিধির বিধান ছিল, তাই দু'বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে সুদূর গৌহাটি থেকে যাদবপুরের হোস্টেলে এসে ওঠা বাঙ্গালী মেয়ের প্রেম হলো এক বছরের সিনিয়র, জাতে রাজপুত ঠাকুর, পাতে মাছ ভাত খাওয়া ৯৯ শতাংশ বাঙ্গালী হয়ে যাওয়া সায়নের সঙ্গে। ওরা দু'জনেই বিশ্বাস করে ওরা একে অন্যের অর্ধাংশ, অর্থাৎ দু'জনে মিলে একজন, এক আত্মা, এক প্রাণ।

ভারতের আকাশে যখন পশ্চিমী সমাজের অত্যাধুনিক সংস্কৃতির কালো মেঘ ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, রক্ষণশীলতা এবং পরম্পরাকে গ্রাস করে ফেলছে, ঠিক এমনই সময়ে সায়ন-পর্ণার প্রেমের জন্ম হলো। অবধারিত ভাবেই যুগের প্রভাব এই দুই তরুণ-তরুণীকেও নিজের কব্জায় এনে ফেলতে দেরি করল না। ১৫-২০ বছর আগেও উচ্চশিক্ষার চারণভূমি মোটামুটি নিজ নিজ শহরে, বড়জোর নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে পরিবারের নজরের আড়ালে খুব বেশি দূরে না যেতে পারার জন্য কিছুটা ভয়ভীতি লজ্জা পায়ে বেড়ির মতো লাগানো থাকত সদ্যযৌবনপ্রাপ্তদের। স্বাধীনতার বকলমে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতা করার আগে সাতবার ভাবতে হতো। পারিবারিক অনুশাসন ভেঙে সমাজে নিন্দনীয় অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসবার আগে বাবা-মা'র মান-মর্যাদা, নিজের নিন্দার ভয় জাগত মনে। কারণ ছোট গণ্ডীর মধ্যে অপকর্মের খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বম্বে, পুণা, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী ইত্যাদি শহরের মতো অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের শহরগুলোতে 'লিভ টুগেদার' শব্দটা প্রায় অপরিচিত ছিল। তবে এখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত, শিক্ষার এভিনিউও সহস্রপ্রকার। তাই ১৮ বছরের অতি সংবেদনশীল বয়সটাই ছেলে-মেয়েরা পরিবার থেকে বহুদূরে সম্পূর্ণ একা কসমোপলিটান এক রঙিন জগতে প্রথম পা রাখে স্বাধীনভাবে। উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ, কিন্তু বাদ সাধে হঠাৎ পাওয়া বেহিসাবী স্বাধীনতা এবং অপরিণত বুদ্ধি। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৮ বছর বয়সকেই সাবালকত্বের বয়স বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ভোটদাতার সংখ্যাবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমাদের দেশে মুখ হাঁ করে মায়ের মাখা ভাতের গরাস মুখে পুরে চিবিয়ে স্কুলে কলেজে দৌড়ানো ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা আসলে যে কতটুকু পরিণত বুদ্ধি সাবালক হয় সেটা মা-বাবারাই বলতে পারবেন বেশি। চরিত্র গঠন এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটার আগেই বহির্জগতে রাখা পা স্বাধীনতা সুখে টলমল করে ওঠে এবং ভুল করে স্বাধীনতার অপচয় করতে করতে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বি বি এ, এম বি এ ডিগ্রিগুলো ওরা করায়ত্ত করে এবং তৎসঙ্গে মোটা বেতনের গালভরা কোম্পানিগুলোতে চাকরিও জুটে যায় নিতান্তই কম বয়সে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও বেহিসেবী ভাবেই এসে যায় ওদের জীবনে। যার ফলে বাবা-মা'র কাছে আর হাত পাততে হয় না, মুখাপেক্ষী হতে হয় না এবং অবধারিত কারণেই অধীনতা চলে যায়। ভয়হীন, লাজলজ্জাহীন আত্মদম্ভে দার্পিত বেশিরভাগ ছেলেমেয়েকেই বলতে শোনা যায়,— 'এটা আমার জীবন। আমি নিজের খুশিমত চালাবো। তোমরা বলবার কে?'

সায়ন-পর্ণা সেই পশ্চিমী কালো মেঘের ছায়া যখন গায়ে মাখলো, তখনও কলকাতায় অন্তত অতটা দুঃসাহসী হয়ে ওঠেনি সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। প্রেম তো ঈশ্বরসৃষ্ট এক অন্যতম স্বাস্থ্যকর, সুন্দর, সুকোমল প্রবৃত্তি। একটা বয়সে প্রেমে প্রায় সকলেই পড়ে লজ্জা লজ্জা ভাবে। বেশিরভাগ মানুষই নিজের প্রেমকে বে-আব্রু করতে চায় না। একান্ত নিজস্ব এই অনুভূতিটিকে নিজের ভেতরেই গোপন রাখার চেষ্টা করে। এমনটাই সবাই আগে হতে দেখেছে। এমনটাই যেন চিরন্তন নিয়ম হয়ে থাকবে বলে ভেবেছে আগেকার মানুষ, হয়ত বা সায়ন-পর্ণার বাবা-মা-রাও। চলিত প্রথা ভেঙে হঠাৎ করে নতুন কিছু করতে গেলে সমালোচনার মুখে পড়তেই হয়, বিশেষ করে সেই কাজটা যদি সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ হয়ে যায়!

সায়নের গীটার বাজানো আর ট্রেকিংয়ের নেশা। ওর সঙ্গে পর্ণাও প্রত্যেক উইকএন্ডে নিরুদ্দেশের বেঠিকানায় বেরিয়ে পড়তে লাগল ট্রেকিং করতে। ছেলেদের হস্টেলে এসব নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা না ঘামালেও মেয়েদের হস্টেলে গুজগুজ, ফিসফাস শুধু নয়, নানারকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করে করে পর্ণার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল অন্য মেয়েরা। পর্ণা জানত, আড়ালে ওরা ওকে বেয়াদপ, বেহায়া, অসভ্য, নোংরা ইত্যাদি নানা নামের অলঙ্কারে

সাজাতো। পর্ণা এও জানত যে যারা ওর আর সায়নের একসঙ্গে বেপাত্তা হয়ে মাঠে-ঘাটে, নদীতীরে, জঙ্গলে তাঁবু গেড়ে রাতকাটানোর নিন্দে করে, তারা নিজেরাও ইউনিভার্সিটির মাঠে, ক্যান্টিনে, সন্ধ্যেবেলা লেকের ধারের অন্ধকারে সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে চায় গোপনে। সায়নের সঙ্গে ট্রেকিং করতে কলকাতার বাইরে যাওয়াটা শালীনতার সীমানা লঙ্ঘন করা, কিন্তু কলকাতায় থেকেই কোনও নিরিবিলি স্থানে জোড়ায় জোড়ায় বসে প্রেম করাটা শালীনতার মধ্যেই পড়ে। এদের বিচারের নমুনা দেখে করুণা হতো পর্ণার— 'জলেতে নামিব সিনান করিব, বেণী ভিজাইব না'— ভাবসাবগুলো যে আসলে মেকি, সেটা ওর অজানা ছিল না। হোস্টেলের মেয়েদের ওর প্রতি বিরূপতা যতটা খারাপ লাগত পর্ণার, এসব নিয়ে যত ভাবনা-চিন্তা করত তার এক কণা ভাবনাও ওর বাবা-মা'র জন্য করেনি। ওর মনে একবারও আসেনি যে, মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল বাবা পরম বিশ্বাসে ওকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য। তাঁর মনে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক স্বপ্ন। তিনি যদি জানতে পারেন তাঁর মেয়ে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার ছেলেটির সঙ্গে ট্রেকিং করার জন্য মাঠেঘাটে তাঁবুতে রাত্রিবাস করছে, তাহলে তাঁর মতো সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা কি হতে পারে— একথা ওর মাথায় আসেনি। কারণ, ও জানে এতদূর থেকে এসব খবর বাবার কানে পৌঁছবে না। ও আরও জানে, সায়নের সঙ্গে ওর জীবন একসুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে। ওরা পড়াশুনো শেষ হলেই বিয়ে করবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ আটকাতে পারবে না ওদের।

এক বছরের অল্প-বেশী সময় হস্টেলে নানা তিক্ততার মধ্যে বাস করে হস্টেলজীবনটা অসহ্য লাগছিল পর্ণার। ট্রেকিংয়েই যাক কি যাই করুক, ফার্স্ট প্রায়োরিটি পড়াশুনার। মন খারাপ থাকত বিদ্রূপ, টিটকিরির জন্য। পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছিল। তাই একদিন সায়নকে বলল,— 'এই হস্টেলে থাকলে লেখাপড়া আর হবে না, জানো? মেয়েরাই মেয়েদের বড় শত্রু। এত খারাপ ব্যবহার করে আমার সঙ্গে যে মন খারাপ হয়ে যায়। পড়তে বসলেই খালি মনে হয় কি এমন অপরাধ করছি আমি যে ওরা দলবদ্ধভাবে কটূক্তি করে? কই, আমি তো ওদের ব্যাপারে নাক গলাই না? হস্টেল ছেড়ে দিয়ে ছোট একটা এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকব ভাবছি। তুমি কি বল?'

সায়ন একটু ভেবে বলে— 'খুব অসুবিধা হলে ফ্ল্যাট নিতে পারো, তবে একা থাকলে খরচ অনেক বেশি পড়ে যাবে। পারবে সামলাতে? যারা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে এখানে ওরা ২-৩ জন মিলে একটা ছোট ফ্ল্যাট নেয়। নিজেরা রেঁধে খায়। যদি একজন সঙ্গী জোগাড় করতে পারো তাহলে সুবিধা হবে। নাহলে পেয়িং গেস্ট হয়েও থাকতে পারো। তাতে দায়িত্বও নেই আর পড়ার ক্ষতিও হবে না। — আচ্ছা, ওরা তোমাকে নিয়ে পড়েছে কেন? কই, আমাকে তো কেউ কিছু বলে না?'

— 'ছেলেরা ছেলেদের কিছু বলে না সায়ন! মেয়েরাই চিরকাল মেয়েদের কাঠি করে এসেছে। কিন্তু তুমি তো আমাকে সঙ্গী জোগাড় করতে বলছ, পেয়িং গেস্ট থাকতে বলছ। সঙ্গী তো পাবোই না জানি, আর পেয়িং গেস্ট থাকলে ল্যান্ডলেডী আমার পেছনে পড়ে যাবে তোমার আমার সম্পর্ক জানলেই। দেখে নিও।'

সায়ন হেসে ফেলে। বলে— 'এই মুহূর্তে তোমার আমার সম্পর্কটাই যত মুশকিল খাড়া করছে দেখছি। এটাকে তো ছেঁটে ফেলা যাবে না। এটাকে টিকিয়ে রেখে অন্য কি ভাবে মুশকিল আসান করা যায় ভাবো।'

— 'ভেবেছি তো! এখন তুমি রাজি হলেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে।'

— 'আমি রাজি হলে? আমি এর মধ্যে কোত্থেকে এলাম? ঝেড়ে কাশো তো!'

পর্ণা সায়নের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে — 'কেন, একটা এক কামরার ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারি না? আমার এক বন্ধু ব্যাঙ্গালোরে ওর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে শেয়ার করে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। আমরা কেন পারব না?'

সায়ন কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না বলে চুপ করে থাকে। পর্ণা প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারে। পর্ণার কাছ থেকে এরকম একটা প্রস্তাব আসতে পারে, সেটা ওর ২৩ বছরের মাথায় ঠিকমত সেট্ করতে পারছে না ও। পর্ণাকে ও ভালবাসে। পাশ করে চাকরি পেয়ে বিয়েও করবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু এখন কলকাতার মতো জায়গায় একসঙ্গে থাকা.... এ যে অসম্ভব! এটা ব্যাঙ্গালোর নয়! তাছাড়া বাবার চামচা নরেন্দ্র সিং ঠিক জেনে ফেলবে এবং বাবাকে জানিয়ে দেবে। আর বাবা কান ধরে হিড়হিড় করে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে, 'আর পড়ে কাজ নেই। যতটুকু শিখেছিস তাতেই প্রমোটারি করতে পারবি বাড়িতে বসে।' বাবা নিজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি না করে নিজেদের ফ্যাক্টরী চালায়। কনস্ট্রাকশন সেক্টরে বিজনেস বিস্তার করার জন্য সায়নকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছে বাবা। তার ওপর বাবা যেমন রাগী তেমনই জেদী, আর তার চেয়েও বেশি বাঙ্গালীবিদ্বেষ। কয়েক পুরুষ বাংলায় বাস করার পরেও বাবা মনেপ্রাণে নিজেকে রাজপুতানার ঠাকুর বংশের বলে ভাবে। ছেলে বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে করতে চায় জানলে দক্ষযজ্ঞ বাধাবে বাবা।

ওকে এতক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে পর্ণা বুঝতে পারে ওর কথা সায়নের মনঃপূত হয়নি। সায়নকে ও যতটুকু চিনেছে, তাতে বুঝেছে যে কিছু কিছু ব্যাপারে ও যেন কেমন রক্ষণশীল মনের। যেন বিগত যুগে পড়ে আছে এখনও। অনেকটা হস্টেলের মেয়েগুলোর মতো— জলেতে নামিব সিনান করিব, বেণী ভিজাইব না গোছের। একটু বিরক্ত সুরেই ও বলে ওঠে— 'ঘাবড়ে গেলে আমার প্রস্তাব শুনে? থাক বাবা, তোমাকে আমার সঙ্গী হয়ে

এক ফ্ল্যাটে থেকে বদনাম কুড়োতে হবে না। আমাকে শুধু আমার বাজেটের মধ্যে একখানা ঘর জোগাড় করে দাও। আমি হস্টেল ছেড়ে চলে যেতে চাই।'

— 'পর্ণা, হস্টেলে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে একথা তোমার বাবাকে জানাচ্ছ না কেন? তিনি নিজে এসে একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হয় না কি? তাঁকে না জানিয়ে ফ্ল্যাটভাড়া করে চলে যাওয়াটা এইটুকু বয়সে কি উচিত হবে তোমার?'

খিঁচিয়ে ওঠে পর্ণা— 'কি বুদ্ধি তোমার! বাবাকে জানালে বাবা এখানে এসে তোমার কথা জানবে না ভেবেছ? তখন কি হবে?'

— 'কি আবার হবে? যাব ওঁর কাছে, বলব তোমাকে বিয়ে করব পাশটাশ করে।'

— 'তাহলেই হয়েছে! বাবা তোমাকে জামাই আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরবে? মাস্টারী করে— মাস্টারী! কলেজের গুরুগম্ভীর অধ্যাপক। এখানকার পাঠশালা থেকে তুলে নিয়ে দিসপুরে চলে যাবে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। ... বোকা বোকা কথা বলো না তো! শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।' — বিরক্ত পর্ণা মুখ ঘোরায় অন্যদিকে।

কিছুদিনের মধ্যেই যাদবপুর সংলগ্ন সন্তোষপুরে এক কামরার ছোট একটা ফ্ল্যাট জোগাড় হলো। যাদবপুর স্টেশনের ওপারটাতে তখন বাঙালী মাড়োয়ারী প্রমোটারদের রমরমা। ডেভলাপমেন্ট হচ্ছে, রোজ নতুন নতুন বিল্ডিংয়ের ভিত পুজো হচ্ছে। আর সেই কর্মযজ্ঞ ঘিরে দলীয় মদতপুষ্ট ক্যাডারদেরও রমরমা। ইঁট, বালি, সিমেন্ট, লোহার কন্ট্রাক্ট পাবার রেষারেষি। মারামারি, বোমাবাজিও ঘটে যায় কখনও কখনও। কি জানি কি ভেবে সায়ন বাঙ্গালী প্রমোটারদের কাছে না গিয়ে ঝুনঝুনওয়ালা নামে এক মাড়োয়ারী প্রমোটারের শরণাপন্ন হলো এবং মিথ্যের আশ্রয় না নিয়ে হস্টেল ছেড়ে ফ্ল্যাট খোঁজার কারণ খুলে বলল। ভদ্রলোক তরুণ ছেলেটির অকপট সত্য কথায় এমন ইমপ্রেসড্ হয়ে পড়লেন যে বিনা সেলামী, বিনা অ্যাডভান্সে একেবারে ন্যায্য ভাড়ায় নিজের নবনির্মিত একটি বিল্ডিংয়ে এক কামরা, কিচেন, বাথরুম সহ একটি ছোট ফ্ল্যাট এক সপ্তাহের মধ্যে রেডি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন। সায়ন আশাতীত ভাবে হাতে চাঁদ পাবার মতো করে ওঁকে বারবার ধন্যবাদ জানালে উনি হাসিমুখে নিজেও সত্য কথাটা বলে দিলেন— 'ইয়ংম্যান, অযথা এত বিনয় দেখিও না। আমি ব্যবসা করে খাই। তুমি সত্যি কথা বললে বলে আমিও সত্যি কথা বলব তোমাকে। আসলে, এক কামরার ফ্ল্যাটের চাহিদা কম। বিক্রি হতে চায় না, তাই আমরা বানাইও না। কিন্তু এই সিঙ্গল বিল্ডিংটাতে টু-রুম, থ্রি-রুমের প্ল্যান করার পর ২০০ স্কোয়ার ফুট মতো খালি পড়ে থাকছিল। সেই জায়গাটুকুকে আমি সিঙ্গেল রুম একটা ফ্ল্যাট করে কাজে লাগিয়েছি। খালি পড়েছিল এতদিন। আজ তোমাকে ভাড়া দিয়ে আমার লাভই হলো, তাই না? তোমরা ইঞ্জিনিয়ার বনে ছেড়ে চলে যাবে। ভাড়াটে ওঠাবার ঝামেলা হবে না আমার। এবার বুঝলে কেন আমি আনম্যারেড

কাপল্‌কে থাকতে দিলাম? তবে তোমাকে বড় ভাল লাগল। আজকাল সত্যি কথা বলতেই লোকে ভয় পায়, কিন্তু তুমি বলেছ। তবে, ঝামেলা পোয়াতে হবে...'।

পাড়ার মস্তানরা ঠিক ধরে ফেলল— এই ছেলেটা আর মেয়েটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওদের বিয়ে হয়নি। বুকে পাটা দ্যাখ! শালা, বে না করে এ পাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে ওমনি ওমনি মাগ্‌নায় থাকবে ভেবেছে। চল, কাত্তিক পুজোর নাম করে পানশো টাকা চেয়ে ভয় দেখিয়ে আসি। পয়সা ফেললে থাকতে দেব নাহলে মেয়েটার হাল খাস্তা করে ছাড়ব। শালা, পেমের রশি কেটে পগারপার হয়ে যাবে।

এসব ছেলেরা যা করে থাকে তাই করা শুরু করল। পর্ণা একা যখন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরে তখন ওর সামনে এসে ট্যারা ছেলেটা বলে— 'কেলাস শেষ হয়ে গেল বুঝি? তা, তোমার বাবু তো সঙ্গে নেই! একা একা ঘরে বসে কি করবে? আমি আসি তোমার সঙ্গে?'— পর্ণা মাথা নিচু করে কোনরকম পাশ কাটিয়ে আসে। শুনতে পায়, ওরা অশ্লীল কথা বলছে, অশ্লীল ভাবে হাসছে ওকে নিয়ে। বুঝতে পারে, হস্টেলের ফ্রাই প্যান থেকে এখানে একেবারে ফায়ারে এসে পড়েছে এবং জোর করে সায়নকেও এনে ফেলে দিয়েছে। ভেতরে ভেতরে অপরাধবোধ জাগে না তা নয়, কিন্তু ওর সহজাত জেদী স্বভাব ওকে উল্টোটা করারই নির্দেশ দেয়। ওর মন বলে, কলকাতার এই শহরতলিগুলো পোস্টাল এ্যাড্রেসে মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এসব অঞ্চলের মানুষের মনে কোনও আলোকপাত ঘটেনি। প্রতিবেশীর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারা, পরনিন্দা, পরচর্চা করা ছাড়া এদের আর কোনও কাজ নেই। বিশেষ করে ট্যাঁরা পটলা, ঘোঁতন এবং আরও যেসব বস্তিবাসী যুবক মোড়ের চায়ের দোকানটাতে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে ফেলেছে এদের জন্য ওর করুণা হয়। শিক্ষা নেই, জীবনে দারিদ্র্যের অভিশাপকে নস্যাৎ করে কাজকর্ম করার ইচ্ছেশক্তি নেই একটা ছেলেরও। অন্ধকার অপরাধের আশ্রয়ে এরা পালিত হয় গাঁজা, মদ, ড্রাগের পয়সার লোভে। এরা সকলেই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লিখিয়ে রাখা ক্যাডার। আর দলের হয়ে গুণ্ডামি করার জন্য দলীয় স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থের কারণেও নেতা-স্থানীয় শয়তানরা ওদের স্কুলের পথে, সুস্থ জীবনের পথে চলতে দেয় না। ওরা যত অশিক্ষিত হয়ে থাকবে নেতাদের তত লাভ। এসব কথা পর্ণা জানে। গৌহাটিতে কখনও ইভ্‌টিজিং হয় না তা নয়। তবে এরকম অসম্ভব অশ্লীলতার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল না আগে। অসমেই ওর বাবা-মা'র বেশিরভাগ আত্মীয় থাকেন। ওঁরাও একসময় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে অসমে এসেছিলেন শুনেছে ও। অসমের অনেক জায়গায় ও বেড়াতে গেছে বাবা-মা'র সঙ্গে। কাজিন ভাইবোনদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমা দেখে রাত দশটায় ফিরেছে। কিন্তু কোথাও এখানকার মতো এমন নগ্ন অশ্লীলতা নজরে পড়েনি। ও জানে ট্যাঁরা, পটলা, ঘোঁতনরা সবকটা উদ্বাস্তু কলোনীর ছেলে। তবে অসমের উদ্বাস্তু বস্তির ছেলেদের সঙ্গে এখানকার উদ্বাস্তু বস্তির ছেলেদের এত তফাৎ কেন সেটাই ওর বোধগম্য হয় না। ওখানে পানের দোকান দিয়ে, রিক্সা চালিয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা আছে। এখানে নেই।

পর্ণার কাছে ট্যাঁরা, পটলাদের অসভ্যতার কথা শুনে সায়ন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একা ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হবে। কারণ ওরা দলে ভারী এবং সমাজবিরোধী গুন্ডা। তবে ওরা প্রমোটারদের হয়ে কিছু কাজকর্ম করে। ঝুনঝুনওয়ালা এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী রিয়েল এস্টেট ডিলার এবং প্রমোটার। ওর কদর রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট আছে বলে শুনেছে সায়ন। ঝুনঝুনওয়ালার কাছে গিয়েই বলতে হবে ওদের কথা। এছাড়া আর রাস্তা নেই।

ঝুনঝুনওয়ালা এই প্রথম পর্ণা দাশগুপ্ত নামের দুঃসাহসী মেয়েটিকে দেখলেন এবং নীরবে বসে পর্ণার অপমানিত লালমুখ, জলভরে আসা চোখ, বন্ধ হয়ে আসা গলায় উত্তেজিত উচ্চারণে বলা নালিশ শুনলেন। পর্ণা থামার পর শান্ত স্বরে বললেন — 'তুমি ক্যামাক স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীটে ফ্ল্যাট নিয়ে সায়নের সঙ্গে থাকছ না বেটি। এটা সন্তোষপুর, মাত্র ক'বছর আগেও জলাভূমি ঘেরা গ্রাম ছিল। দিনের বেলাতে শেয়াল ডাকত। এখানে 'এলিট পীপ্‌ল'-এর বাস নেই যে পাশের ফ্ল্যাটে কে থাকে খবরও রাখবে না। হস্টেল ছেড়ে লাভারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে বলে এতখানি দুঃসাহস দেখাতে পারলে আর ক'টা খারাপ ছেলে খারাপ কথা বলল বলে এখন কাঁদছ? খারাপ কাজ করলে খারাপ কথা শুনতে হয় এবং শুনে হজমও করতে হয়। আমি ভেবেছিলাম তুমি এসব জানো। তোমার সাহসকে আমি বাহ্‌বা দিয়েছিলাম সায়নের মুখে তোমার ইচ্ছার কথা শুনে। কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মতোই অন্যের ওপর নির্ভরশীল এক মেয়ে। অসাধারণ বা ব্যতিক্রমী চরিত্র মোটেই নও। তুমি রীতিবিরুদ্ধ কাজ করবে আবার এটাও আশা করবে যে তোমাকে সবাই সম্মান করুক— এটা কি হয়? দেখ, কলকাতায় এখনও অত্যাধুনিক লিভ-টুগেদারের কনসেপ্ট চালু হয়নি। ওসব ব্যাঙ্গালোর, বম্বেতে দেখেছি আমি। ওখানে গোটা সমাজটাই আধুনিকমনস্ক তাই কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বেটি, এখানে বেশিরভাগ অঞ্চলেই পাড়া কালচার। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষরা পরম্পরাগত রক্ষণশীলতায় বিশ্বাস করে। এখানে তোমার নিন্দে হবেই। কেউ মিশবে না তোমার সঙ্গে। এসব মেনেই চলতে হবে। তবু আমি চেষ্টা করব যাতে রাস্তায় তোমাকে কিছু না বলে। জানি না শুনবে কিনা! একটা কাজ করো তো সায়ন, — ওখানে বড়খোকা বলে একটি ছেলে আসে। পটলা-ফটলাদের ওই-ই ঠাণ্ডা করে রাখে। বড়খোকা কিন্তু পটলাদের মতো নয়। ইজ্জতদার ছেলে। ওকে একটু সমীহ-টমীহ করে কথা-টথা বল, বন্ধুত্ব করতে না পারলেও ভাবেসাবে বন্ধুত্ব দেখাও। মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই সায়ন বুঝলো যে পর্ণা

ঝুনঝুনওয়ালার কথার খোঁচায় খুব চটেছে। মুখ একেবারে গম্ভীর। ওর এই একটাই দোষ। সবাইকে নিজের মতো মনে করে। যেন সবাই ওর ছাঁচে গড়া হবে, ওর মতো কথা বলবে, ভাববে। গুমোট কাটাবার জন্য ও বলে— 'সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। ঝুনঝুনওয়ালা মানুষটা ভাল। কথার দাম দেন। ইনফ্লুয়েন্স আছে নানা জায়গায়।'

ফোঁস করে ওঠে পর্ণা— 'ভাল না ছাই! সুযোগ পেয়ে আমাকে অপমান করতে ছাড়লেন না। বললেন, খারাপ কাজ করলে লোকে খারাপ কথাই বলবে। তোমাকে ভালবাসি, বিয়ে হলে শুধু তোমার সঙ্গেই হবে, অন্য কারও সঙ্গে নয়, তাহলে এখন এক সঙ্গে থাকি বলে অপরাধী হয়ে যাবো? এতই খারাপ কাজ এটা?'

সায়ন বলল— 'তুমি ভুল বুঝলে। আমরা একসঙ্গে থাকব শুনে অন্য বাড়িওয়ালারা দূরদূর করে ভাগিয়ে দিয়েছে আমাকে। উনিই প্রথম মানুষ যিনি সব জেনেই ভাড়া দিলেন। তখন উনি ওঁর একার চোখ দিয়ে দেখেছিলেন পর্ণা! সেই চোখ উদার। এখন সমাজের চোখে আমাদের থাকাথাকিটা কেমন দেখায় সেটাই বোঝালেন। সমাজের চোখ খারাপকে খারাপ বলে। আর অবিবাহিত এক ছাত্র আর এক ছাত্রীর একসঙ্গে থাকাটা সমাজের চোখে খুব খারাপ একটা ব্যাপার। এটা তোমাকে বুঝতে হবে। যাক গে, সব ঠিক হয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। বড়খোকা কে? ওকে খুঁজে বের করতে হবে। দেখি না ওঁর কথা মতো চলে? বয়স্ক মানুষ, মাথার ওপর অভিভাবকের মতো থাকলে ক্ষতি কি?'

২-৩ দিন পর ওরা দু'জন একসঙ্গেই ফিরছিল, এমন সময় চায়ের দোকানে বসা গুণ্ডাগুলো ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো রাস্তা ব্লক করে। — 'দাদা দাঁড়ান, একটু কথা আছে।'

ওরা তো দাঁড়িয়েই পড়েছিল। সায়ন জিজ্ঞেস করে— 'কি কথা বলুন তো?'

হাত কচলে দেঁতো হাসি হেসে ট্যারা পটলা বলে— 'ছিঃ ছিঃ! আমাদের আপনি আজ্ঞে করবেন না। আপনারা অত শিক্ষিত মানুষ, ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, দেশের গব্ব। আমরা তো শালা দেশের আবজ্জনা দাদা! আপনাদের সাহায্য করাই কত্তব্য ছিল। কিন্তু... ভুল করে কত খারাপ কথা বলেছি দিদিকে। দিদি মাফ করে দিন আমাকে .. আর ওদেরও। আর কখনো হবে না। মাইরী বলছি।' — ট্যাঁরা পটলা কথা বলছে আর বাঁ পাশে একটু দূরে চায়ের দোকানের দিকে বারবার তাকাচ্ছে, এটা সায়ন লক্ষ্য করে। দোকানের সামনে একটা মোটরবাইকের সামনে খুব লম্বা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ওর শরীরের গড়নপেটন, পোষাক, সুন্দর মুখশ্রী এবং চোখের সানগ্লাস সব মিলিয়ে অন্যরকম ছাপ, যা পটলাদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। এই কি বড়খোকা? পটলা এই ছেলেটার দিকেই তাকাচ্ছিল। ও দুম্ করে জিজ্ঞেস করে— 'আচ্ছা পটলা, বড়খোকা কে? ওর সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছে ছিল।'

— 'বড়খোকাদা? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা বলবেন?' —বিগলিত গলায় পটলা বলল, — 'আসুন দাদা। কথা বলিয়ে দিচ্ছি।'

ওই দিনের পর থেকে পুরো তিনটে বছর ওরা শান্তিতে ওই ফ্ল্যাটে থেকেছে। ভালভাবে পড়াশুনা করেছে, উন্নত মানের রেজাল্ট করেছে। কেউ আর ওদের ঘাঁটায়নি, বিরক্ত করেনি। বাধা এসেছে ওদের দ্বৈত জীবনে প্রায় একসঙ্গেই। তবে সে বাধা এদিক থেকে নয়, পরিবার থেকে। ওরা সবরকম প্রতিকূলতাকে দু'জনে মিলে মোকাবিলা করে ভালবাসাকে টিকিয়ে রেখেছে। বড়খোকা নামের ইজ্জৎদার ছেলে পাড়ার মস্তানদের ঠাণ্ডা রাখলেও পারিবারিক বিচ্ছেদ তো ওর জানার কথা নয়।

।। দুই।।

— 'কি বলছেন আপনি? পর্ণা দাশগুপ্ত হস্টেলে থাকে না? এসব কথার মানে বুঝতে পারছি না আমি। আমার মেয়ে হস্টেল নম্বর ফোরে থাকে। গেল সপ্তাহে আমি ওর সঙ্গে হস্টেলেই কথা বলেছি ফোনে। আর আপনি বলছেন ও হস্টেলে থাকে না। এটা কি করে সম্ভব?'

এদিক থেকে উত্তর এল— 'পর্ণা দাশগুপ্ত গত সপ্তাহ অব্দি হস্টেলে ছিল। একমাস আগে ও হস্টেল ছাড়ার নোটিশ দিয়েছিল। লিখেছে, রিলেটিভের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ও ৪/৫ দিন আগে হস্টেল ছেড়ে চলে গেছে, তবে রেগুলার ক্লাশ করছে। এটা নতুন কিছু নয়, অনেকেই হস্টেল ছেড়ে অন্য কোথাও থেকে কলেজ করে।'

দিসপুরের বাড়িতে বাবা প্রবাল আর মা রেখার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কেন হস্টেল ছাড়ল? ওদের জানালো না কেন? ফরোয়ার্ডিং এ্যাড্রেস যা দিয়েছেন হস্টেল সুপার সেটা রেখার পিসতুতো বোন অলকার। কিন্তু তাহলে অলকা কিছু জানালো না কেন? একবেলার জন্য মাসির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া আর একেবারে থাকতে যাওয়ায় তো তফাৎ আছে। রেখা সাবধান হয়েই অলকাকে ফোন লাগায়। — 'কি রে কেমন আছিস তোরা? রেখাদি বলছি দিসপুর থেকে।'

— 'বাব্বা! এতকাল পরে মনে পড়ল তোমার? কি এমন কর যে একটা ফোন করতে পার না? পর্ণাও তো মাসিকে ভুলে গেছে। এতদিনের মধ্যে একদিন মাত্র এসেছিল গেল বছর। ও কেমন আছে? তুমি আর প্রবালদা কেমন আছো?'

রেখা চুপসে যায়। পর্ণা মোটেই অলকার বাড়ি যায়নি। ওর হাঁটু দুটো ভয়ে কাঁপছে। কোনওমতে অলকার সঙ্গে কথা শেষ করে বসে পড়ে।

হতাশ দম্পতি একে অন্যের দিকে বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকে। রেখাই ফেটে পড়ে স্বামীর ওপর — 'তখন বারবার বলেছিলাম ওকে গৌহাটিতেই পড়াও। শুনলে না। এখন হলো তো! ... আমার খালি অলুক্ষুণে কথা মনে আসছে গো। দূরে গিয়ে কি করে বসলো মেয়েটা? ... অত যে বন্ধুদের গল্প করত ছুটিতে এসে, তাদের কথা কি তখন ভাল করে শুনতাম? নামই মনে পড়ছে না কারও.. হ্যাঁগো, পালিয়ে টালিয়ে যায়নি তো আমাদের মুখে চুনকালি লেপে?... দূর! আমি আর ভাবতে পারছি না।'

প্রবাল দু'হাতে মাথা চেপে ধরে নীরবে শোনেন। তিনি কি ভাবছেন বোঝার উপায় নেই রেখার। তাঁর বুকের ভেতরে যদি ভূমিকম্পও ঘটে তাহলেও বাইরে থেকে সেই ধ্বংস কেউ জানবে না— এটাই তাঁর চরিত্র। নানা বিভীষিকা কল্পনা করে রেখা একাই কাঁদতে থাকে, 'মেয়ে এলে তুমিই তো সারাক্ষণ পেল্লাদী মেয়েকে নিয়ে বসে থাকতে। ওর বকর বকর মন দিয়ে শুনতে। আমি তো রান্নাঘরে মরেহেজে থাকতুম। ওর বন্ধুদের কারও নাম মনে পড়লে একবার তাকে ফোন করে দেখ না কেন? সেও নিশ্চয় হস্টেল ছেড়ে চলে যায়নি।' — যাকে বলে তিনি নীরব। এদিকে কান্না বাড়ে।

পুরো দুটো দিন কেটে গেল। প্রবাল রেখার অভিযোগ, অনুযোগ, কান্নাকাটিতে কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। মেয়েকে খোঁজার কোনও চেষ্টাই করলেন না এবং প্রাণাধিক প্রিয় মেয়ের নামও উচ্চারণ করলেন না। তৃতীয় দিন রবিবার। টেলিফোন বাজতেই রেখা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে দেখলেন প্রবাল ফোন ধরেছেন এবং ওদিককার কথা একমনে শুনে চলেছেন। রেখা ইঙ্গিতে কয়েকবার কার ফোন এসেছে জিজ্ঞেস করেও উত্তর না পেয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকের কথা শেষ হলো। রেখা প্রবালের গলার স্বর শুনে চমকে উঠলেন, — 'তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ। একমাস আগে তুমি হস্টেলে নোটিশ দিয়েছ। এই একমাসে আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার তোমার কথা হয়েছে, কিন্তু একটিবারও তুমি আমাকে বলোনি যে হস্টেলে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে তোমরা ২-৩ জন মেয়ে মিলে বাড়ি ভাড়া করে থাকার প্ল্যান করেছ। বলোনি যে, হস্টেলেও নোটিশ দিয়েছ ছেড়ে দেবে বলে। এমনকি তুমি নোটিশে লিখেছ আত্মীয়ের বাড়িতে থাকবে এবং অলকার বাড়ির এ্যাড্রেস দিয়েছ, যেখানে গত দেড় বছরে একবারও যাওনি তুমি। তুমি কি আমাকে নির্বোধ, বোকা বলে ভেবেছিলে? ভেবেছিলে, একমাত্র মেয়ে বলে স্নেহে একেবারে অন্ধ হয়ে আছি আমি? খুব ভুল করেছ ওরকম ভেবে। স্পর্ধার সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলেছ তুমি। স্বেচ্ছাচারিতা করার জন্য তোমাকে কলকাতায় পাঠাইনি আমি, আর স্বেচ্ছাচারিতা সহ্যও করব না। আজই তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা শেষ। আমার যা কিছু জমানো টাকাপয়সা ছিল সবটুকুই তোমার হায়ার এডুকেশনের জন্য তোমার নামে কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলাম। মনে আছে বোধহয়? সেই টাকায় ৩-৪ বছর তোমার ভালভাবেই চলে যাবে। নতুন নতুন মিথ্যা কথা শোনানোর জন্য আর কখনও ফোন করবে না। তোমার উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া জীবনের সঙ্গে আমাদের জড়াবার চেষ্টা করবে না। নিজেকে পিতৃ-মাতৃহীন বলেই পরিচয় দিও।' ...

লাল গনগনে মুখে রিসিভার নামিয়ে রাখতেই রেখা চিৎকার করে ওঠে— 'এ কি করলে তুমি? কিছু না জেনেশুনেই মেয়েটার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করলে? তোমার কাছ থেকে এমন আঘাত পেয়ে যদি কিছু করে বসে? তুমি তো ওকে প্রায় ত্যাজ্য করে দিলে!'

কঠিন মুখে প্রবাল বলেন— 'ঠিকই বুঝেছ। ত্যাজ্য করলাম ওকে। ও যদি বাবার স্নেহের সুযোগ নিয়ে বিপথগামী হতে পারে, তাহলে বাবাও ওকে ত্যাগ করতে পারে। ও একটা ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবে বলে হস্টেল ছেড়েছে রেখা। তোমার মেয়ে ২০ বছর বয়সে বিয়ে না করে একটা ছাত্রের সঙ্গে একঘরে একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করবে বলে হস্টেল ছেড়েছে। আর সেসব ঢেকে রাখার জন্য আমার কাছে জম্পেশ করে মিথ্যে কাহিনী শুনিয়েছে। দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল রেখা, তাই ওকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনও পথ ও নিজেই খোলা রাখতে দেয়নি।' — ঘর ছেড়ে যেতে যেতে প্রবাল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন— 'তুমি তোমার কষ্ট, তোমার কান্নাকাটি নিজের মধ্যেই রেখো। আমার সামনে কখনও ওর নাম উচ্চারণ করো না।'

¤ ¤ ¤

বড়খোকা নামের ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে এত ভাল লাগবে সায়ন ভাবেনি। ছেলেটা ওর চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় বুঝতেই পারা যাচ্ছিল। পটলা ওকে সঙ্গে নিয়ে বড়খোকার সামনে এনে বলে— 'এই সায়ন বর্মন খোকাদা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়'।

— 'ঠিক আছে, তুই যা। ... আপনি ওঁকে বাড়ি যেতে বলুন। কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন? তারপর আমরা কথা বলব।' — পর্ণাকে বাড়ি পাঠাতে বলল বড়খোকা।

সায়ন বলে— 'বেশ। তাহলে চাবিটা ওকে দিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দু'জনে চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসল। বড়খোকা দোকানদারকে উদ্দেশ্য করে বলল, — 'ভোলাদা, দুটো দার্জিলিং চা বানাও ফার্স্টক্লাস করে আর ভাল বিস্কুট দিও। ... হ্যাঁ সায়ন, বলুন কি বলবেন।'

সায়ন বলে — 'আমার মনে হচ্ছে যা বলব ভেবেছিলাম আপনি তার সবটাই জেনে ফেলেছেন। আর সেজন্যই ওরা আমাদের কাছে ক্ষমা-টমা চাওয়ার নাটকটা করল। খুব যে একটা বিশ্বাস করলাম ওদের তা বোধহয় নয়। আপনার অনুপস্থিতিতে আবার অসভ্যতা করাটাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক।'

বড়খোকার চোয়াল শক্ত হলো মুহূর্তের জন্য। তারপরই

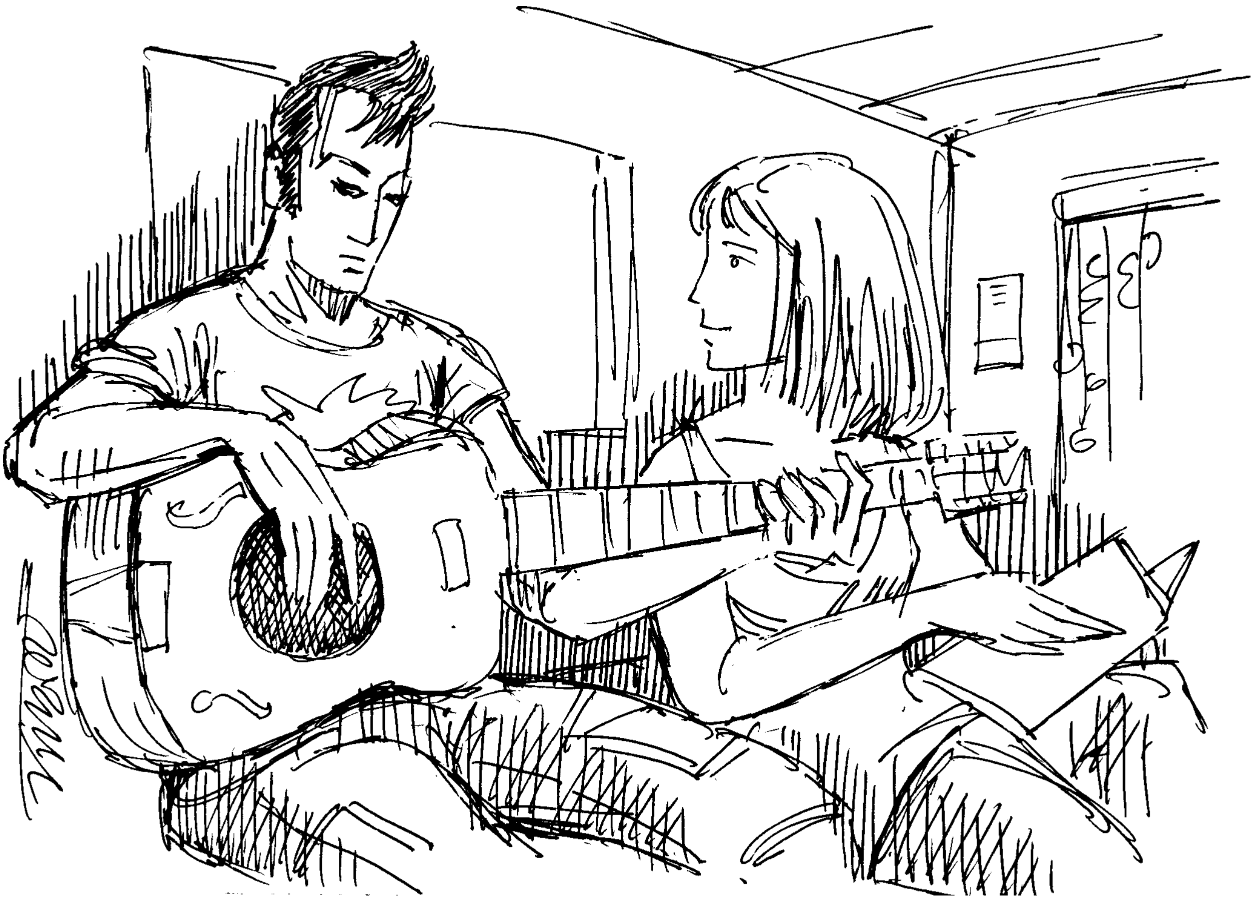

মুখটা নরম হয়ে গেল— দেখল সায়ন। বড়খোকা বলল— ‘আর কোনওদিন কোনও অসভ্যতা করবে না ওরা। আজও ক্ষমা চাওয়ার নাটক করেনি, ক্ষমাই চেয়েছে। আমি কয়েকটা দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, সেই সুযোগে ওরা ... যাক্‌গে, যা হবার হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গিনীকে বলবেন উনি এখন থেকে নির্ভয়ে থাকতে পারেন। আর, ওরা আগবাড়িয়ে একটা দুটো কথা জিজ্ঞেস করলে নাক উঁচু করে যেন চলে না যান। একটু হাসিমুখে— হ্যাঁ ভাল আছি। তোমরা কেমন আছো— বললেই এরা ওঁর পোষা কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে থাকবে। জীবনের নানা দরকারে এরা কিন্তু খুব কাজে লাগে। বিশেষ করে আপনারা যে জীবনযাপন বেছেছেন এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি করে না চলতে পারলে পদে পদে সমস্যা আসতে বাধ্য। আমি আপনাদের নতুন ধরনের জীবনযাত্রার বিরোধী নই এবং সমালোচনাও করব না। পাড়ার অন্য কেউ যাতে আপনাদের শান্তিভঙ্গ না করে তার জন্যই ওদের হাতে রাখা প্রয়োজন সায়ন, আশাকরি বুঝতে পারছেন আমার কথা।’

— ‘বুঝেছি। মিষ্টি মুখে দুটো কথা খরচ করলে যখন ওরা হাতে থাকবে, তখন সেটা না করাটা তো অবশ্যই বোকামি। আমি আপনার কথা রাখব। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। রাখ-ঢাক না করে খোলাখুলি বুঝিয়ে দিলেন প্রচলিত সামাজিক প্রথা ভেঙে চলতে গেলে সমস্যা আসবেই এবং নিজের বুদ্ধি দিয়েই সেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আমরা তো প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে সত্যিই আঘাত করেছি, একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে।’

চায়ের কাপ প্লেট এগিয়ে দিয়ে বড়খোকা বলে — ‘নিন। চা ভোলাদা ভালই বানায়। খান। দেখুন সায়ন, পুরনো নিয়মকানুন ভাঙতে গেলে সাহস থাকা চাই। আপনাদের দু’জনের সেই সাহস আছে দেখে আমি যেমন আশ্চর্য হয়েছি, তেমনি আকৃষ্টও হয়েছি। এই অঞ্চলে আপনারাই প্রথম লিভ-টুগেদার করার সাহস দেখালেন। ভালবাসার নামে সর্বসমক্ষে করা কদর্য বেলেল্লাপনা দেখে দেখে মানুষের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জনসাধারণের চোখের আড়ালে চার দেওয়ালের ভেতরে আপনারা আপনাদের ভালবাসাকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে গোপন রাখতে চেয়েছেন, এই পরিবর্তিত রূপটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে, চোখগুলোকে অভ্যস্ত করতে অনেক সময় লাগবে। কয়েক বছর পরে দেখবেন, এসব নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামাচ্ছে না। এটাই প্রচলিত নিয়ম হয়ে গেছে।’

বড়খোকা নামক এই হিরো হিরো চেহারার অতি ভদ্রছেলের কি করে পটলা, ঘোঁতন, মাকা, ইলিয়াস, বিম্‌লে, ন্যাংচা ইত্যাদি শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় ভেবে কূল পায় না সায়ন। এ তো একটা শিক্ষিত ছেলে! শুধু তাই নয়, ওর

মধ্যে অভিজাত কুলশীলের ছাপ প্রকটভাবে প্রকাশিত। ব্যাপারটা কি জানতে হবে পরে। কৌতূহলী সায়ন ভাবে। মুখে বলে— 'আপনার সমর্থন পেয়ে বুকে বল পেলাম। সাহস আমার চেয়ে পর্ণার বেশি। একসঙ্গে ট্রেকিংয়ে যেতাম, ১-২ দিন টেন্টে কাটাতে হতো আমাদের। এই নিয়ে হস্টেলের অন্য মেয়েরা ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অথচ আমার হোস্টেলে কেউ কিছু বলেনি কখনও। পর্ণা খুব মেধাবী। পড়াশুনোটাই ওর প্রথম পছন্দের কাজ। সেটা প্রায় নষ্ট হতে চলেছিল সারাক্ষণ নানা রকম নিন্দে কটূক্তি শুনে শুনে। উপায়ান্তর না দেখে জেদ ধরে বসল বাইরে বাসা ভাড়া করে থাকবে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। পেয়িং গেস্ট অথবা আর পাঁচজনের সঙ্গে মেসে থাকাও ওর পছন্দ নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা পাবে না বলে। একেবারে একা কি করে থাকবে ২০ বছর বয়সের একটা মেয়ে বলুন? তাই আমাকেও হস্টেল ছেড়ে আসতে হলো।'

— 'সায়ন, আপনি খুব সোজা সরল ছেলে। প্রথম পরিচয়েই নিজেদের অনেক কথা বলে ফেললেন আমাকে বিশ্বাস করে। বুঝতে পারছি, এভাবে থাকা আপনার কাছে অস্বস্তিকর। কিন্তু ওকে ভালবাসেন বলেই তো ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও এসেছেন। ওই বয়সের মেয়ের একা থাকার বিপদ বুঝতে পেরেছেন। এসেই যখন পড়েছেন তখন আর পস্তাবেন না। দেখুন, বদনাম তো কিছুটা হবেই আমাদের সমাজে, ভালবাসা খাঁটি হলে সেটুকু সহ্য করে নিতে পারবেন। আপনারা কি এক জায়গা থেকেই এসেছেন? ছোটবেলা থেকেই পরিচয়?'

— 'না-না। আমি একেবারে কাছেই, দুর্গাপুরের। আমার বাবাও যাদবপুর থেকেই পাশ করা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। যদিও উনি চাকরি করেন না। দুর্গাপুরে আমাদের মেশিন পার্টসের ফ্যাক্টরি আছে, বাবা ওসব দেখেন। আর পর্ণা অনেক দূর— সেই গৌহাটি থেকে এসেছে। আমরা দু'জনেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট। আমি এক বছরের সিনিয়র ওর থেকে। কলেজেই পরিচয়।'

— দু'জনের বাড়িতেই নিশ্চয় জানে না এই একসঙ্গে থাকার কথা?'

— 'না। আমার বাবা জানতে পারলে আমার ক্ষতি হয়ত করবেন না, কিন্তু পর্ণাকে আমার জীবন থেকে বের করার চেষ্টা করবেন, সেটা নিশ্চিত। উনি বাঙ্গালীদের বিশেষ করে বাঙ্গালী মেয়েদের একেবারেই পছন্দ করেন না।'

বড়খোকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে— 'সে কি? আপনি বাঙ্গালী নন? নামটা তো বাঙ্গালী নাম, কথাতেও বাঙ্গালী— তবে?'

সায়ন এতক্ষণে প্রথম হেসে ফেলে বলে— 'আমাদের ফ্যামিলির সবাই বাঙ্গালী, শুধু বাবা ছাড়া।'

আরও অবাক হয়ে বড়খোকা বলে— 'মানে?'

— 'মানে আমরা কোনও এককালে রাজপুত ঠাকুর ছিলাম। বেঙ্গলে কয়েক পুরুষ ধরে থাকার ফলে বাড়িশুদ্ধু সবাই বাঙ্গালী হয়ে গেছি মনেপ্রাণে। বাংলা মিডিয়ামে সবাই পড়াশুনো করেছিল। নামের পাশ থেকে 'সিং' ছেঁটে ফেলে শুধু বর্মন ধরে রেখেছি। কিন্তু বাবা কিছুতেই তাঁর শিরায় বওয়া রাজপুত রক্তটাকে ভুলতে পারেন না। ... অবশ্য বিয়ের সময় কিন্তু রাজপুত নিয়মই মানা হয়। মানে— ওই শেহরা-টেহরা পরতে হয়, শেরওয়ানি পাগড়ী পরতে হয়, কোমরে ভাড়া করা একটা তরোয়াল ঝুলিয়ে ঘোড়ায় সওয়ারও হতে হয় কনের বাড়িতে পৌঁছে একটু সময়ের জন্য। ... এইটুকু ছাড়া আমরা আপনার থেকে কোনও অংশে কম বাঙ্গালী নই।'

এসব শুনে বড়খোকাও হাসে। বলে— 'বেশ জম্পেশ কেস তো? বাবা এত কট্টর বাঙ্গালী বিদ্বেষী জেনেও বাঙ্গালী মেয়ের প্রেমে পড়লেন? বিয়ে না হলে মেয়েটার কি হবে? তাছাড়া আপনার বাবা তো মনে হচ্ছে বেশ প্রভাবশালী লোক! ফ্যাক্টরি মালিক বলে কথা! তিনি কি কি করতে পারেন আপনাকে প্রেমের বাঁধন মুক্ত করার জন্য শুনি একটু!'

সায়ন দু'হাত ওপরে তুলে বলে— 'সে উনি অনেক কিছুই করতে পারেন। প্রথমে ধরুন, টাকার লোভ দেখানো। তাতে সাকসেসফুল হবেন না। তারপর থ্রেট করবেন। এতেও পর্ণাকে কাবু করা মুশকিল হবে। এরপর গুণ্ডা লাগিয়ে ওকে হ্যারাস করে গৌহাটিতে ফেরত পাঠাবার চেষ্টাও করতে পারেন। এমনকি আমাকেও যাদবপুর থেকে তুলে নিয়ে দেশের অন্য কোথাও বা বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। মানে হিন্দী সিনেমায় যা যা দেখায় সেসব করতেই পারেন উনি। তবে মা যতক্ষণ আছে এসব হবে না। মা ওঁকে জব্দ করে রাখে।' — হাসে সায়ন।

বড়খোকাও হাসতে থাকে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে— 'কিন্তু মামলা যখন আমার এজলাসে এসে পড়েছে তখন আমি তো বাঙ্গালী মেয়েকে নিয়ে হিন্দী ফিল্মের খেলা খেলতে দেব না ভাই। সে আপনিই হোন কি আপনার বাবাই হোন। এই বিয়েটা যে হতেই হবে।' — অদ্ভুত গভীর দুটো চোখে সায়নের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে বড়খোকা।

এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম সায়নের মনে হয় বড়খোকা সাধারণ কোনও ছেলে নয়। ওর স্ট্রং পারসোনালিটির পেছনে ধারালো তরোয়ালের মতো একটা আদর্শবাদ রয়েছে। ও বলে,— 'যত বাধাই আসুক সময় এলে আমাদের বিয়েটা যাতে হয় সেটা দেখবেন দাদা।'

বড়খোকা সায়নের হাতের ওপরে হাত রেখে বলে— 'নিশ্চয়ই! একটা ভাল মেয়ের জীবন নষ্ট হোক এটা তো অভিপ্রেত নয়। আপনি আপনার বাবার দিকটা খেয়াল রাখবেন। কিছু মন্দ আভাস পেলে আমাকে আগেই সতর্ক করবেন। ভয় নেই, আপনাদের দায়িত্ব নিলাম। আমি। চলুন এবার ওঠা যাক।'

।। তিন।।

অসময়ে কত্তার গাড়ি বাড়ি ফিরে এলো দেখে সুলোচনা ছোট জা-কে রান্নাঘর ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন নিজের বেডরুমে। কিছুদিন ধরে কত্তার বি.পি. বেড়েছে। কারখানায় যেতে বারণ করলে আমল দেয় না কথাটার। সুলোচনার কোনও কথারই আমল অবশ্য দেন না রঘুনাথ প্রতাপ বর্মন। তবু সুলোচনাও ছাড়েন না বলতে। —'কি হলো? শরীর খারাপ হলো নাকি? এই তো খানিক আগেই গেলে কারখানায়?' — কোনও উত্তর নেই ওপর পক্ষের। মুখখানা আষাঢ় মাসের আকাশের মতো।

সুলোচনা বুঝতে পারেন, শরীর নয়, রেগে আছে কত্তা অন্য কোনও কারণে। কি এমন ঘটল যে কথাই বলছে না! এবাড়িতে তিন ভাই, তিন জা, ছেলে-পুলে, শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে বড় পরিবারের বড় বৌমা সুলোচনা শ্বশুর-শাশুড়ির প্রশ্রয়ে বেশ আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বড় বৌ। স্বামী রঘুনাথের সঙ্গে প্রায় ৩০ বছর হতে চলল ঘর করছে। দোষ-গুণ, খুশি-বদমেজাজ সব নখদর্পণে। একান্নবর্তী পরিবারের বড় বৌয়ের দায় যেমন হাসিমুখে সামলায় তেমনি কড়া তেতো মুখ বানিয়ে স্বামীর বদমেজাজের ওপর বরফজল ঢালতেও সমান দক্ষ। ও আবার জিজ্ঞেস করে — 'কি গো! কথা বলছ না যে? শরীর খারাপ নাকি মেজাজ খারাপ, বলবে তো?' (এ বাড়িতে রাজপুতানার ভাষা কেবল মা একটু জানেন, বাকি সকলেই বাংলায় কথা বলে)

— 'কিছু খারাপ না! খারাপ আমার কপাল। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে তোমার আদুরে দুলাল বড় পুত্র, বুঝলে?' — প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়েন রঘুনাথ।

— 'সায়ন? কেন? কি করেছে সানি যে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল? অবশ্য মাথা যে কবে ঠিক ছিল সেটাই তো জানি না। আমি তো বরাবর খারাপ মাথাই দেখলাম।'

— 'খবরদার বলছি! ছেলের হয়ে একটা কথা বলবে তো আজ কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। কি করেছে তোমার ছেলে? কেন, রোজ একঘন্টা ধরে যে ফোনে কথা বল, তখন তোমাকে বলে না সে? উচ্ছন্নে গেছে তোমার ছেলে। বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। সব তোমার প্রশ্রয়ে। তা না হলে এত সাহস ওর আসে কোত্থেকে?'

— 'অ। যখন ভাল রেজাল্ট করে তখন তোমার ছেলে, আর অন্যসময় শুধু আমার ছেলে? বেশ, মানলাম। কিন্তু ও কি করে চুনকালি মাখালো সেটাই বুঝলাম না।'

— 'প্রেম করছে, প্রেম! তাও একটা বাঙ্গালী মেয়ের খপ্পরে পড়েছে। নরেন্দ্র শর্মা অফিসে এসে বলে গেল, ওই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেকিং করতে পাহাড়ে জঙ্গলে যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। বলিহারী যাই, বাঙ্গালী মেয়েগুলোর ছেনালীপনা দেখে। পড়তে এসেছিস ইঞ্জিনিয়ারিং, তো পড় না। কে বারণ করেছে? আমার ছেলেটাকে বঁড়শিতে গেঁথে তুলবি তোর উচ্চশিক্ষার খরচ আদায় করার জন্য? বদ্‌মাশ মেয়ে।'

— 'তা বাঙ্গালী মেয়েটা একতরফা তোমার ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে বুঝি? আর সানি একেবারে বেকসুর, তাই ওকে সঙ্গে না নিয়ে ট্রেকিংয়েও যেতে পারছে না? আচ্ছা, তোমার বুদ্ধি কবে হবে বলতে পারো? আর এক হয়েছে নরেন্দ্র সিং। তোমার কানে কু-কথা বলা ছাড়া আর কিছু করতে দেখলাম না। ছেলের পেছনে স্পাই লাগিয়ে রাখার ছিল তো পড়তে পাঠালে কেন? নজরের সামনে রেখে বি এস সি পাশ করাতে পারতে। তুমি নিজে যখন যাদবপুরে পড়তে তখন বাবা তো তোমার পেছনে টিকটিকি লাগাননি। লাগালে হয়ত জালে অনেক মছলী ধরা পড়ত— কি বল?'

— 'ম্যালা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। যা জানো না তা নিয়ে কথা বলবে না একদম। আমাদের সময় আর এদের সময় কি একরকম? আমাদের সময় মেয়েরা বারো হাত শাড়িতে নিজেকে ঢেকে রাখত। আর এখন এক টুকরো রুমাল নীচে, এক টুকরো ওপরে— বুঝেছ? লাজলজ্জা বলে কিছু আছে মেয়েগুলোর? ছেলেদের সামনে নিজেকে ওইভাবে প্রদর্শন করে রাখলে ছেলেরা প্রোভোকেটেড হবেই। এই কারণেই এখন কথায় কথায় রোজ দশখানা রেপ কেস ঘটছে। প্রোভোকেশন— বুঝলে? জোর করে ভাল ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাওয়ার নির্লজ্জ ব্যবসা। মা-বাপের সায় না থাকলে করতে পারে? পরতে পারে টু-পিস্ ছোট্ট ঢাকনাটুকু? তুমি এ্যালাউ করবে এবাড়ির মেয়েদের ওরকম পোশাক পরা? তোমার ছেলে নির্ঘাৎ ওরকম মেয়ের পাল্লায় পড়েছে।'

সুলোচনা এত শুনে একটু নরম হয়ে বলেন— 'দেখ, এই বয়সে ওরকম প্রেম প্রায় সকলেই করছে আজকাল। তবে সায়ন তো নিম্নরুচির ছেলে নয় গো। তোমারই ছেলে তো? বাছাই সেরা মেয়েই হবে, দেখে নিয়ো। অত ভেবো না তো! আর নরেন্দ্র সিংকে বলে দিও, সানির খবর আমরা সানির মুখ থেকেই শুনব— ওর কাছ থেকে নয়। যত্ত আল্‌ফাল্ রিপোর্ট এনে দেবে! একে হাই বি.পি., তা সেই মানুষটার কানে উত্তেজক রটনা শোনাচ্ছে।'

রঘুনাথ মাথা নেড়ে বলেন— 'রটনা নয়। কথাটা সত্যি। তবে... মেয়েটা নাকি সানির মতই দারুণ ব্রিলিয়ান্ট। সভ্য-ভব্যও বটে। সানির এক বছর জুনিয়র। নরেন্দ্রর ফেউ ওদেরকে দু-দুবার হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখেছে। দেখ, ওই হাত ধরাধরির প্রেম অব্দি সীমাবদ্ধ থাকলে চিন্তার বিষয় নয়। পাশ করে কে কোথায় চলে যাবে, মনেও থাকবে না। কিন্তু তোমার পুত্রটি তো আবার সিরিয়াস চরিত্রের! পরে বিয়েটিয়ে করতে চাইলে আমি কিন্তু মেনে নেব না।'

— 'থাক না ওসব। পরের কথা নাহয় পরে হবে।'— বলে সুলোচনা রান্নাঘরের দিকে এগোয়। কিন্তু মনে একটা কাঁটা খচ্‌খচ্

করে— 'সানি তো আমাকে সব কথা বলে। এটা কেন চেপে গেল?'

¤ ¤ ¤

পর্ণা এখন শান্তিতে চলাফেরা করে সন্তোষপুর-যাদবপুরের পথে। মনের শান্তি ফিরে পেয়ে সম্পূর্ণ ধ্যান পড়াশুনোয় দিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সায়নের আড়ালে কাঁদে। বাবা শুধু বাবা ছিল না, সখা ছিল ওর। ওর যত কথা সব বাবার সঙ্গে। এত বিশ্বাস করত বাবা যে কলকাতায় পড়তে আসা নিয়ে মা যখন প্রবল আপত্তির ঝড় তুলেছিল, তখন বাবা বলেছিল— 'ও আমার মেয়ে রেখা। সুশিক্ষা দিয়ে বড় করেছি। ভয় পেও না, তোমার মেয়ে বাবা-মা'র মুখ উজ্জ্বলই করবে। কালি মাখাবে না।' — সেই বিশ্বাস ও ভেঙ্গে ফেলেছে। কেন যে মিথ্যে কথা বলতে গেল একথা ভেবে মরমে মরে যায় এখন। সত্যি কথা বললে বাবা এত কষ্ট পেতো না— জানে ও। বড়জোর বকাবকি করত, একটু জ্ঞান দিত, কিন্তু ত্যাগ করে দিত না। পর্ণা বাবাকে চেনে। একবার যখন মুখফুটে বলে দিয়েছে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তখন নেই-ই। এই মুহূর্তে এতবড় পৃথিবীতে সায়ন ছাড়া আর আপনজন কেউ নেই ওর। একসঙ্গে থাকার কনসেপ্টটা সায়ন কিন্তু সানন্দে মেনে নেয়নি। দোলাচলে দুলে শুধু ও একা হয়ে যাবে ভেবে রাজি হয়েছে। বাবারও দোষ নেই। মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল বাবা কি করে মেনে নেবে যে তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন একমাত্র মেয়ে লিভ টুগেদার করতে পারে একটা ছেলের সঙ্গে? এখন পর্ণা বোঝে যে বাবা ঠিকই বলেছে, স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ফেলেছে ও। কিন্তু আর যে ফেরবার পথ নেই।

আপন ভাবনায় ডুবে হাঁটছিল ও। পাশ দিয়ে হুশ্ করে মোটরবাইকটা চলে গেল। পিলিয়নে বসা ন্যাংচা মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'দিদি ভাল আছেন?' বড়খোকার বাইক। ও চালকের আসনে। কিছুদিন ধরে পর্ণার ফিলিং হচ্ছে— বড়খোকা যেন ওকে ফলো করে। নাও হতে পারে, হয়ত কোইন্সিডেন্স। ইউনিভার্সিটির ভেতরেও দেখেছে একদিন। রাস্তায় তো অনেকবার দেখেছে ওর পেছনদিকে থেকে বাইকটা সামনে চলে যায়। সামনা-সামনি কাছ থেকে বড়খোকাকে ও কখনও ভাল করে দেখেনি। চোখ তো সানগ্লাসে ঢাকাই থাকে, তবু চায়ের দোকানে বসে থাকলে পর্ণার মনে হয়, ওই ঢাকা চোখজোড়া ঠিক ওকে দেখছে। সায়ন অবশ্য অন্ধভক্ত হয়ে পড়েছে বড়খোকার। কিন্তু পর্ণার খুব ভয় লাগে ওকে। ওর মনে হয়, মস্তানগুলোর দলনেতা এটা। নিশ্চয়ই কোনও রাজনৈতিক দলের পোষা গুণ্ডা। তবে ও আজ এতদিনের মধ্যে কখনোই পর্ণার সঙ্গে কথা বলার কোনও চেষ্টাই করেনি, এটাই রক্ষে।

এদিকে কিছুদিন ধরে বড়খোকা চায়ের দোকানের ঠেকে নিয়মিত আসে না। ওর চামচাগুলো বলাবলি করে— কি হলো রে গুরুর? কোথায় লাপাতা হয়ে যায় জানিস? কেউ জানে না। এক রোববার সকালে হঠাৎ করে ঠেকে হাজির হতেই ঘোঁতন জিজ্ঞেস করে— 'কি ব্যাপার বল তো? এদিকে আসছোই না? এম এল এ খোঁজ করছিল, বলল, কাজ আছে।'

গম্ভীর মুখে বড়খোকা বলল— 'ওর বাপের চাকর নাকি? ওই হারামজাদাটাকে এবার কাঁচি করতে হবে। বড্ড বাড় বেড়েছে শালা। মানুষের যেন ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই।'

ট্যাঁরা পটলা খিক্‌খিক্ করে দেঁতো হেসে বলে উঠল— 'গুরু জব্বর কাদায় পড়েছে রে। এক্কেবারে এঁটেল মাটির দই মাখামাখি হয়ে গেছে। ওই যে দিদি, যার সায়নের সঙ্গে শোয়াশুয়ি, ওর পেছনে ঘুরে ঘুরে বাইকের হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। দাদা পেমে পড়েছে রে।'

টানটান একটা পাঞ্জা ওর মুখের ওপর ছোবল মারে। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়ায়। বড়খোকা বলে— 'আজ এইটুকু। ওদের নিয়ে আর একটা খারাপ কথা বললে মাথাটা মাটিতে পাবি। নিজের হাতে নিজের মাথা তুলবি মাটি থেকে।'

সকলের চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইক নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে যায় বড়খোকা ওরফে সত্রাজিৎ রুদ্র। বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ শুভজিৎ রুদ্রর ছোট ছেলে এবং ক্যান্সার স্পেসালিস্ট ওংকোলজিস্ট অরিজিৎ রুদ্রর ভাই। একসময় দক্ষিণ কলকাতার নামী স্কুলের সেরা ছাত্র, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্সে র‍্যাংক হোল্ডার সত্রাজিৎ রুদ্র। যে পরীক্ষার সবকটা যুদ্ধে মাথা উঁচু করে জয়ী হয়েছে বটে, কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের পথে ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা শত্রুর হাতে পরাজিত হতে বাধ্য হয়ে এখন বড়খোকা নামে পরিচিত। বাড়িতে বাবা-দাদা কথা বলে না। বাবা বলে কুলাঙ্গার। দাদা বলে মান ডোবানো ছেলে। একমাত্র মা ওকে বোঝে, মা'র কাছেই ওর শান্তি।

অসময়ে ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে ভারতী চিন্তিত মুখে ছেলের রুমে এসে দেখেন জুতোটাও খোলেনি। পা খাটের বাইরে ঝুলিয়ে দু'হাত কপালে ভাঁজ করে শুয়ে আছে সন্তু। মাথায় হাত রাখতেই চোখ খুলে তাকালো। — 'কিরে, অমন হুড়মুড় করে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলি আজ? তাই—

— 'তাই ভাবলে কোথাও ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে এসেছি কিনা? বসো না আমার পাশে।'— ভারতী বসতেই মা'র কোলে মাথা রেখে বলে,— 'আমাকে নিয়ে তোমার জ্বালা আমি বুঝি না ভাবো? তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় মা। পেটের ছেলে বলে না ফেলতে পারো, না গিলতে পারো। ছুঁচোর মতো গলায় আটকে আছি। ভয় পেও না, কিছু হয়নি। আর কিছু হবে না মা, বিশ্বাস কর। তখন ছোট ছিলাম, বড় সহজ-সরল ভাল ছেলে ছিলাম, তাই ফাঁদে পা যে ফেলেছি, বুঝতেই তো পারিনি। এখন তো আমি জেলখাটা ঝানু ছেলে। ফাঁদ পাতা আমিও শিখে ফেলেছি। তুমি দেখো, আমার পাতা ফাঁদে ওদের পুরো দলটা একদিন পা ফেলবে।'

— 'তুই ওসব নিয়ে আর ভাবিস না সন্তু। তুই আবার নতুন করে জীবনটাকে শুরু কর। এখান থেকে দূরে কোথাও চলে

যা। ওরা তোকে আর কখনও মিথ্যে মামলায় জড়াতে পারবে না।'

— 'এত বছর পর কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমাকে অ্যাডমিশন দেবে? তার ওপর আমার জেলে কাটানোর রেকর্ডটা যে গলায় মেডেল হয়ে লট্‌কে আছে। এছাড়া দূরে প্রাইভেট কলেজে পড়তে হলে কয়েক লক্ষ টাকা লাগে মা। সে টাকা কে দেবে বল? .. ওরা আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আর কোনওদিন বোধহয় নোংরা নরকটা থেকে সুন্দর জীবনে ফিরতে পারব না।'

ভারতীর চোখে জল এসে যায়। ওমন হীরের টুকরো ছেলেটাকে একটা শয়তান কিভাবে নষ্ট করে দিল! ওর বাবা পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলল যে ছেলে সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। ভারতী জানেন, সন্তু নির্দোষ, ও কোনও অসামাজিক কাজ করতে পারেই না। ছেলের হতাশ চেহারা তিনি আর সহ্য করতে পারেন না। কি করে যে ছেলেটাকে আবার ওর হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা ফিরিয়ে দেবেন ভেবে পান না ভারতী। ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন,— 'আমার নিজের বেশ কিছু টাকা আছে, আর গয়নাও আছে। তুই ওগুলো নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ। না বলিস না বাপি! তোকে যে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।'

মা চলে যাবার পরও শুয়েই থাকে সত্রাজিৎ ওরফে বড়খোকা, ওরফে সন্তু। ফেলে আসা দিন ওর ভাবনার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। কিছুতেই ভুলতে পারে না অজয় সামন্ত আর ওর একেবারে কাঁচা অশিক্ষিত, তোলাবাজ, গুণ্ডা বাপ অভয় সামন্তকে। যে লোকটা এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে গুণ্ডামী, বোমাবাজি, ভোটের সময় বুথ ক্যাপচারিং, রিগিং করত। ওই দলের টিকিটে রিগিং করে জিতে এম এল এ হলো। তারপর থেকে মন্ত্রী হবার বড়ই সাধ অভয় সামন্তর। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাংয়ের মতো অক্ষরে কোনওমতে নাম সই করা অভয়কে মন্ত্রী আর হতে দিতে চায় না দল। অভয়কে দলের খুব দরকার বলেই টিকিট দিয়ে দু'নম্বরী পথে জিতিয়ে আনছে বটে, কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত কোনও মানুষই যে অভয়কে নেতা হিসেবে চায় না এটা দল ভালই জানে। কসবা অঞ্চল এখন আর আগের মতো উদ্বাস্তু অধ্যুষিত নয়। প্রচুর ডেভেলাপমেন্ট হয়ে মডার্ন আরবান এরিয়া হয়ে গেছে। অভয়ের মতো এম এল এ যে ক্ষমতাসীন দলের হাতের একটা অস্ত্র শুধু সে কথা পাবলিক জানে এবং তাকে ঘেন্নাও করে। স্কুল জীবনে সন্তু এতসব বুঝত না। অজয় সামন্ত এবং ওর মতো আরও কিছু ছেলের সঙ্গে বড় বাড়ির ভাল ছেলে সত্রাজিৎ রুদ্রও মাঠে ফুটবল ক্রিকেট খেলত বিকেলে। অভয় সামন্ত নিজের এক এক ক্লাশে দু'বার করে ফেইলটুস ছেলে অজয়ের সঙ্গে বড় ডাক্তারের মেধাবী ছেলে সন্তুর মেলামেশা, খেলাধুলো, বন্ধুত্ব ইত্যাদিতে খুব খুশি হতো। কুটিল অভয় সন্তুকে সবসময় নজরে রাখত, সময়মত বড়শিতে গেঁথে তোলার জন্য। কারণ, নিজের ছেলে স্কুলে যায় বটে, কিন্তু আসলে যে ওর মতোই গোমুখ্যু, গোঁয়ার হয়ে আছে সেকথা তো অজানা নয়। গুণ্ডামী, বোমাবাজি, মারামারি করতে পারবে, কিন্তু বাপকে মন্ত্রী বানানোর জন্য মাথায় যে বিদ্যেটুকু দরকার সে ক্ষমতা ওর নেই। আর মানুষও এমন বদলে গেল আজকাল যে, অশিক্ষিত গুণ্ডা-বদমাশদের মন্ত্রী-ফন্ত্রী বা এম এল এ, এম পি বানাতেই চায় না। পাবলিক এখন পরিচ্ছন্ন রাজনীতি চায়। শালা! রাজনীতি হলো ঘোলা জল! হাজার ছাঁকলেও কি জীবাণুমুক্ত করা যায়? এম এল এ হয়েও কি আমার কোনও ইজ্জত আছে, কি এ্যাসেম্বলীতে, কি পাবলিকের কাছে? আমার সাঙ্গোপাঙ্গো, ছেলে দুটো তো আমার মতই। সন্তুর মতো একটা আকাশের তারাকে যদি যেনতেনপ্রকারেন একবার পাশে পেয়ে যাই, তাহলে ওর বিদ্যে এনক্যাশ করে আমি একদিন দারুণ দারুণ ভাষণ দিতে পারব। ভদ্র সমাজে কি করে চলতে হয় সেসব আদব-কায়দা জানব, মার্জিত ভাষায় কথা বলতে শিখব। শেখার কি আর অন্ত আছে? ওই যে কথায় বলে, কেচ্ দেম ইয়ং— না কি? নিজের ছেলেদের দিয়ে তো হবে না এই বয়সে, আমাকে শিক্ষিত করে তোলা? ওই সন্তুকে চাই। শালা আমি নামেই এম এল এ। এ্যাসেম্বলীতে পেছনের বেঞ্চে মুখ বন্ধ করে বোবা হয়ে থাকি। মুরোদ নেই বাংলায় ভাল ভাষা বলার, তো ইংরেজী বুঝব কি করে? পার্টির একটা লোকও পাত্তা দেয় না। জোনাল সেক্রেটারি, ক্যাডারগুলোও কি নীচু নজরে যে দেখে! আমি যেন ওদের গলার কাঁটা। বাধ্য হয়ে দু-দুবার পার্টি আমাকে জিতিয়েছে গুণ্ডামী করার জন্য। আমার কারণে ওদের একটা সিট আটকে রয়েছে বলে দলের শিক্ষিত তাবড় নেতাদের বুকে যন্ত্রণা কি আমি বুঝি না? অঞ্চলের খাতে আসা টাকার নাগাল পাই না। শালার প্রতিমন্ত্রীটাই সব দেখভাল করে। আমি যেন এঁটো পাতা। সন্তুর ওই ডাক্তার বাপটা আমাকে কম অপমান করেছে? আমি যেন গরু-ছাগল। প্রতিশোধের আগুনে বুক জ্বলছে। শালার ভাল ছেলেটাকে নষ্ট না করে শান্তি নেই যে! তাই সন্তুকে পটাবার জন্য মাধ্যমিক, এইচ এস, জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোবার পর কসবায় রীতিমত বড় অনুষ্ঠান করে মাল্যদান, সোনার জলকরা মেডেল দিয়ে সম্মানিত করে অভয়। আলাদা করে অজয়কে দিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। আদরে, আপ্যায়নে, খাতিরে সন্তুকে একেবারে ঢেকে রেখে দেয়— 'তুমি আমার পাড়ার গৌরব, বাবা। অজয়ের ছোটবেলার বন্ধু! এক সঙ্গে খেলা করেছ ভাবতেও গর্ব হয় আমার। ওটার তো লেখাপড়া হলো না, কিন্তু তোমার হচ্ছে দেখেই আমি খুশি। তুমিও তো ছেলেই আমার, কি বল?' — স্বাভাবিক ভাবেই সবে ফার্স্ট ইয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হওয়া সন্তুর আঠারো-প্লাস মনটা আনন্দে ভরে থাকে এম এল এ-র ভালবাসা পেয়ে। যদিও ওর বাবা কখনোই প্রতিবেশী সামন্তর ছেলেদের সঙ্গে সন্তুর মেলামেশা পছন্দ করতেন না। দু-চারবার সতর্কও করেছেন— 'ওই অজয়-বিজয়দের সঙ্গে মিশিস কি করে তুই? ওগুলো কি তোর মেলামেশা করার যোগ্য? যেমন গুণ্ডা বাপ, তেমনি পাজি দুটো ছেলে আর মেয়েটা। এখন তুই ছোট নোস আর যে ড্যাংগুলি খেলবি। নামা ওগুলোকে।'

অহংকার পছন্দ হতো না সন্তুর। বলত— 'কি যে বল না বাবা! ছোটবেলার খেলার সাথী, এক পাড়ায় থাকি, দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়া যায়? ওরা আমার ক্ষতি করেছে নাকি? উল্টে সামন্তজেঠু আমাকে সংবর্ধনা দিলেন। তখন তো তুমিও কত খুশি হয়েছিলে বাবা!'

— 'সে সবাই খুশি হয়েছিল পাড়াজুড়ে। ওরা কেউ ভাল নয় রে সন্তু। বিশেষ করে অভয় সামন্ত। লোকটা কোনও উদ্দেশ্য না থাকলে কাউকে স্নেহ-মমতা দেখায় না। তোকে একটু বেশি দেখাচ্ছে বলেই ভয়। সাবধানে থাকিস বাবা।' — সন্তু এসবের গুরুত্ব দেয়নি।

বাবার কথার সত্যতা যেদিন বুঝল, সেদিন আর কিছু করার ছিল না। একটা ক্রিমিনাল ব্রেইনের তৈরি করা সম্পূর্ণ নিখুঁত জালে আটকে পড়ল সন্তু। অভয় সামন্ত অসাধারণ প্লট বানিয়ে নিজের মেয়ের প্রেমিককে দুই ছেলে অজয়-বিজয়কে দিয়ে খুন করালো পানিহাটির এক বাগানবাড়িতে পারিবারিক পিকনিকের নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে। সন্তুর প্রতি স্নেহান্ধ সামন্ত রবিবার ছুটির দিনের অজুহাত দেখিয়ে ওকেও টেনে নিয়ে গেল— 'এই তো কাছেই পানিহাটি'তে। আর ওর আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখের সামনে বিজয় সাঁতার না জানা দুলাল মান্নাকে পুকুরের জলের নীচে চেপে ধরে ডুবিয়ে মারলো। পুকুরে তখন অজয়, বিজয়, দুলাল আর সন্তু। অন্যরা সবাই বাগানে ফুর্তিতে ব্যস্ত। এদিকে পুকুরে অজয় সামন্তর সঙ্গে এপার-ওপার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সন্তুও। দুলাল সাঁতার জানে না বলে ঝামাপাথর বাঁধানো প্রাচীন ঘাটটার জলে পা ডুবিয়ে বসেছিল। বিজয়ও ঘাটটার সামনেই জলে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্তু অজয়কে অনেক পেছনে ফেলে ওপারে পৌছে ঘুরে দাঁড়িয়েই মাঝপুকুরে জলের মধ্যে এক প্রচণ্ড হুটোহুটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ও বিজয়ের গাঁট্টাগোট্টা শরীর আর অজয়কে দেখেছিল। ওরা যেন জোর করে জলের নীচে কিছু চেপে রাখার চেষ্টা করছে। এক পলকের জন্য দুলালের মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠতেই ও বুঝে ফেলেছিল যে দু'ভাই মিলে দুলালকে জলের নীচে চেপে ধরেছে। প্রথম রি-এ্যাকশন হলো সাঁতার না জানা দুলালকে জলে নামিয়ে বোধহয় মস্করা করছে মাথামোটা ভাই দুটো। ওরা যে দুলালকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে, একথা ওর মাথায় আসেইনি। তাই ও চিৎকার করে বলেছিল— 'এ্যাই... ওরকম করিস না, মরে যাবে যে।' — নিজে আগে ওপারে পৌঁছে অজয়কে হারাবার চেষ্টায় ও খেয়ালই করেনি অজয় ওর পেছনে পেছনে না এসে ঘাটের দিকে কখন ফিরে গেছে। যতক্ষণে ও অকুস্থলে সাঁতরে এসে দুলালকে রক্ষা করতে গেল, ততক্ষণে দুলালের দম বন্ধ হয়ে গেছে। আর ওকে বিস্মিত করে বিজয়-অজয় মিলে ওকেই চেপে ধরে বলতে লাগল— 'তুই দুলালকে মেরেই ফেললি? তোর এত হিংসে? তুই জানতিস দুলাল সাঁতার জানে না। তুই জানতিস বিনু তোকে ভালবাসে না, দুলালকে ভালবাসে। আর সেজন্য তুই সুযোগ পেয়ে ছেলেটাকে এভাবে মারলি?'— সন্তু হতবাক্।

বাবা নামকরা উকিল লাগিয়েছিল। নিজের সমস্ত ক্ষমতা, প্রভাব খাটিয়েছিল, জলের মতো টাকা খরচ করেছিল। কিচ্ছু করতে পারেনি। অজয়-বিজয়ের সেই সময়ের এ্যালিবাই অসম্ভব টাইট করে বেঁধে রাখা ছিল। ওদের বিরুদ্ধে কোনও এভিডেন্স ছিলই না। পুকুরের ঘাটটায় দাঁড়ানো একটা ফোটো ছিল সন্তু আর দুলালের। সে ছবিতে অজয়-বিজয় নেই। সমস্ত প্রমাণই সত্রাজিৎ রুদ্রকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করার স্বপক্ষে ছিল। শেষ পেরেকটা মেরেছিল বিজয়দের বোন বিনু আর দুলালের বাবা-মা। ওরা অবশ্য অভয় সামন্তর ভয়ে এবং টাকার বিনিময়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিল সন্তুর বিরুদ্ধে। আর বিনু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেঁদেকেটে বলেছিল— সন্তুদা একতরফা ওকে ভালবাসত। কয়েকবার ওকে দুলালের সঙ্গে মেলামেশা না করার জন্য শাসিয়েছে। বলেছে, ও যদি বিনুকে না পায় তবে দুলালকেও পেতে দেবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি ন্যক্কারজনক নাটক সত্রাজিৎ ঘটতে দেখেছে ওর ঘৃণা মিশ্রিত চোখে। বিনুর সঙ্গে ও কোনওদিন কথাই বলেনি জীবনে। থ্যাবড়া নাক, বিশ্রী বিনুর প্রেমে পড়া তো কল্পনারও অতীত। কিন্তু ষড়যন্ত্র আটঘাট বেঁধে করতে পারলে মিথ্যেকে সত্য বানানো যায়, এটা বুঝতে পেরেছিল সাতবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার সময়। অভয় সামন্তর ভালবেসে দেওয়া 'বড়খোকা' নামটাও খুনি আসামীর পরিচয়ের সঙ্গে আঠার মতো জুড়ে গিয়েছিল ওর জীবনের সঙ্গে। আর খবরের কাগজের বর্ণনাবহুল প্রচারে ওর স্কুল, ওর পরিবার, ওর শিক্ষকরা অধোবদন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন বিশ্বাসঘাতক, কীর্তিমান, কু-ছাত্র, কু-সন্তানটির অপকর্মে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষে শিক্ষার আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সংঘাতে ধ্বংস হয়ে বিলীন হলো অসৎ মানুষের কুচক্রের চোরাবালির নীচে।

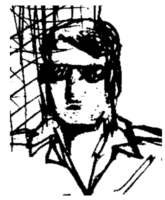

।। চার।।

— 'মা, তুমি আমাকে সত্যিই বিশ্বাস কর তো?'

সুলোচনা ছেলের হঠাৎ করা উদ্ভট প্রশ্নে সন্দিগ্ধ হয়ে সাবধানে পাল্টা প্রশ্ন করে— 'হঠাৎ এমন কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? কিছু কি হয়েছে তোকে অবিশ্বাস করার মতো?'

পুজোর ছুটিতে ১০ দিনের জন্য দুর্গাপুরে এসেছে সায়ন। পর্ণার বাড়ি যাওয়ার পথ বন্ধ। ওকে ফ্ল্যাটে একা রেখে এসে মনে শান্তি নেই সায়নের। বড়খোকা যদিও ভরসা দিয়ে বলেছে — 'গট্ গট্ করে নিশ্চিন্তে চলে যাও। একতলার সিঁড়ির নীচে ট্যাঁরারা রোজ পালা করে শুয়ে গোটা বিল্ডিং পাহারা দেবে। ওর কোনও ভয় নেই বলে দিও।'— তবুও চিন্তা হয়। মাকে লুকোনো ঠিক হবে

না আর। এতদিন লুকিয়ে রেখেছে কেন একথা মা জিজ্ঞেস করবেই। দুঃখও পাবে। কারণ, মা জানে সানি কখনও ওর মা'র কাছে কিছু লুকোয় না।

— 'একটা কিছু তো হয়ে গেছে মা, যা তোমাকে ফোনে বলার চেষ্টা করেও বলতে মুখে কথা আটকে গেছে। তোমাদের কাছে আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। ... খুব খারাপ কাজ। বলতে ভয় পাচ্ছি...

— 'ভয় পাচ্ছিস কেন? চুরি-ডাকাতি-খুন করেছিস নাকি? ওসব তোর দ্বারা হবে না। ... তবে? ও বুঝেছি। নিশ্চয় অ-রাজপুত কোনও মেয়ের প্রেমে পড়েছিস। বাবা জানলে রক্ষে থাকবে না ভেবে ভয় পাচ্ছিস। কি? তাই তো?

মায়ের কথা বলার ধরনে ভরসার গন্ধ পেয়ে সায়নের দমবন্ধ আড়ষ্টতা কেটে যায়। কিছুটা। কিন্তু একসঙ্গে থাকার খবর শুনলে যে কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা ভেবে বুক কেঁপে ওঠে। অ-রাজপুত বলে মা'র যে কোনও আপত্তি কখনোই থাকবে না সেটা সায়ন জানে। কিন্তু ওই লিভ-টুগেদার ব্যাপারটা মানবে না। মা'র চিরকালের সংস্কারে দারুণ আঘাত লাগবে। মা এলেবেলে নয়। ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রী ছিল। যা-তা বলে মাকে বোঝানো যাবে না।

— 'কি রে? বললি না কি করেছিস?... দ্যাখ্, যাই করে থাকিস, সেটা যত খারাপ কাজই হোক, মা'র কাছে কনফেস্ করলে শান্তি পাবি। অন্যায় করলে শাসন করব, বকুনি দেব। অন্যায়ের পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করব— তাই তো আমি মা! বলে ফেল সানি।'

সায়নের কনফেশন শুনতে শুনতে সুলোচনার মুখ রক্তশূন্য হতে থাকে। এ কি করেছে ওর ছেলে? এসব কাণ্ড তো ওদের কলেজ জীবনে কারও ক্ষেত্রে ঘটতে শোনেনি কখনও! আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোথায় নেমে যাচ্ছে ওপরে ওঠার নাম করে। এত সাহস কোথা থেকে আসছে ওদের মনে? এ যে অত্যন্ত নির্লজ্জ বেহায়াপনা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ছেলেকে সুশিক্ষা দিতে পারার বড্ড অহংকার ছিল তার। এখন রঘুনাথের সামনে, পরিবারের অন্য সকলের সামনে কি করে মুখ দেখাবে সানির মা? সুলোচনা পর্ণা নামের মেয়েটাকে কি শ্রদ্ধা সহকারে বড়ছেলের বৌ বলে গ্রহণ করতে পারবে? বিবাহের পবিত্র বন্ধন বলে ওরা চিরকাল যা জেনে এসেছে, সেগুলোর কোনও মূল্য নেই এদের কাছে? পুরনো যা কিছু সবই খারাপ ওদের নজরে? সায়ন তো তবুও পুরুষ। আজও পুরুষের চরিত্র হরণ হয় না চট করে, কিন্তু পর্ণা? পর্ণা কোন আক্কেলে এটুকু বয়সে আর একটা সামান্য বড়

ছেলের সঙ্গে বাস করতে পারছে এক কামরায়? ওর বাবা ওকে ত্যাগ করে কি অন্যায় করেছেন? কত ব্যথা দিলে বাপ তার আদরের একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করতে পারে? সুলোচনার যে হাত ওদের মাথায় আশীর্বাদ হয়ে থাকত, সে হাত কি আর ও ওঠাতে পারবে এই ব্যভিচারী ছেলে আর ওই মেয়ের মাথায়? সানিকে কি শাসন করবে ও? শাসনের বেড়া তো সানি নিজেই ভেঙে ছাড়া গরুর মতো খোঁটা উপড়ে চলে গেছে। মাথায় ভেঙে পড়া আকাশ নিয়ে সুলোচনা কেঁদে ফেলে বলে,— 'কি সর্বনাশ করলি সানি! গুরুজনের আশীর্বাদের বদলে তোরা যে অভিশাপ কুড়িয়ে নিলি রে! আমার আর তোকে বলার কোনও কথা নেই। তবে একটা শেষ উপদেশ দেব। তোরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে নিয়ে ব্যভিচারী বদনাম থেকে মুক্ত হ'।' — সানিকে একা বসিয়ে রেখে পরম দুঃখে উঠে চলে যায় ও।

নরেন্দ্র সিংয়ের কাছ থেকে রঘুনাথ আর কোনও খবর পাননি। সুলোচনাও ছেলের কেলেঙ্কারি ফাঁস না করে অন্যভাবে বুঝিয়েছেন যে, সায়ন ওই বাঙ্গালী মেয়েকেই বিয়ে করবে। রঘুনাথ ফতোয়া জারি করেছেন, কস্মিন কালেও সে সাধ পূর্ণ হবে না। বর্তমান সময়ে নব্বই শতাংশ বাঙ্গালী মেয়ে স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবে আছে। ঘর-সংসার করতে চায় না ওরা, শুধু ফুর্তি করতে চায়। ফুর্তি কমে গেলে ডিভোর্সের মামলা করে। ডিভোর্স পেলেই আবার একটা বিয়ে করে— এভাবেই বাঙ্গালী সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অপসংস্কৃতির অবক্ষয়ে। তাঁর ঘরের বৌ হয়ে বাঙ্গালী মেয়ে আসবে না, এটা যেন সুলোচনা পরিষ্কার জানিয়ে দেয় ছেলেকে। মনে মনে ভেঙে পড়া সুলোচনার তো কোমর ভেঙে দিয়েছে সানি। আগের তেজ এখন নিভে গেছে। মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক ভঙ্গি করে বলে— জানিয়ে দেবে। ও এখন আর আদরের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। কারণ, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, ভারতীয় সমাজে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে নরনারীর মিলনের জন্য শাস্ত্রীয় যে ধাপগুলো পার হয়ে সুহাগ রাতের ফুলে সাজানো শয্যায় গুরুজনকে প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির প্রয়োজনে শুদ্ধাচারে সর্বসম্মতিক্রমে প্রবেশ করার প্রথা ভেঙে এই দুটো ছেলেমেয়ে পাপ পথে যৌবনের শারীরিক প্রয়োজন মেটাচ্ছে। সুলোচনাকে যদি একবার জানাতো, তাহলে ও তক্ষুনি ওদের বলত— তোরা কোনও হিন্দু মন্দিরে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে পুরোহিতের এবং দেবতার সামনে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে আগে বিয়ে করে, তারপর একসঙ্গে যেখানে খুশি যা। দয়া করে কোনও অনাচার করে সর্বনাশ করিস না। এদিকে আবার মহালয়া থেকে পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষে নবরাত্রির একটানা উপবাস ব্রত, রাত্রে সামান্য ফল-দুধ খাওয়া শরীর দুর্বল, মনে অকথ্য যন্ত্রণা, সব মিলিয়ে সুলোচনা ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ওদিকে সায়নেরও ভাল লাগছে না। ছুটিতে বাড়ি এলে এতকাল মায়ের সোহাগ যেভাবে পেত, এবার সেসব নেই। নবমীর রাত্রেই সকলের নিষেধ অমান্য করে বুকভরা অভিমান নিয়ে ফিরে এলো কলকাতায়। এসেই ঘোষণা করল— 'আমরা বিয়ে করছি।'

অবাক পর্ণা বলে ওঠে— 'মানে? চাকরি-বাকরি নেই, এখনও পাশ করে বের হলাম না দু'জনের একজনও। ওমনি বিয়ে? তোমার মাথা খারাপ নাকি?'

— 'মাথা খারাপ হয়েছিল, বাড়ির পরিবেশে ক'দিন থেকে মাথাটা সুস্থ করে এলাম। চাকরিহীন ছাত্রাবস্থায় যদি একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘরকন্না করতে পারি, তাহলে বিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে তা না করতে পারার কোনও কারণ তো নেই! বরং ভয়ে ভয়ে বাঁচার হাত থেকে বাঁচা যাবে।'

— 'এতে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না? বিয়ে মানে তো সংসার। আমরা কি সংসার করছি? কোনও রকমে সেদ্ধভাত খেয়ে, মাটির বিছানায় শুয়ে দিন কাটাচ্ছি, কবে পাশ করে বের হব সেই আশায়। এখন বিয়ে....'

রেগে যায় সায়ন। দাঁতে দাঁত চেপে বলে— 'মাটির বিছানা একটাই। তাতে আমরা দু'জনই একসঙ্গে শুচ্ছি বিয়ে না করে। বিয়েটা করে একসঙ্গে শুলে আমি অন্তত নিজের মা'র কাছে গিয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারব। এবার সেটা পারিনি। ওসব কথা থাক। বিয়ে হবেই ক'দিনের মধ্যে এটা জেনে নাও। রাজি না থাকলে এখনই বলে দাও। চলে যাব। যাবার আগে জেনে যাব যে তুমি ভালবাসোনি, শুধু সঙ্গ চেয়েছিলে, তাই বিয়ে করতে ভয় পেলে।'

কিন্তু কথা কাটাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি, মানাভিমান হলো ক'দিন ধরে, তারপর দু'জনের সম্মতিতেই বড়খোকা অ্যান্ড পার্টি বরপক্ষ-কন্যাপক্ষ হয়ে শুভ দিনে পুরুত ডেকে ওই ফ্ল্যাটেই শালগ্রাম শিলা এবং অগ্নিসাক্ষী করে নিরাড়ম্বর বিয়ে হলো ওদের। একমাত্র নিমন্ত্রিত অতিথি মিঃ ঝুনঝুনওয়ালাকেই শেষমেষ কন্যাদান করতে বসতে হলো। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারও হাজির ছিলেন অবশ্যই।

¤ ¤ ¤

সন্তুকে কোনমতেই ন্যায়-বিচার দেওয়াতে না পারা এবং মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আর সিভিল সোসাইটিতে মাথাকাটা যাওয়া অসম্মানের বোঝা ডাক্তার শুভজিৎ রুদ্রর কাছে বড় বেশী ভারী হয়ে গিয়েছিল। জেলে পচতে থাকা ছোটছেলের জন্য বুক টনটন করে উঠলেই ব্যথা চাপা দেবার টনিক হিসেবে তিনি নিজেকে বোঝাতেন— আমি ওকে বারবার সাবধান করেছি। ও শোনেনি। তাঁতি মরে নিজের দোষে। ও নিজের দোষের ফল ভোগ করছে, সঙ্গে আমাদেরও ভোগাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টও লোয়ার কোর্ট আর হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা দিয়ে দিল। তবুও ওর স্কুলের শিক্ষকরা ও আরও অনেকে সত্রাজিৎ রুদ্রর মেধা এবং চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়ে বারবার আবেদন জানানোর ফলে সন্তুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হয়ে সাত বছরের হয়েছিল। প্রথমে

ভেঙে পড়া সন্তু ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে জেলের মধ্যেই অবসর সময়ে পড়াশুনায় বুঁদ হয়ে থাকত। ছাত্রের প্রতিভার মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন শিক্ষক এস কে অধিকারী। বইপত্র দিয়ে, জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছ থেকে মাসে একবার ভিজিটিং আওয়ার্সের চেয়ে কিছু বেশি সময় থাকার অনুমতি আদায় করে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আসতেন নিরপরাধ প্রিয় ছাত্রের সান্নিধ্যে। এঁদের মতো শিক্ষকরা অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা স্বরূপ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের লিস্টে স্থান পান না। সন্তুর দুর্ভাগ্য, ও ছাড়া পাবার বছর দুই আগে অধ্যাপক অধিকারী ক্যানসারে মারা যান। — ব্যস্ত ডাক্তার শুভজিৎ রুদ্রর মন থেকে এসব কোনও স্মৃতিই মিটে যায় না। প্রয়াত অধ্যাপকের প্রতি নীরব শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আছেন তাঁরা। অধিকারী ছেলেটাকে কম্পিউটার সায়েন্সের থিওরিটিক্যাল বিদ্যায় মাস্টার্স ডিগ্রির উপযুক্ত করে রেখে চলে গেলেন। কিন্তু লাভ তো হলো না। জেলের ভেতরেও অভয় সামন্তর লোক ছিল। কয়েদি থেকে ওয়ার্ডম্যান— বেশ ক'জন। ওরা সন্তুকে নজরবন্দী রাখত। ভয় দেখাত মেরে ফেলার। অভয় সামন্তর লেখালেখি বিষয়ক সমস্ত কাজ ওদের মনের মতো করে না করে দিলে মারধরও করেছে, খাবারও খেতে দেয়নি। অভয়, বিজয়, অজয় কয়েকবার দেখা করতে এসে শাসিয়ে গেছে— 'তুই এখন আমাদের হাতের পুতুল রে সন্তু। ছাড়া পেয়ে আবার ভদ্রলোক বনে যাবি একথা মনেও আনিস না। বাবার তোকে, তোর মাথাটাকে বড় দরকার। কেন কি জানি বাবার কাছে তুই শালা আফিমের নেশা হয়ে আছিস। আমরা তো বলি— সন্তু ছাড়া কি তোমার লেখাপড়ার কাজ করে দেবার অন্য কেউ নেই, না জুটবে না? কি বলে জানিস? বাবা বলে— তোরা গবেট, তাই বুঝবি না। চ্যালেঞ্জটা শুধু সন্তুর জন্য ছিল না রে! ওর ডাক্তার বাপটার জন্যও ছিল। শালার বড্ড গুমোর ছিল। এক পাড়ায় থাকি, দেখা হলে যেন চেনেই না ভান করত। দু'বার ওর চেম্বারে পার্টির লোককে চিকিচ্ছের জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। শালা দু'বারই নম্বর না আসা অব্দি ঘন্টাভর বাইরে বসিয়ে রেখেছে। খবর পাঠিয়েছি এম এল এ সামন্ত এসেছে। তবু এক পয়সার পাত্তা দেয়নি। বলে পাঠিয়েছে— এম এল এ হোক কি মন্ত্রী হোক, যারা আগে এসেছে তাদেরই আগে দেখব। পার্টির লোকেদের সামনে আমার অপমান করবি, দু'পাতা পড়েছিস বলে! ... নে। এবার দ্যাখ্। এক ঢিলে বাপ-বেটা পুরো পরিবার কাৎ। বাবা আর একটা কথাও বলে রে সন্তু! বলে— কোনও ভাল জিনিস নিজের না হয়ে অন্যের হলে বুকে বড় কষ্ট হয় আমার। যতক্ষণ না অন্যের ভাল জিনিসটা নষ্ট করে দিতে পারি, ততক্ষণ বুকের ব্যথা কমে না। সন্তুটা তোদের সঙ্গেই বড় হলো, অথচ দ্যাখ্ ভাল ছেলে ভাল ছাত্র বলে খবরের কাগজে ছবি বেরোয়। আর তোরা, যাক্ গে। তাই সন্তুটাকে দিলুম ফাঁসিয়ে। সঙ্গে ওর বাপটাও।' — হে হে করে হাসত বিজয়-অজয়।

জেলে দেখা করতে এসে ভারতী-শুভজিৎ সব শুনতেন, কিন্তু কিছু করতে পারতেন না। তাঁরা অভয় নন। অভয়ের সঙ্গে পাল্লা নেবার মানসিকতা ভগবান তাঁদের দেননি। ৬/৭ মাস আগে সন্তু রিলিজ হবার পর থেকে ওর চারপাশে মাকড়সার জালের মতো মস্তান লাগিয়ে রেখেছে অভয়। যখন তখন ৪/৫ জন এসে ডেকে নিয়ে যায়, আর ভারতীর বুক কাঁপে। সন্তুকে পাবার জন্য চায়ের দোকানের ঠেকটাও অভয়ের ঠিক করে রাখা। এত প্রতিকূলতার মধ্যে একটাই ভরসা যে চায়ের দোকানে বসা ৬/৭টা ছেলে সন্তুর অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওরা এখন আর সামন্ত, অজয়-বিজয়ের হুকুমকে পাত্তা দেয় না, বরং বড়খোকাদার হয়ে মিথ্যে কথাও বলে সামন্তর কাছে। বলতে গেলে ওরা সন্তুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে এখন বড়খোকারই চামচা হয়ে গেছে।

শুভজিৎ রেগে গিয়ে ছেলেকে কখনও কখনও কুলাঙ্গার বলে ফেললেও ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খায়। আজ যখন ভারতী কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, — 'সন্তুকে কি আমরা আমাদের চোখের সামনে এভাবে মরে বেঁচে থাকতে দেখব?'

— 'কি করব? যখন আমার অবাধ্য হয়ে সামন্ত জেঠুকে বেশি আপন মনে হয়েছিল, তখন ও একেবারে বাচ্চা ছিল না ভারতী। নিজের নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করছে ও। কি করতে পারি এখন তুমিই বল না?'

— 'ওকে কি দূরে কোথাও পাঠিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো যায় না? কাগজে তো রোজ কত কত নতুন ইউনিভার্সিটি, নতুন নতুন কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কতশত অ্যাভিনিউয়ের খবর থাকে দেখি। মোটা টাকা ক্যাপিটেশন ফিজ দিতে হয় সেটাও জানি। দেখো না, একবার। টাকাপয়সা তো ছেলেদের জন্যই করে রাখা। এখান থেকে অনেক দূরে না পাঠালে সামন্তর জাল কেটে ও বেরোতে পারবে না গো।'

— 'আমি সেসব খবর নিইনি ভেবেছ? বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওর বয়স আর ... আর খুনের ব্যাপারটা। প্রফেসার অধিকারী বেঁচে থাকলে হয়ত কিছু হতে পারত।... দেখি, আবার চেষ্টা করে। .. বিদেশে যে পাঠিয়ে দেব, সেটাও মুশকিল। পাসপোর্ট পেতে হলে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে, ওখানেই আটকে যাবে। ভারতী, সামন্ত আমাদের সবরকম ভাবে মেরে রেখেছে। তোমার ওই গর্দভ কুলাঙ্গারটার বোকামির জন্য। যতক্ষণ না পাস্ট রেকর্ডটাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ও নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে, ততক্ষণ পাসপোর্ট পাবে না। তবে ওকে বাইরে আমি পাঠাবোই।'

¤ ¤ ¤

চন্দ্র-সূর্যের ঘুমিয়ে পড়া জেগে ওঠার মাঝখান দিয়ে সময় গড়িয়েছে। সায়ন-পর্ণা দু'জনেই ভাল ভাল কোম্পানিতে মোটা প্যাকেজে চাকরি করছে। এক কামরার ওই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে এখন বি. এইচ. কে. ফ্ল্যাটে হাত-পা ছড়িয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে থাকে। এটাও ঝুনঝুনওয়ালার ফ্ল্যাট। ওরা কিনতে চেয়েছিল ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে, ঝুনঝুনওয়ালাই বাধা দিয়ে বলেছেন— 'কেনার কি দরকার? ক'দিন পরই এই কোম্পানি ছেড়ে আরও বেশি মাইনেতে অন্য কোথাও চলে যাবে হয়ত। তার চেয়ে আমি বলি ভাড়া নিয়েই থাকো।' — ওরা ওঁর উপদেশ মেনে নিয়েছে। সায়ন গাড়িও কিনেছে। অনেক কিছু ছেড়ে দেবার বিনিময়ে ওরা দু'জনে দু'জনের মধ্যেকার পূর্ণতা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। বাঙ্গালী মেয়েটাকে সানি বিয়ে করে ফেলেছে শোনার পর রঘুনাথ প্রতাপ সিং বর্মন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছিলেন। এ বিয়ে মানেন না বলে ঘোষণা করে পর্ণাকে ভয় দেখিয়েছেন। কয়েক লাখ টাকার টোপ ফেলেছেন। পর্ণা টোপও গেলেনি, ভয়ও পায়নি। কারণ, বড়খোকা আর ওর দল সমানে সায়ন-পর্ণাকে আগলে রেখেছিল। অনেক পরে পর্ণাও বুঝেছিল বড়খোকা কেন বাইক নিয়ে ওকে ফলো করে। কেন ঘাটেঘাটে বড়খোকার চামচারা এগিয়ে এসে কথা বলে— 'দিদি আজ এত দেরি হলো ফিরতে? সায়নদা অনেকক্ষণ এসে গেছে।' — কতকিছুই বদলে গেল জীবনে। ওদের যখন বিয়ে হলো সায়নের তখনও প্রায় দেড় বছর বাকি ফাইনাল পরীক্ষার। পর্ণার আড়াই বছর। পর্ণার বাবা যেমন মেয়ের নামে যাদবপুর স্টেট ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে একসঙ্গে অনেক টাকা রেখে দিয়েছিলেন, সায়নের বাবা সেরকম করেনি। তিনি সায়নের অ্যাকাউন্টে ক্ষেপে ক্ষেপে টাকা ফেলতেন ২/৩ মাস বাদে বাদে। তাঁর কানে ওদের বিয়ের খবর পৌঁছেছিল দুর্গাপুরে। ফোনে সিং মশাই সিংহগর্জন করে ছেলেকে বলেছিলেন— 'এ বিয়ে আমি মানি না। জীবনে কোনওদিন ওই বেহায়া বেলজ্জা উচ্ছৃঙ্খল মেয়েকে আমার পুত্রবধূ বলে স্বীকার করব না আমি। এ বাড়ির দেহলীজ (চৌকাঠ) পার হবার চেষ্টাও যেন ও না করে। তুমি আমার ছেলে, তোমাকে ফেলে দেব না আমি, যদি তুমি ওই নির্লজ্জ সংস্কারহীন খারাপ মেয়েটাকে ত্যাগ করে আসতে পারো। আর তা যদি না পারো, তাহলে তুমি তোমার ব্যবস্থা নিজেই করো। তোমার পেছনে আর একটি পয়সা খরচ করব না আমি।'

উনি এত চিৎকার করে বলছিলেন যে পাশে বসা পর্ণা সব পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিল। সায়ন মুষড়ে পড়ে বলেছিল— 'আমার অ্যাকাউন্টে মাত্র হাজার তিনেক টাকা পড়ে আছে। এবার কি হবে? আগামী দেড় বছর কি করে চলবে পর্ণা?'

পর্ণা ওর পিঠে মাথা রেখে বলেছিল— 'আমার তো প্রয়োজনের বেশি টাকা আছে ব্যাঙ্কে। একটু টেনেটুনে চললে হয়ে যাবে। তুমি এত ভেবো না তো! বাবা আমার নামে পাঁচ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছিলেন। সেই টাকার মান্থলী ইন্টারেস্ট যা হয় সবটা আমাকে প্রত্যেক মাসে তুলতে হয় না। কিছু টাকা বাঁচে। সেটা আমি সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে দিই। এখন থেকে আর ফেলব না, সবটাই তুলে নেব। .... অবশ্য তাতে খাওয়া খরচ, হাত খরচটুকু হয়ে যাবে দু'জনের কিন্তু বাড়ি ভাড়া...'

— 'সে হয় না পর্ণা। তোমার টাকায় আমি পড়ব? ছিঃ!' — প্রতিবাদ করে সায়ন।

পর্ণা রেগে যায়। বলে— 'কেন? ছিঃ, কেন? আমরা দু'জন ভাবি তো যে, আমরা একে অন্যের অর্ধেক সত্তা! তাহলে টাকার বেলায় তোমার আমার বলে নাক সিঁটকে ছিঃ বলার অর্থ কি? বাড়ি ভাড়াটা জোগাড় করার জন্য আমি নাহয় দুটো/তিনটে টিউশন ধরে নেব। হস্টেলে দেখতাম অনেক মেয়ে বিকেলে টিউশন করত।'

সায়ন মুখ ভেংচে বলে,— 'দু/তিনটে টিউশন ধরে নেব। তাহলে পড়বেটা কখন? ওসব হবে না। আমি নিজেই সকাল-বিকাল গোটা চারেক টিউশন করব। যতদিন টিউশনের টাকা পাচ্ছি না ততদিন নাহয় তুমি টেনেটুনে একটু চালিয়ে নিও।'

পর্ণা সায়নের পিঠে গুম্ করে একটা কিল মেরে বলে— 'না, তা হবে না। আমারই জন্য তোমার আজ এই দশা। আমি জোর করে তোমাকে এই বিশৃঙ্খল জীবনে টেনে এনেছি। তাই বর্তমান পরিস্থিতির সব দায় আমার। তুমিও পড়বে আমিও পড়ব। হার মানব না কিছুতেই। ভাল রেজাল্ট করে, ভাল চাকরি করে প্রমাণ করে দেব যে, ওঁরা যতই আমাকে বেহায়া, নির্লজ্জ, সংস্কারহীন বলুন, আমি সত্যিই খারাপ মেয়ে নই। আমার বাবা, তোমার বাবা আমাদের ত্যাগ করে দিলেও আমরা দু'জন শত প্রতিকূলতার মধ্যেও লড়াই করে টিকে থাকব একসঙ্গে। দেড় বছর পর দেখো ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টেই তুমি ভাল জব পেয়ে যাবে। তখন টিউশন ছেড়ে দিয়ে আরামে থাকব আর শুধু পড়ব। এখনও পড়ব, তবে অতটা পড়ার সময় পাব না। তা হোক্, সে আমি পুষিয়ে নেব। ভেবো না তুমি।'

দু'জনে আবার কে টিউশন করবে এই নিয়ে তর্কাতর্কিতে পৌঁছে গেল। পর্ণা খাবে না বলে কিচেনের দিক মাড়ালো না। শুয়ে রইল। সায়ন নোটবুকে খরচের হিসেব করতে বসল, ডিম-আলুসেদ্ধ ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসে। খরচপাতি পর্ণাই করে, ও কোনওদিন এসব নিয়ে ভাবেনি। কিন্তু আজ ভাবতে হচ্ছে বলে বসেছে কোথায় কি খরচ হয়, কোন কোনটা কারটেল করা যায়— হিসেব করছে রাত দশটায়। ফোনটা রিং হলো তখনই। বড়খোকা— 'হ্যাঁ, বল। এত রাতে ফোন করলে যে?'

ওদিক থেকে উত্তর এল— 'ঠিকঠাক আছো কিনা জানার জন্য। আজ দুপুরে নাকি বাইরের দুটো ছেলে ভোলাদার চায়ের দোকানে তোমার বাসস্থান খুঁজছিল। ভোলাদা বলেছে, ওরকম কেউ এপাড়ায় থাকে না। অন্য পাড়ায় দেখুন। ভোলাদা বলল, ছেলে দুটো সম্ভবত বিহারী। তোমার বাবা কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

সায়নের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় পর্ণার চিন্তায়। বাবা ওর কোনও ক্ষতি করবে না জানে। কিন্তু পর্ণা! বড়খোকাও নাগপুরে চলে যাবে আর কিছুদিনের মধ্যে। ওর জীবন ইতিহাস এতদিন পর জানতে পেরেছে সায়নরা। ও যে শেষপর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যেতে পারছে নাগপুরে, ওরা তাতে খুব খুশি। যদিও ওর চলে যাওয়ার কথাটা গোপন রাখতে বলেছে বড়খোকা। আজ এই মুহূর্তে সায়নের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়— 'তুমি চলে গেলে কি হবে আমাদের? পর্ণার জন্য চিন্তা হচ্ছে।'

— 'কিছু হবে না। ইলিয়াসকে পর্ণার রক্ষার ভার দেওয়া আছে। ছেলেদের মধ্যে দু'জন করে সবসময় পর্ণার কাছাকাছি থাকবে সশস্ত্র হয়ে। বাকি হকি স্টিক, ক্রিকেট ব্যাটে কাজ না হলে ওরা চাকু-বোমা মারতেও ওস্তাদ। ভয় পেও না। এই মুহূর্তে তোমাদের ফ্ল্যাটের বেসমেন্টে বিম্‌লে আর ঘোঁতন আছে। তুমি যেন বের হয়ে নীচে এসো না বুঝলে?'

সায়ন নোটবই কলম রেখে দেয়। পর্ণা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে লাল বিন্দি টিপ, অলঙ্কার বলতে দুটো হাতে শুধু শাঁখা-পলা। কি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মাটিতে পাতা বিছানায়। এত ভাল মেয়েটাকে বাবা তাড়াতে চায় ওর জীবন থেকে। এ আশা বাবার পূর্ণ হবে না কখনও। — আবার ফোনটা বেজে ওঠে। একি! মা'র ফোন এত রাতে?

— 'হ্যাঁ, মা বল।'

— 'সানি আজ গজেনকে দিয়ে তোর কলকাতার অ্যাকাউন্টে ত্রিশ হাজার টাকা ফেলিয়েছি। টাকার চিন্তায় পড়ার ক্ষতি করিস না। টাকা ঠিক সময়েই অ্যাকাউন্টে পড়বে। ভাল থাকিস।'

— 'হ্যালো... হ্যালো মা ...'। লাইন কেটে দিয়েছে মা। সায়নের গলার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে যায় কান্না।

।। পাঁচ ।।

চার বছর পর

সাধনা সার্থক হয়েছে ওদের। শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দু'জনেই স্বাবলম্বী এখন। পর্ণার রেজাল্টও বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং করার ডাক ও নেয়নি। কারণ শিক্ষকতা করার ইচ্ছে নেই ওর। সায়নের মতোই বিখ্যাত সব কন্সট্রাকশন ফার্মগুলো টানাটানি করছে ওকে নিয়ে। সায়নের কোম্পানি গ্যামনস্‌ও। পর্ণা সিমপ্লেক্সকে বেছে নিল প্রথম কর্মস্থল হিসাবে। দু'জনে দুই আলাদা কোম্পানিতে। অফিস থেকে কে কখন ফেরে কোনও ঠিক নেই। তিন বেডরুম, বড় হলঘর শুদ্ধু এই ফ্ল্যাটটাকে দারুণ সাজিয়েছে পর্ণা। কিন্তু এই সজ্জা, ওদের দু'জনের জীবনের সুখশান্তি দেখে আহ্লাদিত হবার মতো কেউ নেই। কেমন যেন ফাঁকা লাগে সব কিছু। দুর্গাপুর-দিসপুর নিজের প্রতিজ্ঞায় এখনও অটল। ওরা দু'জনও অভিমান সরিয়ে বাবা-মা'র কাছে যেতে অপারগ। অফিসের কলিগরা বন্ধু নয়, বন্ধুর মতো। ওদের জীবনের একমাত্র বন্ধু ওদিকে নাগপুর থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুর্ধর্ষ রেজাল্ট করে মাস্টার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং করছে শিক্ষকতা করবে বলে। তার চরিত্র হনন যারা করেছিল, সে

তাদের হারিয়ে দিয়ে প্রতিভার সাক্ষী রেখে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অভয় সামন্তর মতো ছুঁচো সত্রাজিৎ রুদ্রর নাগাল আর পাবে না কোনও দিন। ফোনে সন্তুর সঙ্গে প্রায়ই কথা হয়। ই-মেল-এ চলে আড্ডা। অভয় সামন্তর এখন শনির সাড়ে সাতি দশা চলছে জানায় সায়ন-পর্ণা। মন্ত্রী সাজার স্বপ্নটা পূর্ণ হলো না আর। উল্টে এতকাল বাদে দুর্নীতির দায়ে সরকার ওকে দল থেকে বহিষ্কার করে গঙ্গাজলে হাত ধুয়েছে। ওর পোষা গুণ্ডার দল ক্ষমতাহীন অভয় সামন্তকে ত্যাগ করে বিরোধী শিবিরে গিয়ে ঢুকেছে। সুদূর মহারাষ্ট্রে বসে সন্তু সব খবর পেয়ে যায় সায়নদের কাছ থেকে। সন্তু সেই যে নাগপুরে গিয়েছিল, তারপর আর একবারও আসেনি কলকাতায়। সায়ন অফিসের কাজে বম্বে গেলে নাগপুরে গিয়ে দেখা করে আসে নিঃস্বার্থ বন্ধুর সঙ্গে। এভাবেই সত্রাজিৎ রুদ্রর মতো এক আদর্শবান ছেলেকে নিজেদের জীবনের একমাত্র পরমাত্মীয় করে আঁকড়ে আছে সায়ন-পর্ণার জীবন। ওদের যুগল জীবনে একে অন্যের সান্নিধ্যও পুরনো হচ্ছে। দু'জনে কেউ মুখে না বললেও, বোঝা যায়, ফ্ল্যাটটার খাঁ-খাঁ শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য একটা পরিবারের যে বড় প্রয়োজন সেটা ওরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। দু'জনেরই গল্পে, কথায় আজকাল বাবা-মা'রা বারবার এসে পড়েন। তারপর একসময় যখন খেয়াল হয়, ওদের বাবা-মা'রা এই সাজানো বাড়ির রুমগুলোতে কোনওদিন পদচারণা করবেন না, তখন ওরা খবরের কাগজ কিংবা ম্যাগাজিনের আড়ালে মুখ লুকোয়। চাকরির শুরুতে এই মুহূর্তে সন্তান আনার কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। এত কষ্ট করে ইঞ্জিনিয়ার হবার পর এখনই বাচ্চা আগলাবার জন্য পর্ণা চাকরি ছেড়ে দিতে পারবে না। সেই আবার বাবা-মা'র প্রসঙ্গ এসেই পড়ে আলোচনায়। তাঁরা পাশে থাকলে! রান্নার লোক মালতিদি আর ঝাড়ু মোছা, বাসন, কাপড়কাচার লোক রমাদির সঙ্গে অফিসে বের হবার আগে অব্দি দিব্যি গল্প করে পর্ণা নামের রেকর্ড মার্কস পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটা। ওদের ঘর-সংসার, সুখ-দুঃখের গল্প বুঁদ হয়ে শোনে। তবে সায়ন এখনও ছুটির দিনে গীটার বাজায়, পর্ণা মন দিয়ে শোনে। এখনও মাসে একবার যে কোনও ছুটির দিন ওরা ট্রেকিংয়ে যায় একটু বৈচিত্র্যের খোঁজে। এইটুকুতে এসে আটকে গেছে ওদের মাত্র কয়েক বছর আগের উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা।

এরকমই একটা স্থিতাবস্থায় হঠাৎ এক মারাত্মক উত্তেজক খবর বাংলা টিভি চ্যানেলগুলোতে রাতের খবরে সম্প্রচারিত হতে দেখে টানটান হয়ে বসল ওরা দুজন। নিউজ রিডার বলে চলেছে— 'প্রাক্তন এম এল এ অভয় সামন্তর কসবার বাড়িতে মুখোশধারী দুষ্কৃতীদের আচমকা আক্রমণে অভয় সামন্তর দুই ছেলে বিজয় সামন্ত এবং অজয় সামন্ত খুন হয়েছেন। এবং অভয় সামন্তর বিবাহিতা একমাত্র মেয়ের মুখে অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়ে দুষ্কতীরা পালিয়ে গেছে। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য, রাত আটটার মধ্যেই নির্জন হয়ে যাওয়া ওই পাড়ায় কেউ দুষ্কৃতীদের দেখেননি। তাছাড়া ওয়ান ডে ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা চলার কারণে নির্জন এলাকা আরও জনশূন্য ছিল। তবে ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ নয় এটা বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির কোনও জিনিসে হাত লাগায়নি আক্রণকারীরা। অভয় সামন্তর পুরো পরিবারই অপরাধপ্রবণ। তাদের শত্রুর অভাব ছিল না। বিনুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ কুকুর আনা হয়েছে। পরবর্তী খবরে যাচ্ছি....

খবর শুনে সায়ন-পর্ণার মুখেচোখে খুশির আলো দেখা যায়। — 'ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। সন্তুকে এক্ষুণি জানাই খবরটা।'— বলে সায়ন মোবাইল টেপে।

⌑ ⌑ ⌑

প্রবাল মেয়ের ফোন পেয়ে শেষবারের মতো কথা বলেছিলেন, সেদিন ফোন নামিয়ে রাখতেই রেখা রাগত গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল— 'তুমি ওর সঙ্গে এমন কর্কশ ভাষায় কথা বললে? এ তো ত্যাজ্য করে দেবার মতো শোনালো?'

প্রবাল ততোধিক রাগত গলায় উত্তর দিয়েছিলেন — 'ত্যাগই তো করলাম, বুঝতে পারছ না! আজ থেকে মনে করো আমাদের কোনও সন্তান হয়নি।'

রেখা প্রতিবাদে মুখর হয়ে বলেছিলেন— 'কি করে এরকম মনে করব? দশমাস পেটে ধরে গর্ভযন্ত্রণা আমি সয়েছি। জন্ম আমি দিয়েছি। আমি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি। আমি তো মা, আমি কি করে মনে করব আমার সন্তান হয়নি?'

তেতো গলায় প্রবাল বলেছেন— 'তুমি এতসব করার পরেও তোমার মেয়ে ওর নিজের কথাই শুধু ভেবেছে, তোমার কথা ভাবেনি। মা-বাবা ওর কাছে তুচ্ছ দুটো প্রাণী। তাই মনে করবে আমরা নিঃসন্তান।'

রেখা প্রথম কিছুদিন শুধু কেঁদেছে। ভাতের ওপর গোঁসা দেখিয়ে দু-একদিন খায়নি, প্রবাল আমল দেননি। রেখা ওসব করতে পারে, এতে হয়ত ওর দুঃখ একটু লাঘব হয়। প্রবালের পুরুষ ইগো ওসব করতে দেয় না। সহজে কান্না আসে না তাঁর। তাই সব যাতনা বুকের ভেতরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে ভেতরে ভেতরে ভাঙে তাঁকে। অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল ওরা দু'জন নিঃসন্তান যুগলের মতোই হয়ে রয়েছেন। মেয়ের ফাইনাল রেজাল্টের আশাতীত সাফল্য সংবাদটা ইউনিভার্সিটি দিসপুরের পারমানেন্ট অ্যাড্রেসে জানিয়ে ছিল। তাই জেনেছিলেন মেয়ে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে এবং পড়াশুনোও করেছে। বাবার স্বপ্ন পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে, তাই বলে তার অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীরা প্রত্যেক ছুটিতে প্রশ্ন করত— পর্ণা আসে না কেন? এখন কেউ আর প্রশ্ন করে না। লোকে নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছে যে, একটা কোনও গোলমাল আছে। রেখার সঙ্গে কথা প্রায় নেই-ই। — 'খেতে দিয়েছি, বাজারের লিস্ট লিখে ফ্রীজের

ওপর চাপা দিয়ে রেখেছি, তোমার প্রেসারের ওষুধ আর দু'দিনের মতো আছে, আনতে হবে। প্রণতি সামনের মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়াতে বলেছে'— এরকম টুকরো কথা হয়। যেটুকু না বললে নয়। মেয়ের প্রসঙ্গ ভুল করেও কেউ তোলেন না। মেয়ে সকলের চোখের আড়ালে বাবা এবং মা'র চিন্তার ভেতর আলাদা আলাদা ভাবে ঢেউ তুলে উপস্থিতি বজায় রাখে নিরন্তর। সে এখন কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, কিছুই জানেন না। কারণ জানার আগ্রহ জাগেনি অভিমানে, রাগে, দুঃখে। কিন্তু অন্তরে গোপন মঙ্গল কামনা দু'জনেরই আছে। মুখে প্রকাশ করতে বাধে তবু দু'জনেই সেটা বোঝেন এখন।

আর পর্ণা? ওর কি মনে পড়ে না বাবা-মা'র কথা? তা কখনও হয়? ওর চেতনার মধ্যেও বাবা-মা উপস্থিত থাকে সবসময়। চেতনার দরজা খুলে ও কাউকে তাদের উপস্থিতি নাই বা দেখালো? বাবা-মা'র মান, আর ওর অভিমান একটা সময়ে দু'তরফের কাছেই সম্পর্কের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ ৩৪ বছর বয়সের পরিণত ভাবনা নিয়ে যখন একা ঘরে শুয়ে শুয়ে ২০ বছরের বাঁধন আলগা প্রগলভ আধুনিক মনস্কতার আলেয়ার পেছনে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে তখন উপলব্ধি জাগে যে, সেসময় ও ভুল করেছে। এবং সায়নকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে উগ্র পশ্চিমী স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে। পর্ণার প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার মূল্য দিয়ে সায়নকেও বাবা-মা-পরিবারহীন হতে হয়েছে— যা ও মন থেকে চায়নি। করেছে শুধু পর্ণার জন্য।

এখন এত বছর পর পর্ণার মনে অপরাধবোধ জাগে। সায়নও জানে না, কতখানি পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে পর্ণা। দাম্পত্য জীবনের প্রথম ৫/৭ বছর ক্যারিয়ার, অর্থ, বিলাস, সঞ্চয় আর ক্রমাগত উন্নততর জীবনের ইঁদুর দৌড়ে নিজেও ব্যস্ত থেকেছে, সায়নকেও ব্যস্ত রেখেছে। এখন যখন চাওয়ার পাত্র পূর্ণ হলো তখন মনে হয় এত আয়োজন কাদের জন্য? দু'জনে দু'জনের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে তো ছিলই ওরা, তাহলে এখন কেন এত অপূর্ণতা? কেন ঘরগুলো খালি খালি মনে হয়? সেই কবে মাঝেসাঝে বড়খোকাকে ধরে নিয়ে আসত আড্ডা মারার জন্য। ওদের দু'জনের কলিগরা ছাড়া এই সাজানো বাড়িতে আত্মীয়রা আসেনি। চৌদ্দ বছরেও শিশুর পায়ের ছাপ পড়েনি। তাই এখন ওর শুধু মনে হয় দু'জনে মিলে সম্পূর্ণতার একটা সীমা থাকে। দু'জনের মিলনে নতুন সৃষ্টি হলে সীমা অসীম হয়। সৃষ্টি করতে না পারলে সম্পূর্ণতার মধ্যে কুঞ্চন আসে, সম্পূর্ণতা সংকুচিত হতে থাকে। পর্ণা আগে কোনওদিন ভাগ্য, নিয়তি, অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাসে বিশ্বাস করত না, ও বিশ্বাসী ছিল কর্মে। কর্ম, উদ্যম আর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলে সবকিছু জয় করা যায়— এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল ওর মনে। জয় করেছেও বটে, মেটেরিয়েলিস্টিক যা যা প্রয়োজন সব বিজয় হয়েছে। কিন্তু ওগুলো বাদ দিয়ে জীবনে যে অন্য আর একটা দিক রয়েছে সেই দিকটা অধরাই থেকেছে। ওদের বাপের বাড়ি,

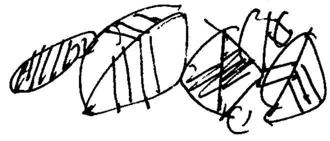

শ্বশুরবাড়ি থেকেও ওদের কেউ নেই। পরিচিত অনেক মানুষ থেকেও বড়খোকা ছাড়া বন্ধু নেই, পিতৃসম ঝুনঝুনওয়ালা ছাড়া আপন অভিভাবক নেই। এখন ও ভাগ্য, নিয়তি, গুরুজনের দীর্ঘশ্বাস, অভিশাপ— সব কিছু বিশ্বাস করে। দুটো বিখ্যাত কোম্পানির সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওরা দু'জনে অনেক সেতু তৈরি করেছে, কিন্তু নিজেদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ব্রীজটা বানাতে পারেনি। নিজেদের নিয়ে মগ্ন থাকার ঘুম যেদিন ভেঙ্গেছিল, সেদিনই প্রথম অনুভব করেছিল সন্তানের প্রয়োজন। অতিমাত্রিক আধুনিক হতে গিয়ে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত সমস্ত সত্য, সমস্ত পরম্পরাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সম্পর্কগুলোকে ধরে রাখা যেমন যায় না, তেমনি নিজেদের দীর্ঘ জীবনটাও সংসারের সুখ বঞ্চিত হয়ে কাটানো চলে না। এতকাল পর্ণা, সন্তান, বংশরক্ষা ইত্যাদি শব্দগুলোকে মুখ ভেংচে বিদ্রুপ করত। আজ মর্মে মর্মে বোঝে একটি সন্তান থাকলে যেমন এই তিন বেডরুম, হল, কিচেন ইত্যাদি শুদ্ধু বাড়িটা এত শূন্য হতো না, একটা পরিবার হয়ে উঠত, তেমনি একটি বংশধরের আগমনে দুর্গাপুর–দিসপুরও ক্ষমাশীল হয়ে ওদের অপরাধগুলো মাফ করে দিত হয়ত। কিন্তু এখন হাজার কাঁদলেও সন্তান কোনওদিন আসবে না। ওদের পরিবার হবে না, পারিবারিক মেলবন্ধন হবে না এ জীবনে। সন্তান এনে সেতুবন্ধনের আশা শেষ। হতভাগ্য সায়ন নিজের অজ্ঞাতসারে 'অ্যাজোস্পার্মিয়া' বয়ে বেড়াচ্ছে দেহে। অর্থাৎ ওর স্পার্মে একটিও জীবিত শুক্রকীট নেই এবং কখনোই থাকবে না।

পর্ণার সেই দিনটার কথা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। দু'বছর আগে ওর ৩২ বছর বয়সে ওরা দুজনেই যখন সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ডাক্তার ক্লিনিক করে চলেছে, যখন পর্ণার সমস্ত রকম টেস্ট দেখে স্পেশিয়ালিস্ট ডাক্তার জানালেন— 'মিঃ বর্মন, আপনাকেও কয়েকটা ক্লিনিক্যাল টেস্ট করতে হবে। আপত্তি নেই তো?'

সায়ন কনফিডেন্টলি বলেছিল,— 'আপত্তি কেন থাকবে? আমার টেস্টও নিশ্চয় হবে। আমরা তো বাচ্চা চাই! তার জন্য সব করতে প্রস্তুত।'

তিনদিন পর সায়ন পর্ণাকে ফোন করে বলেছিল— 'তুমি বাড়ি চলে যেও অফিস থেকে। আমি রিপোর্টগুলো নিয়ে আসব। তোমাকে আর ওখানে আসতে হবে না।'

ধীরে ধীরে রাত বেড়েছিল। সায়নের দেখা নেই। ওর মোবাইল সুইচ অফ করা ছিল। রাত ১১টা, ১২টা, ১২.৩০ মিঃ, ১২.৫০ মিঃ— ভয়ে কাঁপছিল পর্ণার হাত-পা। কি হলো? অ্যাকসিডেন্ট শব্দটাই মগজে পোকার মতো নড়াচড়া করছিল। কাকে বলব? কোথায় যাব খুঁজতে? এই দুঃসময়ে আমার পাশে

দাঁড়াবার মতো কে আছে? থানায় যাব? হ্যাঁ, থানায়ই যেতে হবে। পর্ণা দুরু দুরু বুকে কোনওমতে জুতো গলিয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে থানায় যাবে বলে চাবি হাতে নেয়। ঘড়িতে তখন রাত ১টা। তখনই ডোরবেল বেজে ওঠে। দরজা খুলে চমকে উঠেছিল ও। — 'কি হয়েছে? কি হয়েছে তোমার? এরকম কেন দেখাচ্ছে? কথা বলছ না কেন?' — দেওয়ালে পিঠ রেখে বিবস্ত্র বেশবাস, চুল, ঘামে ভেজা শরীর, শ্বাসে মদের কড়া গন্ধ। এই সায়নকে তো ও দেখেনি কখনো! কোনওমতে ঘরে এনে সোফায় বসিয়ে জুতো জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা বরফ জলে তোয়ালে ডুবিয়ে ক্লেদমুক্ত করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। সায়ন মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়নি, তাহলে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারত না। সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল ওর। ও পর্ণার যত্ন করা দেখছিল, কিন্তু একটা কথাও বলছিল না। আর পর্ণার চোখের দিকেও তাকাচ্ছিল না। পর্ণাও — 'কেন মদ খেয়েছ'— বলে অভিযোগ করে অত রাতে সিনক্রিয়েট করেনি। সায়ন কখনও ড্রিংক করত না তা নয়। কোনও পার্টিতে কিংবা কখনও কলিগদের গেট-টুগেদারে ড্রিংক করত। কিন্তু সেই রাতে সায়নের ড্রিংক করা চেহারা একেবারে অন্যরকম ছিল। অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ফেরার সময়টাও। পর্ণার মনে হয়েছিল সায়নের ওপর দিয়ে যেন ভূমিকম্প পার হয়েছে সেই রাতে।

পরদিন সকালে পর্ণার হাতে মেডিকেল রিপোর্টগুলো দিয়ে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে বলেছিল— 'আমি কোনওদিন বাবা হতে পারব না পর্ণা। আমার রিপোর্টে সেটাই লেখা আছে।'

এই কথা ক'টা উচ্চারণ করতে গিয়ে অসহায় লজ্জায় ওর মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছিল।

সেই মুহূর্তে শোক-দুঃখ, আশাহত হবার বেদনা কিছুই অনুভব করেনি পর্ণা। তখন ওর একমাত্র কনসার্ন ছিল সায়ন। ডাক্তারের কাছে ওর ইনফার্টাইল রিপ্রোডাকটিভ কন্ডিশনের এক্সপ্ল্যানেশন শুনে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল হাজরার মেট্রো স্টেশনে। পারেনি পর্ণার কথা ভেবে। বোধহয় নিজের প্রতি ঘৃণার থেকেও পর্ণার ওপর মায়া ওকে লাইনে ঝাঁপ দেওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এরপর পার্ক স্ট্রীটের এক বারে গিয়ে মদ খেয়ে ভুলতে চেয়েছে ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু ভুলতে বা মেনে নিতে পারছিল না সায়ন। মানসিক ভাঙ্গনের চেহারাগুলো কি এরকমই হয়? আমার বাবা-মা কি এরকম ভাবেই ভেঙ্গে পড়েছিল চোদ্দ বছর আগে? সায়নের বাবা মাও নিশ্চয়ই একই মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে কাটিয়েছিলেন! ওর বাবার ফোনে চিৎকার করে বলা কথাগুলো শুধু রাগ ছিল না। ওগুলো তাঁর মানসিক যন্ত্রণার আক্ষেপ ছিল। এই বোধোদয় ঘটেছিল সেই সময়, তাই কখনও মা হতে পারবে না জানার পরও নিজের আক্ষেপ, সন্তাপ ইত্যাদি মনে স্থান না দিয়ে সায়নকে সুস্থ করে তোলার কাজটা প্রাথমিক প্রাধান্য পেয়েছিল। জীবনে প্রথম স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা এবং অক্লান্ত সেবার পরিশ্রমে চোখের নীচে পড়া কালি আর অযত্নে লালিত মুখ আয়নায় দেখে মনে হয়েছে — 'এতকাল ধরে আমি যেন সায়নের লাস্যসঙ্গিনী ছিলাম, এবার প্রকৃত অর্থে ওর স্ত্রী হলাম। এখন আমাকে ঠিক আমার মায়ের মতো দেখতে লাগছে।'

¤ ¤ ¤

— 'কি ব্যাপার? আজকাল অন্যরূপে দেখি প্রায়ই। হঠাৎ ওয়েস্টার্ন পোশাক কম আর শাড়ী বেশি পরছ? তবে যাই বল, শাড়ী পরলে তোমাকে খুব ভাল লাগে দেখতে।'

— 'তোমার ভাল লাগবে বলেই তো পরছি।'

সায়ন বলে— 'ওটা বাজে কথা হলো। আমার তো আগেও ভাল লাগত, কিন্তু তুমি বলতে শাড়ী পায়ে জড়িয়ে যায়। কমফোর্ট পাও না পরলে।'

— 'এ্যাই। ঝগড়া করবে না বলে দিচ্ছি। এখন থেকে অফিসে ওয়েস্টার্ন, অন্যত্র শাড়ী পরব।'

— 'খুব ভাল কথা। আমার জন্য নিজের সব সুবিধাগুলো ছেড়ে দেবে! এটা ঠিক নয়।'

— 'হ্যাঁ ছাড়ব। তোমার আপত্তি আছে?' — পর্ণার গলায় উষ্মা।

— 'কিন্তু আমি যে তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলাম।'

— 'ছিঃ। কেন আজেবাজে কথা বলছ? ওটা আমারও হতে পারত। হয়ত ওটা আমাদের ভাগ্যে লেখা।'

— 'এতবড় জীবন ভাগ্যে লেখা বলে মেনে নিয়ে কাটাবে? তোমার ঘর যে শূন্যই রয়ে যাবে? তার চেয়ে তুমি যদি.... মানে... তুমি তো মা হতে পারবে.... অন্য কাউকে বিয়ে... আমাকে ডিভোর্স...'

— 'স্টপ ইট্! রাবিশ্ অ্যান্ড রিডিকিউলাস।' কানে আঙ্গুল দিয়ে কেঁদে ফেলে পর্ণা। সায়ন ঘাবড়ে যায় পর্ণার চিৎকার আর তারপরই কান্না দেখে। তাড়াতাড়ি বলে— 'সরি! আমি তোমার কথা ভেবেই বলেছিলাম। প্লীজ কেঁদো না। মুখ তোলো। তাকাও আমার দিকে। আমি আর কখনও বলব না।'

চোখ মুছে পর্ণা বলে— 'তুমি একথা বলতে পারলে? তুমি তো বলতে পারতে— চলো পর্ণা, আমরা অনাথ আশ্রম থেকে দুটো বাচ্চা এনে ওদের বাবা-মা হই! তা না বলে আমাকে মা হবার রাস্তা তৈরি করতে যাচ্ছ ডিভোর্স দিয়ে? ভুলে গেলে আমরা সবসময় বলেছি, আজীবন শত দুঃখ-কষ্টেও একসঙ্গে থাকব? শোনো, বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা আমার শুধু প্রবল হয়েছিল তা নয়। তোমারও হয়েছিল। তুমি কি আমাকে এত চিপ্ বলে মনে কর যে, তুমি একটা জঘন্য প্রস্তাব দেবে আর আমি লুফে নেব? আমি কি করে তোমাকে ছেড়ে বাঁচব সায়ন? একবারও একথা ভাবলে না?'

এভাবেই, আজকাল প্রায়ই সায়ন আকারে-প্রকারে পর্ণাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, কেন ওর মতো এক অপদার্থের জন্য পর্ণা মা

হবার সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইছে? আর এভাবেই প্রত্যেকবার কান্নাকাটিতে এসে এপিসোড শেষ হয়। পর্ণা বারবার বাচ্চা অ্যাডপ্ট করার কথা বললেও সায়ন কানে নেয় না। আজ একরকম জেদ ধরেই ও বলল— 'অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চা এনে অ্যাডপ্ট করতে তোমার এত আপত্তি কেন বলতে হবে আমাকে। বল।'

— 'শুনতে চাও? তাহলে শোনো। — অনাথ আশ্রমের বাচ্চা অজ্ঞাতকুলশীল। সে চোর-ডাকাত, খুনী, নোংরা মেয়ের গর্ভজাত, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত— এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। অনাথ আশ্রমে সাধারণত ডাস্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চারা স্থান পায়। জেনেটিক কত রকম প্রবলেম থাকতে পারে তুমি জানবে কি করে? আগেকার দিনে নিঃসন্তান মানুষরা নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে দত্তক নিত, শুধু কুলশীল বংশ পরিচয় জানা থাকত বলে। এখনও সমাজে সেই প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদিও ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সৌজন্যে বাচ্চা উৎপাদন কম বলে পরিচিতের কাছ থেকে চট করে আর দত্তক পাওয়া যায় না। তাই এখন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 'এ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিকে'র (এ আর টি) দিকে ঝুঁকেছে মানুষ। স্পার্ম ব্যাঙ্ক, এগ-সেল ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা জ্ঞাতিদের ভেতরে ডোনার পেলে তাদের কাছ থেকে এগসেল বা স্পার্ম নিয়ে টেস্ট টিউবে ফিটাস তৈরি করে মায়ের পেটে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করছে পর্ণা। তুমি জানো না বোধহয়, এখন স্বাস্থ্যবান এবং অতিমাত্রায় এ্যামবিশাস ছেলে-মেয়েরা বম্বে, পুণে, ব্যাঙ্গালোরের মতো পশ্ সিটিগুলোতে স্পার্ম আর এগ-সেল বেচে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু স্বাস্থ্য, কাস্ট, শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, বংশ মর্যাদা— সব দেখা হয়। কখনোই ড্রাগ এডিক্ট, জেনেটিক ডিজিজ আছে এমন কারও স্পার্ম বা এগসেল নেয় না ক্লিনিকগুলো। বিদেশে শুনেছি, বিখ্যাত মহিলা-পুরুষরা এগ-স্পার্ম সমাজের কল্যাণ দান করে থাকেন। আর এদেশে যেসব হাইপ্রোফাইল স্পেশিয়েলিস্টরা এ আর টি করে মাসে ৮০ থেকে ১০০ জন নিঃসন্তান দম্পতির কোলে সুস্থ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তান তুলে দিচ্ছেন তারা কখনোই চাইবেন না যে, সামান্য ভুলের জন্য কিংবা লোভে পড়ে সৃষ্টিকর্তার স্থানে পৌঁছে যাওয়া ইমেজে কলঙ্ক লাগুক। — পর্ণা, এই স্পার্ম-একসেল ডোনেশন হাইফাই ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা করে আরও বেশি পকেটমানির জন্য। আর তোমার আমার মতো ছাত্রাবস্থায় দুর্দশায় পড়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা করে বাধ্য হয়ে। কত ছেলেমেয়ে যে পারমানেন্ট ডোনার হয়ে নিজেদের হায়ার এডুকেশনের পুরো খরচ নিজেরাই বহন করছে সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

পর্ণা বলে— 'খবরের কাগজে এসব পড়ি। যারা দান করে তারাও আর যারা টাকা নিয়ে বিক্রি করে তারাও তো কল্যাণ কর্মই করছে সায়ন। কিভাবে করছে সেটা বড় কথা নয়। ওদের একটা স্পার্ম আর একটা এগ থেকে একটা সন্তান সৃষ্টি হচ্ছে— সেটাই বড় কথা। নিত্য অপচয়িত এমন মূল্যবান জীবনদায়ী জিনিস তো যে কোনও সুস্থ মানুষেরই দান করা উচিত। মরবার পর অন্যের স্বার্থে চোখ, কিডনি, হার্ট দান করা যেমন কল্যাণকর, তেমনি একটা দুটো কীট দান করে যদি কোনও নিঃসন্তান দম্পতির কোলে সন্তান এনে দিতে পারে তাহলে তো এটা অনেক বেশি পুণ্য কর্ম হয় সায়ন?'

— 'ঠিক বলেছ। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রচুর খরচসাপেক্ষ। সবাই তো পারে না করতে।'

পর্ণা জিজ্ঞেস করে— 'কলকাতাতেই তো এ আর টি আছে সায়ন? প্রথম টেস্ট টিউভ বেবি দুর্গা আগরওয়ালকে সায়েনটিস্ট ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেন। আমি কি কলকাতায় এ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন করতে পারি না? আমাদের তো সামর্থ্য আছে?'

— 'পারি পর্ণা। তোমাকে তো এত জ্ঞান দিলাম, কিন্তু করাপ্‌শনে ডুবে থাকা এদেশটার ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে সন্তান পেতেও আমার ভয় হয়। আজকাল আমি যেন বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে পারি না। যদি তোমার বা আমার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বেচ্ছায় স্পার্ম ডোনেট করতে রাজি হতো তাহলে এক্ষুণি আমি টাকা নিয়ে প্রস্তুত হতাম। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দুর্ভাগ্যের শিকার। আমাদের কেউ নেই, যে নিঃশব্দে সামান্য ক'টা পোকা দান করে ভুলে যাবে দান করেছিল একটা মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজনে। ঠেকায় পড়ার আগে কোনওদিন আমিও তো ভাবিনি যে কত মানুষের জীবন্ত কীট প্রতিদিন নর্দমার জলে অপচয় হয়ে যায়? আর এখন একটা জীবন্ত কীটের জন্য কেঁদে মরছি। কোনও পথই খোলা নেই মনে হচ্ছে।'

পর্ণা শাড়ীর আঁচলের কোণ দড়ির মতো পাকাচ্ছিল বসে বসে। সায়নের সব কথা মন দিয়ে শুনেছে একটুও তর্ক না করে। ও সায়নের মন পড়তে পারে বলেই বুঝতে পারছে সায়ন সন্তান চায়, কিন্তু অপরিচিত কারও স্পার্ম ধার করে পাওয়া শিশুকে নিজের বাচ্চা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। হয়ত, পরিচিত একান্ত বিশ্বস্ত কারও সাহায্য পেলে ওর দ্বিধা থাকবে না। কাস্ট, বংশ, সংস্কার— এগুলো ওর মজ্জায় মিশে আছে। পর্ণা জানে, এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েও সায়ন বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষ। নিজেই ব্যাঙ্কগুলোর সতর্কতার প্রশংসা করছে, আবার নিজের

ক্ষেত্রে করাপ্টেড দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ্রষ্টাচারের অজুহাত দেখিয়ে বোকার মতো কনট্রাডিক্ট করছে। আসলে ওর প্রজনন ক্ষমতা নেই এটা ওর পুরুষকারে এত আঘাত করেছে যে, ও এই ব্যাপারটা একমাত্র পর্ণা ছাড়া আর কেউ জানুক সেটাই চায় না। আর তাই কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু ওকে ওর মতো করে বুঝিয়েই একটা সিদ্ধান্তে আনতে হবে। মেন্টাল ব্রেকডাউন থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষটার ওপর এখন কোনও জোর খাটানো চলবে না। পর্ণার মনে যে একটা আশার ফুলকি জ্বলে উঠেছে সেটা সাবধানে ওকে জানাতে হবে। এটাই পর্ণার লাস্ট কার্ড। খুশি মনে মেনে নিলে ভাল। না মানলে আর কিছু করার নেই। নিঃসন্তান হয়েই থেকে যাবে দু'জনে বাকি জীবন।

— 'পথ একটা আছে সায়ন।' পর্ণা সন্তর্পণে এগোয়— 'ভগবান সব দরজা বন্ধ করেন না। একটা দরজা অন্তত খোলা রাখেন। আমাদেরও একজন অত্যন্ত বিশ্বাসী শুভাকাঙ্খী আছে যে সবসময়, সব দুর্দিনে বিনা স্বার্থে আমাদের সাহায্য করেছে। এই দুর্দিনেও সেই একমাত্র ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় সাহায্য করবে এবং কাক-পক্ষীও কোনওদিন জানবে না। তুমি তার কাছে সব খুলে বলতে পার। একটুও লজ্জা না করে। তোমার ব্যথা সে না বুঝলে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি নেই, যে বুঝবে। তাছাড়া তুমি যা যা চাও তার মধ্যে সেইসব গুণগুলোই আছে। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমি কার কথা বলছি?'

সায়নের বিষণ্ণ মুখটাতে ভোরবেলার মতো আস্তে আস্তে আলো ফুটে উঠতে দেখে পর্ণা। অনেক অনেকদিন পর সুন্দর হাসিতে চোখ দুটো নেচে ওঠে। ও বলে— 'জানি। কবে তুমি নিজের মুখে বলবে সেই অপেক্ষা করছিলাম। এবার আমাদের সন্তান হবে পর্ণা।'

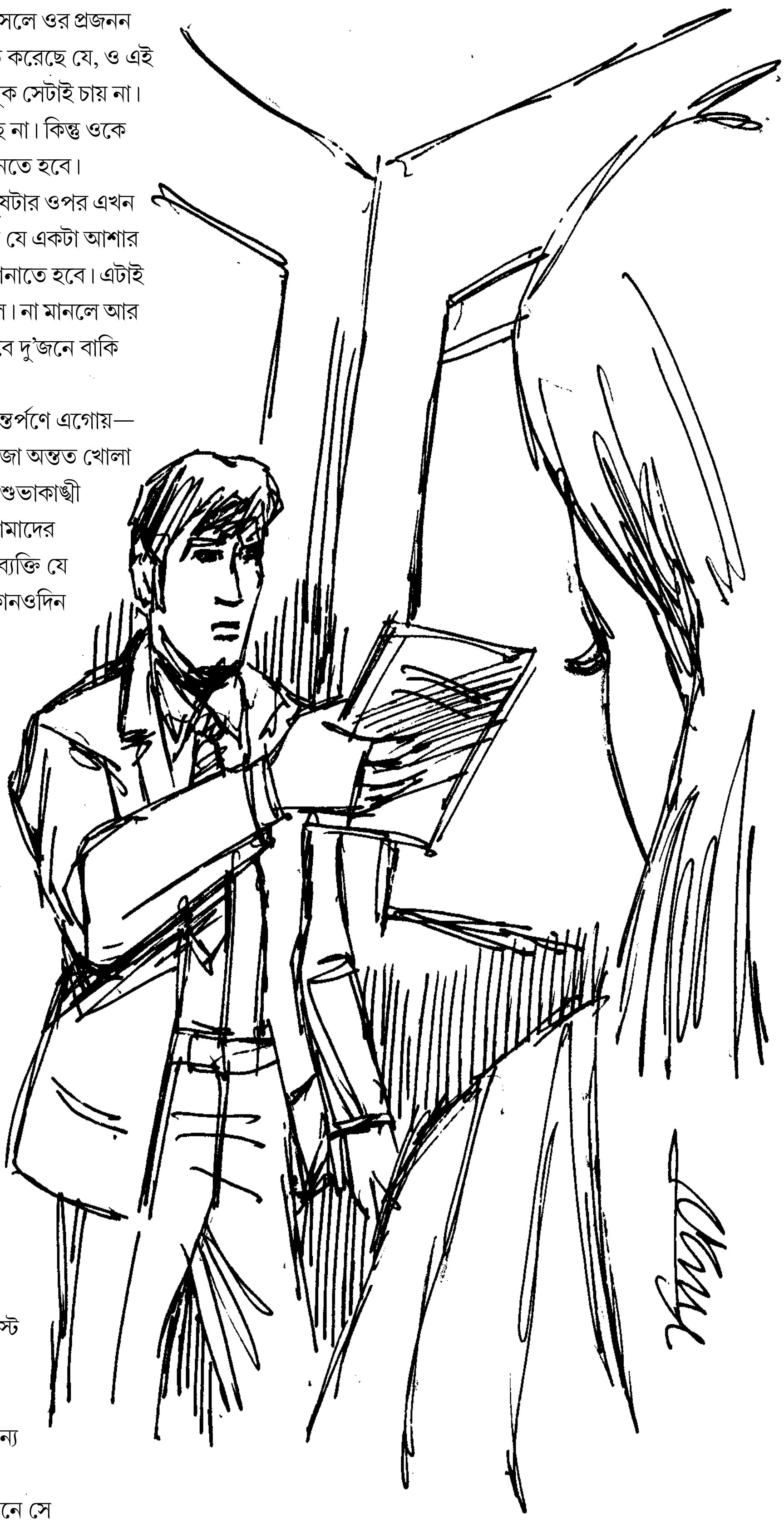

।। ছয়।।

পর্ণা মা হলো। এক বছর ওয়েটিং লিস্টে থাকার পর ওর টার্ন এলো অবশেষে। কোলকাতায় নয়। সায়নের কলকাতার চেনা মহলকে বিশ্বাস নেই। বন্ধু সেকথা বোঝে, অন্য কেউ না বুঝলেও। কারণ সে নিজেও পুরুষ। সায়নের ফোনে বলা দুর্ভাগ্যজনক কাহিনী শুনে সে

এত মর্মাহত হয়েছিল যে রাতে ঘুমোতে পারেনি। সে সায়নের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে চিন্তা করেছিল এবং অনুভব করেছিল, পৌরুষত্বের আঘাত। তাই সায়ন-পর্ণার কেস নিয়ে হায়দ্রাবাদে বিখ্যাত ডক্টর সাইন্টিস্ট শ্রীমতী পুষ্পা ভার্গবের কাছে সে নিজে দৌড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র থেকে। পুষ্পা ভার্গব পর্ণার কেস হাতে নিয়েছিলেন। পর্ণার এক সঙ্গে দুটি পুত্র চাওয়ার দাবিও হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। দুই যমজ পুত্রের জননী পর্ণা এবং সায়ন এখন দুর্গাপুর-দিসপুরে সমাদরে গৃহীত। ওরা দুজনে মিলে অনেক ভেবে দুই ছেলের নামকরণ করেছে। তিন মিনিট আগে জন্ম নেওয়া প্রথম ছেলের ভাল নাম সত্রাজিৎ প্রতাপ বর্মন। ডাকনাম বড়খোকা। তিন মিনিট পরে জন্ম নেওয়া দ্বিতীয় ছেলের ভাল নাম সূর্যদীপ প্রতাপ বর্মন। ডাক নাম ছোটখোকা। একজন এ্যাবসলিউটলি জন্মদাতা পিতার নামে, অন্যজন পালক পিতার নামে বড় হবে। কেউ জানবে না ওরা তিনজন বন্ধু ছাড়া।

সায়ন-পর্ণারা পুরনো চাকরি ছেড়ে কলকাতা ছেড়ে এখন বম্বেতে কোলাবায় সায়নের কোম্পানির দেওয়া বিশাল ফ্ল্যাটে। দুই শিশুর দাপাদাপিতে ফ্ল্যাট এখন সংসার হয়ে উঠেছে। দুর্গাপুর-দিসপুর থেকে দুই নাতির ডাবল সুদের টানে গ্রান্ড পেরেন্টসরা যখন ইচ্ছে এসে পড়ে পরিবারের সুখ দিয়ে যান পর্ণা-সায়নকে। ওদের জীবন এখন সম্পূর্ণতার পূর্ণকুম্ভ। কিন্তু, যার জন্য হারিয়ে যাওয়া সবকিছু ওরা ফিরে পেল, সেই ঈশ্বরসম যুবাপুরুষ বম্বে ছেড়ে সুদূর আমেরিকায় এক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতে চলে গেছে। ফরওয়ার্ডিং এ্যাড্রেস, ফোন নম্বর কিছু দেয়নি। যতদিন ওরা একা ছিল, সমস্যার মধ্যে ছিল, ততদিন ছায়ার মতো পাশে থেকেছে, রক্ষা করেছে। আজ আপনজনরা ওদের জীবনে এসে যেতেই সে নিজে সরে গেছে দূরে। কেন এমন হল? এগারোতলায় ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে সমুদ্রের বুকে একটু একটু করে ডুবে যেতে থাকা অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ওর কথা ভাবতে গিয়ে চোখে জল আসে পর্ণার। অমানুষের অরণ্যে একটিমাত্র 'মানুষ' এসেছিল ওদের জীবনে। সেও চলে গেল। পর্ণার মনে হয়, পাছে কাছে থাকলে কখনও কোনও দুর্বল মুহূর্তে নিজের সন্তানদের প্রতি আকর্ষণ জন্মে যায়, সেই ভয়েই অত দূরে পালিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে সায়নকে। পর্ণা মনে মনে বলে— বড়খোকা, আমি জীবনটা শুরু করেছিলাম উদগ্র ঔদ্ধত্য দিয়ে, তুমি সব জানো। কিন্তু তুমি জেনে গেলে না, তোমার ভেতরের আদর্শ মানুষটাকে দেখে দেখে আমি নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে চলেছি। সায়ন কখনো নিজেকে নিয়ে বড়াই করেনি। ও যেমন, তেমনটিই থাকতে চাইত। কিন্তু আমি কিছু না হয়েও মনে মনে নিজেকে অনেক কিছু বলে ভাবতাম। আমার অহম্ বোধ এত তীব্র ছিল বলেই বাবা-মা'র দেওয়া সুশিক্ষা ভুলে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভুলে, পরম্পরা, সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে যে সব কাণ্ড করেছি, তুমি তার সাক্ষী ছিলে। ঈশ্বরের কিছুটা আশীর্বাদ তবুও ছিল বলেই তোমাকে আমরা বন্ধু করে পেয়েছিলাম। আমি জানি তুমি সায়নের সহজ সরল চরিত্রকে সম্মান করতে, ওকে ভালবাসতে নিজের ভাইয়ের মতো। আমাকে তুমি পছন্দ করতে না, তাই আমাকে সবসময় এড়িয়ে চলতে। সায়নের জন্যই নিজের স্পার্ম ডোনেট করে দুটি সন্তানের বাবা হবার মর্যাদা দিয়ে গেছ তুমি। আমি তো সারোগেট মাদারের মতো শুধু ধারণ করেছি ওদের। তুমি, আমি, আর সায়ন ছাড়া জগৎসংসার না জানলেও এটা তো সত্যি যে, ওরা তোমার সন্তান! ঠিক তোমার মতো করে, তোমার আদর্শে ওদের বড় করে তোলার দায়িত্ব আমার। আমি জানি না, বড়খোকা, এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব কিনা। আপ্রাণ চেষ্টা করব বলে কথা দিচ্ছি। যদি কোনওদিন ফিরে আসো তবে এসে দেখে যেও উচ্ছৃঙ্খল, বেহায়া মেয়ে পর্ণা নিজে মানুষ হয়েছে কিনা! সায়নকে উপহার দেওয়া তোমার আমানত দুটিকে মানুষ বানাতে পেরেছে কিনা! তোমার রক্তের মর্যাদা রেখেছে কিনা?

পিঠে হাত পড়তে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখে সায়ন দাঁড়িয়ে। — 'কি ভাবছিলে এত তন্ময় হয়ে? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি টেরও পাওনি।'

— 'তন্ময় হয়ে একজন প্রকৃত মানুষের কথা ভাবছিলাম সায়ন। বড়খোকা সত্রাজিৎ রুদ্রর কথা ভাবছিলাম। আমি কি পারব সায়ন আমাদের বড়খোকা-ছোটখোকাকে ওর মতো মানুষের মতো মানুষ করে গড়তে?'

সায়ন ওকে নিজের বুকে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— 'পারবে পর্ণা। একমাত্র তুমিই পারবে। তোমার ভয়ঙ্কর জেদ কি কি করতে পারে, আমার থেকে বেশি আর কে জানে? তুমি ওর চেয়েও বেশি ভাল তৈরি করতে পারবে ছেলেদের। এখন ঘরে চলো।'

সূর্য তখন সমুদ্রের জলে পুরো ডুবে অস্তাচলে গেছেন আগামীকালের ভোরে উদিত হবেন বলে।

চার্চিলের গোপন যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে ?

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

ঠিক এক বছর আগে (জুন ২০১০) জার্মান প্রবাসী লেখিকা মধুশ্রী মুখার্জীর "Churchill's Secret War" নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) ধনধান্যে পুষ্পভরা সোনার বাংলায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু অনাহারে প্রাণ হারায়, তার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. উইনস্টন চার্চিলের ভারতে খাদ্য সরবরাহ-নীতির এবং প্রতিহিংসা পরায়ণতার আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

কিন্তু হৃদয়হীন চার্চিলের ভারতীয় সংস্করণ বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বাট এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার Civil Supply Minister (লোকে ব্যঙ্গ করে বলত Un-Civil Non-Supply) নরদস্যু মি. সুরাবর্দী যারা ৪০—৫০ লক্ষ বাঙালীকে অকালে যমালয়ে পাঠিয়েছে, নামমাত্র উল্লেখ রয়েছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য সুরাবর্দী যে 'Gruel Kitchen' বা লঙ্গরখানা খুলে লপ্‌সি বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল, তাকে লোকে 'সুরাবর্দী ঘ্যাঁট' আখ্যা দিয়েছিল।

আর এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত মেদিনীপুরবাসীদের উপর পুলিশ-মিলিটারির বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। পরবর্তী মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাকে ও খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। আইন সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় এবং গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলকে লেখা চিঠিতে তিনি অসৎ এবং অপদার্থ খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী সুরাবর্দীকে তুলোধোনা করেছিলেন। মধুশ্রী মুখার্জীর বইতে সে সবের উল্লেখমাত্র নেই। তিনি মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন, তাও অন্যদের লেখা অনুবাদ করে, কিন্তু সারা বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিবরণ তাতে পাওয়া যায় না বলেই বাংলার তৎকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরাই বর্তমান লেখার উদ্দেশ্য।

ড. মুখার্জী সম্পর্কে লেখিকার সকৃপণ উক্তি :

"In late January 1943, Shyama Prasad Mookerjee, a politician with a Hindu Nationalist

Party, received from the Tamluk Government's Courier, Krishna Chaitanya Mahapatro, an issue of *Biplabi*. Mookerjee had served as Bengal's finance minister but had resigned his post on November 16, 1942, citing official callousness in the response to the cyclone that he said had possibly 'no parallel in the anuals of civilised administration.' According to Mohapatro, when Mookerjee read about the gang rapes, he wept. He subsequently wrote to Chief Minister Fazlul Huq, informing him of the assaults". ব্যস্ এই পর্যন্ত।

ড. মুখার্জীর লেখা পূর্বোক্ত চিঠি ও বক্তৃতাদি ''পঞ্চাশের মন্বন্তর ও রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়" নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং চারদিকে আলোড়ন তুলেছিল। সে গ্রন্থের বা রচনার কোনও উল্লেখ কিংবা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের ত্রাণকার্যে ড. মুখার্জীর অবদানের কোনও উল্লেখ গ্রন্থখানিতে দেখা গেল না। সেসব রচনা থেকে ভয়াবহ দিনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরা গেল।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু কোনও পরিকল্পিত কার্যক্রম ঘোষণার আগেই সরকার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরে। নেতৃত্বহীন জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সরকারও নির্দয়ভাবে শাসনের লগুড়াঘাতে শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলায় এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার জনসাধারণ। সেখানে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমান্তরাল জাতীয় সরকার স্থাপিত হয়।

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের উপর বৃটিশ সরকারের পূর্ব থেকেই প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ ছিল। ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে বহু বিপ্লবীর জন্মস্থান মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন ও কর আদায় করতে গিয়ে সরকার নাস্তানাবুদ হয়েছে। পরপর তিন জন বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর সরকার মেদিনীপুরে আর কোনও বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে সাহস পায়নি। ভারত ছাড় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মেদিনীপুরের একাংশে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ হলে, সরকারের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি হলো যেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর মতামতের তোয়াক্কা না করেই বাংলার লাটসাহেব স্যার জন হার্বাট— আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সে আন্দোলন দমনে পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে। ঠিক এই সময়েই ঘটে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক রোষ মিলে মেদিনীপুরে যে হাহাকার ধ্বনি ওঠে, সে খবর কলকাতা না পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু যখন বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসে পৌঁছল, তখন শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুর ছুটে গেলেন এবং সেখানকার জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা আর সরকারপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা দর্শনে মর্মাহত হলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়েও তিনি দুর্গত জনগণের দুঃখদুর্দশা অপনোদনে কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারছেন না— এই চিন্তায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। তিনি এগার মাসের মাথায় ১৯৪২ এর ২০ নভেম্বর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এর কয়েকমাস পরে গভর্নর হার্বার্ট সাহেব ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে পুনরায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দী চক্রকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু তখন যুদ্ধ পরিস্থিতি ও খাদ্য পরিস্থিতি সাংঘাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। সরকার পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করায় বাংলায় দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী ও তাদের দোসররা ক্ষমতা ভোগ দখলে যত তৎপর, দেশবাসীর মুখে অন্ন জোগাতে তার সহস্রাংশের একাংশ আন্তরিকতা দেখা যাচ্ছে না। হিন্দুদের কথা দূরে থাক, মুসলমান ভাইদের— যারা বেশীর ভাগ গরীব চাষী ও মজুর, তাদের প্রতিও মন্ত্রীদের দরদের কোনও নমুনা দেখা গেল না। শুধু হিন্দু বিদ্বেষ আর ইসলাম বিপন্ন ধ্বনি দিয়েই তারা বুভুক্ষু মুসলমানদের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করতে থাকে। সিন্ধী ও পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ীদের স্বার্থসমৃদ্ধি রক্ষাই তাদের একমাত্র কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর প্রাণের বিনিময়ে ইস্পাহানী, সিদ্দিকীদের লাভের থলি ফুলে ফেঁপে উঠেছে, আর তার ছিঁটে ফোঁটা উচ্ছিষ্ট খেয়ে লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থক ও সদস্যরা নিজেদের চৌদ্দ পুরুষের (ফজলুল হকের ভাষায়—fourteen generations up an down) হিল্লে করেছে।

এই মন্বন্তরে দেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার মতো তেমন কেউ ছিল না। মন্বন্তর নিয়ে কেউ কবিতা রচনা করেছেন, গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন বা ছবি এঁকেছেন। ভরপেট বিদগ্ধজন সেসব শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় মেতেছে। আর শ্যামাপ্রসাদ অন্নহীন বাঙালীর (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) ক্ষুধার্ত ক্রন্দনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন, মূল অপরাধীদের মুখোশ খুলেছেন বক্তৃতায়, লেখায় এবং চিঠিপত্রে। দিবালোকে আলো জ্বেলে পথচলা যেমন হাস্যকর, তেমনি পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কীয় রচনাগুলি সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা বা টিকাটিপ্পনীও অনাবশ্যক। বাঙালীর জীবনের এক করুণ অধ্যায়ের জীবন্ত ইতিহাস এই রচনাসমূহ। যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকৃত ইতিহাস, তার ভয়াবহতা, শাসককুলের হৃদয়হীনতা ও দেশবাসীর অসহায়তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে চান— তারা এই রচনাগুলি পাঠ করলে মনুষ্যসৃষ্ট এই মন্বন্তরের কার্যকারণাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ওই সঙ্কটময় মুহূর্তে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা জাতিধর্ম নির্বিশেষে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। যে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দুর্গত ও বিপন্ন মানুষের পাশে আশা ভরসার প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর সেই মানবদরদী ভূমিকার কথা আজও অবিস্মরণীয়।

''সরকারের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ হিসাবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় Bengal Cyclone Relief Committee গড়ে তোলেন। তিনি নিজেই এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ড. বিধানচন্দ্র রায় এর কোষাধ্যক্ষ হন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র

ঘোষ সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এর আগে অবশ্য তিনি মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য "Political Sufferers' Relief Committee" গঠন করেছিলেন। এভাবে শ্যামাপ্রসাদ দু'দিক থেকে মেদিনীপুরের মানুষকে সাহায্য করতে লাগলেন। একদিকে দুর্গত মানুষদের কাছে সাহায্য নিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে সরকারি অত্যাচার ও অবহেলার নমুনা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা। শ্যামাপ্রসাদের এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে বাংলার গভর্নর দিল্লীতে ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত তার গোপন রিপোর্টে লেখেন, 'Since his resignation. Dr. Mookherjee has devoted himself to exploiting the situation in Midnapore in a manner, calculated to discredit his excellency, the Governor and the Government officials.'

চার্চিল

ফজলুল হকের Progressive Coalition মন্ত্রিসভার কাজকর্মের উপরও ইংরেজ সরকার আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করার পরেও তাদের সন্দেহ কাটেনি। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর কাছে বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের পাঠানো এক গোপন চিঠিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়— 'I am not satisfied with Huq's attitute. He also seemed reluctant to issue statement or to carry out counter propaganda against Gandhi's movement. Nor I am altogether happy with the attitude of Mahasabha.'

এখানে উল্লেখ্য যে হিন্দুমহাসভার নাম তিনি ত্রাণ ও সেবাকার্যের স্বার্থে জড়াতে চাননি। তবুও Bengal Relief Committee-র পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক শক্তি সক্রিয়, সেটা সরকারি গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেখানে লেখা হয়—'The only party that stood out to view and treat problem of famine on humanitarian ground and keep it beyond the purview of political gain, was the Bengal Hindu Mahasabha in the person of Dr. Shyma Prasad Mukherjee.'

কিন্তু জাতির এরকম একটা দুঃসময়েও কংগ্রেস তার ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল না। মুসলিম লীগের তরফ থেকে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলমান জনসাধারণকে সেবা করার কথা ঘোষণা করা হলো। কংগ্রেসের তরফ থেকে তবু লীগের ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দিতে জনগণকে অনুরোধ করা হলো। কংগ্রেস নেতা জি. ডি. বিড়লা নিজে মুসলিম লীগের তহবিলে প্রচুর অর্থদান করলেন।

এরপর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপর চারিদিক থেকে চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন উঠতে লাগল যে Bengal Relief Committee-র সমস্ত কাজ যদি হিন্দুমহাসভাকেই করতে হয়, তবে মহাসভার নাম দিতে আপত্তি কোথায়? অনেকেই দাবি করলেন যে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা এই সময় প্রমাণের যে সুযোগ পাওয়া গেছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। অনেক ভাবনা চিন্তার পর Bengal Relief Committee. 'Hindu Mahasabha Relief Committtee'-তে রূপান্তরিত হলো।

ওই সময় আবার মুসলিম লীগ সরকার ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা করলে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৩ সালের ২০ ও ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় শ্যামাপ্রসাদ বিক্ষোভ সংগঠন করেন। সেখানে 'খাদ্য চাই' 'খাদ্য দাও' 'অপদার্থ লীগ সরকার নিপাত যাক' প্রভৃতি স্লোগানে প্রতিবাদী ভুখা মানুষ তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করে। সরকার শ্যামাপ্রসাদের সমস্ত বক্তব্য সেন্সর করে। সরকারি নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্যামাপ্রসাদ দাবি করেন যে, 'Political maladministration is at the root of the present catastrophe. No lasting solution can come until India is economically and politically free.' স্বাভাবিকভাবে শ্যামাপ্রসাদের এই ভূমিকা সরকারের অপছন্দ হলো। বৃটিশ সরকার তার গোপন রিপোর্টে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কংগ্রেস 'did little' এবং হিন্দুমহাসভা 'did much' এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "is perhaps the one man who is working for the relief of the distress without sparing himself the least bit."

(দূরদর্শী রাজনীতিক ড. শ্যামাপ্রসাদ—শ্যামলেশ দাশ)

'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা' বলে একটা কথা আছে। শয়তানের কারখানা সব সময়ই সচল ও উৎপাদনশীল। হীন চিন্তা নীচ মনোবৃত্তি সেখানে সবসময় খেলা করে বেড়ায়। তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রাণঘাতী দুর্ভিক্ষের কালে। মনুষ্যত্বের এই চরম লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝেও একদল লোক মরণাপন্নকে নিয়েও ধর্মের বেসাতি করতে ছাড়েনি। খাক্‌সার পার্টি সমেত কয়েকটি মুসলিম সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের আশ্রয় ও খাদ্য দানের জন্য বাংলার বাইরে শিবির খোলে। সেখানে তারা অনাথ হিন্দু বালকবালিকাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করে। এই ঘটনা জানাজানি হলে

খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং শ্যামাপ্রসাদ এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা করতে উদ্যোগী হন —

" When Dr. Shyamaprasad Mukherjee came to know of these activities of the Khaksars he immediately met the Khaksar leaders working in Calcutta and requested them to make over to the Hindu Mahasabha and other Relief Organisations those Hindu destitutes who were picked up by them and sent to their different camps outside Bengal and also to stop further despatch of destitutes from Bengal. .... Due to the strenuous efforts of the Mahasabha under the leadership of Dr. Mookerjee and relief organisations the Government was convinced of the reasonableness of the demand of the Bengal Hindus and thus further removal of Hindu destitutes from Bengal by the Khaksars was stopped" (How the Hindu Mahasabha Fought Bengal Famine) ।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলম্বনে লিখিত চিঠিপত্র, বক্তৃতা ও বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধগুলিকে ভারতের তথা বাংলার তৎকালীন টলটলায়মান রাজনীতির নির্যাস বলা যায়। এসব চিঠি, বিবৃতি ও বক্তৃতা থেকে ব্যক্তি শ্যামাপ্রসাদ, অসাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদ, দূরদর্শী রাষ্ট্রবিদ শ্যামাপ্রসাদ, বাগ্মী শ্যামাপ্রসাদ এবং দেশপ্রেমিক জনদরদী শ্যামাপ্রসাদের পূর্ণ পরিচয় মেলে এবং হুজুগপ্রিয় ও হাততালি লোলুপ রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। ভারতীয় রাজনীতির সন্ধিক্ষণের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসাবে এ রচনাগুলিও স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

শ্যামাপ্রসাদের প্রথম চিঠিখানা বাংলার লাট স্যার জন হার্বার্টকে লেখা— মন্ত্রীত্ব গ্রহণের তিনমাসের মাথায়। মূল বিষয় জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে কি ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সামরিক পন্থা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা ও সুপরামর্শ দান।

দ্বিতীয় চিঠিটিও গভর্ণর হার্বার্টকে লেখা — ২৬/৭/৪২ তারিখে। তখন যুদ্ধ আরও ঘনিয়ে এসেছে ভারত সীমান্তের কাছে। এ চিঠিতেও তিনি গভর্ণরকে প্রতিরক্ষা, আর্থিক অবস্থা, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, খাদ্য সমস্যা প্রভৃতি প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী একগুঁয়েমি, অবিশ্বাস ও ভেদনীতি পরিহার করে এবং জননেতাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সম্পূর্ণ খোলা মনে সমবেতভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সুপরামর্শ দান করেন। কিন্তু লাট সাহেব সেসব হিতবাণী শোনার পাত্রই নন। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অগ্রাহ্য ও হেয় করে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সাহায্যে সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে বদ্ধপরিকর এবং মুসলিম লীগের সপক্ষে ওকালতি ও নষ্টামিতেই তৎপর।

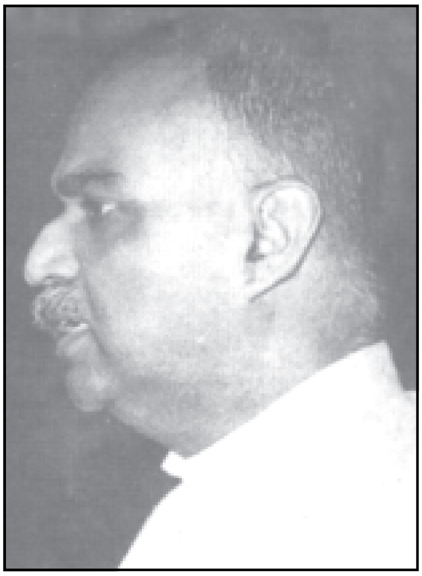

শ্যামাপ্রসাদ

তৃতীয় পত্রখানি বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে লেখা। তারিখ ১২ আগষ্ট ১৯৪২, অর্থাৎ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' ডাক দেবার তিনদিন পরে। পত্রের মূল বক্তব্য জাপান কর্তৃক আসন্ন ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' দাবির আলোকে ভারতকে স্বাধীনতা দানের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য এবং ভারতবাসীকে প্রতিরক্ষার কাজে সক্রিয় ভাবে যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন গঠনমূলক প্রস্তাব। এই চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন, "কংগ্রেসের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে যে দাবি রূপ পরিগ্রহ করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই দাবি সারা ভারতের জাতীয় দাবি। ... বর্তমান ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় কেউ সন্তুষ্ট নয়; ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসানের জন্য অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা আবশ্যক।"

১৬.১২.৪২ তারিখে স্যার জন হার্বার্টকে লেখা পত্রখানিতে শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করেছেন। এই পত্রে তিনি লিখেছেন— "আমার পদত্যাগের কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, আমি সর্বপ্রথম সুযোগে ৯ই আগষ্ট তারিখেই আপনাকে জানিয়েছিলাম যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারত গভর্ণমেন্ট দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেছেন, আমি তা অনুমোদন করিন না।.... আমার দ্বিতীয় কারণের সঙ্গে আপনিই প্রধানত সংশ্লিষ্ট। সেটা হচ্ছে, আমার মতে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে, আপনি মন্ত্রীমণ্ডলের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন।" এই পত্রে শ্যামাপ্রসাদের আত্মমর্যাদাবোধ, স্বদেশবাসীর চরম দুর্দশাকালে বিদেশী শাসককুলের নির্লজ্জ ঔদাসীন্য ও পশুসুলভ আচরণের প্রতি তীব্র ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে। পত্রখানা পড়তে পড়তে ৮৮ বছর পূর্বে লর্ড লিটনকে লেখা তাঁর পিতা স্যার আশুতোষের ঐতিহাসিক পত্রখানার কথা বারবার মনে পড়ে।

পঞ্চম পত্রখানি প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে লেখা পদত্যাগপত্র। সে সঙ্গে গভর্ণরকে লেখা পত্রের নকল সংযোজন করে শ্যামাপ্রসাদ হক সাহেবকে জানিয়েছেন, "ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমি এ

হিন্দু মহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সাম্প্রদায়িক বলে গালাগালি না করে যারা পানি গ্রহণ করেন না— মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার তোষণ পোষণকারী সেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মিথ্যা প্রচারের জবাব। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট— দেশভাগের এই দুই মহাপাপী— একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে কল্পিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একই গামলায় জাবনা খাচ্ছে, জাবর কাটছে। ওদের সঙ্গে জুটেছে কিছু বিকৃত বুদ্ধি ও বিক্রিত বিবেক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক খেতাবধারী ভাড়াটে কলমচীর দল। এদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলা যায় : মিথ্যার বেসাতি বেশিদিন চলে না।

বিশ্বাস রাখি যে বাংলার জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য এবং সাম্প্রদায়িক সুস্থ আবহাওয়া বজায় রাখার জন্য আপনি ও আমি একত্রে কাজ করতে পারব।"

এখানেই দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভয়। হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতারা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নিদ্রা টুটে যয়। শ্যামা—হক মিলনে তারা যে মোটেই খুশি ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

"৮ আগষ্ট 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হবার পূর্বে বড়লাট লিনলিথগো ভারত সচিব অ্যামেরির নিকট টেলিগ্রাফ করে জানান, ফজলুল হকের উপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে, বাংলা সরকার হয়তো এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা (অর্থাৎ কংগ্রেসীদের ধরপাকড়) অবলম্বন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেন। লিনলিথগো বলেন— "Herbert is not very certain of the attitude of Huq who under Shyama Prasad Mukherjee's influence shows signs of wobbling with the result that Bengal Government my be reluctant to take necessary action." (পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুক হক — অমলেন্দু দে)।

মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হয়েছে। এই বিবৃতির শেষাংশটুকু মানুষ শ্যামাপ্রসাদকে বোঝার পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করবে— "**পরিষদের সকল সদস্যের কাছে আমি আবেদন করছি, অত্যাচার ও নির্যাতন সমূলে উৎপাটনের জন্য সংগ্রামে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিবাদ করে নিজেদের দুর্বল করেছি, তার ফলে শক্তিশালী হয়েছে সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদের ভেদ-বৈষম্যের উপর। আজ হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে নয়, বাঙালি ও ভারতীয় হিসাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে আসুন আমরা এমন শাসন প্রবর্তনের দাবি জানাই— যে শাসন আমাদের ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করবে। হিন্দু এবং মুসলমানের বহু বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু উভয়েই আমরা সমানভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করি। অসহনীয় দাসত্বের অবসানের জন্যই আমি আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।**"

'ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের অন্তঃশূন্যতা' শীর্ষক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাত্মক রচনাটিতে শ্যামাপ্রসাদ উক্ত প্রস্তাবের শর্করাচ্ছাদিত তিক্ত বটিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বৃটিশ শাসকগণ হিন্দু-মুসলমানে মানসিক ও রাজনৈতিক বিভাজন সম্পন্ন করে। বৃটিশ মদতে পুষ্ট হয়ে মুসলিম লীগ ভৌগোলিক বিভাজনের দাবি নিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি অর্থাৎ পাকিস্তান দাবি তোলা হয়। ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের ঠিক দু'বছরের মাথায় শাসন সংস্কারের প্রস্তাব অর্থাৎ প্রকারান্তরে দেশভাগের প্রস্তাব নিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দিল্লিতে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম লীগ দেশভাগের প্রস্তাব তোলামাত্র তাকে সমর্থন জানিয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। আর তাদের দাবির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন গান্ধীজী। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে এবং এক বছর পরেই 'রাজাজী ফর্মুলা' নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের ছলনা, শঠতা ও বিভেদাত্মক রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি এই প্রস্তাবের দুরভিসন্ধিমূলক নির্গলিতার্থ প্রকাশ করে বলেছেন, "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনও প্রাদেশিক এককের বিচ্যুত হবার যে অধিকার, তাই নিয়ে আমি সর্বপ্রথম আলোচনা করছি। বস্তুত, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রস্তাবটির মধ্যে ভারত-ব্যবচ্ছেদের বীজ আছে— ভারতীয় জনগণের একটিমাত্র অংশের ইচ্ছাতেই তা অঙ্কুরিত হবে। ... ভারত শাসনে বৃটেনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব রাজনৈতিক ঐক্যবৃদ্ধি। আর ১৯৪২ সালে বৃটিশ রাজনীতিকরা সেই ঐক্য নিজ হাতে ভেঙ্গে দিতে চাইছেন।" সোজা কথায় দাঁড়াল, ভারতভাগে মুসলিম লীগের সোচ্চার দাবি, তাতে বৃটিশের (কৌশলী) সমর্থন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির

(সোল্লাস) সমর্থন আর কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় সমর্থন— এই চতুষ্পদের সমবেত কৃতকর্মের ফল হল ভারত বিভাজন।

সর্বশেষ রচনাটি হল যুদ্ধ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য গভর্ণরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য। ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে, যুদ্ধ সম্পর্কীয় কোনও কাজে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে, শুধুমাত্র শুভেচ্ছামূলক প্রস্তাব গ্রহণে যে যুদ্ধজয় কোনও সুফল দেয় না, শ্যামাপ্রসাদ সে অপ্রিয় সত্যটি স্পষ্ট করে বলেছেন।

এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রচনা ও চিঠিগুলি অভিনিবেশ সহকারে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয় পাঠ করলে পাঠক তৎকালীন সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের, বিশেষ করে বাংলার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারবেন। হিন্দু-মুসলিম বিভেদের এবং ভারতভাগ ও বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পটভূমি কেমন সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়েছে তার পরিচয়ও জানা যাবে।

আর জানা যাবে, হিন্দু মহাসভা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে সাম্প্রদায়িক বলে গালাগালি না করে যারা পানি গ্রহণ করেন না— মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার তোষণ পোষণকারী সেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মিথ্যা প্রচারের জবাব। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট— দেশভাগের এই দুই মহাপাপী— একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে কল্পিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একই গামলায় জাবনা খাচ্ছে, জাবর কাটছে। ওদের সঙ্গে জুটেছে কিছু বিকৃত বুদ্ধি ও বিক্রিত বিবেক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক খেতাবধারী ভাড়াটে কলমচীর দল। এদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলা যায় : মিথ্যার বেসাতি বেশিদিন চলে না। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জার্মান প্রবাসী ভারতীয় লেখিকা মধুশ্রী মুখার্জী "Churchill's Secret War" — চার্চিলের গোপন যুদ্ধের ইতিহাসে গোপন যুদ্ধের বলি সমকালীন বাংলা ও বাঙালীর জীবন-যন্ত্রণার তেমন ছাপ পাওয়া গেল না— যেমনটি ফুটে উঠেছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে। মুসলিম লীগ ও সুরাবর্দীর কুকীর্তি গোপন রাখার প্রবণতাই তার রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

চার্চিলের নেতৃত্বে গ্রেট বৃটেন জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে 'ওপেন ওয়ার'-এ জিতেছে। ভারতীয় সেনারা বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় লাখে লাখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অথচ স্বদেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে সেসব সেনাদের পরিবার পরিজনকে ভাতে মারার জন্য চার্চিল 'সিক্রেট ওয়ার' চালিয়েছেন।

চার্চিলের এই মানুষ মারা খাদ্যনীতির বড় শিকার হয়েছিল দুর্ভাগা বাংলার মানুষ। গ্রন্থখানায় বৃটিশ বিরোধী হিন্দুদের ওপর চার্চিলের ঘৃণা ও ক্রোধের যেমন পরিচয় মেলে, তেমনি মুসলমানদের সহযোগী মনোভাবের পুরস্কার হিসাবে দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রদানের আগাম চিন্তা-ভাবনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গল্প

উইসা

জিষ্ণু বসু

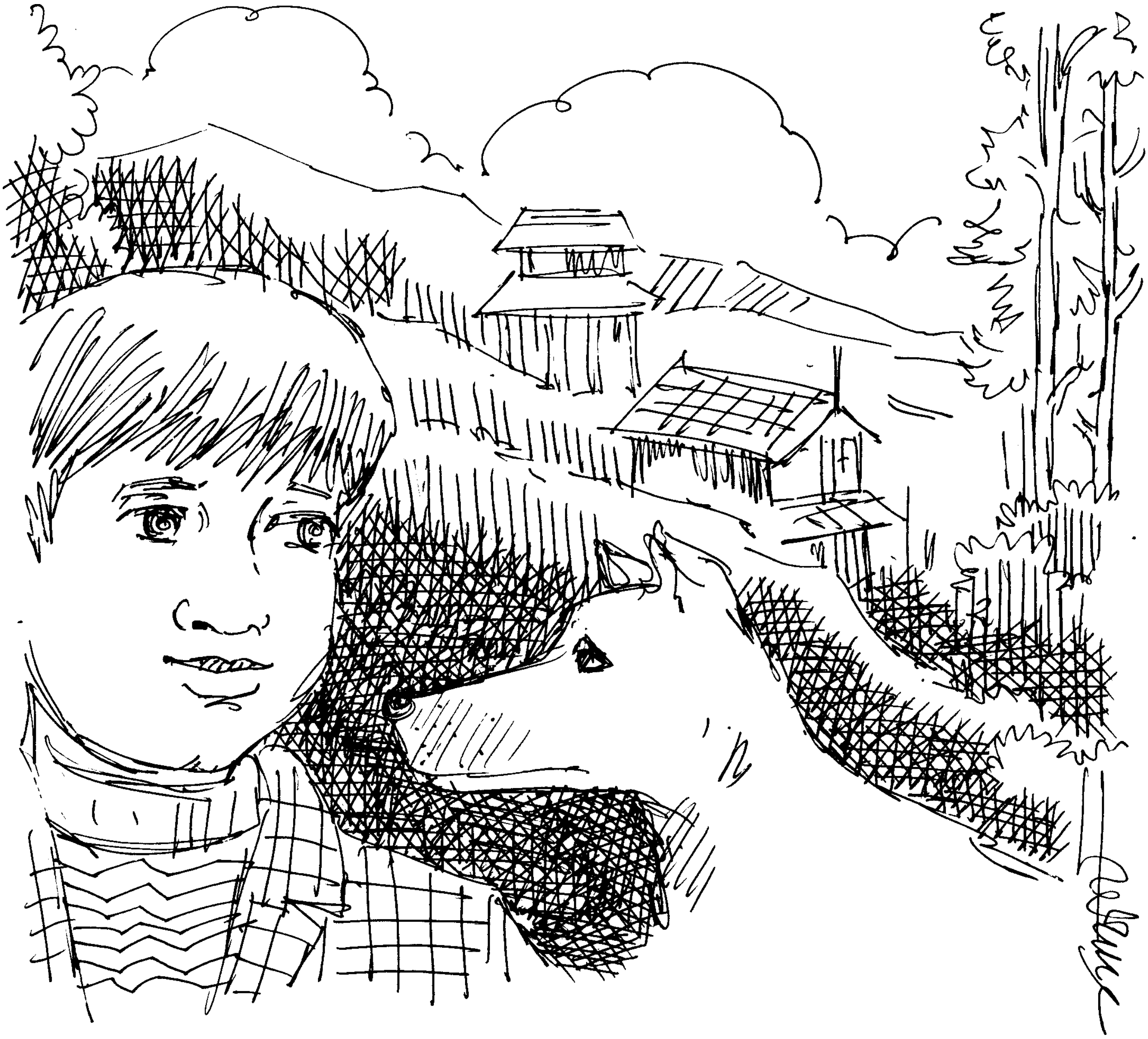

উইসা মানে কুকুরের মাংস। মিজো ভাষায় সা মানে মাংস। যেমন ভকসা মানে শূয়োরের মাংস, আরসা মানে মুরগীর মাংস, উই হলো কুকুর, উইসা তার মাংস। আইজলে সবচেয়ে বেশি দাম সেই মাংসের। পাঁঠার মাংস একশো ষাট টাকা কেজি হলে উইসা দুশো টাকা। মেরী মাউন্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে বেশ কয়েকজন মিজো বন্ধু হয়েছে তমোঘ্নের। লালসাঙ্গ, সানজুয়েলা এরা ওকে ওইসব অদ্ভুত অদ্ভুত খাবারের গল্প করে। সিল্ক তৈরি করে যে হলুদ রেশম পোকা, তার ফ্রাই নাকি দুর্দান্ত লাগে। একদম চিংড়ি মাছ ভাজার মতো। তমোঘ্ন একটু নাক সিটকে ছিল। সানজুয়েলার পরিষ্কার মাথা, জ্যামিতির বাঁকা-তেড়া অঙ্কগুলো ঝপ্ ঝপ্ কষে দেয়। ও বুঝিয়ে দিল, 'তোরা প্রন খাস তো, প্রন তো পোকাই। প্রনও পোকা,

সিল্ক ওয়ার্মও পোকা। যেখানে যেটা পাওয়া যায়, সেখানের মানুষ সেটাই খায়।'

সব মিলিয়ে আইজলটা দারুণ লেগে গেছে তমোঘ্নের। প্রথম যেদিন এখানে এল সেদিনটা ভীষণ মনে পড়ে ওর। প্লেনটা যেখানে নামল সেই বিমানবন্দরের নাম লেংপুই। কি মজার নামটা। লেংপুই থেকে বের হয়েই ওর চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে শুধু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। গাড়িটা খানিকটা এগোতেই সামনে এল একটা বড়সড় কাঠের সাঁকো। অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। তিন চারটে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। সাঁকোটার গায়ে নদীর নাম লেখা, দিদি পড়ে ফেলল— 'ত্লাং'। পরে অনেকবার তমোঘ্ন গিয়েছে ত্লাং নদীর ধারে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেক অনেক নীচে জল। জলের ধারে দাঁড়িয়ে সবুজ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখতে হয় আকাশ। নদীর জলের মধ্যে মধ্যে জেগে আছে পাথর। বেশ চওড়া চওড়া পাথরের সারি চলে গেছে নদীর মাঝখান পর্যন্ত। একটা থেকে লাফিয়ে অন্য পাথরে যেতে এত মজা লাগে। মা পাড়ে দাঁড়িয়ে মানা করছিলেন। পাথরের চাতালের নীচ দিয়েই বয়ে চলেছে খরস্রোতা জলের ধারা। কিন্তু বাবা আরও লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় মাঝখান পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। দিদিটা খুব ফটর ফটর করে কিন্তু আসলে বেশ ভীতু। দিদি দুটো পাথর লাফিয়ে পেরোতেই জামা ভিজিয়ে ফেলল।

কলকাতায় তমোঘ্ন আর দিদি দুটো আলাদা স্কুলে পড়ত, এখানে দু'জনেই ভর্তি হল মেরী মাউন্ট স্কুলে। সকালে হাসপাতালে যাওয়ার পথে বাবা ওদের গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে যান। মা লাইপাতা দিয়ে চিকেনের স্যুপ করে দেন, নয়তো গরম গরম গলা গলা ভাত, আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ, মাখন দিয়ে। লাই পাতা লেটুস পাতার মতো একটা পাতা, এখানে পাওয়া যায়। খুব সুন্দর খেতে। সেই খেয়ে দুই ভাই-বোন পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে চাল্‌তলাং, চাঁদমারী, জারকোয়াট হয়ে স্কুলে। স্কুলটা একটা পাহাড়ের মাথায়। স্কুলের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনেক অনেক দূরে পাহাড় দেখা যায়। দু-তিনটে পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ বাটির মতো উপত্যকা। তাতে মেঘ জমে আছে। মনে হয় যেন সবুজ লাইপাতা দেওয়া গরম স্যুপের বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। রাস্তা থেকে তমোঘ্নদের বাড়িটায় ঢুকতে হয় তিন তলা দিয়ে। তারপর নিচে পাহাড়ের গা বেয়ে দুটো তলা। আর উপরে শুধু এক তলা। রাত্রে আইজল শহরটা এত সুন্দর লাগে যে বলে বোঝানো যায় না। পাহাড়গুলো যেন হীরে মুক্তো দেওয়া আলোর মালা পরেছে। ওদের ঘরে জানালা থেকে সবচেয়ে দূরে যেটা দেখা যায়, তা হ'ল 'আইজল গেট'। দুটো দেওয়ালের মতো পাথরের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট রাস্তা। ওটাই নাকি ছিল আইজলে ঢোকার একমাত্র পথ। এখানে সব লোকই নাকি ওই পথ দিয়েই এই উপত্যকায় ঢুকেছে। রাতে আইজল গেট দিয়ে একটার পর একটা গাড়ি ঢোকে। শুধু আলোর বিন্দুটাই দেখা যায়। তারপর আলোর বিন্দুটা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে নেমে আসে শহরের মাঝখানে, ওদের বাড়ির কাছে। ঠিক যেন বাগাডুলির বোর্ডের গড়িয়ে আসা বল।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে ওরা তো অবাক। বাবাও ফিরেছেন হাসপাতাল থেকে। মা ওদের বললেন, 'ঝটপট ফ্রেস হয়ে এস, সারপ্রাইজ আছে।' ওরা ভাইবোন তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে চলে এল। ডাইনিং টেবিলে এসে তো ওদের চক্ষু স্থির। কত রকম রান্না। মায়ের সেই বিখ্যাত মটন হায়দ্রাবাদী, পাবদা মাছের ঝাল, কই মাছের হরগৌরী, আলু বোখরার চাটনী, রসগোল্লার পায়েস, কি নেই? আর সবার প্রথমে আছে ভেটকী মাছের ফিস বাটার ফ্রাই, দিদি যাকে বলে মাছের বেগুনী। এত রকম মাছ আইজলে পাওয়া যায় না। বাবার এক পেসেন্ট আছেন ধ্রুব কাকু। ধ্রুবকাকুর আসল বাড়ি অসমের শিলচরে। সেখান থেকেই এতসব মাছ নিয়ে এসেছেন। এতসব দেখে বাবাও অবাক, 'এতসব খাবে কে?'

'কাপ্পু লোমা, কাপ্পি আর ছেলে মেয়েদের বলেছি, ওরা এসে পড়ল বলে।'

মিজো ভাষায় কাপ্পু মানে মিস্টার, আর কাপ্পি মিসেস। যে বাড়িতে তমোঘ্নরা থাকে সেই বাড়িটা যাঁর, তিনি হলেন কাপ্পু লোমা। তাঁর দুই মেয়ে সাঙপুই আর জোয়েলা।

সেই রাতটা সারা জীবন ভুলবে না ওরা। লোমাকাকু ভীষণ মজার লোক। নাটক করেন। মিজো ভাষার একটা জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালে কমেডিয়ানের অভিনয় করেন। আর দারুণ ভালো গীটার বাজান।

সেদিন লোমা কাকিমা মাকে উপহার দিয়েছিলেন একটা দারুণ সুন্দর পোয়ান। নানা রঙের হাতের কাজ করা মিজো স্কার্ট আর টপকে বলে পোয়ান। এক সময় মা দারুণ নাচতেন। ভরত নাট্যম, ওড়িশি দুটোই। ওদিন গীটারের সঙ্গে মা নতুন পোয়ান পরে নেচেছিলেন। আর তার সঙ্গে সাঙ্গপুই আর জোয়েলা দুই বোন।

সেদিন থেকে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। লোমা কাকিমা খুব সৌখিন। ভীষণ সুন্দর করে সাজানো ওদের ঘরগুলো। ঘরে আসবাব, সাজানোর জিনিস সব যেন ঠিকঠাক জায়গায় রাখা। কখনও কখনও সন্ধ্যায় ওরা ক্যারাম খেলতে যায় জোয়েলাদের ঘরে। লোমা কাকিমা অনেক রকম ফল দেওয়া পুডিং করে দেন। কখনও বা ঘরে বানানো কুকিস।

বর্ষাকালটাই শুধু বিরক্ত লাগে আইজলে। সারাদিন স্যাঁতস্যাঁতে। বৃষ্টি না হলেও মেঘের রাজ্য দিয়ে যেতে হবে তোমাকে। শুকনো জামা পরে বের হলে ফিরবে ভিজে সপ্‌সপ হয়ে। এই সময় এখানে এক রকম পোকা ডাকে সারাদিন। ডাকটা অদ্ভুত। টিক্ টিক্, টিক্ টিক্।

আজ রবিবার, ছুটি। কিন্তু বাইরে আকাশের যা অবস্থা, সারাদিনই ঘরে বসে থাকতে হবে মনে হচ্ছে।

এ বাড়িতে তমোঘ্নর একটা গোপন আস্তানা আছে। সেটা কেউই জানে না। আসলে বাড়িটা তো পাহাড়ের ঢাল কেটে বানানো। তাই দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা পাথরের খোদল থেকে গেছে। ছাদ করার সময় সেখানে ছাদ হয়েছে। কিন্তু সেই ছোট্ট জায়গাটায় আসা যায় না কোনও বাড়ি থেকে। তমোঘ্নদের পিছনের বারান্দায় যেখানে মা অনেকগুলো টবে একটা ফুলের বাগান করেছেন, তার পাশে ছোট্ট একটা ফাঁক আছে। সেটা দিয়ে কোনমতে গলে আসতে পারে তমোঘ্নর মতো ছোট্ট কেউ। কিন্তু একবার পৌঁছে গেলে জায়গাটা দারুণ মজার। রাস্তার দিকে আর পাহাড়ের ঢালে সবুজ উপত্যকার অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অথচ তোমাকে দেখতে পাবে না কেউ।

আজ সকাল থেকেই আকাশের মুখ গোমড়া দেখে তমোঘ্ন চলে গিয়েছিল ওর গোপন স্থানে। হঠাৎ দেখে দূরে চাঁদমারির বড় রাস্তা থেকে লোমা কাকু আসছে। কাকুর হাতে ওটা কি? একটা বস্তা? আর বস্তার থেকে যেন কিছু একটা মুখ বার করে আছে। হ্যাঁ, কি যেন একটা মুখ বার করে আছে। কি ওটা? দেখতে হচ্ছে তো। গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে ও ছুটে এল সামনের বারান্দায়। দিদি চেয়ারে বসে বাটিতে করে নুডুলস্ খাচ্ছিল। তমোঘ্ন ধপাস্ করে বসে পড়ল ওর পাশের চেয়ারটায়।

'দ্যাখ দিদি, লোমা কাকু না কি একটা নিয়ে আসছে বস্তায় করে।'

বলতে বলতে কাকু চলে এলেন বাড়ির সামনে। মেঘের ঝাপ্‌টা খেতে খেতে একেবারে ভিজে চুপ্পুস দশা। হাতের বস্তায়, মাথা বের করে ওটা কি? আরে একটা কুকুর ছানা। কাকু কলিং বেল বাজাতেই বাড়ির সকলে বেরিয়ে এলো। সাঙপুই, জোয়েলা আর কাকিমা। কুকুরটা দেখে দুই বোন লাফিয়ে উঠল। জোয়েলা হাততালি দিতে দিতে খানিকটা নেচে নিল। লোমওয়ালা কুকুরটার সারা শরীর বস্তা বাঁধা, শুধু মুখটা বার করে এদিক ওদিক দেখছে।

'জোয়েলারা কি কুকুরটাকে পুষবে? ওকে ওইরকম বস্তায় বেঁধে রেখেছে কেন রে দিদি?'

দিদিও অবাক। আনমনে উত্তর দিল, 'তাই তো, কি জানি?'

আস্তে আস্তে ওরা বুঝল ব্যাপারটা। ওরা পুষবে না কুকুরটা। আজ ওদের বাড়িতে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। তাই উইসা রান্না হবে। কুকুরটাকে মেরে রান্না হবে উইসা।

কাকার জামা ভিজে একসা। কাকিমা তাই তাড়া দিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন জামা কাপড় পাল্টানোর জন্য। জোয়েলাকে বললেন, বাবার জন্য শুকনো জামা বের করতে। বলতে বলতে চারজনই ঘরে ঢুকে গেল।

বারান্দায় পড়ে রইল বস্তা বাঁধা কুকুরটা। জলের ঝাপটা আসছে বারান্দায়। কুকুরটা মৃদু কুঁউ কুঁউ করছে। তমোঘ্ন একবার চুক্ চুক্ করে ডাকল। কুকুরটা ঠিক শুনতে পেল। একবার কুতকুতে চোখে তাকালো উপরের দিকে। তমোঘ্নর কি মনে হল, অদ্রিজার হাত ধরে বলল, 'দিদি নিচে চ।'

কুকুরের বস্তাটা নিয়ে সন্তর্পণে উঠতে উঠতে দিদি চাপা স্বরে বলল, 'কিন্তু রাখবি কোথায়?'

বস্তাটা বেশ ভারী। তমোঘ্ন মাথার দিকটা ধরেছিল, বলল, 'আছে একটা জায়গা, চুপচাপ চল।'

অদ্রিজা এই প্রথম দেখল গোপান আস্তানা। বারান্দার বাগানের পেছনে ছোট একফালি জায়গা! বারান্দার ফাঁকটা দিয়ে ভাই সুরুৎ করে গলে পৌঁছে গেল সেখানে। তারপর হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল বস্তায় ভরা কুকুর ছানাটা। গোপন আস্তানার চাতালে রেখে আস্তে আস্তে খুলে দিল বস্তার বাঁধন। তিড়িক করে বেরিয়ে এল বাচ্চাটা। বেরিয়েই ওর নাকটা একটু চেটে দিল। তমোঘ্ন বস্তা বাঁধার দড়িটা নিয়ে হাল্কা একটা ফাঁস দিয়ে বেঁধে রাখল ওকে।

যেমন আশা করেছিল তাই হল। বাইরে বেরিয়ে বস্তা বাঁধা কুকুর দেখতে না পেয়ে লোমাদের পরিবারে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। কাকু, সাঙপুই, জোয়েলা সবাই চেঁচাচ্ছে। ওদের ডাকাডাকিতে আশপাশের বাড়ি থেকেও বেরিয়ে এল দু-একজন ছাতা মাথায়। সবারই বক্তব্য, আশ্চর্য ব্যাপার, এখান থেকে বস্তাটা নেবে কে? আর আইজলে তো বড় একটা চোর ছ্যাঁচ্চোড় নেই। মা-বাবা দু'জনেই নিচে নামলেন। কি একটা অপরাধবোধে তমোঘ্নরা ভাই-বোন নীচে নামল না। খানিকক্ষণ পরে বাবা উঠে এলেন। আরও বেশ কিছু পরে মা। মা এসে বললেন, আজ জোয়েলার জন্মদিন, তাই উইসার স্পেশাল ডিস খাওয়ার কথা ছিল। মেয়েটো কাঁদছে। তারপর তমোঘ্নকে বললেন, 'এই বুচা লোমা কাকিমা তোকে কেন যেন খুঁজছিল, বোধহয় কেক টেক কিছু দেবে।' মা কথাটা বলেই বাবার দিকে ঘুরে বললেন, 'একটু বাজারে যাও না, ছোট্ট মেয়েটার জন্মদিন কিছু একটু তৈরি করে দেওয়া দরকার।' কেক আনতে তমোঘ্ন আর নীচে যায়নি। দিদি বাবার সঙ্গে বাজারে গেল। ও উপর থেকে দেখল, বাবা বের হবার সময় কাকু অনেকক্ষণ ধরে কিসব বলছেন। বাবা আর দিদি বেরিয়ে গেলে ও একটা বাটিতে হেল্‌থ ড্রিংসের সঙ্গে দুটো বিস্কুট গুলে দিয়ে গেল ঘোচুকে। এর মধ্যে তমোঘ্ন ওর নাম দিয়ে ফেলেছে, একাই নাম ঠিক করল। দিদি নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

দু'ব্যাগ ভর্তি বাজার করে ফিরলেন বাবা। দিদিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল তমোঘ্ন, 'লোমা কাকু কি বলছিল রে এতক্ষণ ধরে।'

'বলছিল আগে এসব চুরি চামারি হত না। এখন আইজলের বাইরে থেকে অনেক লোক আসছে। তারাই এখানের সততা নষ্ট করছে, এইসব...।'

'ওঃ, এই কথা!' একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ভাই।

মা জোয়েলার জন্য দারুণ সব পদ রান্না করলেন। বৃষ্টির দুপুরটা সুস্বাদু খাবারের

গন্ধে একেবারে ম-ম করে উঠল। বাটি, বাটি করে খাবার দিয়ে আসা হল নীচে জোয়েলাদের। জোয়েলার সুবাদে তমোঘ্নদের খাওয়াটাও হঠাৎ বেশি রকম ভালো হয়ে গেল। খাওয়ার শেষে বাটিতে করে ভাত নিয়ে ঘোচুকেও দিয়ে এল তমোঘ্ন। খাবার দিয়ে ঘোচুকে বুঝিয়ে বলে এল, 'একদম চেঁচাবি না, বড়রা জানতে পেলেই সর্বনাশ।' ঘোচু লেজ, মাথা একসঙ্গে নেড়ে বলতে চাইল, 'বটেই তো, বটেই তো।'

কিন্তু দুপুরে সবাই যখন চুপচাপ, সেই নিস্তব্ধতায় দু-একবার ভেসে এল ঘোচুর কুঁউ কুঁউ শব্দ। মা একবার বললেনও 'কি যেন একটা ডাকছে।'

কিন্তু সেই টিক্ টিক্ করা পোকাদের একটানা ডাক আস্তে আস্তে ঘোচুর অনিচ্ছাকৃত ভুল ঢেকে দিল।

রাত্রে দুই ভাই বোন ভাবতে বসল, ঘোচুকে নিয়ে কি করবে। একবার ভাবল রাতের অন্ধকারে কোলে করে নিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ছেড়ে দেব। কিন্তু আবার ভাবল, যদি আবার কেউ ধরে নেয়! তাছাড়া ওকে ছেড়ে দিতে একদম মন চাইছে না। কি যে করা যায়....

এর মধ্যে মায়ের ডাক এল রাত্রে খাওয়ার। রাত্রে খেয়ে উঠে দিদি একবার কি যেন বলছিল। কিন্তু তমোঘ্নর চোখে তখন রাজ্যের ঘুম। সারা দিন যা গেল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল মায়ের ডাকে—'এই বুচা ওঠ। দ্যাখ কাকিমা আর জোয়েলা কি বলতে এসেছেন।'

চোখ কচলাতে কচলাতে এসে তমোঘ্ন দেখল, ওরা লিভিং রুমের বড় কাউচের ওপর বসে আছে। দু'জনেই হাসছে। কাকিমার হাতে একটা কিসের যেন প্যাকেট।

কাকিমা বললেন, 'তমোঘ্ন, হোয়ার ইস ইয়োর ডগি?'

তমোঘ্নর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। তবে কি সব জেনে গেছে? কি হবে এখন?

'কাল তুমি আর তোমার দিদি যখন বস্তাটা নিয়ে উপরে উঠছিলে, আমি তখনই তোমাদের দেখেছি।'

অদ্রিজাও এসে দাঁড়িয়েছে লিভিংরুমে, 'তাহলে আমাদের কিছু বললেন না কেন? এতসব চেঁচামেচি হলো।'

কাকিমার শান্ত উত্তর, 'তোমরা তো ভাল কাজই করেছ। জেসাস জোয়ালার জন্মদিনে তোমাদের দিয়েই ভালো কাজটা করিয়েছেন। কাল রাত্রে আমি সবাইকে বোঝালাম। প্রথমে একটু রেগে গিয়েছিল, তারপর সবাই মেনে নিল।'

জোয়ালার লঙ্কাচেরা চোখের কোণে হাসি, 'তাই মা কাল সন্ধ্যায় ডগ বিস্কিট কিনে এনেছে। ওকে আমরা সবাই মিলে পুষব।'

বাবা-মা দু'জনেই হতবাক। কাকিমা তাড়া লাগালেন, 'ব্রিং দ্য ডগ। ইজ ইট অলরাইট?'

তমোঘ্ন সম্বিৎ ফিরে পায়, 'হ্যাঁ, আছে। ভালই আছে। এখুনি নিয়ে আসছি।'

ও তাড়াতাড়ি ছুটে যায় গোপন আস্তানা থেকে ঘোচুকে বের করে আনতে। যাক ঘোচুর একটা হিল্লে হল। তবে গোপন আস্তানাটা কখনোই বড়দের দেখানো যাবে না।

চুমকি, ক্ষমা করো

রমানাথ রায়

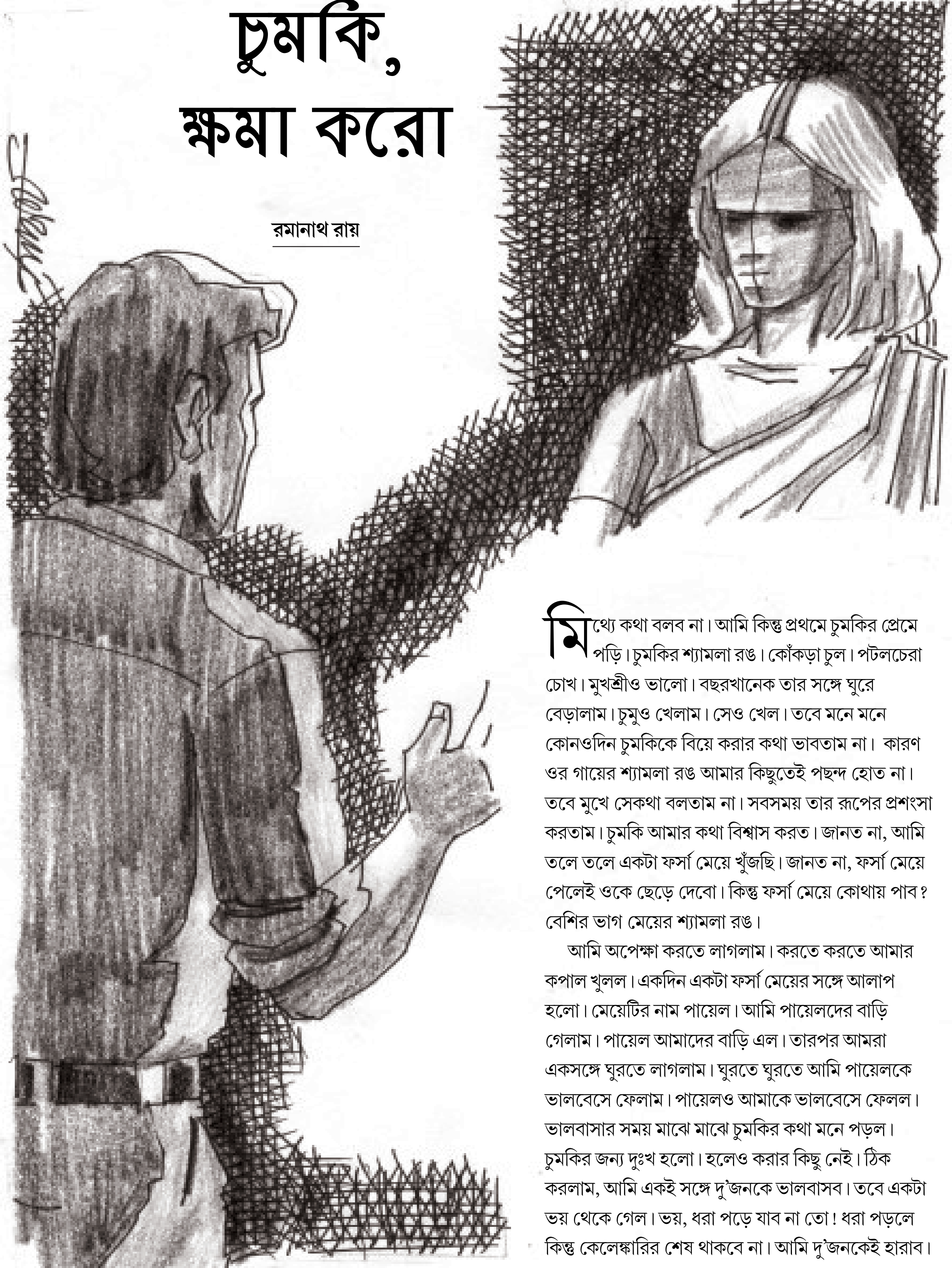

মিথ্যে কথা বলব না। আমি কিন্তু প্রথমে চুমকির প্রেমে পড়ি। চুমকির শ্যামলা রঙ। কোঁকড়া চুল। পটলচেরা চোখ। মুখশ্রীও ভালো। বছরখানেক তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। চুমুও খেলাম। সেও খেল। তবে মনে মনে কোনওদিন চুমকিকে বিয়ে করার কথা ভাবতাম না। কারণ ওর গায়ের শ্যামলা রঙ আমার কিছুতেই পছন্দ হোত না। তবে মুখে সেকথা বলতাম না। সবসময় তার রূপের প্রশংসা করতাম। চুমকি আমার কথা বিশ্বাস করত। জানত না, আমি তলে তলে একটা ফর্সা মেয়ে খুঁজছি। জানত না, ফর্সা মেয়ে পেলেই ওকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু ফর্সা মেয়ে কোথায় পাব? বেশির ভাগ মেয়ের শ্যামলা রঙ।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। করতে করতে আমার কপাল খুলল। একদিন একটা ফর্সা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটির নাম পায়েল। আমি পায়েলদের বাড়ি গেলাম। পায়েল আমাদের বাড়ি এল। তারপর আমরা একসঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে আমি পায়েলকে ভালবেসে ফেলাম। পায়েলও আমাকে ভালবেসে ফেলল। ভালবাসার সময় মাঝে মাঝে চুমকির কথা মনে পড়ল। চুমকির জন্য দুঃখ হলো। হলেও করার কিছু নেই। ঠিক করলাম, আমি একই সঙ্গে দু'জনকে ভালবাসব। তবে একটা ভয় থেকে গেল। ভয়, ধরা পড়ে যাব না তো! ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আমি দু'জনকেই হারাব।

শুধু তাই নয়, দু'জনেই আমার জীবন নরক করে তুলবে। অতএব আমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে।

কিন্তু মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। তারা কী করে যেন সব টের পেয়ে যায়। আসলে মেয়েরা ভীষণ সন্দেহপ্রবণ।

একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আমি আর চুমকি দু'কাপ কফি নিয়ে গল্প করছিলাম। তখন সকাল এগারোটা। এমন সময় পকেটে মোবাইল বেজে উঠল। এসময় আবার কার ফোন এল? বিরক্তিকর। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, পায়েল ফোন করেছে। সর্বনাশ! এখন কি করব?

চুমকি জিজ্ঞেস করল, কার ফোন?

— এক বন্ধুর ফোন। — বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। এসে ফোনটা ধরলাম।

— হ্যালো...

পায়েল জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কোথায়?

মিথ্যে কথা বললাম, শ্যামবাজারে।

— কী করছ?

আবার মিথ্যে কথা বললাম, ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে এসেছি।

— বিল জমা দিয়ে একবার বাড়িতে আসতে পারবে?

আবার মিথ্যে কথা বললাম,— বিশাল লাইন পড়েছে। যাওয়া সম্ভব হবে না।

— তাহলে কাল এসো।

— কখন?

— সকালে।

— চেষ্টা করব। — বলে ফোনের লাইন কেটে দিলাম। দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। টেবিলে এসে বসলাম। বসতেই দেখি, চুমকির মুখের চেহারা বদলে গেছে। বুঝতে পারলাম, চুমকি ভীষণ রেগে গেছে।

চুমকি জিজ্ঞেস করে, — কার ফোন? সত্যি কথা বলো।

— এক বন্ধুর ফোন।

— মিথ্যে কথা।

— মিথ্যে কথা কেন?

— বন্ধুর ফোন হলে টেবিলে বসেই কথা বলতে। বাইরে বেরিয়ে যেতে না।

— কী বলছ তুমি! এখানে বসে কথা বলা যায়!

— কেন যাবে না?

— চারপাশে এত কথা এত শব্দ যে আমি তার কথা শুনতে পাব না। সেও আমার কথা শুনতে পাবে না।

— বাজে কথা। দেখি তোমার মোবাইলটা।

— মোবাইল দিয়ে কী হবে?

— দেখব কে তোমাকে ফোন করেছে।

— না, দেখতে হবে না।

— আমি দেখব। দাও মোবাইলটা।

— না, দেব না।

— তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। — বলে চুমকি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, — কোথায় যাচ্ছ?

চুমকি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর ভাবলাম, ভালোই হল। আমি তো চুমকির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতেই চেয়েছিলাম। এত সহজে সেটা হয়ে গেল, দেখে খুশি হলাম। আমি এখন নিশ্চিন্ত। চুমকি আর আমাকে ফোন করবে না। আমিও আর চুমকিকে ফোন করব না। চুমকি আস্তে আস্তে আমাকে ভুলে যাবে। আমিও চুমকিকে ভুলে যাব। ফলে পায়েলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে আমার অসুবিধা হবে না।

কিন্তু পরদিন সকালে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটল। চুমকির মা আমাকে মোবাইলে ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, চুমকি আর নেই।

ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানে?

— চুমকি কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে।

— কেন?

— জানি না।

আমি এবার উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু লিখে গেছে?

— না।

ঘাম দিয়ে আমার যেন জ্বর ছাড়ল। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। চুমকি যদি তার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করে লিখে যেত, তাহলে আমার হাজতবাস কেউ আটকাতে পারত না। আমি মনে মনে চুমকির আত্মাকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর চুমকির মাকে বললাম, মাসিমা, আমি এখনই আসছি।

চুমকির মা বললেন, তাড়াতাড়ি এসো। তুমি এসময় পাশে থাকলে খুব ভালো হয়।

আমি মোবাইল বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পায়েলদের বাড়ি আর যাওয়া হলো না।

।। দুই।।

এরপর তিনমাস কেটে গেছে।

একদিন আমি আর পায়েল সন্ধ্যেবেলা রবীন্দ্র সদনে সিঁড়িতে বসেছিলাম। চারদিক বেশ ফাঁকা। আমরা নানা বিষয় নিয়ে নানা কথা বলছিলাম। বলতে বলতে পায়েল হঠাৎ বলল, বাবা তোমাকে ডেকেছে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কেন?

— বোধহয় বিয়ের কথা বলবে।

— কার বিয়ে?

— কার আবার! আমাদের।

— এখনই বিয়ের তাড়া কেন?

— জানি না। তুমি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করো।

— কবে?

— কাল সন্ধ্যেবেলা এসো। আসবে তো?

— আসব।

তারপর আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বাড়ি চলে এলাম। এসে বাবা-মা'র পাশে বসে টিভি দেখলাম। দেখার পর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে বিয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা ঠিক হবে না। কারণ, প্রেম করায় কোনও ঝামেলা নেই। মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা বললেই চলে। কিন্তু বিয়ে করলে হাজার ঝামেলা পোহাতে হবে। কী করব তাহলে? কাল কি পায়েলের বাবার

সঙ্গে দেখা করব? যদি না করি তাহলে পায়েল রেগে যাবে। পায়েল আমার হাতছাড়া হতে পারে। তখন পায়েলের মতো ফর্সা মেয়ে পাওয়া কঠিন হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে রাত বাড়তে লাগল। ঘরের হাল্কা নীল আলোয় সবকিছু আলোকিত হয়ে আছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। আর ঠিক তখনই আমার কপালে একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগল। আমার সারা শরীর শির্‌শির্ করে উঠল। আমি উঠে বসলাম। বসতেই দেখি একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম— কে?

ছায়ামূর্তি বলল— চুমকি। আমাকে চিনতে পারছ না?

আমি শিউরে উঠলাম,— তুমি কী চাও? কেন এসেছ?

ছায়ামূর্তি বলল— তুমি পায়েলকে বিয়ে করো না।

— কেন?

— মেয়েটা ভালো নয়। তাছাড়া....

— তাছাড়া কী?

— আগে ওর দু'বার বিয়ে হয়েছিল। একটা ছেলেও আছে। তোমাকে এ নিয়ে কিছু বলেনি?

— না।

— অতএব সাবধান। — বলে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে বিছানায় বসে রইলাম।

পরদিন পায়েলকে ফোনে জানিয়ে দিলাম আজ যেতে পারব না। কবে যেতে পারব তা ফোন করে জানিয়ে দেব। পায়েল এতে রেগে গেল। রাগুক। আমি এখন পায়েলের অতীত ইতিহাস জানতে চাই। টাকা খরচ করে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে গোয়েন্দা জানাল, পায়েলের আগে সত্যি সত্যি দু'বার বিয়ে হয়েছিল। দু'জনের সঙ্গেই ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটি ছেলেও আছে। শুধু তাই নয়, ডিভোর্স করে দু'জনের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে পায়েলকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম— তোমার আগে দু'বার বিয়ে হয়েছিল? তোমার একটি ছেলেও আছে? একথা আমাকে বলোনি কেন?

উত্তরে পায়েল কিছু না বলে ফোন নামিয়ে রাখল। দ্বিতীয়বার আর পায়েলকে ফোন করলাম না। পায়েলও করল না। মনে মনে চুমকিকে ধন্যবাদ দিলাম। চুমকির জন্য খুব জোর বেঁচে গেছি।

এবার চুমকির জন্য আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চুমকির সঙ্গে আমি যে অন্যায় করেছি, তার জন্য দুঃখ হতে লাগল। আমার চোখ ফেটে জল চলে এল। ভালো করে খেতে পারলাম না। রাত্রির অন্ধকারে রোজ বলতে লাগলাম, চুমকি, আমাকে একবার দেখা দাও। আমি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা কর।

একদিন রাত্রে চুমকির ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে ধরতে গেলাম। সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তারপর আর চুমকি দেখা দেয়নি।

সখারাম গণেশ দেউস্কর শতবর্ষ পরে

নিখিলেশ গুহ

ভারতবর্ষের দুই বিপরীত প্রান্তের দুটি প্রদেশ বাংলা ও মহারাষ্ট্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তারা পরস্পরের হাত ধরেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারাই ছিল এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। দেশের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একরকম তাদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু নেতাদের রেশারেশি এবং সামগ্রিক অসংহতির ফলে তাদের পক্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জাতির বিপর্যয় দেখে উনিশ শতকের শুরুতে সদাশিব বিট্‌ঠল দেউস্কর নামে এক মারাঠা ব্রাহ্মণ কাশীধামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিবাহসূত্রে তিনি দেওঘরের কাছাকাছি করোঁ গ্রামে একখণ্ড নিষ্কর জমি লাভ করেন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁদের কারুর দাম্পত্যজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বৈধব্য দশা মেনে কন্যাকে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হয়। সদাশিব বিট্‌ঠলের

পৌত্র এবং গণেশ সদাশিব দেউস্করের পুত্র আলোচ্য কাহিনীর নায়ক সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর (পৌষ ১৩২৬ সংবৎ) শুক্লা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। গণেশ সদাশিব এবং তাঁর বিধবা বোনের স্নেহচ্ছায়ায় সখারাম বড় হয়ে ওঠেন। পিতা ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁর কাছে সখারাম শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পান। পিসীমার কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির কথা তিনি শুনেছিলেন। সদাশিব বিট্‌ঠলের পুত্র-কন্যা দুজনেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, শাস্ত্রজ্ঞ। এরকম পরিবেশে বড় হয়ে সখারাম যে পরবর্তীকালে জাতীয় চিন্তা ও চেতনার ধারক বাহক হয়ে উঠবেন, এতে আর আশ্চর্য কি!

একটু বয়স হলে সখারামকে দেওঘরের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তখন প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু, কবি মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতকার হিসাবে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চায় সখারামের আগ্রহ বৃদ্ধিতে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। জীবনের এই পর্বে সখারামের ওপর অন্য যিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি হলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি তখন দেওঘরে জীবনযাপন করছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেছেন—''তিনি (সখারাম) সময় পাইলেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। বসু মহাশয় পরম ধার্মিক, সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী ও মজলিশী লোক ছিলেন। সখারাম নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন।" জাতীয় চেতনার প্রসারে রাজনারায়ণ বসুর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। ''হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব" নামক প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীকে প্রাচীন ভারতের গৌরব সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হোত।

সেকালের প্রথা অনুসরণ করে অল্প বয়সে সখারামের বিবাহ হয়। বিবাহের পর ১৮৯১ খৃস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সংসারের চাপ বৃদ্ধির ফলে তাঁর পক্ষে প্রথাসিদ্ধ শিক্ষালাভ আর সম্ভব হয়নি। বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সাংসারিক দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও সখারামের বিদ্যাচর্চায় কিন্তু এতটুকু ভাটা পড়েনি। বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসাবেই তিনি সেকালের বিখ্যাত ''নবভারত" পত্রিকায় ''প্রাচীন মহারাষ্ট্র" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা (অগ্রহায়ণ ১২৯৭)। পুস্তকাকারে তাঁর প্রকাশিত প্রথম রচনা ''এটা কোন যুগ"। (২ সেপ্টেম্বর ১৮৯২, বাংলা ১৮ ভাদ্র ১২৯৯)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি ''তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু কাল গণনার মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধটি সেকালে পণ্ডিত মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

১৮২৩ খৃস্টাব্দে দেওঘর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে সেকেন্ড পণ্ডিতের পদে সখারাম নিযুক্ত হন। বেতন পনেরো টাকা। ছাত্রদের তিনি সহজেই আকৃষ্ট করতে পারতেন। মহারাষ্ট্রে এই সময়ে তিলকের নেতৃত্বে শিবাজী উৎসব প্রবর্তিত হয়। সখারাম তাঁর ছাত্রদের কাছে শিবাজীর আদর্শ প্রচার করতেন। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তখন দেওঘর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। স্মৃতিকথায় সখারাম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

''নিচের ক্লাসের শিক্ষক হলে হবে কি, তাঁর ও হেড মাস্টার মশাইয়ের মতো ছেলেদের জনপ্রিয় শিক্ষক এমন কেউ আর দেওঘরে তখন ছিলেন না।

''স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে খুব ভালোবাসার জিনিস ছিলেন সখারামবাবু। দীর্ঘছন্দ ঋজু দেহ, কেশ-বহুল বিস্তৃত বক্ষ, দ্রুত দৃঢ়সঙ্কল্পের গতি, সুকৃষ্ণ গুম্ফ, ঘন ভ্রূযুগ, সুরসিক, সদাহাস্যপরায়ণ অথচ আদর্শবাদী এই মানুষটি ছিলেন সব বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রাণ। আমাদের দরিদ্র ভাণ্ডার, কুষ্ঠাশ্রম সাহায্য সমিতি, সবকিছুর ইনিই ছিলেন নেতা। তখন ১৮৯৪ সাল, অত আগে আমরা এই সখারামবাবুর প্রেরণায় দাড়োয়া নদীর স্তব্ধ বালুচরে লাঠি খেলতুম, নন্দন পাহাড়কে দুর্গ করে একদল মোঘল আর অন্যদল মাওলী সেনা সেজে যুদ্ধ করলুম। সখারামবাবুর জীবনে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল শিবাজীর জীবনচরিত লিখে যাওয়া, মহারাজ বীর ছত্রপতির এতবড় শ্রদ্ধালু পূজারী আমি আর দেখিনি। এঁর প্রাণাগ্নির আঁচ পেয়ে আমরাও নেপোলিয়ন ও শিবাজীকে করেছিলুম আদর্শপুরুষ।"

ছাত্রমহলে এই জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও দেওঘরে সখারামের বেশিদিন শিক্ষকতা করা হলো না। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্ড সম্পর্কে ''হিতবাদী" পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পায়। সখারামের লেখা ওই কাগজে যেহেতু নিয়মিত প্রকাশ পেত, ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহ করলেন— গোটা ঘটনার পিছনে তিনি আছেন। সখারাম এবং তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসুকে দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা হয়। ''হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই দুর্দিনে সখারামকে ত্রিশ টাকা মাস মাহিনায় প্রুফ পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। সখারামের পক্ষে এ একরকম সাপে বর হলো। দেওঘর ছেড়ে তিনি কলকাতায় বিপুল কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রে নিমজ্জিত হলেন। কর্মদক্ষতার গুণে অল্পকালের মধ্যে তিনি ''হিতবাদী" পত্রিকার একজন প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠেন। বাইরের জগতে তখন সরকারের সঙ্গে সঙ্ঘাতের এক নতুন পর্ব শুরু। উনিশ শতকের শেষ বছরে ভারতের শাসনকর্তা হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ঝাড়ে-বংশে নির্মূল করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রতিবাদে স্বাদেশিকতার অভূতপূর্ব জনজোয়ারে ভাসল বাংলা।

বিশ শতকের প্রথম দশকে এদেশে জাতীয় আন্দোলন যাঁদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল সখারাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯০২ খৃস্টাব্দে শ্রী অরবিন্দের নির্দেশে তাঁর অনুজ বারীন্দ্রকুমার বাংলায় বিপ্লবী দলগুলি সংগঠনের জন্য পশ্চিম ভারত থেকে আসেন। তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে সখারামের যোগাযোগ ঘটে। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ঘাটে আলোচনার মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। কর্মী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে যেতেন। এ তথ্য বারীন্দ্রকুমারের জীবনীকার ক্ষীরোদকুমার দত্ত বলেন—''ভারতে ভাবী সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে, বারীন্দ্রকুমারের মুখে

একথা শুনে তাঁর শৈশবের মন্ত্রদাতা শিক্ষাগুরু তো আনন্দে আত্মহারা। যতীন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও পি. মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সমিতির অন্তরঙ্গ কর্মী হলেন। ক্রমে তাঁর উপর ভার পড়ল অনুশীলন সমিতির অর্থনীতির ক্লাস নেবার।" অনুশীলন সমিতি ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সতীশচন্দ্র বসু বলেছেন—

"সখারামবাবু অনুশীলনের Moral Class-এ বক্তৃতা দিতেন। আমি তাঁহাকে (পি.) মিত্রের কাছে লইয়া যাই। এই বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্বে হেম মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগন ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি জাপান প্রফেসর ওকাকুরাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়া আনেন কিন্তু কোন সমিতি ইহারা গঠন করেন নাই।"

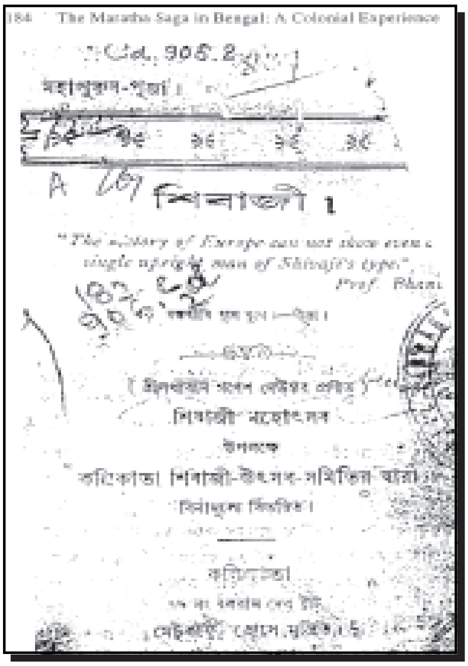
184 The Maratha Saga in Bengal: A Colonial Experience

শিবাজী।

"The history of Europe can not show even a single upright man of Shivaji's type." — Prof. Bhan[illegible]

সখারাম দেউস্কর প্রণীত 'শিবাজী' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

ইংরেজ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের দিকটা উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের রচনায় প্রথম উদঘাটিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতের অতীত সমৃদ্ধির পাশাপাশি সমকালীন দুর্গতির চিহ্ন তুলে ধরে তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেন,—সরকারী নীতির ফলে কিভাবে দেশীয় শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এদেশের সম্পদ বিভিন্ন সূত্রে নিষ্কাশিত হয়েছে। বিপরীতে সরকার পক্ষ থেকে ভারতের শ্রীবৃদ্ধির যে-সব লক্ষণ প্রচারিত হোত (রেলপথ প্রবর্তন যার অন্যতম), আদতে সেগুলি যে বৃটিশেরই স্বার্থনির্বাহী,—জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা তা-ও প্রতিপন্ন করেন। এর বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী ও বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। স্বদেশীর বার্তা এর অর্ধ শতক আগে প্রথম প্রচার করেছিলেন মারাঠী জাতীয়তাবাদী নেতা গোপালরাও দেশমুখ। হিন্দু মেলার বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে (১৮৬৭-৮০) স্বদেশী পণ্য প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে অল্প সময়ের জন্য একটি স্বদেশী ভাণ্ডার পরিচালনা করেন। সরলা দেবীও এদিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯০৩ সালে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে একটি স্বদেশী বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করেন। অন্যদিকে বাংলায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের আহ্বান প্রথম জানিয়েছিলেন মহর্ষি ভোলানাথ চন্দ্র। "মুখার্জী'স ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে এই মর্মে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বস্তুত তাঁর লেখা থেকেই এই রাজ্যের মানুষের মনে স্বদেশী ও বয়কটের চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে এমনও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

সখারাম স্বদেশী ভাবধারার অন্যতম প্রচারক ছিলেন। মুম্বাইয়ের দেশী মিলের মোটা কাপড় তিনি অঙ্গে ধারণ করতেন। তার পাড়ের রং পাকা হোত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই গ্রাহ্যেই আনতেন না। সখারামের অর্থনৈতিক চিন্তার সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রকাশ "দেশের কথা" গ্রন্থে। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে এই সময়ে সখারামের যে চিত্র আমরা পাই তা নিম্নরূপ—

"আমাদের রাজনীতিক জগতের ভাণ্ডার ছিল যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী, আনন্দমঠ ও ম্যাটসিনির আত্মচরিত। আর ভারতীয় অর্থনীতির জ্ঞান আমরা আহরণ করিতাম ডিগবি ও দাদাভাই নৌরজীর পুস্তক হইতে। যাঁহার বেশী দৌড় ছিল, তিনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক মতবাদ, সোসালিজম ও রুশীয় বৈপ্লবিকদের ইতিহাস পড়িতেন। এইসব বৈজ্ঞানিক মালমসলা লইয়া সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের লইয়া ক্লাস করিতেন। তিনি নাকি বৈপ্লবিক নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই 'দেশের কথা' পুস্তক লেখেন। দেউস্কর মহাশয় আমাদের ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী।"

"দেশের কথা" গ্রন্থের ভিন্ন এক উৎসের নির্দেশ করেন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ডঃ ভবতোষ দত্ত। পাঞ্জাব প্রদেশাগত এক বন্ধুর সঙ্গে সখারাম একদিন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। আলোচনায় স্বামীজির মুখে কেবল ভারতের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার সমস্যার কথা শোনা গেল। বিদায় নেবার সময় পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বলেন, —স্বামীজির কাছ থেকে আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভের অনেক আশায় তিনি এসেছিলেন; কিন্তু আলোচনা বাস্তব সমস্যাতেই আটকে রইল। স্বামীজি জবাব দেন—

"Sir, so long as even a dog of my country remains without food, to feed and take care of him is my religion and anything else is either non-religion or false religion." এই ঘটনা ১৯০২ সালে হওয়াই সম্ভব। কারণ, আমরা জানি কলকাতায় শিবাজী উৎসবে পৌরোহিত্যের অনুরোধ নিয়ে সখারাম সে সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজির পক্ষে সে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর অল্পকাল পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন। এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে সখারাম পরে বলেন,— স্বামীজির সেদিনের

কথাগুলি তাঁর অন্তর দগ্ধ করেছিল, দেশাত্মবোধ কাকে বলে তিনি সেই সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন। ''দেশের কথা'' গ্রন্থ রচনার পিছনে স্বামীজির বক্তব্যের প্রভাব অধ্যাপক দত্ত উল্লেখ করেছেন।

''দেশের কথা'' বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এক অমূল্য সংযোজন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং দীনেশচন্দ্র সেনের মতো সেকালের প্রধান মনীষীরা গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রী অরবিন্দ বলেন—

"This book had an immense reperenssion in Bengal, captured the mind of young Bengal and assisted more than anything else in the preparation of the Swadeshi movement." স্বদেশী যুগে ''দেশের কথা'' যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বিক্রয় পরিসংখ্যান তার একটি অকাট্য প্রমাণ। ১৯০৪ সালের জুন মাসে এর প্রথম সংস্করণ (১০০০ কপি) প্রকাশ পায়। পরের বছর তা পুনঃ প্রকাশিত হয় (২০০০ কপি)। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার চার দিন আগে গ্রন্থটি বর্ধিত কলেবরে পুনরায় প্রকাশ করতে হয় (অক্টোবর ১৯০৫)। চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট না হওয়ায় ১৯০৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গ্রন্থটির আরও পাঁচ হাজার কপি ছাপতে হয়। ১৯০৭ এবং ১৯০৮ সালে গ্রন্থটির আরও দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই শেষ সংস্করণে বঙ্গভঙ্গের উপর একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল। এছাড়া ''কৃষকের সর্বনাশ'' নামে গ্রন্থটির শেষাংশ স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের পক্ষে এই অভুতপূর্ব সাড়া কম বিস্ময়কর ছিল না। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ''দেশের কথা''-র নূতন সংস্করণ প্রকাশের সময়ে গ্রন্থারম্ভে সখারাম লেখেন—

''বঙ্গীয় পাঠক সমাজে এরূপ নীরস বিষয়পূর্ণ পুস্তকের সমাদর হইবে, তাহা পূর্বে কল্পনা করিতে পারি নাই। তাহাদিগের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াও মূল্য পূর্ববৎ রাখা হয়। পরন্তু বার আনা মূল্যের ''দেশের কথা''র একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিতে সাহসী হই''।

''লর্ড কার্জনের যথেচ্ছাচারে দেশবাসীর চিত্ত বৈদেশিক মোহপাশ ছিন্ন করিয়া স্বদেশের অভিমুখী হওয়ায়, দেশের কথা জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে 'দেশের কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলি অতি স্বল্প সময়েই নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন পুস্তকের আকার বৃদ্ধিপূর্বক তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। ওই সংস্করণের পঞ্চম সহস্রখণ্ড দেড় বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর চতুর্থ সংস্করণের বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ ও অনেক ইংরাজী অংশের বঙ্গানুবাদ নূতন সংযোজন করা হইয়াছিল। এই পঞ্চম সংস্করণেও এই গ্রন্থে কতিপয় নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। পরন্তু বহুদিন হইতে অনেকে গ্রন্থের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য যে অনুরোধ করিতেছিলেন, এবার তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সাধারণের সুবিধার জন্য এই চতুঃশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী রাজ সংস্করণের মূল্য পাঁচ সিকা স্থলে একটাকা ও সুলভ সংস্করণের মূল্য বার আনা স্থলে আট আনা মাত্র করা হইল।''

বিংশ শতকের শুরুতে বাংলায় প্রতি বছর মহা সমারোহে শিবাজী উৎসব পালিত হোত। সখারাম ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। শিবাজী বৃত্তান্ত বাংলার প্রথম প্রচার করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদদের যিনি পথ প্রদর্শক। তার সম্পাদিত ''বিবিধার্থ সংগ্রহ'' পত্রিকায় প্রথমে প্রবন্ধ আকারে ''শিবাজীর চরিত্র অর্থাৎ যবনপ্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবনবৃত্তান্ত'' প্রকাশের পর ১৮৬০ এবং ১৮৬২ খৃস্টাব্দে তা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর ''আর্যকীর্তি'' (১৮৮৩) এবং ''বীর- মহিমা'' (১৮৮৬) গ্রন্থে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান বর্ণনা করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রীর লেখা ''শিবাজীর জীবনচরিত'' ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলার এটিই শিবাজী সম্পর্কে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর অঙ্গুরীয় বিনিময়'' উপন্যাসে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ''মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'' গ্রন্থে শিবাজীর গুণকীর্তন করেন। শিবাজী উৎসব প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সখারাম এই আগ্রহকে গণভিত্তিক রূপ দেন। একাজে নেতৃত্ব দেবার পক্ষে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। জন্মসূত্রে মারাঠী, তিনি উনিশ শতকের শেষদিক থেকে মারাঠী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের রচনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দ থেকে তিলক-প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবের দৃষ্টান্ত তাঁর সম্মুখে ছিল। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে এই ধরনের অনুষ্ঠান পালনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হলেও ১৯০২ খৃস্টাব্দের পূর্বে তা রূপায়িত হয়নি। ১৯০২ থেকে ১৯০৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর এই উৎসব কলকাতার বিডন স্ট্রিটের ক্লাসিক থিয়েটারে কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হোত। প্রথম দু'বছরের অনুষ্ঠানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সখারামের লিখিত ''শিবাজীর মহত্ব'' এবং ''শিবাজীর দীক্ষা'' শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত হয়ে প্রথম দু'বছর অনুষ্ঠান-স্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে যথাক্রমে বিতরিত হয়। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ''শিবাজী উৎসব'' কবিতা রচনা করেন। ১৯১১ বঙ্গাব্দের ১১ ভাদ্র দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা এক চিঠিতে কবি বলেন— ''আজ দেউস্কর মহাশয়ের বিদ্যুৎ তাড়নায় শিবাজী উৎসব সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া পাঠাইলাম।''

সখারাম নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করতেন। তিনি বলেছেন— ''বন্ধুমানের রাজবংশ বহু শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গলায় বাস করিয়াও নিজেদের 'বাঙ্গালী' বলেন না। কিন্তু আমি Proud to call myself a Bengalee''। শিবাজী উৎসব কেবল কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল না। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৯০৪ সালে এই অনুষ্ঠান করেন। বরিশালের ব্রজমোহন প্রাঙ্গণ ছিল সভাস্থল। সভাপতির ভাষণে অশ্বিনীকুমার দত্ত বলেন— ''এরূপ বিশাল জনসমাগম বরিশালে পূর্বে কেহ দেখে নাই এবং সমগ্র দেশে এই উৎসব এক নবীন জাতীয় চেতনার সঞ্চার করিয়াছে।'' ১৯০৬ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসবে যোগ দিতে আসেন তিলক। জি এস খাপার্দে এবং বি এস মুঞ্জে নামে তাঁর দুই প্রধান অনুগামী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল যেখানে, সেখানে আগে ছিল শান্তির মঠ নামে এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। স্বদেশী যুগে সেখানে

অনেক জনসমাবেশ হোত। ১৯০৬ সালের শিবাজী উৎসব সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে তিলক এবং তাঁর সঙ্গীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, হাতে লাঠি এবং বুকে ''বন্দেমাতরম'' লেখা ব্যাজ। স্বদেশী আন্দোলন ততদিনে ধর্মযুদ্ধের চরিত্র গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানীর মূর্তি স্থাপন করে তার পদতলে শিবাজীর প্রতিকৃতি রাখা হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস এবং দেবী ভবানীর পূজার আয়োজন করা হয়। নরপূজা এবং পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্মে নিষিদ্ধ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নেতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। পরিকল্পনা করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। চিত্তরঞ্জন দাস— ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও— এতে আপত্তিকর কিছু দেখেননি। অনুষ্ঠান শুরুর দিন (৫ জুন) মঞ্চের পিছনের একটি বাড়ির বারান্দা থেকে কাপড়ের ওপর আঁকা শিবাজীর একটি বিশাল প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চতুর্দিক ছিল লোকে লোকারণ্য। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রায় সব অগ্রগণ্য নেতা, মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন মৌলবী দেদার বক্স এবং ডঃ গফুর। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১০ জুন তিলকের নেতৃত্বে ৩০ হাজার লোক গঙ্গাস্নান করেন। চারদিক থেকে অগণিত জনতা তিলকের স্পর্শলাভের জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়ে, যে তাঁর প্রায় সলিল সমাধি ঘটেছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঘটনার এমন ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেনি। ইতিমধ্যে তাঁকে এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে একটি গণসংবর্ধনা সভায় সম্মান জানানো হয় (৭ জুন)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিলকের কলকাতায় আসার কয়েক মাস আগে ওই ১৯০৬ সালেরই মার্চ মাসে বিপ্লবী ''যুগান্তর'' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, ''কেবল একজন মাত্র প্রাচীন লেখক আমাদের সঙ্গে ছিলেন— তিনি সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়।'' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ ''মুক্তি কোন পথে'' পুস্তিকাকারে প্রকাশ হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, তা প্রতিটি বিপ্লবী কেন্দ্রে পাওয়া যেত। এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে মডারেটদের সঙ্গে চরমপন্থীদের দূরত্ব বাড়ছিল, ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনে যা চরম আকার ধারণ করে। তিলক ও অরবিন্দের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা কংগ্রেস অধিবেশন ত্যাগ করে। ''হিতবাদী'' পত্রিকার মালিকরা চেয়েছিলেন সখারাম এই ঘটনার জন্য তিলককে দায়ী করে বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে কি করে! কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানতে না পেরে সখারাম বরং পত্রিকার কাজে ইস্তফা দিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তাঁকে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে ন্যাশনাল এডুকেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা ভাষা এবং ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বরণ করে নিলেন (জানুয়ারি ১৯০৮)। তাঁর ছাত্রদের একজন পরবর্তীকালের বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়, যিনি শ্রী অরবিন্দকে নিরাপদে পণ্ডীচেরী পৌঁছে দেন, বলেছেন— ''বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনার মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতাম। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ঐতিহাসিক তথ্য ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁর খ্যাতি ছিল বেশী।''

স্বদেশী আন্দোলনের গতি রোধ করতে না পেরে সরকার এই সময়ে চরম দমনপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেয়। ১৯০৭ সালের ৩ জুনের এক আইনের দ্বারা পত্রিকায় রাজদ্রোহের অভিযোগে তার সম্পাদককে গ্রেপ্তার এবং তার বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়। পরের মাসে পুলিশ ''যুগান্তর'' ও ''বন্দেমাতরম'' পত্রিকার কার্যালয়ে হানা দেয়। ''যুগান্তর'' পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ''বন্দেমাতরম'' পত্রিকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাস কারাদণ্ড হয় (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৭)। তাঁর মুক্তিলাভের দিন (৯ মার্চ ১৯০৮) ''পত্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং তার সম্পাদক হিসাবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। কারাগারেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (অক্টোবর ২৭, ১৯০৭)। পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায় এবং তাঁর প্রধান সহযোগী অজিত সিং নির্বাসিত হন। বিপ্লবীরা এর জবাব দেয় মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে। প্রফুল্ল চাকি প্রাণ দেন। ক্ষুদিরাম হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করেন। ''কেশরী'' পত্রিকায় মজঃফরপুরের ঘটনার জন্য তিলক সরকারী নীতিকেই দায়ী করেন। বিচারে দু'বছরের জন্য তিনি মান্দালয় জেলে নির্বাসিত হন। তাঁর জন্য তহবিল গঠনে বাংলায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব দেন।

সখারামের পক্ষে এই অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব ছিল না। ''তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত'' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি দেশবাসীকে ঘটনা সম্পর্কে যথাসাধ্য অবহিত করতে চান। এই বই এবং ''দেশের কথা'' সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ''হিতবাদী'' পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ ব্যতীত আর কোথাও প্রতিবাদ শোনা যায়নি। স্বদেশী যুগের প্রধান নেতৃবৃন্দ (অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু) দেশ থেকে নির্বাসিত এবং বিনা বিচারে বন্দী। সখারামের গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার ন্যায্য কোনও কারণ সরকারের ছিল না। তিলকের বিচার-সংক্রান্ত যেসব তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা তিনি একত্রিত করেছিলেন মাত্র। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সখারাম আদালতের বিচারপ্রার্থী হবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তার আগে সহকর্মীদের ওপর এই ঘটনার আঁচ যাতে না পড়ে সেজন্য শিক্ষা পরিষদে শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করেন।

জীবনের এই শেষ পর্যায়ে তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ। তাঁর এক পুত্র কলেরায় মারা যায়। শোকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী

লোকমান্য তিলক

উমাদেবী অল্পকাল পরে লোকান্তরিত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ''ধ্বংসোন্মুখ জাতি'' (A Dying Race) নামক ইংরিজিতে প্রকাশিত আদমসুমারির তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বাংলায় এই বইয়ের সারসংক্ষেপ ''হিন্দু সমাজ (নিবেদন পত্র)'' নামে ছাপা হয়ে ২৫, ০০০ কপি বিনামূল্যে বিতরিত হয়। সখারামের কাছে এই ধরনের চিন্তা ছিল অসহ্য। তথ্য সহযোগে ''বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্বংসোন্মুখ?'' নামে একটি পুস্তিকায় তিনি পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করেন। ততদিনে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের কয়েকটি সারণী প্রস্তুত করতে পরিষদের ছাত্ররা তাঁকে সাহায্য করেছিল, একথা তিনি নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। পুস্তিকাটির প্রকাশে মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর জমিদারি তত্ত্বাবধায়ক মনোমোহন ভট্টাচার্য তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ''হিতবাদী'' পত্রিকার হিন্দী সংস্করণের কাজে যোগ দিয়ে সখারাম তাঁর গ্রন্থের বিরুদ্ধে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে মামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময়ে ২৩ নভেম্বর ১৯১২ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে অকালে তিনি প্রয়াত হন!

প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বুদ্ধিজীবীর যে ভূমিকা আমরা কল্পনা করি সখারামের জীবন তার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। তিনি বিত্তহীন, কিন্তু সারাজীবন আপোষহীন সংগ্রামী, অকুতোভয়। সমকালে শিকড় মেললেও তাঁর চেতনার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকারে। মারাঠা জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে তাদের মধ্যে যে কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়, বীর্য ও উদ্ভাবনী শক্তি এবং সাংগঠনিক প্রতিভা প্রভৃতি লক্ষণ পরিস্ফুট হোত, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার সবই তাঁর চরিত্রে আত্মগত। বাংলায় শিবাজী উৎসবের তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর ''বৈদ্যুত তাড়না''র কথা, জাতিকে যা জাগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর শিবাজীর জীবনী রচনার আশা অপূর্ণ থেকে গেলেও গত শতকে বাঙালি ঐতিহাসিকদের অনেকে মারাঠা ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তার পিছনে তাঁর অবদান কারুর চেয়ে কম নয়। তাঁর স্কুল শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু আঠারো শতকে হোলকার রায়ের শাসনকর্ত্রী অহল্যাবাঈয়ের একটি জীবনী রচনা করেন (১৯০৪ বঙ্গাব্দ)। ভূমিকায় তিনি তার সূত্র হিসাবে কর্নেল ম্যালেগনের ''মধ্যভারত ও মালব দেশের ইতিহাস'' ছাড়াও ''হোলকরাঁচী কৈফিয়ৎ'' নামে একটি মারাঠী বখরের উল্লেখ করেন। তাঁর উক্তি—''শেষোক্ত গ্রন্থখানি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত। আমি মহারাষ্ট্র ভাষায় অভিজ্ঞ নই। ইহার অনুবাদের জন্য আমি পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান সখারাম দেউস্করের নিকট কৃতজ্ঞ আছি। মহারাষ্ট্র দেশ পরিভ্রমণকালে তিনি এই গ্রন্থ আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং তাহার আবশ্যকীয় অংশ অনুবাদ করিয়া দেন।''

আন্তঃরাজ্য সংহতির (এখানে মহারাষ্ট্র ও বাংলার) ক্ষেত্রে সখারামের মতো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে কোনও যুগেই বিরল। কিন্তু আমরা তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণে এতকাল কি করেছি? তাঁর ক্ষুরধার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণী প্রতিভার প্রতি সম্মান জানাতে কেন্দ্রীয় সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্সেস-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখা প্রতিষ্ঠার পর তাঁর নামে প্রতি বছর একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমানে তা অনুষ্ঠিত হয় না। শিবাজী প্রসঙ্গে তাঁর অগ্রন্থিত রচনাগুলি সম্প্রতি বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় মুদ্রিত হয়েছে। (কলকাতার অরবিন্দ ভবন থেকে)। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে তাঁর নামে একটি পথ নামাঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু এসবই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র। তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে পুনঃপ্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করাই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অন্যতম উপায়।

তথ্যসূত্র :

নিখিলেশ গুহ সম্পাদিত—সখারাম গণেশ দেউস্কর রচনাবলী, খণ্ড ১ : শিবাজী

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম— ভবতোষ দত্ত— কীর্তির্যস্য

Karabi Mitra-The Maratha Saga in Bengal Institute of Historical Studies, Kolkata, 2011.

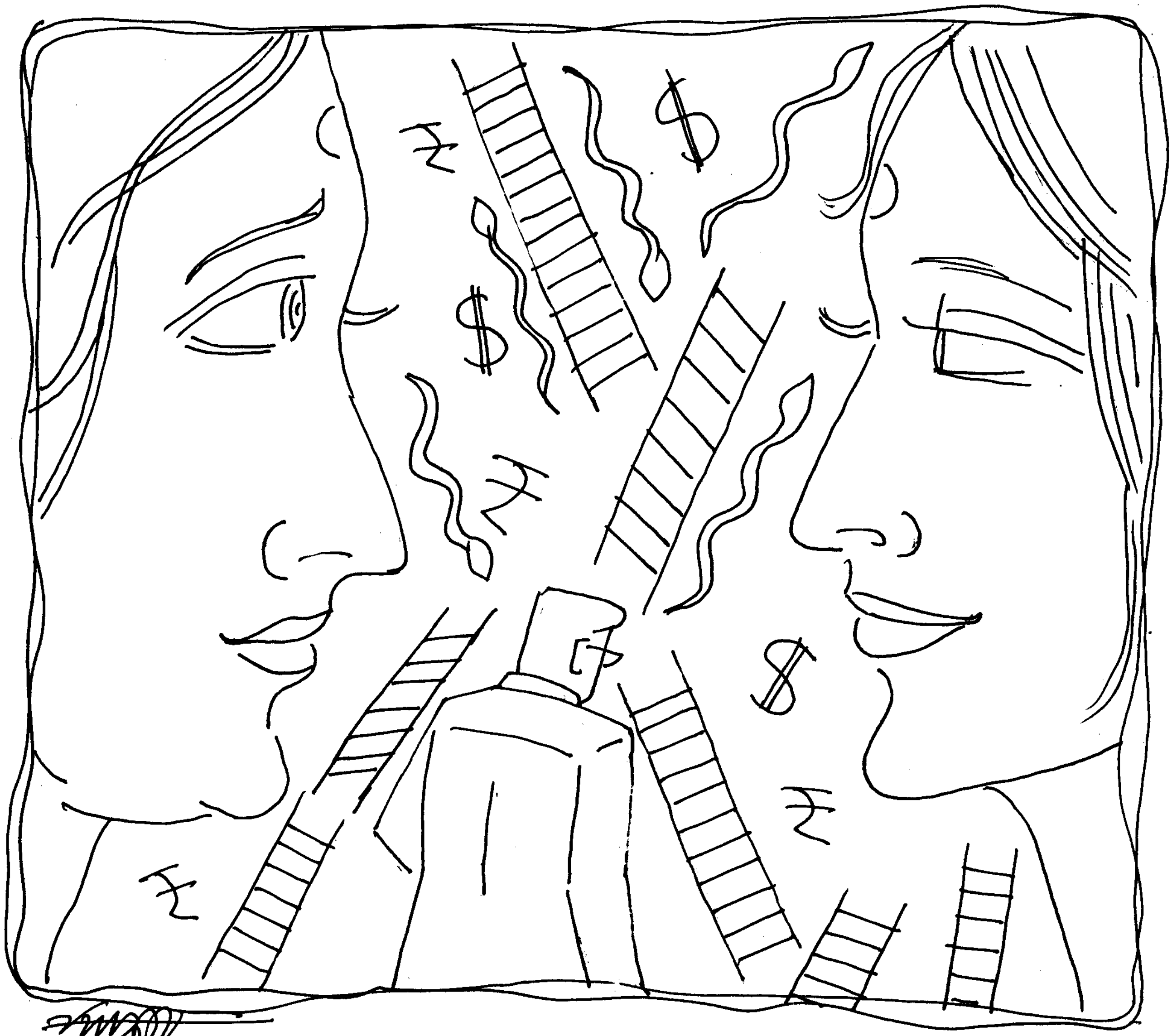

প্রতিবিম্ব

দীপঙ্কর দাস

"এখন আমাদের আর ভাবার সময় নেই। অনেক ভেবেছি আমরা। অনেক চোখের জল ফেলেছি। অনেক সহ্য করেছি। লাঞ্ছনা আর অপমানের বোঝা বয়ে বয়ে আমাদের শিরদাঁড়া বেঁকে আছে। অত্যাচার আর শোষণে আমরা আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বের কথাও ভুলতে বসেছি। আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওদের মন্ত্র জপতে জপতে ওদের মতোই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে—এটাই এদেশের নারী সমাজের আদর্শ আচরণ। মেয়ে হয়ে জন্মালে এই নিয়তিকে স্বীকার করে নিতে হবে আমাদের।'

'নারী জাগরণ সমিতি'র পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মধ্যকলকাতার সাহেব পাড়ার এক ডাকসাইটে হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আলোচনা সভা শুরু

হয়েছে বেলা দশটা থেকে। সারাদিনের কর্মসূচি, তিন তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে অধিবেশনকে। প্রথম ভাগের আলোচনা সভা বসেছিল বেলা দশটায়। চলেছিল দুপুর একটা পর্যন্ত। কেন্দ্রের নারীকল্যাণ মন্ত্রী আলোচনা সভার সূত্রপাত ঘটিয়ে গিয়েছিলেন। পরে কফি ব্রেক চলেছিল পনেরো মিনিট। তারপর শুরু হয়েছিল আলোচনা। প্রথম ভাগের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সমাজসেবী পত্নীরা। তাদের বক্তব্য রাখায় অগ্রাধিকার দিতেই হয়েছিল। কারণ তাদের স্বামীদের মালিকানাধীন কোম্পানিগুলিই এই 'নারী জাগরণ সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক। নিয়মিত মোটা টাকার ডোনেশন দিয়ে থাকেন তারা। সেই কারণেই তো সমিতির প্রধান প্রধান অফিস বিয়ারাররা,— যেমন সভাপতি দীপিতা রায়, সম্পাদক অদিতি ব্যানার্জী, যুগ্ম সম্পাদক মাধুরী খান্না এবং মধু সাকসেনা, কোষাধ্যক্ষ গুরসরণ কৌর, — ইত্যাদি— সারা বছর যেমন হিল্লি দিল্লি করে বেড়াতে পারেন, তেমনি বছরে অন্তত একবার আন্তর্জাতিক নারী জাগরণ ফোরামের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য উড়ে যেতেও পারেন। আন্তর্জাতিক ফোরামের বার্ষিক অধিবেশন যে প্রতি বছর বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট শহরে বসে, এমন নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন শহরে আয়োজন করা হয় অধিবেশনের। কে না জানে এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে থাকলে যে কোন সংস্থার মধ্যে জাড্য দোষের কারণে আলস্য জমে ওঠে। তাই গতিশীল থাকতে হলে যে কোনও মানুষের মতোই যে কোন সংস্থার দ্রুত অবস্থান বদলাতে হয়।

একটা থেকে দুটো— ছিল লাঞ্চ ব্রেক। লাঞ্চ ব্রেক-এর পার্টি থ্রো করেছিল নামী সফটওয়্যার কোম্পানি 'আই পি সল্যুশন'। এই কোম্পানির কর্ণধারের পত্নী মধু বাজোরিয়া আবার নারী জাগরণ সমিতির আহ্বায়ক। ফলে এটুকু তো করতেই হয়। যেমন দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা পর্ব চলবে দুটো থেকে পাঁচটা। তারপর হাই-টি। এক ঘণ্টা। তৃতীয় ভাগের আলোচনা পর্ব চলবে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। তারপর ডিনার। ডিনারে ককটেল পার্টি দিচ্ছে বিশিষ্ট জেলা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট— সারা দেশে পাঁচ পাঁচটি সুপার স্পেশিয়ালিটি হসপিটালের মালিক দেওধর বাটপাড়িয়া। ফলে আজকের তৃতীয় পর্বের আলোচনা সভার সঞ্চালকের ভূমিকাটি অলঙ্কৃত করেছেন মিসেস বাটপাড়িয়াই।

দিনের দু'দুটি পর্বের আলোচনা যথেষ্ট উত্তেজক এবং দিলচোস্ত মোড় নিয়েছিল। এক বক্তা মঞ্চে উঠে পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্যগুলিকে অকাট্য যুক্তিবাণে বিদ্ধ করেছেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহও করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে বার বার।

তৃতীয় পর্বের শেষ বক্তা অদিতি ব্যানার্জি। অর্থাৎ নারী জাগরণ সমিতির স্বয়ং সম্পাদক যিনি। তার বক্তব্যের পরেই এবারের পঞ্চদশ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হবে। ঘোষণা করবেন সমিতির সভাপতি দীপিতা রায়। দেশের নির্মাণ শিল্পের জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং 'রয় কনস্ট্রাকশনস'-এর প্রপাইটার রজত রয়-এর সহধর্মিণী। তারপরই ককটেল পার্টি। সকলের যেমন কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেক ঘটেছে, তেমনি তৃষ্ণাও জেগেছে। ফলে অদিতিও জানেন এখন ভাষণ দীর্ঘায়িত করার অর্থই শ্রোতৃবৃন্দের বিরক্তি উৎপাদন করা। দক্ষ বক্তা, বিগত চৌদ্দ বছর ধরে সমাজের দুঃস্থ নারী সমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করা অদিতি ব্যানার্জি এটা ভালো করেই জানেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে অদিতি তার ভাষণের উপসংহার টানার জন্য গলায় অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কোনও কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে যাওয়া মঞ্চাভিনেত্রীর মতোই বললেন— ''তাই বলছি বন্ধুগণ,—আর পালিয়ে বাঁচার কোনও পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। কারণ আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখনই সঠিক সময় প্রত্যাঘাত করার। ওদের হাত থেকে শাসনের চাবুকটা কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠতে হবে আমাদের। বলতে হবে,—আমরা সেই ঋক-বৈদিক যুগের ঘোষা, অপলা, বিশ্ববারা, মমতা, লোপামুদ্রার মতো মহান নারীদের উত্তরাধিকারী। এবার শাসন করব আমরা।' অদিতি ভাষণ শেষ করামাত্র পুরো হলঘর করতালিতে ভেঙে পড়ল। বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিতে দিতে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,—'মন মে হ্যায় বিশওয়াস। মন মে হ্যায় বিশওয়াস। হাম লোগ বনেঙ্গে কামিয়াব...'। তারপর অধিবেশন সমাপ্তির ঘোষণা হলো। সঞ্চালক মিসেস বাটপাড়িয়া বিনীত স্বরে ঘোষণা করলেন,— আপনারা সারাদিন ধরে আমাদের সঙ্গে যে ভাবে কো-অপারেট করেছেন, এরজন্য আমরা ধন্য। এখন আপনারা সকলেই নিশ্চয় ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। এই কারণে আমরা ডিনার অ্যান্ড ড্রিঙ্কস-এর সামান্য ব্যবস্থা করেছি। আপনারা যদি দয়া করে পাশের ডাইনিং হলে...।

ঘোষিকার ঘোষণা আর শেষ করার প্রয়োজন হলো না। তার আগেই বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী ব্যাঙ্কোয়েট হল খালি করে ডাইনিং হলের দিকে রওনা দিলেন। একটু যেন দ্রুতই পৌঁছিয়ে গেলেন ডাইনিং হল-এ।

ডাইনিং হলটিও সুপরিসর যুক্ত। এক একটি টেবিল ঘিরে বসেছেন চারজন করে। ফলে ডাইনিং হল এখন মুখরিত হয়ে উঠেছে পুরুষ, নারী কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিতে। সাদা পোশাকে আবৃত নম্র অ্যাটেনডেন্টরা টেবিলে টেবিলে ঘুরে সার্ভ করে যাচ্ছে উচ্চমূল্যের হুইস্কি, জিন, ভদকা। অতিথিরা নিজের নিজের পছন্দ মতো বেছে নিচ্ছেন পানীয়। গ্লাসে মৃদু চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজবের মধ্যে ডুবে গিয়ে পরবর্তী ডিনার খাওয়ার জন্য খিদে বাড়িয়ে নিচ্ছেন।

পছন্দের ব্র্যান্ড-এর হুইস্কির সঙ্গে

পর্যাপ্ত জল মিশিয়ে গ্লাসে মৃদু চুমুক দিতে দিতে অদিতি শরীর মনের ক্লান্তি জুড়িয়ে নিচ্ছিলেন। তার সঙ্গে টেবিল শেয়ার করে বসেছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে আসা চন্দ্রপ্রসাদ ধড়িবাজ। আসলে ভদ্রলোকের প্রকৃত নাম চন্দ্রপ্রসাদ ভরদ্বাজ। বিশিষ্ট শিল্পপতি। শিল্পপতি বলতে তেমন কোন বড় ইন্ডাস্ট্রি যে তার আছে এমন নয়। হয়তো নিজের একটা সফট্ওয়্যার কোম্পানি আছে দিল্লিতে। সেটা পাতে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু যেটা চন্দ্রপ্রসাদকে বিশিষ্ট করেছে, সেটি তার মনমোহনী রূপের অধিকারী তার স্ত্রী গীতা ভরদ্বাজের মাধ্যমে অর্জিত। যেহেতু চন্দ্রপ্রসাদ ভরদ্বাজ তরুণ বয়সে কিছু রাজনীতি- টিতি করেছিলেন, তাই কি করে যেন চন্দ্রপ্রসাদের বেশ লবি তৈরি হয়ে গেছিল দিল্লির সাউথ ব্লক, নর্থ ব্লকে। আর এই সুবাদেই তিনি স্ত্রীর রূপ এবং যৌবনকে পুঁজি করে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসালটেন্সি' নামের একটি সংস্থাই খুলে ফেলেছিলেন। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে দেশের তাবড় তাবড় শিল্পপতিদের সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য এই কাজটি করেন গীতা ভরদ্বাজ। মন্ত্রী এবং শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ আলোচনার পরে উভয় পক্ষের স্বার্থ পূর্ণ হয়ে গেলে শিল্পপতিদের ন্যূনতম দশ শতাংশ কমিশন দিতে হয় 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসালটেন্সি' নামক সংস্থাকে। অর্থাৎ ভরদ্বাজ দম্পতিকে। তাই চন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণত্বরূপী ভরদ্বাজ পদবীটি দিল্লির সাউথ ব্লক, নর্থ ব্লকের করিডরে যাতায়াতকারীদের মুখে ধড়িবাজ-এ পরিণত হয়ে গেছে অনেকদিন। এমনকী এই শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা তাকে চন্দ্রপ্রসাদ ধড়িবাজ বলেই জানেন।

মিস্টার ধড়িবাজের মৃদু নেশা ধরে গেছিল। তিনি মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে অদিতিকে দেখছিলেন। অদিতি ব্যানার্জী আজ বেশ কিছুদিন ধরে ধড়িবাজ মহাশয়ের পেছনে লেগে আছেন। কেন্দ্রের নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সমিতির জন্য লোভনীয় অনুদান আদায় করার জন্য অদিতির হাতিয়ার এই ধড়িবাজ মহাশয়। এছাড়াও প্রতিবছর কেন্দ্রের নারী কল্যাণ মন্ত্রক এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে নারী জাগরণে বিশিষ্ট অবদান রাখার জন্য একজন সমাজসেবীকে 'মহিলা মঙ্গল' নামের এক পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। সেই পুরস্কারের দিকে নজর আছে অদিতি ব্যানার্জির। গত বছর পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত তিনজন সমাজসেবীর যে তালিকা তৈরি হয়েছিল, সেই তালিকায় দ্বিতীয় নামটি এই ধড়িবাজ মশাই-এর কল্যাণে ছিল অদিতি ব্যানার্জীরই। কিন্তু শেষমেশ পুরস্কার পেয়ে যান মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমাজসেবী কল্পনা দেশাই। এবার যাতে কিছুতেই হাত ছাড়া না হয়, এই কারণে অদিতি আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন। সেই সূত্রেই ধড়িবাজ মহাশয়কে প্রধান অতিথি করেছেন অদিতি। নিজেই দিল্লি গিয়ে চন্দ্রপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। তিনদিন চন্দ্রপ্রসাদবাবুর জন্যই দিল্লি কাটিয়েছেন। চন্দ্রপ্রসাদের যাবতীয় চাহিদাও হাসি মুখে পূর্ণ করেছেন। হাজার হোক অদিতিও তো কম রূপবতী ছিলেন না তাঁর প্রখর যৌবনবেলায়। এমনকী এখন তার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও নিয়মিত যোগাভ্যাস, জিমে যাওয়া-আসা, মেডিটেশন এবং অবশ্যই বিউটি পার্লারের দৌলতে যে রূপ ধরে রেখেছেন নিজের শরীরে, তাকে অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি কোনও মধ্য চল্লিশের পুরুষেরই নেই। বিশেষ করে এমন পুরুষের— যার স্ত্রী যথেষ্ট লাবণ্যময়ী হয়েও কোম্পানির স্বার্থে আজ এই মন্ত্রীর সঙ্গে, কাল কোনও ডাকসাইটে শিল্পপতির সঙ্গে দেশের কোনও নির্জন রিসর্টে রাত কাটান। আর সেই পুরুষকে একা একা রাত কাটাতে হয় নিঃসঙ্গ শয্যায়।

—কি দেখছেন এমন হাঁ করে? চোখের নীচে চকমকি ঠুকে আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অদিতি।

—আপনাকে। মিস্টার ধড়িবাজ জবাব দিলেন।

—নতুন দেখছেন নাকি? অদিতি শরীরটাকে সামান্য ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাঁধের আঁচল খসিয়ে ফেলে বললেন, —আমার সব কিছুই তো দেখা হয়ে গেছে আপনার।

—রাম। রাম। ধড়িবাজ জিভ কাটলেন। তবে আঁচলের আড়াল খসিয়ে দেওয়ার ফলে গোলগলার ব্লাউজের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া অদিতির দুই বুকের ভাঁজে নিজের সম্মোহিত দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে ভুললেন না। সেভাবেই বললেন ধড়িবাজ, —আমি সেই দেখার কথা বলছি না। দেখে দেখে ভাবছি আপনার স্পিচ নিয়ে। কত জোস, কত ইনভলভমেন্ট থাকে আপনার ভাষণে। শুনতে শুনতে মনে হয় আপনি সত্যি সত্যি দেশের জেনানাদের কথা হার্টলি চিন্তা করেন। আপনার অ্যাপিয়ারেন্স'-এর মতোই অ্যাট্রাক্টিভ আপনার ভাষণ। আমি রিয়েলি ইন্সপায়ারড হয়ে পড়ি।

—ছাই পড়েন। অদিতি চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করলেও ধরে রাখা বেত্রলতার মতো নমনীয় শরীরটাকে নাড়িয়ে তেইশের যুবতীর মতো মায়াজাল সৃষ্টি করে কৃত্রিম অভিমানে ভরা গলায় বললেন —'আপনার যদি আমার দিকে মন থাকত, তবে গত বছর মহারাষ্ট্রের কে না কে এক কল্পনা দেশাই আমার নাকের ওপর দিয়ে পুরস্কারটা নিয়ে যেতে পারত না'।

অভিমানের প্রকাশ ঘটানো অদিতির কাছে স্বাভাবিক। কারণ ধড়িবাজ মশাই-এর এক শ্যালক যে কেন্দ্রের হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব, —জানেন অদিতি। এছাড়াও নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ধড়িবাজের নিবিড় সম্পর্ক আছে। সুতরাং বছরের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবীর পুরস্কার পাওয়া না পাওয়াটা তো ধড়িবাজের ইচ্ছাধীন। ধড়িবাজ সত্যি সত্যি চাইলে ওই পুরস্কার অদিতির ভাগ্যে জোটা তো একেবারে নিশ্চিত।

ধড়িবাজের ডান হাতটা অদিতির নরম বাম উরুর ওপর নেমে এল। অদিতি তার নরম বাম উরুর ওপর ধড়িবাজের ডান হাতের পাঁচ আঙুলের কামড় পড়া টের পেলেন। অদিতি তবু নিস্পৃহ, উদাসীন। উরু সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে অদিতি তাঁর চেয়ারটাকে আরও একটু এগিয়ে এনে ধড়িবাজের শরীর ঘেঁষে বসলেন। কারণ এবছর কোন অবস্থাতেই পুরস্কারটাকে হাতছাড়া করতে চান না অদিতি।

—মিসেস ব্যানার্জি, আমি ওয়ার্ড দিচ্ছি, —এ বছর আর অ্যাওয়ার্ড ফসকাবে না। আপনি পাবেন। জরুর পাবেন। ধড়িবাজের বাম হাত উরু ছাড়িয়ে কোমরের ভাঁজে থাবা বসালো। ''লোকটা কি মানুষ, নাকি জন্তু! এত জোরে কোমরের নরম মাংসে থাবা বসাতে পারে নাকি কোন মানুষ।'' মনে মনে বললেও দুই ঠোঁট ফাঁক করে উত্তেজক একমুদ্রা করে অদিতি বললেন —'আপনি আমাকে এত মিসেস ব্যানার্জি, মিসেস ব্যানার্জি বলে ডাকেন কেন বলুন তো। আমার একদম পছন্দ নয়'।

—লেকেন আপনি তো ফেমাস আর্কিটেক্ট মিস্টার সুব্রত ব্যানার্জির স্ত্রী আছেন। নাকি? ধড়িবাজের ডান হাত কোমর ছাড়িয়ে যে অদিতির বক্ষদেশে পৌঁছাতে চাইছে, নিছক জনবহুল ডাইনিং হল বলেই পারছে না। বুঝতে পারছিলেন অদিতি। জন্তুটার খিদে দেখ! খাবার দেখলেই স্থানকাল ভুলে খাওয়া শুরুর জন্য ছটফট করতে থাকে। আজকের রাতটা যে অদিতি ধড়িবাজের সঙ্গেই বাইপাশের ধারের একটি হোটেলে কাটাবেন, সেই প্রোগ্রাম তো অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। সুব্রতও অফিসের কাজে এখন মালয়েশিয়ায়। আর ছেলে তো সেই কবে থেকে দুন স্কুলের হস্টেলে। এমন অবস্থায় খোদ কলকাতা শহরেই স্ব-গৃহ ছেড়ে একটি রাত হোটেলে কাটানো এমন কি বিসদৃশ হবে অদিতির কাছে। মনে মনে ভাবলেও অদিতি কিশোরীর মতো আদুরে গলায় বললেন,— তাতে হয়েছেটা কি? সুব্রত ব্যানার্জি আমার হাজবেন্ড হতে পারেন। তাই বলে আমি তো তার প্রাইভেট প্রপারটি হয়ে যাইনি। তার সারনেম আমি কেন নেব? আমার কি নিজের কোনও নাম নেই? এই পিতৃতান্ত্রিক থাবার বিরুদ্ধেই তো আমাদের লড়াই।

—ওঃ, হাউ সুইট! হাউ চার্মিং। আমিও তো চাই আপনাকে স্রেফ অদিতি, মাই সুইট অদিতি বলে ডাকতে। লেকেন...।

—ডাকুন না। প্রাণ খুলে ডাকুন। মন দিয়ে ডাকুন। তবে ওই অ্যাওয়ার্ডটাকে কেবল ডাকলেই চলবে না কিন্তু। আমাকে পেতেও হবে। যেমন আপনি আমাকে পান।

—শিওর। শিওর। আপনার বিনিময়ে ওই মহিলা মঙ্গল অ্যাওয়ার্ড, তুচ্ছ আছে। আপনি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর থাকেন অদিতি। মাই সুইট অদিতি।

।।দুই।।

চন্দ্রপ্রসাদ ধড়িবাজ এবার কথা রেখেছেন। নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রদত্ত দেশের সব চেয়ে মর্যাদাময় ''মহিলা মঙ্গল'' পুরস্কারটি এবার সত্যি সত্যি রাজ্যের নারী জাগরণ সমিতি'র সম্পাদিকা, অনুন্নত এবং অত্যাচারিত মহিলাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ শ্রীমতী অদিতি ব্যানার্জির ভাগ্যেই জুটল। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা এন জি ও-গুলির কাছ থেকে— যেসব এন জি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে নিয়মিত লাভ করে। এবং বিশিষ্ট বিজনেস হাউসের স্পনসরশিপের দৌলতে আর্থিক দিক দিয়ে স্ফীত হয়ে সারা বছর ধরে অভিজাত এবং ধনী গৃহের সুখী ঘরণীদের নিয়ে কখনও মুসৌরি, কখনও উটাকামণ্ড, কিংবা কখনও গোয়ার সমুদ্র সৈকতের কোন আন্তর্জাতিক মানের হোটেলে দেশের দুঃস্থ এবং পশ্চাৎপদ নারী সমাজের উন্নতি সাধনের পথ সন্ধানের জন্য ঘন ঘন আলোচনা সভা, সেমিনার, কনভেনশনের আয়োজনের কাজে ব্যস্ত থাকে, সেইসব সংস্থা থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও 'মহিলা মঙ্গল' পুরস্কার-কমিটির কাছে বহু মহিলা সমাজসেবীর নাম এসেছিল। বলা বাহুল্য প্রতিটি নামের পেছনেই ছিল দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অতি বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সুপারিশও। যেমন সব পুরস্কারের ক্ষেত্রেই হয়। সেইসব নামের ভেতর থেকে সর্বমোট দশটি নাম বেছে নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রাথমিক তালিকা। তারপর মন্ত্রণালয়ের উচ্চ আধিকারিকরা ঘন ঘন মিটিং করে নিয়ম অনুযায়ী তিনটি নাম নির্বাচন করে একটি চূড়ান্ত এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা বানিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পেশ করেছিলেন। দুই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদ্বয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওই তিনজনের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে যে নামটি বেছে নিলেন, সেটি এক বাঙালি মহিলার নাম। —শ্রীমতী অদিতি ব্যানার্জি। সেদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ব্রডকাস্টিং মন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করে অদিতি ব্যানার্জির নামটিও ঘোষণা করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ঘোষিত হলো এ বছরের কভেটেড 'মহিলা মঙ্গল' পুরস্কার পাচ্ছেন শ্রীমতী অদিতি ব্যানার্জি।

সেদিন সন্ধ্যায় পুরস্কারের কথা সরকারিভাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রচারিত হলো। বলাবাহুল্য অদিতি সেদিন দিল্লির অশোক রোডের এক অভিজাত হোটেলে উপস্থিত। বস্তুত সেদিন কেন, পুরস্কার ঘোষণার দিনের আগে থেকেই দিল্লিতে হাজির হয়েছিলেন অদিতি। ধড়িবাজবাবুর সঙ্গে আজ শাস্ত্রী ভবন, কাল চাণক্যপুরি, পরশু সাউথ ব্লক। —বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরের বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কাছে নিজের সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা জমা

দিয়ে প্রয়োজনে সেই ব্যক্তির সঙ্গে ধড়িবাজবাবুর পয়সায় নামী দামি হোটেলে লাঞ্চ গ্রহণ করতে হয়েছে অদিতিকে। বিনিময়ে কেবল ধড়িবাজবাবুর সঙ্গে হোটেলের ঘরে একই শয্যায় রাত কাটাতে হয়েছে। যেমন হয় আর কি! এই নিয়ে অদিতির মধ্যযুগের অসূর্যম্পস্যা কুলবধূদের মতো যেমন কোন স্পর্শকাতরতা নেই, তেমনি পুরুষ শাসিত সমাজের অনুশাসনের প্রতিও সামান্য মান্যতাও নেই।

যেদিন সন্ধ্যায় দিল্লির সিরিফোর্ট প্রেক্ষাগৃহের এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের হাত থেকে অদিতি ''মহিলা মঙ্গল'' পুরস্কার গ্রহণ করলেন, সেদিন দেশের বিভিন্ন বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে সেই অনুষ্ঠানের লাইভ টেলিকাস্ট হলো। দুন স্কুলের রিক্রিয়েশন হলের টিভির সামনে বসে অদিতির পুত্র সৌরভ সেই অনুষ্ঠান দেখল মুগ্ধ বিস্ময়ে। গর্বে তার বুক ফুলে দশ হাত। সহপাঠীদের অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে গেল সৌরভ। অনুষ্ঠান শেষে সৌরভ তার সেল ফোনের স্ক্রিনে আঙুল ছুঁইয়ে এখন দুবাই সফরকারী তার বাবাকে ফোন করল। —ড্যাড, মাম্মি অ্যাটালাস্ট ওন দ্য রেস। ইউ প্লিজ কনভে ইওর কনগ্র্যাটস টু মাম ইমিডিয়েটলি।

কেন জানি পুত্রের মুখ থেকে স্ত্রীর এতবড় পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ শুনে তেমন উচ্ছ্বাস জানালেন না সুব্রত। সৌরভকে বললেন,—ডোন্ট ওয়ারি মাই সন। তোমার মার অভিনন্দন পাওয়ার ভাণ্ডার আমার সামান্য অভিনন্দনের অভাবে অপূর্ণ থাকবে না।

থাকেনি অপূর্ণ। অভিনন্দনের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ছে। অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতেই অদিতি ব্যানার্জি নিজের শহরে ফিরলেন। তারপর টানা এক সপ্তাহ জুড়ে শহরের বিভিন্ন বাংলা চ্যানেলে চলল অদিতির সাক্ষাৎকার পর্ব। প্রিন্ট মিডিয়ার ইন্টারভিউ। অদিতি চ্যানেলের স্টুডিওয় বসে দেশবাসীকে, বিশেষ করে নারী সমাজকে জানালেন, —তিনি কেমন করে ঘরসংসারের সমস্ত কাজ সামলে, স্বামীর প্রতি আদর্শ ভারতীয় স্ত্রীর পালনীয় প্রতিটি কর্তব্য নিষ্ঠা নিয়ে পালন করে, পুত্রের প্রতি আদর্শ জননীর দায়িত্ব সম্পাদন করে দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত নারী সমাজকে জাগ্রত করার কাজে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। প্রতিটি সাক্ষাৎকারের উপসংহারে অদিতি প্রশ্নকর্তার অনুরোধে দেশের নারী জাতির উদ্দেশ্যে তার শেষ বার্তা দেওয়ার জন্য বলতে ভুললেন না যে,— ''নারী সমাজের জাগরণের অর্থ কিন্তু এটা নয় যে পুরুষকে অগ্রাহ্য করা। প্রতিটি নারীকে মনে রাখতে হবে যে সে, ভারতীয় নারী কিংবা স্ত্রীর যে সুমহান ঐতিহ্য আছে,— সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারিণী। স্বামীই তার জীবনে প্রথম আর শেষ পুরুষ। শরীরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই এদেশের স্ত্রীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এবং গর্বও'।

।। তিন ।।

দশ বছর কেটে গেছে। অদিতি এখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। শরীরে অবাঞ্ছিত মেদ এবং চর্বি জমিয়ে ফেলে অদিতি এখন যথেষ্ট স্থূলকায়। এছাড়াও রক্তে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড জমে জমে অদিতি এখন অস্টিও আর্থারাইটিসের পেশেন্ট। ডাক্তারের চিকিৎসাও যেমন চলছে, তেমনি সেবিকার হাতে ফিজিও চলছে। সব মিলিয়ে অদিতি এখন একরকম গৃহবন্দি হয়ে থাকেন। তবে সুব্রত এখনও যথেষ্ট সচল। অবশ্য সচল না থাকার কোনও কারণই নেই। কারণ সুব্রতকে তো জীবনে কখনও দেশসেবার দায়িত্ব নিয়ে অভিজাত হোটেলে মিটিং সেমিনার করতে হয়নি। হাই ডিনার, ডেলিসিয়াস লাঞ্চ-এর নাম করে পর্যাপ্ত মদ্যপান করে এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি আর কলেস্টোরাল সমৃদ্ধ দেশি, বিদেশী, থাই খাবারও খেতে হয়নি। যাদবপুর থেকে আর্কিটেকচারে স্নাতক হয়ে বেরিয়ে সেই কবে নিজেই একটি আর্কিটেক্ট-ফার্ম ফেঁদেছিলেন, তারপর উদয়অস্ত খেটে খেটে সেই সংস্থাকে দেশের প্রথম দশটি অগ্রণী আর্কিটেক্ট সংখ্যায় পরিণত করেছেন নিজের চেষ্টায়। তার সংস্থার জন্য কাজ সংগ্রহের জন্যও সুব্রত যখন বিদেশ যান, তখনও ভুল করেও পানীয় গ্রহণ করেন না। সকাল বিকেলে ফল ছাড়া আর কিছু খান না। দু'বেলার প্রধান খাদ্যের তালিকায় থাকে না এমন কোন আইটেম— যা তেল মাখনে তৈরি। এখন সুব্রতর সংস্থায় প্রায় তিনশো কর্মী কর্মরত। দেশের এমন ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যার দিনে তিনশো জন কর্মীর চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পেরেই সুব্রত সন্তুষ্ট। এই তিনশো কর্মীর মাস মাইনে সুনিশ্চিত করার জন্য পঞ্চান্ন উত্তীর্ণ সুব্রত আজও অনলস। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে চলেছেন। অচল হওয়ার মতো শৌখিনতা তাকে মানায় না।

অদিতির ছেলে সৌরভ দুন স্কুল থেকে ক্লাস টুয়েলভ পাস করে রুরকি আই আই টি থেকে ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনে বি-টেক ডিগ্রি নিয়ে কলকাতার সল্টলেকের বাড়িতে অদিতির কাছে ফিরে এসেছে। এখন সল্টলেকেরই সেক্টার ফাইভ-এ এক বহুজাতিক সফট্‌ওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করছে। আর মাস ছয়েক পরে, আগামী বছরের এপ্রিলে সৌরভকে তিন বছরের জন্য তার কোম্পানির হেড অফিস জার্মানির স্টুডগার্ড শহরে পাঠাবে। সৌরভ সবে সাতাশ পূর্ণ করল এই বছরের সেপ্টেম্বরে।

এখন নভেম্বরের শুরু। কার্তিকের শেষাশেষি। এ সময় শহর কলকাতায় শীতের আভাসটুকুও টের পাওয়া যায় না। তবে সল্টলেকের মতো খোলা জায়গা বলেই হয়তো সারাদুপুর যত তাপই থাকুক, সন্ধ্যার পর থেকে সামান্য হিম ভাব

টের পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে শীত আসছে। শীতেই তো অদিতির হাঁটু আর কোমরের ব্যথা বাড়ে।

সেদিন রাতের ডাইনিং টেবিলে বসে অদিতি সুব্রতর কাছে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করলেন।— আর তো ছ'টা মাস হাতে আছে। তারপরেই সৌরভ বিদেশে চলে যাবে। একদিন দুদিনের জন্য নয়। পাক্কা তিন বছর। তাই ভাবছিলাম এর মধ্যে সৌরভের বিয়েটা যদি দিয়ে দিই, তাহলে এই তিন বছর কথা বলার জন্য আমি একজনকে কাছে পাব। তুমি কি বল?

—তুমি যখন ভেবেছো, তখন কি আর আমার বলাবলির কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে। সুব্রত মাছের পাতলা ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললেন,—ছেলের বিয়ে দেবে। বাবা হয়ে আমি আপত্তি জানাবে, —এমন ভাবছই কেন? তবে আমি ভাবছিলাম বিয়ের পর বউমা স্বামীকে ছেড়ে তিন বছর এ বাড়িতে একা একা কাটাবে, —এটাও তো একরকম নির্যাতনই হলো, তাই না।

—মোটেও না। বিয়ের পরে সব মেয়েরই শ্বশুরবাড়িই নিজের বাড়ি হয়। আর কোন স্ত্রী স্বামীর বিদেশ যাত্রার পরে শ্বশুরবাড়িতে থেকে যদি শাশুড়ির সেবা যত্ন করে নারী নির্যাতন বলে না, এদেশে এটাই ঐতিহ্য। ঐতিহ্য সবাইকে মানতে হয়। অদিতির কথা মানেই সেটা বাস্তবে রূপ পাবেই। সৌরভের খুব একটা সম্মতি ছিল না মাত্র সাতাশেই বিয়ে করে সংসার জীবনে ঢোকার। কিন্তু সৌরভও জানে যে তার জননী যখন একবার ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন, তখন অসম্মত হলে ঘরে আগুন জ্বলবে। তাই মাঘ মাসের একটি শুভ দিনে সৌরভের সঙ্গে দেবলীনা নামী এক রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী অতীব সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। দেবলীনা সবে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হয়েছে। কলকাতার একটি ছোটখাটো আর্কিটেকচার সংস্থায় হাত পাকানোর জন্য কাজ শুরু করেছে। বিয়ের আগে অদিতির আরোপিত শর্ত হিসেবে বিয়ের পরে দেবলীনা সেই চাকরি ছেড়ে দিল।

দেখতে দেখতে সৌরভের জার্মানি যাওয়ার দিন চলে এল। গোছগাছ কেনাকাটায় ক'টা দিন খুব ব্যস্ত রইল পুত্র এবং পুত্রবধূ। ফলে পুত্রবধূর হাতে সেবা পাওয়ার তেনন সুযোগ ঘটল না অদিতির। অদিতি নিজেকে বললেন,— এই তো কটাদিন, একটু সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নিক দুজনে। তারপর তো পুত্রবধূর হাতে সেবা নেওয়ার অখণ্ড অবসর পড়েই আছে।

এয়ারপোর্ট খুব দূরে নয়। তবু কাল থেকে অদিতির কোমরের ব্যথাটা এতটাই বেড়েছে যে শয্যাও ছাড়তে পারছেন না। ফলে এয়ারপোর্টে গিয়ে ছেলেকে সি-অফ করার প্রশ্নই ওঠে না। সঙ্গে সুব্রত যাচ্ছেন। দেবলীনাও যাবে।

যাওয়ার সময় হয়ে এল। সৌরভ শয্যাশায়ী মার কাছ থেকে বিদায় নিতে অদিতির শয়নকক্ষে ঢুকল। সঙ্গে পুত্রবধূ দেবলীনা। দেবলীনার বেশবাস, সাজসজ্জা দেখে অদিতি অবাক। বিছানায় শুয়েই অদিতি বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বললেন, —কেবল এয়ারপোর্টে সৌরভকে ছেড়ে আসার জন্য এত সাজগোজের কি দরকার ছিল বউমা! কতটুকু আর রাস্তা। যাবে আর আসবে।

—দেবলীনা তো আমার সঙ্গেই জার্মানি যাচ্ছে মা। সৌরভ জানাল।

—তার মানে? অদিতি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।—আমি তো কিছুই জানিনা। ডিসিশনটা কে নিল সৌরভ? তুই?

—না অদিতি। ডিসিশনটা আমার। জবাবটা দিতে দিতে সুব্রত অদিতির শয্যার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। বললেন,— তোমাকে না জানিয়ে এতবড় একটা ডিসিশন নিতে আমারও খারাপ লেগেছিল। কিন্তু উপায় কি বল,— তুমি তো তোমার পুত্রবধূকে যেতে দিতে না। তাই আমাকেই গোপনে ওর পাসপোর্ট, ভিসা, এমনকী স্টুটগার্ডে আমারই পরিচিত এক আর্কিটেক্ট-সংস্থার সঙ্গে কথা বলে ওর একটা চাকরির ব্যবস্থা— সব আমাকেই করতে হয়েছে। অবশ্যই গোপনে।

—বউমা চাকরি করবে? অদিতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। এবারে আর্তনাদ করে উঠলেন,— এ বাড়ির বউ চাকরি করবে! তাও আবার বিদেশে!

—চাকরি আর কি! দ্বিধা নিয়ে বললেন সুব্রত। বললেন,— তিন বছরের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম নেবে আরকি। এছাড়া উপায় কি ছিল বল? আমার তো বয়স হয়েছে। ক'দিন আর দৌড়ঝাঁপ করতে পারব। জার্মানি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিন বছর পরে দেশে ফিরে আমার ফার্মের দায়িত্বটা তো বউমাকেই সামলাতে হবে। হাজার হোক তিনশোজন কর্মীর পরিবারকে পথে বসিয়ে ফার্ম তুলে দিতে পারি না তো আমি। ওকেই সেই দায়িত্ব সামলাতে হবে। তাই এত বড় একটা সুযোগ যখন এসেই গেল, তখন হাতছাড়া করলাম না। সৌরভ, দেবলীনা এবং সুব্রতকে নিয়ে সুব্রতর গাড়ি এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা দিল। বিছানায় শুয়ে থেকেও অদিতি গাড়ি ছাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। অদিতি শুয়ে শুয়ে দেখলেন বিকেলের মরা রোদ পশ্চিমের জানলা গলে ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ''মহিলা মঙ্গল'' পুরস্কার লাভের অনুষ্ঠানে অদিতির সম্পর্কে পঠিত স্মারকপত্রটির যা সযত্নে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। ধুলো জমেছে কাঁচের ওপর। ফলে বড় ঝাপসা হয়ে গেছে শংসাপত্রটি। পড়া যাচ্ছে না।

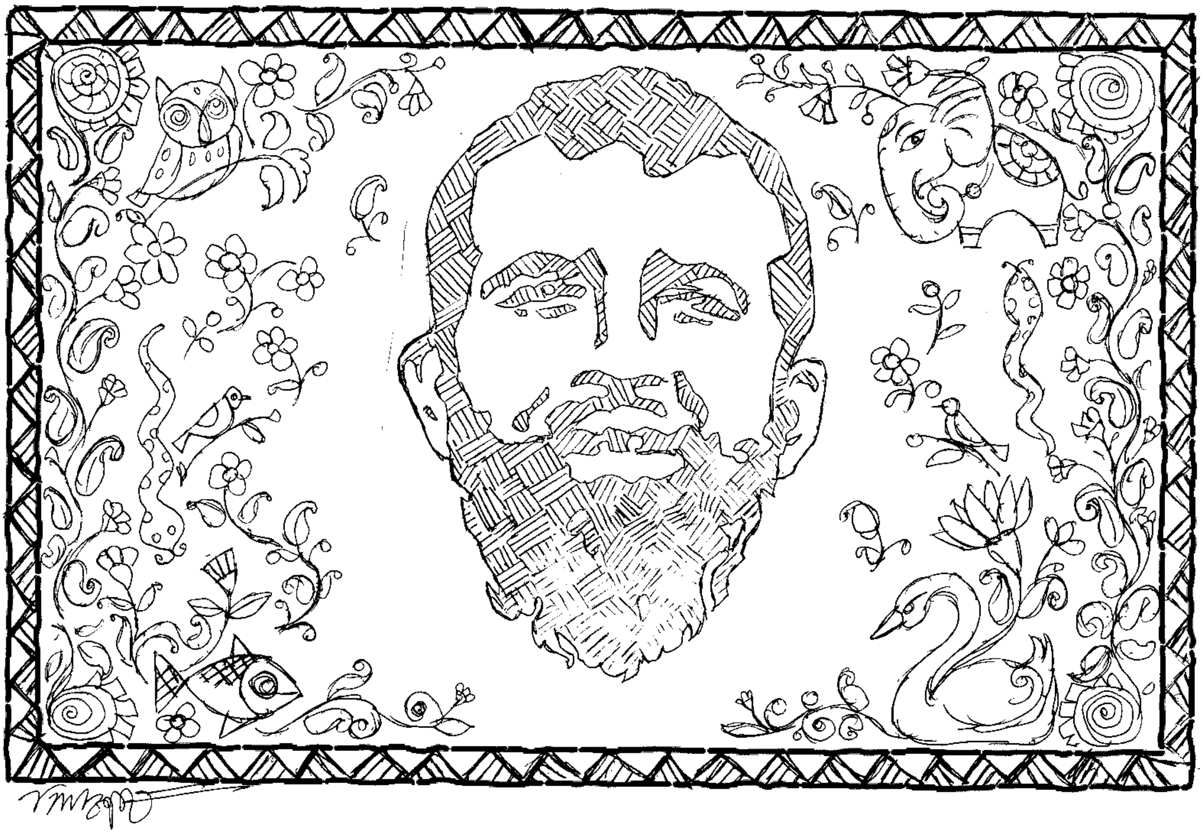

শ্রীরামকৃষ্ণ, কথামৃত ও পশুপাখী

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

শ্রীরামকৃষ্ণ সারা জীবন তাঁর উপলব্ধিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সকলের মধ্যে। কিন্তু সকলে যাতে বুঝতে পারেন তাঁর কথাগুলো সেইজন্য তিনি গান, গল্প, উপমা, উদাহরণের মাধ্যমে সহজ সরল করে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যকে।[১]

এই ব্যাপারে তিনি মাঝে মাঝে প্রাণী জগৎ থেকেও এনেছেন অনবদ্য উপমা। পশুপাশি, কীটপতঙ্গও স্থান পেয়েছে তাঁর কথামৃতে। মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভাল-মন্দের প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রাণীর আচার আচরণের কথা বলেছেন সহজ ভঙ্গিতে। তাতে যেমন বিষযটি বোধগম্য হয়েছে মূর্খাতিমূর্খ ব্যক্তির কাছে, তেমনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিও। তিনি আশ্চর্য তীক্ষ্নতায় লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন পশুপাখি ও কীট-পতঙ্গের প্রকৃতি ও আচার-আচরণ আর তেমনি অসাধারণ নৈপুণ্যে সেগুলোকে তাঁর উপদেশ দানের সময় কাজে লাগিয়েছেন।

বলা চলে, তাঁর সহজিয়া বাচনভঙ্গি ও উপদেশ-দানের পদ্ধতির সঙ্গে এই প্রাণীজগৎ-চর্চা অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে। কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্টতর হবে। সেইজন্যই ‘কথামৃত’ মহাগ্রন্থ থেকে কতগুলো পশুপাশি ও কীটপতঙ্গের বিষয় উল্লেখ করছি।

১. মাছ — মাছের প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবেই। তিনি একদিকে বলতে চেয়েছেন, ঈশ্বরই সব দিয়েছেন অধিকার ভেদে। উপমা দিলেন— ‘এক মা-র পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন, যার পেটে যা সয়। কারও জন্য পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা— এই সব

করেছেন (১/১/৩)। বলা বাহুল্য, এবার কারও বক্তব্যটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না।

মাছের কথা তিনি আবার বলেছেন জীবের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য। মানুষ চার ধরনের— বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। যেমন, পুকুরে জাল পড়েছে, দু-চারটে মাছ এমন সেয়ানা হয় জালে ধরা দেয় না। এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কতগুলো মাছ পালাতে চেষ্টা করে— এরা মুমুক্ষু। কয়েকটা আবার পালিয়েও যায়— এরা মুক্তজীব। আর অধিকাংশই পাঁকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, মনে করে আর কোনও ভয় নেই। এরা হলো বদ্ধজীব (১/১/৬)

সংসারী বদ্ধজীবের প্রসঙ্গে অন্য একদিন তিনি বলেছেন, তারা বেরিয়ে আসতে পারে না— 'যেমন ঘূর্ণির মধ্যে মাছ, যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া— তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে না।(২/২/২)।

অবশ্য পাঁকাল মাছের কথা আলাদা। ঠাকুর বলতেন, সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রাখা যায়। তিনি বলেছেন, 'পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই।' (২/৩/১)।

ঈশ্বরকে দেখতে হলে সাধনা করতে হয়। 'যেমন বড় মাছ ধরতে হলে তার জন্য চারা (চার) কর, হাত সুতো, ছিপ যোগাড় কর'। (২/১৯/৩)

কিন্তু মাছ দিয়ে তিনি সুন্দর একটা জিনিসও বুঝিয়েছেন। বেলঘোরের মতি শীলের ঝিলে তিনি মাছদের মনের আনন্দে জলে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। পরে শ্রীম-কে বলেছেন, 'দেখতে খুব আনন্দ হয়। তোমার উদ্দীপন হবে, যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে।' (২/৭/২) মাছের জলক্রীড়া তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে উচ্চতম অধ্যাত্মস্তরের এক উপমা।

২. কচ্ছপ --- তিনি কচ্ছপের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন সংসার-সন্ন্যাসের কথা বোঝানোর জন্য। তাঁর মতে, সংসারের সব কাজ করতে হয় ঈশ্বরে মন ফেলে রেখে। যেমন 'কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলো আছে।' (১/১/৫)। বাহ্যিকভাবে সংসারের থাকার কথাটা তিনি বুঝিয়েছেন কচ্ছপের উপমা দিয়ে।

৩. বিড়ালের ছানা — তিনি বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন 'বেড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে, ... তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে' (১/১/৫)।

৪. ময়ূর— অনেক সময় পশু-পাখির মধ্যেও একটা নেশা ধরতে পারে। শ্রীম তাঁর কথায় আকৃষ্ট হয়ে চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে যেতেই অন্যদের ঠাকুর মজা করে বলেছেন, 'দেখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিচ্ছিল। তার পরদিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত— আফিমের মৌতাত ধরেছিল' (১/১/৯)। আসলে, তিনি বুঝেছিলেন, শ্রীম তাঁর কাছ থেকে এক অদ্ভুত অধ্যাত্ম নেশায় মজেছেন, তাঁকে বারবার আসতেই হবে।

অবশ্য ময়ূরের প্রসঙ্গ আবার এসেছে— তবে একেবারে অন্যভাবে। শিল্পপ্রেমিক রামকৃষ্ণদেবের সৌন্দর্যবোধ ছিল একেবারে নিখুঁত। তাই তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গুলো বড় নোংরা' (৩/১০/৫)। মিলিয়ে নিলে দেখা যাবে, কথাটা একেবারে অভ্রান্ত।

৫. উট— সংসারীদের প্রকৃতি বোঝানোর জন্য একদিন তিনি উটের কথা বলেছেন। সংসারী মানুষ এত দুঃখ, এত দাগা পায়, তবু চৈতন্য হয় না। কেমন? 'উট কাঁটা ঘাস ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে। তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না' (১/৪/৩)।

অবশ্য উটের চেহারাটা নিয়েও তাঁর মধ্যে একটা বিরূপতা ছিল। তিনি বলেছেন, 'উট বড় কুৎসিৎ, তার সব কুৎসিৎ' (৩/২০/৫)।

৬. ব্যাঙ/ কোলাব্যাঙ — অর্থ, অহঙ্কার এনে দেয়। ঠাকুর কথা-গল্প দিয়ে বুঝিয়েছেন, 'একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতি সেই গর্ত ডিঙিয়ে গিয়েছিল। তখন ব্যাঙ বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতিকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বলল, 'তোর এত সাধ্য যে আমায় ডিঙিয়ে যাস। টাকার এত অহঙ্কার' (১/৪/৬)। তিনি কোলাব্যাঙের গল্পও বলেছেন রামের ধনুকে রক্তাক্ত হয়ে যে বলেছিল, রাম মারলে আর কি করা যাবে?

অন্যদিন তিনি ব্যাঙের কথা বলেছেন ভিন্ন এক প্রসঙ্গে। ধরতে হয় সৎ গুরুকে — 'যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে?' এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একদিন একটা কোলা ব্যাঙ ডাকছিল, ঢোঁড়া সাপে তাকে ধরেছিল, গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। কিন্তু জাত সাপে ধরলে তিন ডাকের পরেই সে চুপ করে যেত' (১/৪/৫)।

৭. মাছি/ মৌমাছি— সাধারণ মানুষ এবং নিত্যসিদ্ধ সাধকের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি মাছি ও মৌমাছির কথা বলেছেন। সাধারণ লোক ঈশ্বরে ভক্তি করে, আবার সংসারেও আসক্ত হয়— যেমন মাছি ফুলে বসে। বিষ্ঠাতেও বসে। কিন্তু 'নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের ওপর বসে, মধু পান করে' (১/৫/২)। আবার বলেছেন 'জ্ঞান হলে মানুষ হয়ে যায়, যেমন মৌমাছি মধু খাওয়ার সময় গুণগুণ করে না' (৩/১/৩)।

৮. বিষ্ঠার পোকা — বদ্ধজীবের কথা এসে পড়ায় তিনি বিষ্ঠার পোকার কথাও বলেছেন। তাঁর কথা— 'বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই মেলা আনন্দ। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহলে মরে যাবে' (১/৪/২)।

৯. আরশোলা— সমাধিতে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। অমৃতের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, আরশোলা কুমুরে পোকার কথা চিন্তা করে নিজেই কুমুরে পোকা হয়ে যায় (১/৪/২)।

১০. পাখি — পাখির প্রসঙ্গ আছে কয়েকবার। তিনি একবার

সংসারীর সঙ্গে পাখির তুলনা করেছেন। সংসারীর পক্ষে সঞ্চয় দরকার, যেমন পাখির ছানা হলে সে সঞ্চয় করে, ছানার জন্য মুখে করে খাবার আনে (১/৮/৩)। পাখির প্রসঙ্গ তিনি আবার টেনে এনেছেন ব্রহ্মের কথা ওঠায়। অনন্তকে বোঝানো যায় না, 'পাখি যত উপরে ওঠে, তার উপরে আরও আছে' (৫/৫/২)। যোগীর মন বোঝানোর জন্যও তিনি পাখির কথা বলেছেন, 'যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে, কিন্তু মনটা ডিমের দিকে' (৩/৯/৬)। পাখি নিয়ে তিনি একটা অসাধারণ গল্পও বলেছেন— এমন কাব্যিক গল্পের নজির মেলে না।[৩] একটা পাখি অন্যমনস্কভাবে বসেছিল জাহাজের মাস্তুলে। জাহাজটা গঙ্গার মধ্যে দিয়ে এক সময় মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। পাখিটার হঠাৎ খেয়াল হতেই সে উড়ল ডাঙার খোঁজে। কিন্তু যেদিকেই যায়, দেখে অনন্ত সমুদ্র। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চেষ্ট হয়ে এসে বসে পড়ল সেই মাস্তুলেই' (৩/১৭/৪)। এমনি করেই এক সময় আমাদের নিজেদের সঁপে দিতে হয় সর্বনিয়ন্ত্রার ইচ্ছের কাছে। তখন আমরা শরণাগত। জ্ঞানীর ধ্যানের প্রসঙ্গেও তিনি পাখির উপমা দিয়েছেন— 'অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি আনন্দে উড়ছে। অনন্ত আকাশ, আত্মা পাখি' (৩/২১/৩)।

১১. শুকপাখি — ঠাকুর বলেছেন, মানুষ বাইরে মালা জপে, গঙ্গাস্নান করে, তীর্থে যায়। কিন্তু অনেকের মধ্যেই সংসারে আসক্তি থেকেই যায়। প্রবৃত্তিটা কিছুতেই বিদায় হয় না। যেমন 'শুকপাখি সকাল বেলায় রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বিল্লি ধরলে নিজের বুলি বেরোয়, ক্যাঁ-ক্যাঁ করে' (১/১২/৬)।

১২. গোরু — তিনি জানিয়েছেন, সকলের সঙ্গে মিশতে হয়। সকলকে ভালবাসতে হয়, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ভোগ করতে হয় শান্তি ও আনন্দ। রাখাল গোরুকে মাঠে নিলে সব গরু মিশে যায়, কিন্তু সন্ধের সময় তারা নিজের ঘরে ফেরে। তখন 'আপনাতে আপনি থাকে' (১/১২/৯)। আবার বলেছেন — যে গোরুর ন্যাজে হাত দিলে লাফায় তাকে ক্রেতা পছন্দ করে (১/১৪/১)।

বিশ্বাসের কথা বলার সময়ও তিনি গোরুর উপমা দিয়েছেন। বিশ্বাস দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়, আর সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। যেমন 'গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তাহলে দুধ কম দেয়। সব রকম গাছ খেলে সে হুড় হুড় করে দুধ দেয় (৫/৮/২)। আবার বলেছেন — ঈশ্বর আছেন সর্বভূতে, কিন্তু অবতারে তা প্রকাশ, যেমন গোরুর বাঁট থেকেই দুধ (১/১৩/৬)।

মজা করেও একবার তিনি গোরুর প্রসঙ্গ টেনেছেন। বলরামের আয়োজন নিয়ে তিনি রঙ্গ-রসিকতা করতেন। তিনি বলেছেন, 'বলরামের আয়োজন কি জান, বামুনের গোড্ডী (গোরু), খাবে কম, দুধ দেবে হুড় হুড় করে' (৩/১৪/৫)।

১৩. বাদুলে পোকা — বাদুলে পোকার প্রসঙ্গটা কিন্তু চমৎকার। একবার যদি সংসারীরা ঈশ্বর স্বাদ পায়, আর ইন্দ্রিয় সুখ তাদের টানতে পারে না। উপমাটা অপূর্ব— বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তাহলে আর অন্ধকারে যায় না' (১/১৩/৬)।

১৪. হাতী — তাঁর কথায় হাতীর প্রসঙ্গও কয়েকবার এসেছে। তাঁর মতে, গম্ভীরাত্মাদের ভাল বোঝা যায় না, — 'যদি ডোবাতে হাতী নামে, তাহলে তোলপাড় হয়ে যায়। কিন্তু সায়ের দীঘিতে নামলে তোলপাড় হয় না'— (১/১৬/৫)। তিনি আবার বলেছেন, মহাভাব ঈশ্বরের ভাব— এই দেহ মনকে তোলপাড় করে দেয়। এই প্রসঙ্গেও এসেছে হাতীর কথা— 'যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়' (৩/১/২)। একবার বলেছেন, সাধকের মনে রাখা উচিত হাতী চলার সময় কিছু গ্রাহ্য করে না — (১/১/৬)

১৫. পিঁপড়ে — তিনি পিঁপড়ের কথা বলেছেন দুটো অনবদ্য বিষয়ে। কী সুন্দর কথাটা — 'পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো— পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে' (১/১১/৭)।

তবে আমাদের ক্ষুদ্রতা বোঝাতে গিয়েও তিনি পিঁপড়ের কথা টেনে এনেছেন। আমরা একটু গীতা, একটু ভাগবত পড়েই ভাবি, সব বুঝেছি। 'চিনির পাহাড়ে একটা পিঁপড়ে গিয়েছিল। এক দানা চিনি খেয়ে তার পেট ভরে গেল। আর একটা দানা মুখে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। খাবার সময় ভাবছে, এবার এসে পাহাড়টা নিয়ে যাব' (২/১৮/৩)। ক্ষুদ্রের বিরাট আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কী চমৎকার উপমা!

১৬. সাপ — সাপের প্রসঙ্গও কয়েকবার এসেছে। তিনি বিদ্যাসাগর মশাইকে বলেছেন, 'ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিছু হয় না' (৩/১/৩)।

আরেকবার তিনি শয়তান লোকের প্রসঙ্গে সাপের উপমা করেছেন। তাঁর ভাষায়— 'কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় ছোবল দেবে' (২/১৫/২)।

কিন্তু অন্য একবার তিনি আদ্যাশক্তি ও পরমব্রহ্মের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়েও সাপের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, একটাকে ছেড়ে অন্যটার কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন — 'সাপ আর তির্যক গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যকগতি ভাববার যো নেই। আবার সাপের তির্যকগতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নেই' (২/১০/৩)। আবার একদিন বলেছেন, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, এঁকেবেঁকে চললেও (৪/৭/২)।

১৭. চিল — তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত থেকে চিলের গল্পটাও ভক্তদের বলেছেন। একটা চিলের মুখে মাছ ছিল। তাই হাজার কাক তার পেছনে ছুটেছে। যখন মাছটা হঠাৎ পড়ে গেছে, কাক-রা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, তখন সে মুক্ত' (৫/১৪/২)।

১৮. নেউল — বিষয়-চিন্তা কেমন? ঠাকুর বলেছেন, ও দেশে দেয়ালের ভেতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে থাকলে আরামেই থাকে। কিন্তু কেউ ল্যাজে ইঁট বেঁধে দিলে, ইঁটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তে ভেতর ঢুকতে যায়, ততবারই বাইরে চলে আসে' (৪/৭/৫)। অতি সহজে যেন একটা পরম সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।

১৯. ইঁদুর — তাঁর বক্তব্য ছিল, ঈশ্বরের আনন্দ কেউ যদি একবার পায়, তাহলে সংসার করা আর হয় না, সৃষ্টিও চলে না। সাধারণ মানুষও তাই সব কিছু নিয়ে ভুলে থাকে। উপমাটা লক্ষ্য করা

যাক — 'চালের আড়তে বড় বড় বস্তার ভিতরে চাল থাকে, পাছে ইঁদুরগুলো ওই চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি রেখে দেয়। ওই খই মুড়কি মিষ্টি লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না' (৪/১০/৩)।

২০. চাতক — অহঙ্কার দূর করে তাঁর শরণ নিতে হয়, তাহলে ভূমিতে থেকেই করা যায় ভূমার সাধনা। উপমা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'চাতকের দ্যাখো মাটিতে বাসা, কিন্তু কত উপরে ওঠে' (৪/১৪/১)। অন্য এক দিকে আরও সুন্দর উপমা দিয়েছেন। ঈশ্বরের আনন্দ অন্য জিনিস, সেই আনন্দের কাছে সকল কিছু ফিকে হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সাতসমুদ্র, যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপুর। তবু সে জল খাবে না' (৩/১৪/৬)। এই উপমাটা নীতি-কবিতার মতো পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে।[৪]

২১. শকুন --- অথচ শকুনের ব্যাপারটা একেবারে বিপরীতধর্মী। ভক্তিহীন পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের মনে পড়েছে শকুনের কথা। যাঁরা শুধু পণ্ডিত, তাঁদের মন কামিনী-কাঞ্চনে। ঠাকুর বলেছেন, 'শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ে' (৩/১/২)।

২২. হাঁস — ঠাকুর ঈশানকে বলেছেন, 'এই মায়ার সংসারে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই-ই আছে। পরমহংস কাকে বলি ? যিনি হাঁসের মতো দুধে জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন ' (৩/৭/২)। হাঁসকে তাঁর ভাল লেগেছে এই গ্রাহ্য—ত্যাজ্য বোধের জন্যই। তাছাড়া ভক্তি যায় ঈশ্বরের দিকেই, যেমন হাঁস সোজা চলে (৫ পরিশিষ্ট - ক)।

২৩. ঘোড়া — ঘোড়া সম্বন্ধে অবশ্য তিনি কিছু বলেননি। কিন্তু তার জন্যও ঠাকুরের কী মমতা। সুরেন্দ্র ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি যাবেন, ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার জন্য বন্ধুদের ডাকছেন। ঠাকুর বলেছেন, 'তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশি নিও না' (৩/৯/৬)।

২৪. বাছুর — 'আমি' বা 'আমার' বোধ ভাল না। কারণ ঈশ্বরই কর্তা, অন্যেরা অকর্তা। বাছুরের কথা বলে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। বাছুর হাম্বা ('আমি') করে তাই তার দুর্গতির শেষ নেই। সারাদিন লাঙ্গল টানে, তাতেও খাওয়া জোটে না। শেষে কসাই কেটে ফেলে। তখন ছালটা দিয়ে জুতো হয়, ঢাক হয়— তখনও মুক্তি হয় না। সব শেষে নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে ধুনুরীর তাঁত হয়। তুলো ধুনবার সময় ধুনুরী শব্দ তোলে 'তুহুঁ' 'তুঁহু' (তুমি)— তবেই মুক্তি। তখন শরীরের আর কিছু দিয়ে কোনও জিনিস হয় না' (১/১০/৫)।

২৫. পানকৌটি — প্রকৃত ভক্ত সংসারে থাকলেও সংসার তাঁকে ছুঁতে পারে না। ঠাকুর বলেছেন, 'পানকৌটির মতো গায়ে জল লাগবে, ঝেড়ে ফেলবে' (১/১১/৭)।

২৬. ব্যাঙাচি — যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ না খসে, ততনি কেবল জলে থাকতে হয়— যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙায় থাকে। তেমনি মানুষের অবিদ্যার ল্যাজ না খসলে সংসারের জলে পড়ে থাকে, জ্ঞান হলে মুক্ত হয়ে থাকতে পারে। সংসারেও থাকতে পারে। কেশবচন্দ্রকে প্রথম দেখে তিনি ব্যাঙাচির উদাহরণ দিয়েছিলেন। (১/১৩/৪)।

২৭. বানরের ছানা — এক ধরনের সাধক সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চায়। বানরের ছানা যেমন তার মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তার মা-ই তাকে নিয়ে এখানে-ওখানে লাফ মারে। কিন্তু আরেক ধরনের সাধক সব কিছু ঈশ্বরকে দিয়ে তাঁর ওপরেই নির্ভর করে থাকে, যেমন বিড়াল ছানা (৩/৭/১)।

২৮. কুমীর — ঠাকুর বলতেন, একরকম লোক আছে যাদের ঈশ্বর-কথায় চৈতন্য হয় না। যেমন কুমীরের গায়ে তরবারির চোপ লাগে না (৩/৯/৯)।

২৯. কাক — কাক সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা আদৌ ভাল ছিল না। একবার তিনি বলেছেন, কামিনী কাঞ্চনে যারা আসক্ত, তাদের দিয়ে ভাল কিছু হয় না। যেমন 'কাকে ঠোক্‌রানো আম ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ' (২/২০/৫)। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি অন্য একদিন বলেছেন, 'কাক মনে করে আমি অনেক স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে চলে' (৫/ পরিশিষ্ট– ক)।

কিন্তু তিনি সেই কাকটার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই একদিন স্মরণ করেছেন। রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়ে দেখেছেন একটা কাক জল খেতে গিয়েও খেতে পারছিল না। রাম তখন বলেছিলেন, এই কাক পরম ভক্ত, জল খেতে পারছে না , রাম-নাম জপে ফাঁক হবে— এই কারণে।

৩০. হোমাপাখি — বেদবর্ণিত হোমাপাখির কথাও তিনি বলেছেন নিত্যসিদ্ধদের প্রসঙ্গে। হোমাপাখি আকাশে উড়তে উড়তে ডিম পাড়ে, তার ছানা বেরিয়ে এসে তার মায়ের পেছনেই উড়ে যায়। মাটিতে নামে না (২/৩/৩)। নিত্যসিদ্ধরাও ঠিক যেমন।

৩১. গুটিপোকা — বদ্ধজীবের সঙ্গে তিনি গুটিপোকার তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'সংসারী জীব – এরা যেমন গুটিপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিজে ঘর বানিয়েছে। ছেড়ে আসতে মায়া হয়। শেষে মৃত্যু' (২/৩/৪)।

৩২. গাধা — গাধার প্রসঙ্গ এসেছে শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন 'চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন' (৪/১০/৩)।

৩৩. ফড়িং — বালকের সরল বুদ্ধির কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর রামলালের ভাই শিবরামের (তখন ৪-৫ বছর বয়স) ফড়িং ধরার ব্যাপারটা বলছেন। পাতা নড়ছে পাছে ফড়িং পালিয়ে যায়। শিবরাম পাতাকে বলত — চোপ্' (৪/১৪/৩)।

৩৪. পায়রা — পায়রার কথা তিনি বলেছেন সংসারীদের মানসিক দুর্বলতা বোঝানোর জন্য। 'যারা পায়রা ভালোবাসে, তাদের কাছে পায়রা সুখ্যাতি করলেই খুশী হবে, আর নিন্দা করলেই রাগ করবে' (৩/১০/২)।

৩৫. বাঘ — তিনি বাঘের গল্প বলেছেন গুরুর ভূমিকা বোঝানোর জন্য — গল্পটার বীজ আছে অবশ্য সাংখ্যদর্শনে। বাঘ

শিশুটা ছাগলের সঙ্গে থেকে ব্যা-ব্যা করে, অন্য এক বাঘ তাকে আত্মদর্শন করিয়েছিল (২/৬/৩)। অন্যবার তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ন্যায়' দর্শনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'বাঘের মতো ভয়ানক বললে যে বাঘের মতো একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাড়ী-মুখ থাকবে, তা নয়' (৫/পরিশিষ্ট - ৪)।

৩৬. বিড়াল — শ্রীম বলেছিলেন, তাঁর পাতের কাছে বেড়াল মাছ নিতে আসে, তিনি কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর কিন্তু বলেছেন, 'কেন, একবার নাড়লেই বা, তাতে ক্ষতি কি? সংসারী ফোঁস করবে' (২/৮/১)।

৩৭. কুকুর — তিনি বলেছেন, যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করলে হয়'— (২/১৫/১)।

৩৮. ষাঁড় — তাঁর মতে, ষাঁড়কেও এভাবে ঠাণ্ডা করতে হয় (২/১৫/২)।

৩৯. গিরগিটি — তিনি একবার বলেছেন, গাছের ওপর একটা জানোয়ার ছিল, সে বারবার রঙ পাল্টাত — সেইজন্য তার আসল রঙ নিয়ে অনেকের মধ্যে তর্ক হোত। সেই গাছের নিচে একজন থাকত, সেই বলল আসল কথাটা। জানোয়ারটা বহুরূপী— নানা রঙ সে করতে পারত। কখনও সে সগুণ আবার নির্গুণও।

ঠাকুর বলতে চেয়েছেন, ভক্তকে ঈশ্বর নানা ভাবে দেখা দিতে পারেন। 'অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে বল পায় — (১/১/৪)।

সত্যিই অদ্ভুত ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, জীবনের সমস্ত দিক— লৌকিক জীবন, প্রাণী জগৎ— কিছুই বাদ যায়নি। আর সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি বারবার উপদেশ দানের কাজে লাগিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রতিবারই পাওয়া গেছে তাঁর consumarate wit and Keenness of observation।[৬]

স্বামী নির্মলানন্দ লিখেছেন রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ছিল নিজস্বতায় অনবদ্য— "his words held men enthralled by their wealth of spiritual experience, their inexhaustible store of simile and metaphor, their power of observation, their bright and subtle humour, their wonderful catholicity, their ceaseless flow of wisdom"।[৭]

এখানেই নিহিত আছে তাঁর অনন্যতা। তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। কারণ অনায়াসে এবং সহজতম ভঙ্গীতে তিনি বোঝাতে পেরেছেন ধর্ম ও অধর্ম চিন্তার গূঢ়তর বিষয়। ম্যাক্সমুলার লিখেছেন, "...by the simple language... he propounded the highest truths of religion and philosophy"।[৮]

কিন্তু শুধু ভাষার সারল্য বা প্রকাশভঙ্গির স্বাভাবিকতা নয়, তাঁর বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তাঁর উপলব্ধির সমৃদ্ধিতেও। বিপুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁর উপদেশ সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেরই অনবদ্য প্রতিফলন। বলা চলে, "they are derived from his own experience and hence, they possess firstrate validity।[৯] তাঁর প্রতিটি কথাতেই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ছাপ। বাস্তব জীবনের সমস্ত দিকগুলো সম্বন্ধেই তাঁর গভীর উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল, সেই জন্য তাঁর কথাতেও ছিল সেই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি— "Everything he spoke had reference to god and devotional life, and was delivered with tabling effect beacause of their direct experience।[১০]

এই ব্যাপারে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ কোনও কিছুই তাঁর কৌতূহল এড়িয়ে যায়নি। তাদের আচার-আচরণ, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তিনি যেমন লক্ষ্য করেছেন গভীর কৌতুহল নিয়ে, তেমনি তাকে কাজে লাগিয়েছেন উপদেশ দানের সময়। গ্রামে তো বটেই, শহরের নানা স্থানে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, তাদের আচার-আচরণ। তিনি গেছেন বিভিন্ন জায়গায়, গাছপালা, নদী, মাঠঘাট সর্বত্র খুঁজেছেন জীবন ও মহাজীবনের উপাদান।[১১] জীবজন্তুর উপমা তার সেই বিপুল অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন।

সূত্রনির্দেশ :—

১. শ্রীম নিজেই বিস্মিত হয়ে লিখেছেন — এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কীরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন। আর এই সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি (লেখক) এই পর্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।

২. তাঁর অভিনব পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্বন্ধে মুক্তিপ্রাণা মন্তব্য করেছেন — 'অদ্ভুত ছিল পর্যবেক্ষণ শক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৯৪।

৩. ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ— শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৭৬।

৪. ঐ, পৃঃ ১৬১।

৫. স্বামী সোমেশ্বরানন্দ — লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২২।

৬. Preface - Tales and parables of Sri Ramakrishna, B- VI.

৭. Sri Ramakrishna, P-72.

৮. Ramakrishna : His Life and Sayings P- 55.

৯. D.S. Sharma - The Master and the Principle, P-41.

১০. Swami Tapasyananda - Sri Ramakrishna, P-107.

১১. হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় — শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম, পৃঃ ৪৬।

উপন্যাস

ছিন্নমায়া

নবকুমার বসু

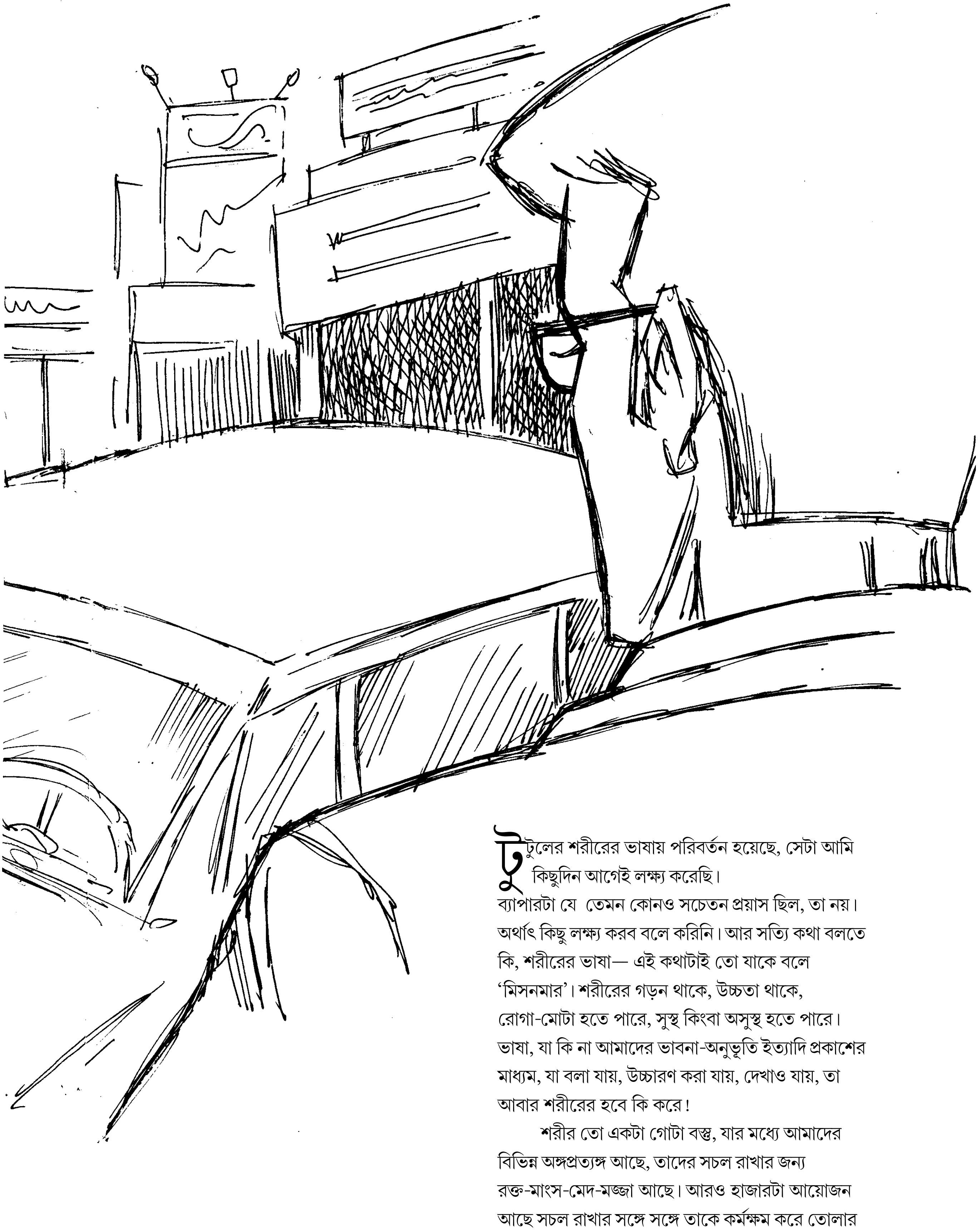

টুটুলের শরীরের ভাষায় পরিবর্তন হয়েছে, সেটা আমি কিছুদিন আগেই লক্ষ্য করেছি।

ব্যাপারটা যে তেমন কোনও সচেতন প্রয়াস ছিল, তা নয়। অর্থাৎ কিছু লক্ষ্য করব বলে করিনি। আর সত্যি কথা বলতে কি, শরীরের ভাষা— এই কথাটাই তো যাকে বলে 'মিসনমার'। শরীরের গড়ন থাকে, উচ্চতা থাকে, রোগা-মোটা হতে পারে, সুস্থ কিংবা অসুস্থ হতে পারে। ভাষা, যা কি না আমাদের ভাবনা-অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যম, যা বলা যায়, উচ্চারণ করা যায়, দেখাও যায়, তা আবার শরীরের হবে কি করে!

শরীর তো একটা গোটা বস্তু, যার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাদের সচল রাখার জন্য রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা আছে। আরও হাজারটা আয়োজন আছে সচল রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কর্মক্ষম করে তোলার

জন্য। আলাদা করে তার আবার ভাষা কী!

ভাষা তো মুখের ব্যাপার এবং উচ্চারণ করতে গেলে জিভ-ঠোঁট-দাঁত এবং বিশেষ করে কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। এবং তার মিলিত ব্যবহার করতে গেলে দরকার হয় কাগজ-কলম-পেনসিল এবং অবশ্যই হাত, হাতের আঙুল আর ভাবনা। অবশ্য এই সব ব্যাপারগুলো আমাদের শরীরেরই অন্তর্গত বটে। কিন্তু অন্তর্গত সবকিছুর সমষ্টি তো আর ভাষা নয়।

হ্যাঁ, কথাটা খুব সত্যি। ব্যাকরণগত কিংবা অভিধানিক ব্যাখ্যায় 'শরীরের ভাষা' বলে কিছু হয় না। ভাষা হচ্ছে আমাদের বচন, বুলি, মুখ দিয়ে উচ্চারণযোগ্য, ব্যবহৃত শব্দসমাহার, যা ভাবনা ও মনোভাবকে শ্রবণযোগ্য করে তোলে এবং একের সঙ্গে অপরের সংযোগ ঘটায়। সেই অর্থে ভাবনার বাহ্যিক ও মৌখিক প্রকাশকেই ভাষা বলাটা ঠিক হবে। দেশে দেশে তার উচ্চারণ ও অর্থ অন্যরকম। কিন্তু ভাবনার প্রকাশ যদি বাহ্যিক না হয়ে আর কিছু.... যেমন শারীরিক যদি হয়, তাহলে কি...!

নাহ্। ব্যাপারটা জটিল না করে সরল করা যেতে পারে এইভাবে— অর্থাৎ যে ভাবে উচ্চারিত শব্দ ছাড়াই আমি টুটুলের মনোভাব টের পেয়েছিলাম, যে ওর নানান অভিব্যক্তি, হাঁটাচলা, পোশাক, তাকানো, নড়াচড়া... এসবের মধ্যে দিয়েই যেন ভাষাহীন একটা মানসিকতা, বক্তব্য ইত্যাদি আমার সঙ্গে ওর সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছিল। অনেক কিছু ও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিল না, কিন্তু না করলেও ওর কথা, বক্তব্য, ভাবনা আমার বোঝা হয়ে যাচ্ছিল।

সুতরাং 'শরীরের ভাষা' শব্দযুগলের সার্থকতা কিংবা বোধগম্যতা হলো অনুভূতির স্তরে। একটু কাব্যিক আভাসও আছে বলা যায়। তো সেটা যাই হোক, টুটুল স্পষ্ট করে কিছু আমাকে বলেনি, কিন্তু বলার দরকারও যেন হয়নি। অথচ প্রতি বছর আমি বিদেশ থেকে বাড়িতে এলেই ও যেমন আমার কাছাকাছি আসে, যায়, থাকে, তার মধ্যে দিয়েই আমি লক্ষ্য করেছিলাম, কিংবা এখন বলতে পারি— পড়ে নিয়েছিলাম ওর মুখের না বলা ভাষা অর্থাৎ শরীরের ভাষা।

না, তাও ঠিক না। আমি যেটা পড়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ওর পাল্টে যাওয়া শরীরের ভাষা। এবং আসলে তখনই আমি অনুভব করেছিলাম, সচেতন হয়ে অনেক কিছু আমরা লক্ষ্য না করলেও, পরিবর্তনের অনিবার্যতায় যখনই সজাগ হই, তখনই এক ধরনের নিঃশব্দ ভাষা ফুটে বেরুতে থাকে এবং তা সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। টুটুলের সেই প্রকাশ আমি দেখেছিলাম।

কিন্তু দেখা, লক্ষ্য করা বা ওর সেই শরীরের ভাষা পড়তে পারার পরেও আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিইনি ব্যাপারটাকে। ভেবেছিলাম, ওর এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। দশ-বারো বছর আগেকার টুটুল আর এখনকার এই মধ্যবয়সী, বিবাহিত, এক সন্তানের পিতা টুটুলের কোনও পরিবর্তন হবে না, আমিই বা তা আশা করব কেন!

সম্পর্কে মামা হলেও আসলে তো বেশ ছোট থেকেই ওদের দেখেছি এবং মিশেওছি বন্ধুর মতো। ওদের বললাম, কেননা, টুটুলের আরও দুই ভাই আছে। ও-ই বড়। মেজ ভাইটা ওর প্রায় পিঠোপিঠি। রাতুল। আর ছোটটা পান্না বা সানু ওদের দু'জনের থেকেই বেশ খানিকটা ছোট, হয়তো সে কারণেই ডাকনামের মধ্যে ধ্বনিগত মিল রাখার কথাও ওদের বাবা-মা মনে রাখেনি। আমার সঙ্গে অবশ্য টুটুলেরই ভাল যোগাযোগ, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক— যাই বলা হোক অনেক বেশি। ওরা সবাই জানে, মামা, অর্থাৎ আমি, টুটুলকে একটু বেশি ভালবাসি। এমনকী ওর মা, আমার পিসতুতো দিদি রুনুদিও সেটা ভাল বোঝে এবং জানে। মনে হয় রুনুদি তাইতে বেশ একটা তুষ্টিও অনুভব করে।

রুনুদির স্বামী অর্থাৎ টুটুলদের বাবা নিখিল জামাইবাবু অবশ্য আমাদের সঙ্গে ওর পরিবার— রুনুদি এবং ছেলেদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক দেখে যেতে পারেননি। বেচারা বেশ অল্প বয়েসেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলেন।

লোকটা সৎ, সরল এবং আমার ধারণা আজীবন কিঞ্চিত দুঃখী গোছের ছিলেন। তবে দুঃখিত হওয়ার অনুভবে নিখিল জামাইবাবুকে কখনও আমি মুহ্যমান হয়ে থাকতে দেখিনি। হয়তো উনি নিজে দুঃখ ব্যাপারটা নিয়ে তত মাথা ঘামাতেন না। আর্থিক অবস্থা কোনওদিনই ভাল ছিল না। নানান জায়গায় চাকরি করেছেন। লেখাপড়া বেশিদূর হয়নি, সাদামাটা বি এস সি পাশ। কিন্তু একটা টেকনোলজির ব্যাপার উনি বেশ ভাল আয়ত্ত করেছিলেন। সেটা হল— গ্লাস টেকনোলজি অর্থাৎ কাঁচশিল্প ও তার প্রযুক্তি। কাঁচের বিভিন্ন জিনিস, যেমন ইলেকট্রিক বাল্ব, চিম্‌নি, শার্সি ইত্যাদি যেসব ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত হয়, সেখানে নিখিল জামাইবাবুর কদর ছিল। উনি নাকি গ্লাস ফার্নেস সম্পর্কে একজন এক্সপার্ট ছিলেন। কিরকম ফার্নেস-এ কী ধরনের কাঁচের জিনিস এবং কেমন তার কোয়ালিটি হবে, অভিজ্ঞতাসূত্রেই উনি তার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কাঁচের আর কতই বা ফ্যাক্টরি আছে আমাদের দেশে। কাঁচ ব্যবসার রমরমাই বা এমন কী! তার ওপর সত্তর দশকের শেষদিক থেকেই তো পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানা বন্ধ হতে শুরু করেছিল।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে রুনুদি আর নিখিল জামাইবাবুদের বরাবর যোগাযোগ ছিল। থাকার কারণ অবশ্য ওদের দিক থেকে অনেকটাই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। তা নয়তো এসব খুব একটা কাছের আত্মীয় তো নন ওঁরা। রুনুদি পিসির মেয়ে, আমার পিসতুতো বোন বা দিদি ঠিকই। কিন্তু পিসতুতো মামাতো সম্পর্কের আর এমন কী-ই বা ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা থাকে! কত মামাতো-পিসতুতো সম্পর্কের ভাই-বোন বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছে আমি জানি। কিন্তু আমাদের পরিবারে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি ভালই, কাছের আত্মীয়র মতো সম্পর্ক ছিল। এবং সেটা আসলে গড়ে উঠেছিল মূলত আমার বাবার জন্য এবং খানিকটা আমার পিসিমা অর্থাৎ রুনুদির মা'র জন্যও। বাবা আর পিসিমা ভাইবোন এবং আমি জানি পিসিমার বিয়ে দেওয়ার

ব্যাপারেও বাবার সামান্য ভূমিকা ছিল বড়দা হিসাবে। কিন্তু রুনুদির বিয়ে তো বলতে গেলে বাবা-ই দিয়েছিল। পিসেমশাই কিছুটা উড়োনচন্ডী গোছের লোক ছিলেন। আর বাবা যেহেতু ডাক্তার, ভাল পসার যাদবপুরে এবং তার ওপর রুনুদিকেও খানিকটা মেয়ের মতো ভালোবাসতো— তার বিয়ে ব্যাপারে উৎসাহী তে হবেই। আসলে আমি এখন বুঝতে পারি, আমার বাবার মতন মানুষ চিরকালই বিরল পৃথিবীতে।

বাবা যে শুধু ভাল ডাক্তার ছিলেন তাই নয়, মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত হৃদয়বান, আন্তরিক অথচ চূড়ান্ত বাস্তববোধসম্পন্ন ছিলেন। আমি নিজে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলে খানিকটা বুঝতে পারি, বাবা কিরকম সৎ, পরিশ্রমী, আবার উদারচিত্ত ছিলেন। কিন্তু সমাজের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে, রাজনীতি-অর্থনীতির সঙ্গে মানুষের পাল্টে যাওয়াটাও বোধহয় কিছুটা স্বাভাবিক। কিছুটা বললাম এই কারণে, যে কিছুটা পাল্টালেও, কিছুটা আবার থাকেও নিশ্চয়ই। স্বভাব-চরিত্র-মানবতা ইত্যাদির কি একটা পেডিগ্রি অর্থাৎ বংশ পরম্পরা জাতীয় ব্যাপার থাকে না।

আমার তো মনে হয় থাকে।

সত্যি বলতে কি তা যদি না থাকতো, তাহলে পিসতুতো দিদির ছেলে হিসেবে আজ টুটুলরা কি আমাদের বাড়িতেই থাকতে পারতো! ও আমার ভাগ্না, তাও আবার পিসতুতো ভাগ্না। কী এমন হাতিঘোড়া সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও ওরা আসে।

আপন রক্তের সম্পর্কের মধ্যেই মারামারি, হানাহানি, লাঠালাঠি লেগে রয়েছে। টাকাপয়সা, সম্পত্তি নিয়ে চলে কোর্ট কাছারি, উকিল-আদালত, শাপ-শাপান্ত আর ইগোর লড়াই। এ তো ঘরে ঘরের কাহিনী এখন। সে তুলনায় আমাদের তো সম্পর্কের দূরত্ব থাকলেও কাছাকাছি এবং পরবর্তীকালে এই বাড়িতেই বসবাস সম্ভবপর হয়েছিল। হয়েছিল বাবার জন্য।

আসলে বাবা, রুনুদিকে যতটা না আত্মীয়া কিংবা বোনের মেয়ে বা ভাগ্নী হিসাবে দেখেছিলেন, তার চেয়ে বেশি আমার মনে হয় দেখেছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত একটি সংসারী মেয়ে হিসাবে। আত্মীয়তাটা ছিল পরের ভাবনা। কী জানি, হয়তো রুনুদির বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও বাবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব ছিল বলে, পরবর্তীকালে ওর দুর্ভাগ্য এবং দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের জন্য বাবা মনে মনে কোনও দায়বদ্ধতা অনুভব করতো কিনা।

কিন্তু যেটাই হোক, নিখিল জামাইবাবুর অকস্মাৎ এবং বেঘোরে মৃত্যুর পরে বাবাই তো ওর তিন ছেলেসহ সংসারটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এবং সেটা মামা হিসাবেই হোক, আত্মীয় হিসেবে হোক কিংবা চেনা পরিচিত কাছের মানুষ হিসাবেই হোক, নিয়েছিলেন— এটাই বড় কথা। আর নিয়েছিলেন কোনও কিছুর পরোয়া এবং প্রত্যাশা না করেই। কেননা, আমি জানি, রুনুদিদের সবশুদ্ধ আমাদের বাড়িতে তুলে আনার পরে, বাবা কোনওদিন একবারের জন্যও জানতে চাননি, নিখিল জামাইবাবু কী টাকা পয়সা রেখে গেছেন, কিংবা ওদের কী সম্পত্তি আছে, অথবা কোম্পানি থেকে রুনুদি কোনও পেনশন-টেনশন পাবে কিনা।

বাবা যেন চোখকান বুজে ধরেই নিয়েছিলেন, বোনের মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর এখন ওঁরই দায়িত্ব ওদের আশ্রয় দেওয়া এবং প্রতিপালনের। কেননা, ততদিনে আমার পিসিমা টিমটিম করে বেঁচে থাকলেও পিসেমশায় প্রয়াত হয়েছেন। ছেলেটা মানুষ হয়নি, কোনওমতে দু-কামরার বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকে। ওই বাড়িতে ভাইয়ের আশায় রুনুদি যেতে পারবে না, এবং নিখিল জামাইবাবুর ভাই-টাইগুলোও অত্যন্ত স্বার্থপর। সাময়িক পিরিত দেখালেও ওদের পৈতৃক বাড়িতে ভবিষ্যতে রুনুদির ভূমিকা ঝি এবং সর্বক্ষণের কাজের লোক ছাড়া আর কোনও পরিচয় থাকবে না। আর তিনটে ছেলে গোল্লায় যাবে।

বাবা যেন ঠিক নিজের মেয়ের মতোই, গরীব বিপাকে পড়ে যাওয়া অসহায়, সদ্যবিধবা ভাগ্নীকে সপুত্র আমাদের বাড়ির সদস্য করে নিয়েছিলেন। বাবার মানসিকতাটা ছিল, অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় এখন না। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা' রবীন্দ্রনাথের এই গীতাবাণী ছিল বাবার, ডাক্তার প্রেমাঙ্কুর চট্টোপাধ্যায়ের মর্মবাণী এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই অনুভবে, নীরবে।

আর যে সিদ্ধান্ত স্বয়ং বাবা নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমাদের তো মতামত নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের বলতে অবশ্য খুব বেশি আর কে-ই বা ছিল তখন?

আমরা তিন ভাইবোন। দিদি সব থেকে বড়। ওকে আমরা সোনাদি বলি। তারপর আমি। তৃণাঙ্কন থেকে আমার ডাক নাম হয়ে গেল তিনু। তারপরে আমাদের ছোটবোন ঝুমা। আর মা। অরুন্ধতী নাম হলেও বাবা থেকে শুরু করে সবাই মাকে অরু বলে ডাকতেই অভ্যস্ত। মা'রও বাবার ওপর কথা বলার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, মানে উঠতো না। আমরা বুঝতে পারতাম, বাবার জীবনযাপন, কর্মোদ্যোগ এই সব দেখতে দেখতে মা বোধহয় কোনওদিন প্রয়োজনই বোধ করেনি, যে ওই লোকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনও কথা বলবে। সুতরাং নিখিল জামাইবাবু মারা যাওয়ার পরে বাবা যখন ঠিক করলেন, রুনুদি আর তিন ছেলেকে আমাদের যাদবপুরের বাড়িতেই নিয়ে আসবেন। আমাদের কারোরই তখন ইচ্ছা অনিচ্ছা জানাবার বা মতামত দেওয়ার কথা ওঠেনি। আসলে ওঠার কোনও সুযোগ ছিল না, সেটা যেমন সত্যি, তেমনই প্রয়োজন অনুভব করিনি, সেটাই সত্যি।

আর কথা তুললে একমাত্র আমিই তুলতে পারতাম। কেননা, আমি তখন সংসারী। বিবাহিত, পুত্রের পিতা। মাত্র কয়েক বছর আগে আমি তখন প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে গেছি। সোনাদির তো বহু আগেই বিয়ে হয়েছিল, আমি তখন স্কুলে পড়ি। ক্লাস এইটে। সোনাদি আর রুনুদির বিয়ে হয়েছিল, মনে আছে,

কাছাকাছি সময়ে। আর মেডিকেল কলেজে যখন ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ি, তখন ঝুমারও বিয়ে হয়ে যায়। ঝুমার বিয়েটা বাবা একটু তাড়াহুড়ো করেই দিয়েছিল। এবং তার পিছনে, আমার ধারণা বাবার একটা উদ্বেগ মেশানো অতীত অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল। যদিও ঝুমার জন্য সরাসরি বাবার কোনও টেনশন ছিল না। ও খুবই ডিসিপ্লিন্‌ড, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং ধীরস্থির মেয়ে, লেখাপড়াতেও মেধাবী ছিল। গান গাইতো।

কিন্তু বাবাকে দু'বার ধাক্কা খেতে হয়েছিল, আমি তা জানি। একবার... এই আমার পিসির মেয়ে রুনুদিকে নিয়ে। আর একবার নিজেরই জ্যেষ্ঠা কন্যা অর্থাৎ সোনাদিকে নিয়ে।

আসলে ইদানীং টুটুলের যে শরীরের ভাষার কথা একটু আগে বলেছিলাম, ওর যে বেশ লায়েক লায়েক ভাব হয়েছে এবং বছর দু'য়েক ধরেই দেখছি, আমাদের বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও ওর যে কিছু চাপা বক্তব্য রয়েছে, আমি টের পাচ্ছি। সেইসব লক্ষ্য করতে করতে এবং ভাবতে ভাবতে আমার সব নানান পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। ও যে অবশ্য আমাকে অশ্রদ্ধা করতো তা নয়, বরং বয়স অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান স্ট্যাটাস যেটুকু হয়েছে, তাইতে ওর পরিবর্তনকে আমি স্বাভাবিক বলেও মেনে নিয়েছি। তাহলেও মাঝে মাঝে ওর কথা শুনে আমার মনে হয়, সত্যি সত্যি স্ট্রাগ্‌ল কাকে বলে, সেটা না বুঝলে মূল্যবোধ ব্যাপারটা কী তাও বোঝা সম্ভব হয় না। বিনা শ্রমে ওরা পেয়ে গেছে অনেক।

আসলে ওরা তো সেই ইতিহাস জানে না, কিংবা কিছুটা জানলেও তা নিয়ে ভাবে না, যে কোত্থেকে কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজকের জায়গায় পৌঁছেছে। কত সহজে কত কিছু পেয়ে গেছে বলেই আজ ওর বডি-ল্যাঙ্গুয়েজে এই পরিবর্তন। আমি অবশ্য মন্তব্য করার থেকে শুনি বেশি এবং এও জানি, অনেক কথা টুটুল আমাকে আপাতত শোনানোর জন্যই বলছে। তবে এখনও ওর বক্তব্য খুব উচ্চকিত নয় অবশ্য। সেটা চালাকিও হতে পারে। বছরে একবার করে আমি যখন ইংল্যান্ড থেকে দেশে আসি, বরাবর টুটুলই আমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসে। আমাদের গাড়ি নিয়েই আসে। ড্রাইভার চালায়। যেহেতু আমাদের অনুপস্থিতিতে টুটুলই গাড়ি ব্যবহার করে এবং মাঝে মাঝে বউ-ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরোয়, সেইহেতু ড্রাইভিংটা বেশ রপ্ত করেছে এবং বোধহয় আমাকে একটু সম্মান দেখাবার জন্যই ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে নিজে চালায়। আমিও সেটা বেশ উপভোগ করি। সামনের সীটে ওর পাশে বসে বকর বকর করতে করতে বাড়ি আসি।

এখন তো অবশ্য শুধু বাড়ি না, আমি দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড যাওয়ার কয়েক বছর আগে থাকতেই আমাদের বাড়ি আর নার্সিং হোম একই ঠিকানায়, একই সীমানার মধ্যে। বাবা মারা যাওয়ার আগেই।

আচ্ছা সে কথায় পরে আসছি।

সেবার আমি এসে পৌঁছেছি একটু রাতের ফ্লাইটে। সুটকেস কালেক্ট করে বেরুতে বেরুতে প্রায় রাত সাড়ে দশটা হয়েছে। আমি শীতকালেই আসি। ক্রিসমাস-এর আগে কলকাতায় মোটামুটি ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে। আমার অবশ্য একটু গরমই লাগছিল।

টুটুলকে দেখলাম স্যুট পরে এসেছে। ওর চেহারাটা খারাপ না। মাঝারি উচ্চতা, মোটা কম, মাজা রং। বেশ স্মার্ট লাগছে। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে বোধহয় স্যুট পরার জন্যই একটু সচেতন হয়ে পড়ল। আমার হাত থেকে ট্রলিটা নিতে নিতে আগেই বলে ফেলল, আজ একটু বেশি সাজগোজ করেই তোমাকে রিসিভ করতে এলাম।

আমি বললাম বেশ করেছিস, ভাল লাগছে দেখতে। সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ সব ঠিক আছে। মাইমা-বুবু-টোটা ভাল আছে?

ভাল আছে। তবে ঠাণ্ডায় বরফে একেবারে জেরবার অবস্থা। এবার নভেম্বর থেকেই খুব স্নো পড়ছে।

ওরাও এই সময়টা চলে আসতে পারে না!

না রে! একসঙ্গে সবাইয়ের আসা খুব মুসকিল। বুবুর সেকেন্ড ইয়ার থেকেই বেশ চাপ আছে, মেডিকেল স্কুলে ছুটিও কম। টোটার এবার জি সি এস সি, যেটা আমাদের মাধ্যমিক আর কি! ও-ও ইউনিভার্সিটি চলে গেলে হয়তো আমি আর তোর মামী একসঙ্গে আসব।

টুটুল হঠাৎ বলল, মাইমার কাজ তো খুব লাইট। জিপি-দের আর কাজ কী! সেই তো কাশি-জ্বর আর পেট খারাপ।

আমি একটু হেসে বললাম, না রে তা নয়। ওদেশে জিপিরা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের মূল স্তম্ভ।

জিপিরা পাত্তা পায়? আমি তো নার্সিং হোমে জিপি'দের সঙ্গে কথাই বলি না। সবসময় ওদের খাম খাওয়ার ধান্ধা।

খাম খাওয়া! মানে?

বুঝলে না? একটা রুগি ধরে এনে ভর্তি করলেই কমিশনের জন্য বসে থাকে।

আমি টুটুলের অবাচীনতা এবং ব্যবসার টেকনিক আন্দাজ করেও অন্য কথা বললাম। ইংল্যান্ডের চিকিৎসা ব্যাপারটা কলকাতায় বসে বোঝা সম্ভব নয়। আর জিপি-রা ওদেশে খুবই দায়িত্বের কাজ করে। তাছাড়া বাড়ির কাজও তো কম না।

টুটুল বলল, বাড়ির কাজ তো খুবই ইজি, শুনেছি ওদেশে। এই তো আমি এদেশেই মিতালিকে দেখছি, খুন্তি নেড়ে দুটো রান্নাও করতে হয় না এখন, তার ওপর আরও দুটো লোক রয়েছে। মা রয়েছে। তাতেও নাকি বলে সময় পায় না।

আমি একটু হেসে বললাম, ওদেশে সব বাড়ির বউরাই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করে, মানে না করে উপায় নেই।

কথা বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম। টুটুল হঠাৎ যেন একটু সচেতন হয়ে বলল, এই দ্যাখো মামা, তোমার সঙ্গে দেখা হতে না হতেই সব বাড়ির কথা শুরু করে দিলাম। তোমার

খবরই নিলাম না।

বললাম, চল, আমার খবর নেওয়ার সময় পাবি। খুব একটা নতুন কিছু তো নেই।

টুটুল পকেট থেকে দামী মোবাইল বের করে ড্রাইভারকে ডাকল। তারপর একটু তফাতে গিয়ে আরও দু-একটা ফোন করল। কাছে সরে এসে বলল, তোমার অনারে আজ সবায়ের জন্য সিরাজ-এর বিরিয়ানি-চাঁপ আর রেজালার অর্ডার দিয়ে দিলাম।

আমি একটু বিব্রতই বোধ করলাম। বছরে একবার বাড়ি এসে বাড়ির রান্না খাব, তা নয়, দোকানের খাবার! তাছাড়া আমি এসব বড়লোকি চাল, পয়সার অপচয় পছন্দ করি না।

টুটুলকে বললাম, কী দরকার ছিল! রাতে বাড়ির খাবারই তো ভাল। দোকানের খাবারদাবারে আমার বিশ্বাসও নেই।

তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না মামা। সিরাজের নতুন এই ব্রাঞ্চটা আমায় স্পেশাল খাতির করে। আমার অর্ডারে প্রবলেম হলে নার্সিং হোমের সাপ্লাই অর্ডার সব বন্ধ হয়ে যাবে, ওরা জানে। আমায় সমঝে না চললে উপায় আছে!

আমি আর মন্তব্য করলাম না। যাদবপুর অঞ্চলে টুটুল যে এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে নার্সিং হোমের দৌলতে আমি তা বুঝি।

একটু পরে গাড়িতে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, তো কেমন চলছে নার্সিং হোম?

কথাটার উত্তর দেওয়ার আগেই টুটুল যে একটু মানসিক প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে, সেটা ওর নড়াচড়া থেকেই আমি টের পেলাম।

মাথাটাথা নেড়ে বলল, চলছে মামা.... তোমার আর মাইমার সময় থেকে ভালই বলা উচিত, রুগিপত্র আসছে-যাচ্ছে। কিন্তু কী বলব, লোকজনের খরচ, ট্যাক্স, চাঁদা, ঘুষ সব এতো বেড়ে গেছে যে টেনশনে আমার ব্লাডপ্রেসার হাই হয়ে যাচ্ছে।

আমি তা সত্ত্বেও বললাম, টেনশন যে কোনও কাজেই থাকে। রোজগারের কথাটাও তো ভাবতে হবে।

সেটাই তো কথা, মামা। খরচের ধাক্কায় রোজগার তো আর চোখে দেখি না, আসছে আবার চলে যাচ্ছে। তার ওপর রিপেয়ারিংয়ের কাজ, ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন, প্লাম্বিং— এসবের জন্য যে কী খরচ তোমায় বোঝাতে পারব না।

আমি চুপ করে গেলাম। চোদ্দ বছর নার্সিং হোম চালাবার পরে টুটুলের কাছ থেকে আর যাইহোক নার্সিং হোম বিজনেস চালাবার ব্যাপার আমায় বুঝতে হবে না নিশ্চয়ই। তাও যদি ও ডাক্তার হতো একটা কথা ছিল। ও তো সাজানো বাগানে ফুল ফোটাচ্ছে। তো সে যাই হোক, চালাচ্ছে এবং বেশ ভালই যে আছে, তাইতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

একটু ভাবনা আমার হচ্ছিল তা সত্ত্বেও। এবং সেটা ওর, ওই সেই শরীরের ভাষার জন্য।

বিগত কয়েক বছরে টুটুলের হাবভাব চালচলনে পরিবর্তনটা যেন আমার প্রত্যাশার থেকে একটু বেশি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল।

বাবার হৃদয়বত্তার সঙ্গে বাস্তববোধের কথা বলছিলাম একটু আগে।

একটু বড় হতে হতে আমি ভেবে দেখেছিলাম (এমনভাবে ভাবতে শেখাটাও আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া, বাবারই শিক্ষা), বাস্তবতা কিংবা বাস্তববোধ ব্যাপারটার সঙ্গে সবসময়ই একটা আন্তরিকতার যোগ থাকা উচিত এবং দরকার। তা যদি না হয়, তাহলে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে মানুষ অনেক উলটোপাল্টা কাজ করতে পারে। এমনকী কুকর্ম করাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আসলে অনেককেই আমরা দেখি, দেখে থাকি, যারা নিজেদের জীবনযাপন, কর্মোদ্যোগ সবকিছুর পিছনে যুক্তির নিরিখে একটা বাস্তবতা আছে বলে ভাবতে এবং চালাতে চায়। কিন্তু তাদের সেই যুক্তিটাই ভাল, না মন্দ, সু নাকি কু সেই বিচারটা ঠাণ্ডা মাথায় করে না। কাজ, তা সে ভাল হোক অথবা মন্দ— মানুষই তো করে। আর খারাপ কাজ হিসাবে যা কিছু চিহ্নিত এবং প্রমাণিত, একজন যখন সে কাজটাও করে, সে কিন্তু ঠিক একটা না একটা যুক্তি খাড়া করে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তার যুক্তিটাকে বাস্তবতা বলে চালাবার একটা ব্যাখ্যা দেয়।

আমরা সবাই মানি, চুরি করা, ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া, কাজে গোঁজামিল দেওয়া ইত্যাদি এসবই কুকাজ।

কিন্তু যে অথবা যারা এসব করে তারা সকলেই এসব কাজের সপক্ষে একটা 'প্র্যাকটিক্যাল থিংকিং'-এর যুক্তি দেখিয়ে দিতে পারে। এমনকী কুকর্মটি যদি ধর্ষণের মতো গর্হিত কাজ, অপরাধও হয়, তাহলে ধর্ষণকারীও (এবং কারিণীও) ঠিক একটা যুক্তি বার করে। সে যুক্তি অতঃপর ধোপে টিকবে কি টিকবে না, সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু যুক্তি একটা দেখায়।

আমি, আমার সামান্য নিজস্ব বুদ্ধিতে ভেবে দেখেছি, যুক্তি আর বাস্তবতার এই পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানোর ক্ষেত্রেই হৃদয়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, আমি জানি, আমার 'হৃদয়' শব্দটাকেই এক্ষুনি কেউ 'বিবেক' আখ্যায় পাল্টে দিতে চাইবেন এবং সংশোধন তথা শুদ্ধিকরণের পরামর্শ দিতে পারেন।

কিন্তু আমি সবিনয়ে তাঁদের বলব, হৃদয় আর বিবেক— দুটি শব্দের ব্যঞ্জনা অনেকসময় কাছাকাছি হলেও একটু খেয়াল করে দেখবেন, প্রয়োগ এবং জীবনযাপন, জীবনধারণের ক্ষেত্রে দুটো ব্যাপারকে সবসময় মেশানো যাচ্ছে না। হৃদয়বত্তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আবেগের। তাকে আমরা বলি হৃদয়াবেগ। আর এই হৃদয়াবেগই অনেকসময় প্রভাবিত করে

বিবেককে। যাই হোক, এক কথা থেকেই পাঁচ কথা এসে পড়ে।

তাহলেও, আমার মনে হয়, এসব পাঁচ কথা থেকে আমি যে আমার বাবার হৃদয়বত্তা এবং বাস্তববোধের কথা বলছিলাম, তার একটা প্রাসঙ্গিকতা সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি সেই রুনুদি-নিখিল জামাইবাবুদের কথায় ফিরে যাই।

হ্যাঁ, তার আগে শুধু আমাদের পারিবারিক ব্যাপ্তির বিষয় আমার একটা সংক্ষিপ্ত ভাবনার কথা বলব। ভাবনাটা আমার মাথায় প্রাথমিকভাবে ঢুকিয়েছিলেন আমার দাদামশায়— মা'র বাবা, আমার শিক্ষাগুরু শান্তিময় মুখোপাধ্যায়।

দাদু বলতেন, পরিবার, সংসার হচ্ছে ঝাঁটার মতো। গোড়ার দিকে শক্ত করে, গোছ করে বাঁধা থাকে। তারপর যতদিন যায়, আস্তে আস্তে ছড়াতে থাকে। উপমাটা আকারজনিত হলেও ভেবে দেখেছিলাম, তাই বটে। একটা সংসারের পত্তন হয় দুটো মানুষ দিয়ে। তারপর দিনে দিনে তাদের ছেলেপুলে হয়, নাতি-নাতনি হয়, এবং এভাবে বাড়তে বাড়তে একজন থেকে একজন বিচ্ছিন্ন হতেও শুরু করে, অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে ছড়াতে শুরু করে, যেমন ব্যবহার হতে হতে ঝাঁটার অবস্থা হয়। কাঠিগুলো আগে সব একসঙ্গে কাছাকাছি থাকতো শক্ত বাঁধনের জন্য, তারপর ঢিলে হতে হতে একটা থেকে একটা সরে যায়।

উপমাটা আমার মনে এল, বাবা-পিসিমা-রুনুদি... তারপর টুটুলদের সংসার ইত্যাদির কথা মনে করে। আসলে এখন সব তুতো সম্পর্কের দূরত্ব এসে গেলেও, বাবা আর পিসিমা তো আপন ভাইবোনই ছিল। আর বাবা যেহেতু কৃতী মানুষ ছিলেন, পিসিমারা সবসময় যোগাযোগও রাখতেন। বিশেষ করে, পিসেমশায়ও তেমন এলেমদার লোক তো ছিলেন না।

এই রুনুদিকে নিয়ে তখন একটা কাণ্ড হয়েছিল। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। তার মানে বারো-তের বছর বয়স। কিন্তু মোটামুটি সব ঘটনা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, মনেও আছে। না থাকা, না বোঝার কোনও কারণও ছিল না। কৌতূহলের বয়স তখন, তার ওপর কৈশোরের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে, মেয়েতে-ছেলেতে তফাৎ এবং আকর্ষণ দুই-ই টের পাই। সোনাদি তখনই কলেজে পড়ে, কিন্তু ঝুমা বেশ ছোট। বোধহয় ক্লাস থ্রি কিংবা ফোর-এ পড়তো।

পিসিমা অর্থাৎ রুনুদিরা থাকতো সোদপুরে। ও বোধহয় নাইন-টেন-এ পড়তো তখন। লেখাপড়ায় মাথা এবং মন কোনওটাই ছিল না এবং শুনতাম, পিসিমা আমাদের যাদবপুরের বাড়িতে এলেই মাকে, বাবাকে বলতো, ওর জন্য একটা ছেলে

দেখে দাও। পার করতে পারলে বাঁচি। বাবা খুব একটা পাত্তা দিতেন না। তাছাড়া ব্যস্ত প্র্যাকটিশনার, সময়ও ছিল না।

দুর্গাপুজোর পরে পরে একদিন দুপুরবেলা, পিসিমা উদ্‌ভ্রান্তের মতো রুনুদি সহ আমাদের এই যাদবপুরের বাড়িতে এসে হাজির। আমাদের পুজোর ছুটি চলছে তখনও, কয়েকদিন পরে কালীপুজো। বাবা বাড়িতে ছিল না। মা বোধহয় ঠাকুরকে জল-টল দিয়ে বাবা আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, দু'জনে খেতে-টেতে বসবে। তখনও আমাদের বাড়ির তিনতলা হয়নি। একতলায় বাবার চেম্বার আর ডিসপেনশারি। দোতলায় আমরা থাকি। মোটামুটি খোলামেলা বড় বাড়ি, তিনখানা ঘর, চওড়া বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম। একতলায় ডিসপেনসারির পাশে একটা ঘর, বাথরুম আছে, সেখানে বাবার কম্পাউন্ডার দেবুদা, দেবুতোষ ঘোষাল থাকে।

পিসিমা দোতলায় উঠেই, একেবারে মা-র ঘরে গিয়ে, মাকে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ কান্না।

বউদিগো আমায় বাঁচাও, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আমাদের একটা ডিসিশন ছিল যে, বড়দের কথাবার্তার মধ্যে না ঢোকা। নেহাৎ কোনও প্রয়োজন হলে দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকতে হতো— মা একটু শোনো, একটা দরকার আছে। তারপর অনুমতি কিংবা ডাক পেলে ভিতরে যেতাম, নয়তো মা বেরিয়ে আসতো।

সেদিন আচম্বিতে পিসিমার কান্নার আওয়াজ শুনে যেন রিফ্লেক্স বশতই মা-র ঘরে দিকে ছুটেছিলাম। অথচ কী একটা অজানা বোধেই যেন আগে থমকে গেলাম। ঘরের দরজার বাইরে কেমন একটা অপ্রতিভ অবস্থায় যেন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে রুনুদি। ওর পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ, খালি পা, মাথার চুল এক বিনুনি করা। ও আমার দিকে তাকাল না।

কিভাবে যেন বুঝে ফেলেছিলাম, কিছু একটা বড়দেরই ব্যাপার, যার মধ্যে অন্তত আমার প্রবেশ নিষেধ।

এর পরের গল্প খুব বিরল কিংবা সংসারে অপ্রত্যাশিত, তা নয়। কিন্তু আমার সেটা বুঝতে বুঝতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল। তাই যাওয়ার কথা ওই বয়সে। কিন্তু বাড়িতে চাপা কথাবার্তা, পিসিমা-রুনুদির থেকে যাওয়া, বাবা-মা'র মধ্যে আলোচনার ছিটকে কানে আসা শব্দ.... সব মিলেমিশে একটা বাস্তবের কাছাকাছি ছবিই মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিলাম। যদিও আমাকে আর ঝুমাকে সেই সময়ের বাড়ির পরিবেশ থেকে একটু ইচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নতায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

ঘটনা কিংবা গল্পটা তা সত্ত্বেও জানা হয়ে গিয়েছিল।

রুনুদির প্রাইভেট টিউটর ছিল খড়দার গোপালদা। সাইকেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলেমেয়ে পড়াত। বি কম পাশ। বাবার মনোহারি দোকান, কিন্তু ছেলে দোকানে বসবে না। মাস্টারিতে নাকি প্রেস্টিজ, পয়সা দুইই আছে। পয়সার এমনিতেই খুব অভাব ছিল না, যে কারণে মাস্টারি করলেও গোপালদা নাকি শৌখিন ছিল। দেখতেও ভাল, লম্বা-স্লিম, সৌমিত্র কাটিং চেহারা।

এহেন ইয়াং মাস্টারের সঙ্গে লেখাপড়ায় মনোযোগহীন ক্লাস টেনের মেয়ের কী সম্পর্কই আর হবে। বিশেষ করে যে মেয়ের বাবা নিজে উড়োনচণ্ডী। আর পিসিমারও কোনও গোপন ভাবনা ছিল না কে বলতে পারে! তা যদি নাই হতো, তাহলে অমন মাস্টারের সঙ্গে ছুতোনাতায় পিসিমাই বা কেন রুনুদিকে ঘুরতে বেড়াতে যেতে এ্যালাউ করতো?

এ তো খাল কেটে কুমীর আনার মতোই ব্যাপার। তাই হয়েছিল।

একটু একটু করে সাহস বাড়ছিল মাস্টার-ছাত্রী দু'জনেরই। মাহেশ-এর রথ, ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট, শ্যামনগরের কালীবাড়ি। পুজোর সময়েও নাকি ঘোরা-বেড়ানো হয়েছিল। তারপরেই পিসিমার আবিষ্কার, মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা।

বাবা সব জানার পরে খোঁজ নিয়েছিল, ছেলেটা এখন কোথায়?

আর উত্তরটা জানার পরেই বোধহয় কিংকর্তব্য স্থির করে নিয়েছিল।

সেই গোপালদা নাকি চাকরি নিয়ে রাতারাতি আলিপুরদুয়ার চলে গেছে। সুতরাং ও ছেলের সঙ্গে যে রুনুদির বিয়ের কথা ভাবা বাতুলতা, বাবাই সেটা পিসিমাকে বুঝিয়েছিল। আর সেই বোঝানোর অর্থই, ভাগ্নীর অনেকখানি দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়া।

সুতরাং একইসঙ্গে বাস্তববোধ এবং হৃদয়বত্তা দিয়েই বাবা সেই তখন থেকে রুনুদির ভার নিয়ে ফেলেছিলেন। (বলে রাখা ভাল, বাবার সম্পর্কে আমার এই সম্বোধনের তারতম্য তুমি থেকে আপনি, আজ্ঞে ইত্যাদি একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত। শুধু যখন আপনপ্রিয় তখন বলি নিয়েছিল, করেছিল... এইরকম। তার সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাব মিশে গেলেই বলি, করেছিলেন, নিয়েছিলেন ইত্যাদি।)

নিজে ডাক্তার বলে বাবার সুবিধাও ছিল। মানে, রুনুদির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে।

কেয়াতলা রোডে বাবার বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জীর নার্সিংহোমে রুনুদির এ্যাবরশন করানো হয়েছিল এবং যথারীতি যাবতীয় গোপনীয়তা অবলম্বন করে। এবং তারপর এই নিখিল জামাইবাবুকে পাত্র হিসাবে খুঁজে রুনুদির বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার প্রেমাঙ্কুর চট্টোপাধ্যায় যে মুখ্য ভূমিকা নেবেন, তা আর ব্যাখ্যা করার কী আছে। তবে আমি কিন্তু আসলে অন্য একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেই বাবাকে একটা সীমাহীন শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম।

বাবা কোনওদিন রুনুদির এই ব্যাপারটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। এবং তারপর থেকে শুধু রুনুদি নয়, পিসিমার পুরো সংসারটাকেই বাবা মানসিক এবং আর্থিক অবলম্বন দিয়ে চলেছিলেন। আসলে, আমরা পরবর্তীকালে সবাই তো তুতো

সম্পর্কের আত্মীয়, কিন্তু পিসিমা যে বাবার আপন বোন! তার মেয়ে ভাগ্নী হলেও কন্যাসম। বাবা আজীবন চেষ্টা করেছিলেন, যেন রুনুদির মধ্যে কখনও কোনওদিন হীনমন্যতা এবং গোপন অপরাধবোধ না থাকে।

ছিল কি ছিল না, তা অবশ্য জানি না। তবে এরপরে যখন বাবা কোনও বন্ধুবান্ধবের মারফৎ নিখিল জামাইবাবুকে পাত্র হিসাবে পছন্দ করে, রুনুদির বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, শুনেছিলাম, পিসিমা-পিসেমশাই নাকি ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, আহা, একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র পেলে না বড়দা! এ ছেলের কী-ই বা ভবিষ্যৎ?

শুনেছিলাম বাবা নাকি শুধু বলেছিলেন, আমি ছেলেটার রোজগার, ফ্যামিলি, কোয়ালিফিকেশনের চেয়ে মানুষটা কেমন, সেটাই দেখেছি। নিখিল আর যাই হোক, সেই আগের ছোঁড়াটার মতো ধোঁকাবাজ নয়, কাপুরুষও না। তাছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস না যে, অন্য কোথাও মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে তারাও নানান খোঁজখবর নেবে। এদের ফ্যামিলি আমার ওপর কোনও কথা বলবে না। আমি রুনুর ভবিষ্যতের কথাও মাথায় রেখেছি।

পিসিমাদের এর পরে আর অন্য কথা বলার সাহস হয়নি।

আর এটাও ঠিক, নিখিল জামাইবাবুর পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না, কিন্তু মানুষটা সাচ্চা ছিল। আর যতদিন বেঁচে ছিল, নানান জায়গায় চাকরি করলেও, রুনুদি আর ছেলেদের অযত্ন করেননি। তাছাড়া মামাশ্বশুর তো ছিলেনই।

কিন্তু কি বলব! কপালে ফাঁড়া থাকলে খণ্ডায় কে?

ওদের বিবাহিত জীবন বোধহয় বাইশ-তেইশ বছরের মতো স্থায়ী হয়েছিল। তার মধ্যে টুটুল-রাতুল আর পান্না তিন ছেলে। নিখিল জামাইবাবু মারা যাওয়ার সময় টুটুল সবে কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়েছে। চেন্নাই থেকে দৌড়ঝাঁপ করে ট্রেন ধরে কলকাতায় আসছিলেন। ট্রেনেই হার্ট অ্যাটাক। তারপর যা হোক করে বাড়িতেও পৌঁছেছিলেন, কিন্তু ক্রিটিক্যাল, চল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই লেফট্ ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর হয়ে মারা যান। কারোর কিছু করার ছিল না। আমি তখন প্র্যাকটিস করছি, সবই বুঝতে পারছিলাম, আর মোটামুটি ভবিষ্যতটাও আন্দাজ করতে পারছিলাম।

যাই হোক, এতোটা ওদের কথা বলার কারণ এই যে, আজ যখন নিখিল জামাইবাবু মারা যাওয়ার পরে আরও প্রায় কুড়ি বছর কেটে গেল এবং ওদের ফ্যামিলিটার বর্তমান অবস্থা দেখি, তখন ভাবি, সত্যিই, রাখে হরি মারে কে!

আরেকটা ব্যাপারও মনে হয়। টুটুলের হাবভাব স্ট্যাটাস আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, ওর বোধহয় কোনও ধারণাই নেই যে, জীবনটা কোন খাতে বয়ে যেতে পারতো! আর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কথাটা শুনতে খারাপ হলেও সত্যি, যে নিখিল জামাইবাবু অকালপ্রয়াত হয়ে, বউ ছেলেদের উপকারই করে গেলেন। আর যে অলিখিত দায়িত্ব বাবা আমার ওপরেও দিয়ে গেলেন, পরবর্তীকালে আমি জানি, তাকে আমি কখনোই উপেক্ষা করতে পারব না। পারিনি এবং করিনি, আশাকরি, সেটা টুটুলরা বোঝে। অন্তত রুনুদি তো নিশ্চয়ই বোঝে।

তবে ওই যে গোড়ায় বলেছিলাম, শরীরের ভাষা!

মাঝেমাঝে বিদ্যুচ্চমকের মতো আমার মাথায় আসে, টুটুল-রাতুল এমনকী পান্নারও জীবনযাপন, মূল্যবোধ সব ব্যাপারগুলো ঠিক আছে তো! এখন তো পান্নার বয়েসও ত্রিশ হতে দেরি নেই। বিয়েও করবে শিগগির শুনেছি।

তবে আমাদের বাড়ির আশ্রয়ে থেকে, আর যাই হোক, ওদের তো মাথার ওপর কোনও দায়িত্ব নেই, বোঝাও নেই। বরং এবার আমাকেই ভাবতে হবে, এই বাড়ি, নার্সিং হোম সবকিছুর কী গতি করব! মনে মনে একটা কথা অবশ্য ভেবেই রেখেছি, আমি বিলেত থেকে ফিরেই আসি, বা মাঝেমধ্যে যাতায়াত করি, নার্সিংহোম যেরকম চলছে, চলবে তো বটেই, এবং অন্তত টুটুলের জন্য আমাকে ভবিষ্যতের পাকাপাকি ব্যবস্থা কিছু করে দিতে হবে। এ আমারই দায়বদ্ধতা। বাবার আত্মার কাছে আমার নীরব অঙ্গীকার। আমি জানি, টুটুলের আর অন্য কিছু করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি, লেখাপড়া, অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না, নেইও। কন্ট্রাকটরি করার জন্য যে উঞ্ছবৃত্তির লাইন ধরেছিল, আমি ঠেকা না দিলে এতোদিনে ও শেষ হয়ে যেত, কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু যে যাই হোক, ওর নার্সিংহোমে ঢোকার ইচ্ছে, অনুরোধকে আমি তো আর ফেলে দিইনি।

সুতরাং আজ যখন ও পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, আমাকেও তো দেখতে হবে যেন মাটিটা থাকে, আরও শক্ত হয়। ও কি আর বোঝে না, মামা ওকে কতটা ভালবাসে। তাছাড়া আমিও তো প্রেমাঙ্কুর চ্যাটার্জীর ছেলে।

হ্যাঁ, ওদের কথা বলার আগে, একটু সোনাদি আর আমাদের বাড়ির কথা বলে নিই।

আমার মনে হয়, রুনুদির ঘটনা বা কীর্তি ব্যাপারটাকে বাবা সেদিন যতটা উদার মনে দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিল, একইসঙ্গে বাবার কোথাও একটা গভীর উদ্বেগও তৈরি হয়েছিল। এবং অনিবার্যভাবেই তা সোনাদিকে নিয়ে। মুখে সবকিছু প্রকাশ না করলেও নিজের বাড়িতে যে একটি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে রয়েছে, একথা কি বাবার মতো দায়িত্বশীল মানুষের ভোলার কথা!

আরও একটি কারণ ছিল।

কারণটা খুব অভিপ্রেত ছিল না বটে, কিন্তু তা এড়ানোও যায়নি এবং সব থেকে বড় কথা তা বাবার নজর এড়ায়নি। বুদ্ধিমান এবং বাস্তববাদী মানুষের তা চোখে না-পড়ার কারণ ছিল না।

কারণটা হচ্ছে, আমাদেরই বাড়ির একতলায় থাকা, বাবার কম্পাউন্ডার— দেবুদা, দেবতোষ ঘোষাল।

দেবুদার চেহারাটা এ্যাভারেজ, সাতাশ-আটাশ বছর বয়স,

শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। মেদিনীপুরের ছেলে। বাবা বোধহয় বুঝেছিল, ছেলেটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেই কারণে কম্পাউন্ডারী করার লাইসেন্স নিয়ে কাজ করতে এলেও, বাবা ওকে পড়াশুনা করার উৎসাহ দিয়েছিলেন। তারপর নিজেই ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে মানিকতলার কাছে ডি এন দে হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। দেবুদার নিজের উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা ছিল। আমাদের বাড়িতে থাকাকালীনই একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মোটরবাইক কিনে ফেলল। কলেজে যায়, বাবার চেম্বারের কাজও করে। সামনের চট্টেশ্বরী হোটেলের সঙ্গে দু'বেলা ভাত-মাছ খাওয়ার মাসকাবারি ব্যবস্থা ছিল। বেশ চটপটে এবং চতুরও ছিল।

এসব ঠিকই ছিল। থাকতে থাকতে আমাদের বাড়ির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা যেরকম ডেভেলাপ করার কথা, করেছিল। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই, বাড়িতে একটি যুবতী মেয়ে থাকলে যা হয়, যেতে আসতে দেখাশোনা, দুটো কথা, একটু হাসি, বই দেওয়া-নেওয়া, মাঝেমধ্যে মা'র একটু কিছু খাবার পাঠানো, দেবুদা দেশ থেকে আসার সময় পাটালি কিংবা গোছকরা সজনেডাঁটা নিয়ে আসা... ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে একটা দুর্বলতার আবহ ক্রমশ আশনাই-এর দিকে গড়িয়েছিল। ওপর ওপর দেবুদা সম্ভ্রমের দূরত্ব রাখতো ঠিকই, এবং সেটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারি, সোনাদিটা ছিল ভীষণ সেক্সি মেয়ে, ঠাট-ঠমকে দেবুদাকে কাত করে দিয়েছিল।

সোনাদিকে দেখতে খুব একটা ভাল না, ফিগারে নিতম্বের গড়ন-টড়নগুলো ঠিক মেয়েলি নয়। কিন্তু বুদ্ধি, স্মার্টনেস আর হাঁটাচলা, কথা, চোখমুখের খেলায় ছেলেদের চোখে পড়ে যেত। যথারীতি দেবুদার চোখেও পড়েছিল। বলা যায়, নানাবিধ ইন্ধন এবং সুযোগ রচনা করে দিচ্ছিল। তারপর শান্তশিষ্ট ছেলেগুলোর যেমন হয়, 'মুখে নেই রা, পর্বতে মারে ঘা'। খেলাধুলো শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং বাবার অনুপস্থিতির সময় সুযোগে আড়ালে আবডালে সোনাদি আর দেবুদার রোমান্স ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছিল।

বাবার নজর এড়ায় না কোনওদিক থেকে। এক্ষেত্রেও এড়ায়নি। তার ওপর অল্প কিছুদিন আগেই রুনুদির অভিজ্ঞতা। মনে মনে তখনই হয়তো বাবা জপতে শুরু করেছিল, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বধিবার সুযোগ দেওয়ার মতো লোক ছিলেন না প্রেমাঙ্কুর চ্যাটার্জী। মা'র সঙ্গে আগে সোজাসুজি কথা বলে নিলেন।

অরু, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো। পাত্র যখন ঠিক হয়ে রয়েছে, আমি আর ফেলে রাখব না।

মা কি আর বুঝতো না! সবই জানতো, বুঝতো, কিন্তু বাবার ওপর চূড়ান্ত ভরসা বলেই হয়তো অপেক্ষা করছিল। তাও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলল, পাত্র ঠিক হয়ে রয়েছে মানে!

বাবা হেসে বলল, আমায় বাজিয়ে দেখছো নাকি? খবর আমি সবই রাখি। দেবুও ছেলে খারাপ না। কিন্তু দেরি করব না।

মা বলল, দেবু! দেবু তোমায় কিছু বলেছে নাকি?

ও আবার কী বলবে! আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি ভাবো নাকি? তুমি কাজে লেগে পড়ো। টের পাচ্ছি, ঝুঁকি বাড়ছে।

দাঁড়াও বাপু। এ তুমি তো এমন বলছো যেন... ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে! মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে না আগে?

যা বলার বলো। তবে আমার যা বোঝার তাও বোঝা হয়ে গেছে।

তাহলেও বিয়ে বলে কথা... ওর কথাটা তো শুনতে হবে। দেবুও কী ভাবছে... ওদের বাড়ির লোকজন, বাবা-মা কী ভাবছেন।

বললাম তো, আমার ওসব ভাবনা হয়ে গেছে। সোনুর সঙ্গে কথা বলো, দেখবে, দেবুর বাড়ির খবরও তোমার জানা হয়ে যাবে। আরও দেখো, আমি রেডি হয়েছি শুনলে তোমার মেয়ে খুশিই হবে। শীতের শেষদিকেই ভাবছি... তিনু-ঝুমার পরীক্ষার পরে।

মা বলল, সব তো ঠিক করেই ফেলেছো নিজে নিজে, আমার তাহলে আর...।

বাবা মাঝপথেই মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমারই তো কাজ গো। এখন মন দিয়ে শোনো, আরও যা যা ভেবেছি। সেগুলো নিয়ে তুমিই কথা বলবে সোনুর সঙ্গে। যদি মনে করো, আমার কথা বলার দরকার আছে, তাহলে তুমি যা অ্যাডভাইস দেবে...।

বাবার এই এক টেকনিক ছিল। সিদ্ধান্ত নিজেই নিত, কিন্তু কখনই মাকে খাটো করে নয়। বরং ঠাট্টার ছলেই হোক, কিংবা একটু সিরিয়াস ভাবেই হোক, মা'র ভূমিকাটাও যে গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত বাবা তাই ভাবছে, সেটা মাকে বুঝিয়ে দিত।

মা একটু ঠোঁট মুচড়ে বলল, ওহ্ কি একেবারে অ্যাডভাইস শোনার লোক! কী ভেবেছো শুনি!

বাবা বলল, বিয়ের আগেই দেবুকে অন্য ঘর দেখে চলে যেতে হবে। তা বলে যেন না ভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছি... যাতায়াত করবে। টালিগঞ্জের এদিক-ওদিক আমি একটা জমির খোঁজ করছি ওদের জন্য। মনে হয় পেয়ে যাব। বছরখানেকের মধ্যে ওর তো হোমিওপ্যাথি ডিগ্রিটাও হয়ে যাবে.... তখন নিজেদের ঘরবাড়ি করে ওদিকে প্র্যাকটিস শুরু করবে। আস্তে আস্তে তারপর এখান থেকে পাট গুটিয়ে নেবে। নিজের মতো কিছু করে-টরে না নিলে সারা জীবন ইনসিকিউরিটি কমপ্লেক্স-এ ভুগবে, সোনুও স্বস্তি পাবে না।

মা হঠাৎ বলল, দেবু কলকাতায় থেকে প্র্যাকটিস করবে... ওদের বাড়ি থেকেও শুনেছি, তেমনই হচ্ছে। দেশে জমিজমা তো আছে।

বাবা টেরচা চোখে মিটমিটে হাসি নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, বুঝলাম। তলে তলে অনেক কথাই তাহলে হয়ে গ্যাছে বলো!

ওমা, কথা আবার কী হবে! তুমি কিছু না-বলা পর্যন্ত আমি কি রা কাড়তে পারি!

আচ্ছা বেশ। এখন তাহলে আমি যা বললাম, তারপর তোমার কী মত বলো?

দাঁড়াও, মেয়ের সঙ্গে কথা বলি। তবে মনে হচ্ছে, সোনুর বিয়ের ইচ্ছেটিচ্ছে হয়েছে। রুনুর বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই। আমি তাহলে ঠিক সময়েই কথাটা ভেবেছি বলো!

মা বলল, তুমি আরও আগে ভাবলেও আমি আপত্তি করতাম না। রুনু একটা যা ধাক্কা দিয়েছিল, তখন থেকেই আমি কাঁটা হয়েছিলাম।

বাবা বলল, আসলে বাবা-মা যদি জেগে ঘুমোয়, তাহলে মেয়েকে দোষ দিয়ে লাভ কী! জীবন সম্বন্ধে কতটুকু অভিজ্ঞতা ওদের!

তাহলেও বাবা... মা বলল, বাড়িতে বড় একটা মেয়ে থাকলেই, ওই উপমাটা মনে পড়ে— 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস'।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলল, সেই আর কী! যুগ পাল্টেছে, দিনকাল পাল্টাচ্ছে। তবু মেয়ের বাবা-মা'র টেনশন। ভেবে দেখো অরু, দোষটা আমাদেরই। এখনও ছেলেদের থেকে আমরা মেয়েদের আলাদা চোখে দেখি।

মা বলল, কী করব... আমাদের কালচারটাই যে অমন।

ওসব কালচার আর ধোপে টিকবে না এরপরে...। যাই হোক, তুমি লেগে পড়ো। আমার আর একটিও তো আর ছোট থাকছে না।

কে, ঝুমা? পাগল নাকি? তিনু ডাক্তারি পাশ না করা পর্যন্ত ঝুমার কোনও কথাই তুলবে না বলে দিচ্ছি।

আমি কিছু তুলবো না। দেখবো, তুমি কতদিন চুপ করে থাকো।

... তো সেই সোনাদিরও বিয়ে হয়ে গেল দেবুদার সঙ্গে, রুনুদির বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে। ওদের দু'জনেরই ছেলে, এই টুটুল আর সোনাদির ছেলে টিপলু হয়েছিল কাছাকাছি সময়ে। তারপর আবার রাতুল হলো রুনুদির, আর বছরখানেক পরে সোনাদিরও আবার ছেলে— জোজো জন্মাল। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে মেডিকেলে ঢুকে গেছি। বাবা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল নিশ্চয়ই।

ধীরেসুস্থে তখন বাড়ির তিন তলাটাও হয়ে গেল।

অথচ এখন ভাবলে মন হয়, আসলে তখন দিনগুলো খুব দ্রুতই কেটে গিয়েছিল। যেন দেখতে দেখতেই এক একজনের জীবনের পট পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। আর সেই সঙ্গেই বদলে যাচ্ছিল আমাদের দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক চেহারাও। এখন পিছনে তাকিয়ে মনে হয়, একটা সার্বিক অস্থিরতা যেন সেই সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে কালো ধোঁয়ার মতো শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, এমনকী শুধু ভারতবর্ষেও না, সারা পৃথিবীর ওপর স্থায়ী প্রভাব নিয়ে ছেয়ে ফেলল আকাশ।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার টিকল না। শ্রীমতী গান্ধীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে, সাহায্যে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান কোনওদিনই আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্পর্ক রাখেনি। বাংলাদেশ হওয়ার পরে তিক্ততা আরও বেড়ে গেল। আর তার থেকেও আশ্চর্যের কথা, যাদের সহযোগিতায় অবলম্বনে আশ্রয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেল, কয়েক বছরের মধ্যে তারাও নিজেদের মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার সঙ্গেই ভারতবিরোধী হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কাতারে কাতারে বাংলাদেশী মানুষ তখন আমাদের দেশে চলে এসেছেন। নক্সাল আন্দোলন চলছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস সরকারের ঘটও উল্টে গেল। আর তার পরের বামফ্রন্ট সরকারের জগদ্দল পাথর পশ্চিমবঙ্গের বুকে অনড় হয়ে বসে থাকার কী ভবিতব্য, বাঙালি আজও তার হদিশ পায়নি। শুধু টের পায়, পাল্টে যাওয়া কমিউনিস্ট কালচারে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ কতখানি পিছিয়ে পড়েছে, আরও অন্যান্য রাজ্য থেকে। কিন্তু বিকল্পই বা কী!

বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডে থাকতে থাকতে এখন দেশে গিয়ে আমারই মাঝেমধ্যে মনে হয় যেন, আংশিক পরবাসী আমি। এবং আমার এই অনুভূতি শুধু বাইরে না, ঘরেও অনুভূত হয় যেন। একইসঙ্গে একটা চাপা উদ্বেগ প্রায়ই মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। চেষ্টা করি, সেটাকে গুরুত্ব না দেওয়ার, কিন্তু পরিস্থিতি পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক আবহ আমায় নীরবে সতর্ক করে। উদ্বেগ প্রশমিত হয় না।

বাড়ির চেহারা আর অবস্থার কথা একটু বলি।

বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে আমাদের বাড়িটা রাস্তার ওপরেই বলা যায়। দু'পাশে অন্যান্য বাড়ি থাকলেও, আমাদের চওড়া গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকে যায় এবং গিয়ে বেশ খানিকটা লম্বা উঠোন মতো, তার ডানদিকে আমাদের তিনতলা বাড়ি। উঠোনটার খুব একটা এখন আর অবশিষ্ট নেই, কেননা বাবা বেঁচে থাকাকালীন আমি যখন মাত্র দু'খানা বেড দিয়ে গুডলাক নার্সিংহোম খুললাম, তার কিছুদিন পরে পরেই, পড়ে থাকা জমিটায় কন্স্ট্রাকশনের কথা ভাবলাম। বাবাকে বললাম। বাবা খুশি হল। নার্সিংহোম বড় হবে।

কিন্তু ফাইনাল অনুমতি দেওয়ার আগে বাবা একটা দারুণ কাজ করেছিলেন।

আমাকে ডেকে বললেন, শোন, ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জটিলতা এড়ানোর ভাবনা ভেবে রাখার দরকার।

আমি বললাম, আমাদের এখানে জটিলতা সৃষ্টিরই তো সুযোগ নেই। কে করবে?

নিশ্চয়ই কেউ করবে না। তাহলেও... একটা প্রশ্ন উঠতে

পারে...।

আমি মাঝখানে বললাম, বাড়িটা কার? তোমার, নাকি আমার? সেই প্রশ্ন!

বাবা হেসে বলল, ভবিষ্যতে সে প্রশ্ন করার জন্য আমি নেমে আসতে পারব না বটে, যদ্দিন আছি ততদিনও করব না। কিন্তু সোনু, ঝুমা যে কোনওদিন করবে না, সে কথা কি গ্যারান্টি দিয়ে কেউ বলতে পারে! আমায় ভুল বুঝিস না।

আমি সত্যি ভুল বুঝবো কি, বাবার বাস্তব ভাবনা এবং দূরদৃষ্টির কথা ভেবে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

আমার নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই বাবা বলল, আর কিছুই না, এই উদ্যোগের মধ্যে আমি আসলে আমাদের ঘরবাড়িরও একটা উইল-টুইল করে ফেলব। বয়স হয়েছে, এসব আর ফেলে রাখব না।

আমি খানিকটা সংকোচে সিঁটিয়ে, অস্বস্তিতে বলে ফেললাম, শোনো বাবা, তুমি যা ভাল বোঝো করো। আমি কিন্তু সম্পত্তি-টম্পত্তির মধ্যে নেই। আমার তো মাথাতেই আসেনি যে বাড়ি-টাড়ি নিয়ে কথা উঠতে পারে।

কেন তোর মাথায় আসেনি? আসা উচিত ছিল। দেবু-সোনুর দৃষ্টি দেখতে পাস না?

বাবা! তুমি আমাকে তেমন বৈষয়িক, সম্পত্তিমনস্ক বলে ভাবো?

ওরে বোকা, ভাবি না বলেই তো আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোর কাজ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যেতে চাই। একটা কথা মনে মনে রাখিস তিনু, মানুষ হিসাবে আমি তোকে যতখানি বুঝি, সোনু-ঝুমাও ততখানি বুঝবে না।

আমার তখনই চোখ জল এসে যাচ্ছিল।

বাবা তার মধ্যেই আবার বলল, তাছাড়া মেয়েদের আমি বুঝলেও ভবিষ্যতে জামাইদের কার কী মানসিকতা দাঁড়াবে, তার ঠিক কি! সেইজন্যই কোনও কথা ওঠার পথ আমি খুলে রাখতে চাই না। রেজিস্টার্ড উইল এবং দলিল করে ফেলতে চাই।

বললাম, যা ভাল বোঝো করো, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

আজকে নেই বলছিস, ভবিষ্যতে তোকেই কিন্তু সামলাতে হবে সব। দরদ থাকলে তোরই থাকবে, আমি জানি। তাছাড়া সোনু-ঝুমাকেও আমি তো বঞ্চিত করে যাব না, তারাও তো আমারই সন্তান।

কী করতে চাও তুমি!

তিনতলা বাড়ির এক একটা ফ্লোর তোদের নামে করে দেব। কিন্তু সোনু-ঝুমা যদি তা রাখতে না চায়, বিক্রি করে দিতে চায়, তাহলে তোকেই বিক্রি করতে হবে। ইন আদার ওয়ার্ডস, তুই ওদের টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে পুরো বাড়িটা নিজের করে নিতে পারিস। আমার মনে হয়, সেটাই হবে এবং হলেই ভাল। নিশ্চয়ই ওরা তাইতে খুশি হবে। ওরা এখানে এসে থাকবে না।

আর উঠোন, গ্যারেজ এসবগুলো?

ওগুলো তো রাস্তাঘাট চওড়া হওয়ার পরে কতটা কী থাকবে জানি না। ওটা সব আলাদা দলিল করে তোর নামে এখন থেকে লিখে দেব, যাতে এ্যাবসল্যুটলি কোনও কথা না ওঠে। এবং তুই যাতে কন্সট্রাকশনের কাজ শুরু করতে পারিস। এমনিতেই এটা পুরনো পোড়ো জমি, একসময় কলোনী ছিল। ডিসপিউট আছে কিনা জানি না। থাকলেও তোকে টাকাপয়সা দিয়ে কোর্ট থেকে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। দেখবি, তাতেও বেশ খরচ আছে। সুতরাং তোকে আমি বেশি করে ফ্রি কিছু দিয়ে যাচ্ছি, একথা অন্তত শোনু-ঝুমার বলার কোনও অবকাশ থাকবে না, কেননা, ওরা এসব ঝামেলা ঘাড়ে নেবে না।

বাবার সামনে তখন সত্যি সত্যি আবেগ দেখানোর আর বয়স ছিল না আমার। ডাক্তার হয়েছি, বিয়ে করেছি ছ'বছর হয়ে গেছে, স্বল্পকালীন বিলেত গিয়ে পড়াশুনা, ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছি। বুবু-টোটাও জন্মে গেছে। ওদিকে ঝুমারও বিয়ে হয়ে এক মেয়ে হয়েছে। সোনাদি তো প্রায় মধ্যবয়স্কা। দেবুদা হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিসের সঙ্গে শেয়ার মার্কেট আর জমির দালালি করে বেশ পয়সা করেছে। বিয়ের সময় বাবা যে জমি দিয়েছিল, সেটা বিক্রি করে দিয়ে ওরা সস্তায় হরিদেবপুরে বড় জমি কিনে বাড়ি করেছিল ওই টাকায়।

আসলে দেবুদাটা ছিল বুদ্ধিমান এবং পাকা ব্যবসাদার। টাকা ছাড়া ও আর কিছু বুঝতো না, সেটা ক্রমশ জেনেছি।

বাবা নিশ্চয়ই একটু একটু করে টের পেয়েছিলেন যে, ওই জামাইটিকে একসময় আশ্রয় দিয়ে, সাহায্য করে শেষপর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেও, ওর সঙ্গে রুচিগত কোনও মিল হয়নি। যে কারণে ওপর ওপর যোগাযোগ থাকলেও মনের সম্পর্ক বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। আর সোনাদিও কালক্রমে দেখা গেল, মুখে বড় বড় কথা, মানবিকতা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বুলি কপচালেও চিত্তের চাপা অহমিকা আর অর্থের গোলামী ছাড়া কিছু করল না। ওরা দু'জনেই প্রকৃতপক্ষে অতি হিসাবী মানুষ।

সত্যি কথা বলতে কি, পরবর্তীকালে আমিও কেমন একটা শ্রেণীগত পার্থক্য অনুভব করায়, সোনাদি-দেবুদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার আবেগ, উৎসাহ হারিয়েছিলাম। তাছাড়াও একটা কারণ আছে, সেটা পরে বলছি।

ওদিকে ঝুমার বরটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার, দূরদর্শনের প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করে। আবৃত্তি-টাবৃত্তি করে, ঝুমাও গান বাজনাটা পুরো ছেড়ে দেয়নি। ওদের দু'জনেরই কিছুটা সাংস্কৃতিক দুর্বলতা আছে। সাতে পাঁচে থাকে না। লেকগার্ডেন্স-এ ফ্ল্যাট কিনেছে তিন কামরার। সৈকত-ঝুমা আর ভাগ্নী রুমনির সঙ্গে আমাদের এখনও বেশ যোগাযোগ আছে।

যাই হোক, এক কথা থেকে অন্য কথায় এসে পড়ছি।

বাবা বাড়ি-জমি ইত্যাদি সব উইল-টুইল করে দিয়েছিলেন। তিনতলা সোনাদির। দোতলা ঝুমার। একতলা আমার। তাছাড়া জমির যে অংশ পড়েছিল, সেটা আমার নামে আলাদা করে লিখে

দলিল করে দিলেন। আমি সেটা নিয়ে আলিপুর কোর্টে গেলাম রেজিস্ট্রি করানোর জন্য। আর তখনই জানতে পারলাম, আমাদের পুরো বাড়িরই রেজিস্ট্রেশন, কর্পোরেশনের ট্যাক্স কিছু দেওয়া হয়নি বহু বছর। সবকিছু রেগুলারাইজ করে পাট্টা পেতে হলে কয়েক লাখ টাকা লাগবে।

এদিকে আমি তখন নার্সিংহোম ভাল করে করার জন্য, যাকে বলে মেন্টালি প্রিপেয়ারড্। কিন্তু টাকার কথা বাবাকে বলব না।

সাধারণত এরকম অবস্থায় সব পুরুষ মানুষই যা করে, আমাকেও তাই করতে হল। বউয়ের সঙ্গে আলোচনা, পরামর্শ। বিষয়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি আগলাতে আর ছেলেপুলে মানুষ করতে বউয়ের বিকল্প আর কিছু হয় না। আর ছায়া আমার কলেজের ক্লাসমেট থেকে বউ হয়ে গেলেও সত্যিই ও আমার ছায়া ভিন্ন আর কিছু না। কিন্তু সেটা কর্মক্ষেত্রে।

বাস্তব জীবন ওর একটি শান্ত ব্যক্তিত্ব যেমন আছে, তেমনই মনের দিক থেকে কুচুটে এবং পরশ্রীকাতর নয়। মা-বাবা দু'জনকেই ও অসম্ভব ভালবাসে। বাবা-মাও, আমি জানি আমার বধূ নির্বাচনে সন্তুষ্ট। আমি একসময় মাকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার নাম অরু না হয়ে যদি তরু হতো, তাহলে আমি বাড়ি নার্সিংহোম— সবকিছুর নাম দিতাম — তরুছায়া।

ছায়াকে বললাম, কী করব তাহলে? যে টাকা দিয়ে নতুন কন্সট্রাকশন শুরু করব ভেবেছিলাম, শুধু জমি রেজিস্ট্রেশন আর ট্যাক্স দিতেই তো তার থেকে বেশি লেগে যাবে। এসব তো আগে করিনি, হিসেবের মধ্যেও ছিল না।

চিন্তান্বিত মুখ নিয়ে ছায়া নীরব হয়ে রইল।

আমাদের সেইসময় বেশ খারাপ অবস্থা। বিলেত ফেরৎ ডাক্তার দু'জনে, কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। টুকটাক যা রোজগার তাই দিয়ে যা হোক করে সংসার চলছে। কিন্তু স্টক বলতে সেই ইংল্যান্ড থেকে যা নিয়ে এসেছিলাম। তার ওপর দুই ছেলে, ছয় আর এক বছরের এবং বাবা-মা থাকলেও আমরা কিন্তু আলাদা থাকি, খাই। বাবা-মা রুনুদিরা তিনতলায়, আমরা দোতলায় এবং একতলায় আমাদের এবং অবশ্যই বাবারও ক্লিনিক ইত্যাদি। উইল-এ আছে, বাবা-মা'র জীবদ্দশায় আমরা কেউ নিজেদের বাড়ির অংশ দাবি করতে পারব না। একমাত্র জমি বা উঠোন যেহেতু শুধু আমার নামে, ওখানে আমার কিছু করার হলে করতে পারি।

ছায়া একটু পরে বলল, বাবার সঙ্গে একবার কথা বললে কেমন হয়!

আমি চমকে উঠে বললাম, ইমপসিব্‌ল। প্রথম কথা হচ্ছে বাবার হাতে এখন আর টাকা পয়সা নেই। দ্বিতীয় কথা উঠোনের জমি বাবা আমায় দিয়েছে, যদিও তা প্রায় কেনারই সামিল, কিন্তু তাহলেও...

ছায়া আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলল, না-না, আমি আমার বাবার কথা বলছি। লেক টাউনে আমাদের বাড়ির অর্ধেক তো আমারই। সে আজ কত বছর আগে বাবা উইল করেছে। ভাগাভাগি হয়নি, কিন্তু হাফ তো আমারই।

কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হল আমার। প্রকারান্তরে সেই তো শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকেই নেওয়া।

অথচ আর একদিক থেকে ভাবতে গেলে, সংসারটা তো আমাদের দু'জনারই। স্বামী-স্ত্রীর প্রপার্টি কি আলাদা হয়! তাছাড়া প্রাপার্টির থেকে বড় কথা, আমি এমন একটা প্রতিষ্ঠান করতে চাইছি, যেখানে আমরা উভয়ই জীবিকা অন্বেষণ করব।

কিন্তু মনের খচ্খচানি যাচ্ছে না। ছায়াকে বললাম, থাক এখন। তোমার সম্পত্তি যেমন আছে থাক।

ছায়া শান্তভাবেই বলল, থেকে কী হবে বলো তো? আমি কি ওবাড়িতে গিয়ে কোনওদিন থাকবো?

সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। হুট বলতে বাড়ির আধখানা তুমি কি বিক্রি করতে পারো?

সে কথাই উঠছে না। দাদাকে বলব, পুরো বাড়ি ও নিয়ে নেবে, আমাকে টাকা দিয়ে দেবে। এমনিতেই শুনছিলাম, ও বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুবিধা বলে দাদা একটা বড় ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবছে। পুরো বাড়ি নিজের হলে এক্সটেন্ড করতেও পারে।

আমার মুখের চেহারা দেখে ছায়া আবার বলল, বুঝেছি, তোমার আঁতে লাগছে। তাই না!

একটু এনতাম করে বললাম, একটু লাগারই কথা না! নার্সিংহোম করার জন্য বউয়ের সম্পত্তি বিক্রি করতে হচ্ছে....

সম্পত্তি নিয়ে বউ করবেটা কী? প্রয়োজনে কাজে লাগবে বলেই তো বাবা দিয়েছে, নাকি? এটা ঠিক বিক্রি করাও না।

কিন্তু প্রয়োজনটা কার?

কার মানে! তোমার-আমার, বুবু-টোটা সকলেরই।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গিয়েছিল। ছায়াকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি দাদার সঙ্গে কথা বলো, নার্সিংহোমটা ফেলে রাখা যাবে না, বাড়াতেই হবে এবং নতুন কন্সট্রাকশন করতে হবে। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে।

বলো, শুনি।

এই নতুন বাড়ি, নার্সিংহোম সব তোমার নামে হবে।

কী বুদ্ধি তোমার! সব আমার নামে হবে.... তারপর ইনকাম ট্যাক্স যখন আমার গলা কাটবে?

আগে তো ইনকাম হোক.... তখন দেখা যাবে। কিন্তু ওসব তোমার নামে হয়ে যাবে।

বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল। বাবার বাড়ির গা ঘেঁষেই পাঁচতলার ফাউন্ডেশন দিয়ে আমাদের বাড়ির পিলার উঠতে লাগল। তারপর যা হয়, খানিকটা হয়ে যায়, আমাদের হাত খালি হয়ে যায়, আবার একটু এগোয়। কিন্তু দুটো ফ্লোর আমরা একটানে শেষ করে ফেললাম। আর ছাদ ঢালাই হয়ে গিয়েছিল সব ক'টার অর্থাৎ চারটে ফ্লোর-এর। বাবার বাড়ি, আমাদের বাড়ি নিয়ে একটা এল প্যাটার্নের কন্সট্রাকশন হল, কিন্তু দুটো বাড়ির গেট রইল একটাই।

নার্সিংহোম বড় হয়ে গেল। পুরনো বাড়ির একতলা আর নতুন বাড়ির দুটো ফ্লোর নিয়ে গুডলাক নার্সিংহোম পরিচিতি পেতে লাগল। আমরা একটু একটু করে এবার পায়ের নীচে মাটি খুঁজে যাচ্ছি। থাকি পুরনো বাড়িতেই, দোতলায়। বাবা-মা ওপরে। এক তলাটাও আমরাই ব্যবহার করি— তাই মাসে মাসে ভাড়া দিই বাবা-মাকে। আসলে বাবা-মা থাকাতে ছেলেদের জন্য আমাদেরই কত সুবিধা। সে তুলনায় ভাড়ার জন্য টাকা তো কিছুই না।

ছেলেরা পড়ছে। আমরা প্র্যাকটিস করছি। জীবন বয়ে চলেছে। বাবা-মার বয়স হয়েছে, কিন্তু ভালই আছে। বাবা আগের মতো আর প্র্যাকটিস করে না, কিন্তু ই এস আই-এর কিছু রোজগার আছে। তাছাড়া অতিথি আপ্যায়ন ছাড়া বাবা-মা'র খরচই বা কী! সোনাদিরা, ঝুমারা মাঝেমধ্যে আসে। পিসিমা আসে। রুনুদি তো সবসময়ই ওপর নীচে যোগাযোগ রাখে। খেয়াল করেছি, দেবুদা-সোনাদি যখনই আসে, ঘুরেফিরে আমাদের নতুন বাড়ির প্রসঙ্গ, সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাটা ঠিক কিভাবে উঠে আসে।

আমি পাত্তা দিই না। মনে হয়, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের হীনমন্যতা থেকেই দেবুদা বড় বড় কথা বলে। তাছাড়া সুদখোর, ব্যবসাদার।

এর মধ্যেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটনা। নিখিল জামাইবাবুকে নিয়ে রুনুদি, পিসিমারা হাজির আমাদের নার্সিংহোমে। হিস্ট্রি থেকেই হার্ট অ্যাটাক বোঝা গিয়েছিল। ইসিজি দেখে তো হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার জোগাড়। কিন্তু সব থেকে মুসকিল হলো, সেকথা রুনুদিদের মতো অবচীনদের বোঝাবে কে! ওদের বোধবুদ্ধি, শিক্ষা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমার ভালই ধারণা আছে। ছোট থেকে দেখে আসছি, ওরা শুধু নির্ভর করতে শিখেছে। আর একবার সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তারা ভুলে যায়, নির্ভর করার কোনও শেষ নেই। শুধু তাই না, একসময় সেটাকে তাদের পাওনা বলেই ভাবে বোধহয়।

যাই হোক অক্সিজেন-টক্সিজেন দিতে দিতেই এ্যাম্বুলেন্স ডেকে কোনও আই সি সি ইউ-তে নিয়ে যাব ভাবছি, কিন্তু নিখিল জামাইবাবু, রুনুদি কেউ রাজি না। আমি জানি, কোথাও নিয়ে গেলেও আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে যা হওয়ার তা হবেই। তাহলেও নিয়ে যেতে হবে। নাহ্... কোনও সুযোগ হয়নি। নিখিল জামাইবাবুর ডায়াবিটিসও ছিল। ওরকম ম্যাসিভ এ্যাটাকে আর কিছু করা যায় না। কার্ডিওলজিস্ট দেখলেন, কিন্তু পরের দিন সকালেই লোকটা ধড়ফড় করে মরে গেল।

মানুষটাকে ভালবাসতাম, কী যে একটা কষ্ট গলার কাছে আটকে রইল!

আর সেই কষ্টটাই যেন এক নীরব অসহায়তায় বুকে আটকে রইল, যখন টুটুল আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, ও মামা গো... এ কী হলো... বাবা মরে গেল..।

কী উত্তর দেব! ওদের চোখের সামনে থেকে সরে না গেলে, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না জানি। কিন্তু আজও,

এখনও আমি টের পাই, টুটুলের সেই একুশ-বাইশ বছর বয়সের বিভ্রান্ত, অসহায়, দিশাহারা কান্না, কোথায় যেন আমার মধ্যে ওর জন্য একটা স্থায়ী দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ওকে আমি আর কখনোই ছাড়তে পারিনি।

বাবা কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল।

আমাকে শুধু দশ-বারো দিন পরে বলেছিল, নিজের আর একটা মেয়ে থাকলে কি এ অবস্থায় ফেলে দিতে পারতাম!

আমাকে ওকথা বাবা কেন বলেছিল, আমি তা ভালই জানি।

বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষ আপন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকে। আর থাকে বলেই নিজের ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কিছু আভাস ইঙ্গিত দিয়ে যায় ভালবাসার মানুষের কানে। ভালবাসা থেকে তৈরি হয় বিশ্বাস। আমি জানি, বাবা মুখে না বললেও বিশ্বাস করতো, সে ভাবনার বীজমন্ত্র আমার কানে দিয়ে গেছে, আমি তা বিস্মরণ হবো না। বাবার সঙ্গে আমার ভালবাসার এমন একটা গোপন বাঁধন ছিল, যা ওপর ওপর আবেগে ছলছল করতো না, কিন্তু দৃঢ়তায় গভীরে বইতো। আমি ছাড়া আর কাকেই বা বাবা নিজের ইচ্ছা-তরীটি বাইতে দিতে পারতো!

সদ্যবিধবা রুনুদি, তিন ছেলে— টুটুল, রাতুল, পান্নাসহ আমাদের বাড়ির তিনতলার বাসিন্দা হয়ে এলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। আর সত্যিই কিছু কিছু মানুষের ছোট মন, নিস্পৃহতা এবং স্বার্থবোধ যে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনার পরেও যে কত সীমাহীন হতে পারে, সেই সময়েই আমি তার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখেছিলাম। সোনাদি-দেবুদাদের আচরণে, কিছু মন্তব্যে এবং ওদের কাল্পনিক আগাম আশঙ্কায়। ওরা বোধহয় ভেবেছিল, বাবা এবার রুনুদির সংসারটা প্রতিপালনের জন্য মাসে মাসে কিছু অর্থ সাহায্য করতে বলবে ওদেরও। এমনকী বলা যায় না, ওরা সম্ভবত এই আশঙ্কাও করেছিল, বাবা শেষপর্যন্ত নতুন উইল করবেন না তো! যাতে রুনুদি এবং ওর ছেলেদের বাড়ির কিছু অংশ দিয়ে দেবেন!

আমার কানে এসেছিল সোনাদির মন্তব্য : বাবার অত উদারতার আদিখ্যেতা দেখানোর কী হয়েছে!

ওদের মানসিকতার আর একটা প্রকাশ ঘটতে দেখেছিলাম, কয়েক মাস পরে। মা'র কাছে ইনিয়েবিনিয়ে সোনাদি বলেছিল, বাবার বাড়ি তো আমাদের শুধু নামেই হয়ে রইল। কাজে কিছুই লাগছে না। তিনু যদি একটা ফ্লোরের দাম হিসেবে টাকাটা দিয়ে দেয়, তাহলে আমরা একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারতাম।

বাবা আমাকে বলেওছিল, তিনু... পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিতে পারবি? তাহলে নিজের মেয়ে-জামাই হলেও, ওই টাকার কাঙালদের আর এ ত্রিসীমানার মধ্যে আসা বন্ধ হয়ে যেত।

আমি কী করব! আমরা যে তখনও হালে পানি পাইনি। বাড়ি করে, নার্সিংহোমের ইন্সট্রুমেন্টস্ কিনতে কিনতে ফতুর হয়ে যাচ্ছি। রোজগার চোখে দেখি না। বাবাকে বলেছিলাম, আমার মাথায় সব আছে বাবা। শুধু আর একটু সময় লাগবে। পঞ্চাশ হাজার কেন, স্কোয়ার ফুটের হিসাব করে আমি ওদের টাকা দিয়ে দেব, এবং সেটা যত টাকাই হোক।

বাবা বলেছিল, রুনুরা এ বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করার পর থেকে ওদের টেনশন বেড়ে গেছে আমি জানি। আর তোদের প্রতিও ওদের অসম্ভব ঈর্ষা। আমার মেয়েও যে এমন পয়সা-পিশাচ, লোভী, নিকৃষ্ট সংকীর্ণমনা হতে পারে, কেন হবে, আমার মাথায় আসে না। আসলে কী জানিস, সব হচ্ছে হীনমন্যতা। পয়সা আছে, কিন্তু মন নেই, কালচার নেই, মনুষ্যত্ব নেই।

আমি সবসময় ভাবতাম, কখনও যেন সোনাদিদের এই মানসিকতা রুনুদি-টুটুলরা না জানে। যত অবহেলা, অশিক্ষা, অবাচীনতা ওদের থাক, ওরা যে অসহায়, সে ব্যাপারে তো কোনও সন্দেহ নেই। প্রাথমিকভাবে বাবা-মা এবং তারপর আমি-ছায়া ওদের যদি কাছে টেনে না রাখি, কোথায় যাবে! নিখিল জামাইবাবুর ফ্যামিলি তো হাত ধুয়ে ফেলেছে।

না, রুনুদি-টুটুলরা কিছু জানতে পারেনি। আমরা ওদের জানতে দিইনি।

ঝুমা-সৈকতরা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারতো না বটে, কিন্তু খোঁজ খবর নিত। সহানুভূতিও ছিল রুনুদিদের জন্য।

তিনটে ছেলে যা হোক পড়াশুনা করছে। দাদু-দিদিমার কাছে আছে। আমরা মামা-মামীও কাছে আছি। আর বাচ্চাদের তো আপন-পর বোধ কম থাকে। বাবা-মা'র আচরণ দেখেই যা শেখার শেখে। টুটুল-রাতুল-পান্নাকেও বুবু-টোটা দাদা বলে বুঝে গেছে। নীচের তলায় আমরা থাকলেও একই বাড়িতে বাস। সবাই ওরা কাছের মানুষ।

কয়েক বছরে আমাদের বাড়ির তিনতলা-চারতলা শেষ হলো। আমরা শিফ্‌ট করলাম নতুন বাড়িতে। কিন্তু ঝুমার অংশ দোতলাটাও নার্সিংহোমের কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। সুতরাং মাকে বাবাকে ভাড়া হিসেবে টাকাটা ডবল করে দিলাম। রুনুদিদের জন্য খরচটা তো টানতে হবে। চারটে মানুষের খরচ কম না। বেড়েও যাচ্ছে দিনকে দিন।

এসময়েই আমি টের পাচ্ছিলাম, টুটুলের মন উড়ু উড়ু। লেখাপড়া তো ছেড়ে দিয়েছে, এদিক সেদিক রোজগারের ধান্ধা করছে। বয়সে ও আমার থেকে এগারো বছরের ছোট, তা সত্ত্বেও কয়েক বছর ধরে কাছাকাছি থাকতে থাকতে ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠেছে। আমি খেয়াল করেছি, লেখাপড়া না করলেও, টুটুল মিশুকে ছেলে এবং বেশ বুদ্ধি ধরে। এহেন ছেলের এই বয়সে মন উড়ু উড়ু হওয়ার কারণ বুঝবো না, অত বোকা আমি নই। এদিক সেদিক থেকে কানেও এসেছে, কলোনী পাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে লটঘট চলছে।

চেম্বারের পর একদিন আমাদের নতুন বাড়ির ছাদে বসে বীয়ার খেতে খেতে ওকে ধরলাম। এমনিতেও আমার কাজের পর

সময় পেলে কখনও-সখনও টুটুল এবং ওর দু-একটা বন্ধুবান্ধবও আমার কাছে আসে। মেশামিশির ব্যাপারে আমার কোনও জড়তা এবং ভারিক্কিভাব কোনওদিনও নেই, যে কারণে ওরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে আমার সামনে। কয়েকবার আমরা একসঙ্গে পিকনিক টিকনিকও করেছি ওই ক'বছরে। নতুন পাড়ায় এসেও টুটুল নিজেকে পরিচিত করে ফেলেছে আমি জানি।

টুটুলকেও গ্লাসে বীয়ার দিয়ে চিয়ার্স বলে জিজ্ঞেস করলাম— তোর কাজকর্ম কেমন চলছে? ঠিকঠাক হচ্ছে কিছু?

গ্লাসে চুমুক দিয়ে টুটুল বলল, মোটামুটি যোগাযোগগুলো তো হয়েছে মামা, কিন্তু কন্ট্রাক্টরি লাইনটাই হচ্ছে একেবারে ছ্যাঁচড়ামি আর ছোটলোকামির লাইন।

মনে মনে বললাম, কী আর করা যাবে! অন্য কোনও লাইনে যাওয়ার উদ্যোগ, যোগ্যতা কোনওটাই তো তোর নেই। বি এস সি-টা পাশ করলেও না হয় কোনও একটা ওষুধ কোম্পানি-টোম্পানিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তাও করলি না।

মুখে বললাম, সে সব তো তুই বুঝেশুনেই শুরু করেছিস।

হ্যাঁ, তা তো বটেই। টুটুল বলল, আসলে এসব কাজে একটা মোটা ক্যাশ-ফান্ড নিয়ে নামতে পারলে লাভ আছে। কিন্তু আমার পুঁজি বলতে তো সেই বাবা মারা যাওয়ার পরের চল্লিশ হাজার টাকা।

আমি বললাম, কী আর করবি! ফ্যামিলির টাকা না পেলে, বড় ক্যাপিটাল নিয়ে কেউ ব্যবসা শুরু করবে কি করে! ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছিলি, আমি বলে দেওয়ার পর?

ওহ্, হ্যাঁ। তুমি গ্যারান্টার হয়েছ বলেই তো মিস্টার সিন্‌হা ইনিশিয়ালি এক লাখ টাকা লোন দিয়েছিলেন।

সেটা কাজে লেগেছে?

ওটাই তো আমার বেস। সে টাকা আমি ফেরতও দিয়ে দিয়েছি। তারপর আবার দু লাখের জন্য এ্যাপ্লাই করেছি। মনে হচ্ছে পেয়ে যাব। এসব করেই টুকটাক চলছে। বন্ধুরাও হেল্প টেল্প করছে। ডিভিসি, ও এন জি সি বলেছে কাজ দেবে।

কিছুক্ষণ এসব কথা বলতে বলতেই টের পাচ্ছিলাম, টুটুল উৎসুক হয়ে উঠেছে, কিছু অন্য কথা বলার জন্য। অন্য কথা যে কী, আমিও তা বুঝতে পারছি, তাহলেও ওর বলার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। টুটুল প্রসঙ্গ উত্থাপন করল নিজেই।

ইয়ে.... মামা, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কার জন্য ইম্পর্টেন্ট? তোর না আমার?

না-না, আমার জন্যই। তাহলেও তুমি আর মামী ছাড়া একথাটা অন্য কারুর সঙ্গে...। মানে একটা ডিসিশনের ব্যাপার...।

মনে মনে টের পাচ্ছি, আর একটি দায়িত্ব আসছে। বললাম, ডিসিশনটা কি তাড়াতাড়ি নিতে হবে?

হ্যাঁ! টুটুল বোকার মতোই হেসে ফেলল। তারপর বলল, না— মানে হ্যাঁ, নিতে পারলেই ভাল।

মেয়েটার নাম কী? কী করে? বাড়ি কোথায়? বাবা-মা জানে?

আচমকা এগিয়ে আমি এতোগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে ফেলব, টুটুল বোধহয় আশা করেনি। কিন্তু করায়, ও যে খুশি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে বুঝতে পারলাম। গ্লাসের সবটা বীয়ার একসঙ্গে খেয়ে ফেলল।

তারপরের গল্প মোটামুটি সবার ক্ষেত্রে যেরকম হয়, তার থেকে খুব অন্যরকম কিছু না।

টুটুলের প্রেমিকার নাম মিতালী। বাবার কাঠের ব্যবসা, অবস্থা খারাপ না। আমাদের কাছাকাছি, ঠাকুরপাড়া রোডে বাড়ি। বাবা মা জেনে ফেলেছে। বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে, কেননা, ছেলের নিজস্ব চালচুলো নেই। তবে আমাদের বাড়ির ছেলে বলে আবার একেবারে নস্যাৎ করেও দিতে পারছে না। মেয়ে কলেজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে আছে, বিয়ের জন্য রেডি। মেয়ে নাকি বলেই দিয়েছে, বাড়িতে বেশি অশান্তি হলে সে সোজা আমাদের এখানে চলে আসবে এক কাপড়ে।

আমি আবার মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। বিয়ের ব্যাপারে কথা আছে, 'ছেলে ক্ষেপলে বুদ্ধিনাশ, মেয়ে ক্ষেপলে সর্বনাশ'। মেয়ে যখন এতোটা ব্যগ্র, তাহলে আবার কোনও গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে নেই তো! অভিজ্ঞতায় আমিও আংশিক ঘরপোড়া গরু।

টুটুলের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেই জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে, ঠিক করে বল, খুব আর্জেন্ট ডিসিশন নেওয়ার কোনও কারণ নেই তো?

যাহ্ মামা, কী যে বল!

টুটুল ভাল করে হেসে, আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। তারপর বলল, যতটা তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। এখনও আর কাউকে বলিনি, তুমি যা বলবে সেইমতো। তবে তার আগে একদিন তুমি যদি একটু ওর বাবার সঙ্গে... তোমায় তো চেনেই।

মানে আমার তাহলে একটা পীস অব্ মাইন্ড হয়।...

ভেবে দেখলাম, দায়িত্ব অনেক সময় নিতে হয় না, এসে পড়ে। জীবনযাপন মেলামেশা, জীবিকা, রুচি, পরিচিতি এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের এমন একটা ভূমিকা গড়ে তুলি, সেই ভূমিকাই নির্দিষ্ট করে দেয়, কী জাতীয় এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একজনের কাঁধে চাপতে পারে। টুটুল আমার কতখানি আত্মীয়, তার চেয়ে বড় কথা ও যে আমার ঘনিষ্ঠ এবং প্রীতিভাজন, বিগত কয়েক বছরে সেটা অনেকের কাছেই জানাজানি হয়েছে। একসময় সোনাদিরা সেটা নিয়ে অহেতুক কটাক্ষ করায় আমি বেদনাহত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি তা ঝেড়ে ফেলেছিলাম। ভাললাগা কিংবা ভালবাসার কি কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায়! কিন্তু এখন তো বুঝে গেলাম, ভাললাগার ভূমিকা থেকেই দায়িত্ব এসে আমার দরজায় কড়া নাড়ছে। আমি হাত-পা

গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না।

মনে আছে, সেদিনই টুটুল আমাকে প্রথম একটা প্রস্তাব দিয়েছিল।

মামা, নার্সিংহোমের যে এতো জিনিস, ওষুধ, স্যালাইন, এক্স-রের মেটিরিয়াল, ল্যাবের ইনগ্রেডিয়েন্টস, আরও কত কি আছে, সেগুলো আমি সাপ্লাই দিতে পারি না! তুমি আর মামী একটু ভাবো না। তাহলে তো...

অর্থাৎ, নার্সিংহোমে সংযুক্তির ভাবনাটা ওর মাথায় রয়েছে। সুতরাং আমার মাথাতেও আর এক ভাবনা ঢুকলো।

বাড়ির ছাদেই প্যাণ্ডেল করে, রান্নার আয়োজন, টেবিল চেয়ার ভাড়া করে এনে আত্মীয় বন্ধুদের নেমন্তন্ন খাইয়ে টুটুলের বিয়ে হয়ে গেল। তিনতলাতেই বউ নিয়ে রইল। এবাড়ির ভিতর দিয়ে ও বাড়িতে যাতায়াত তো আছেই।

বছর দেড়েকের মধ্যেই টুটুল-মিতালীর ছেলে হলো নার্সিংহোমে, মানে প্রায় বাড়িতেই। ছায়া সিজার করল, আমিও ছিলাম।

এর কিছুদিনের মধ্যে অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা এবং আমার শ্বশুরমশায়ও প্রয়াত হলেন। আমি এখনও টের পাই, বাবার মৃত্যু আমার মধ্যে কষ্ট ছাড়াও যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, তার সবটা এতোগুলো বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমরা অবশ্য খানিকটা স্থিতু হয়েছি। কিন্তু স্থিতিশীলতা বড়ই আপেক্ষিক এবং সাময়িক ব্যাপার।

বাবা মারা যাওয়ার পরে আমাদের দায়িত্ব বেড়েছে এমনিতেই। কিন্তু এবার ছেলেরা বড় হতে হতেই মনে হচ্ছে আমাদের ব্যস্ততা, প্র্যাকটিস, নার্সিংহোমের ম্যানেজমেন্ট সবকিছু চালাতে গিয়ে বুবু-টোটার ভবিষ্যতের প্রতি কি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারছি? যে ছেলেদুটোকে পৃথিবীতে এনেছি, অন্যদিকে দেখতে গিয়ে ওদের ওপর কি সুবিচার করছি!

প্রায় মাঝবয়সে এই সময়েই আমাদের দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার ভাবনা মাথায় আসে। চিঠি চাপাটি লিখলাম। আর যেহেতু বারো বছর আগে প্রথমবার গিয়েছিলাম, কাজ করেছি, থেকেছি, সেই হেতু ডাকও পেয়ে গেলাম।

এখন ভাবতে অবাক লাগে, দেখতে দেখতে দশ-বারোটা বছর তারপরেও এতো দ্রুত কেটে গেল!

শেষপর্যন্ত গত বছর আমরা কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনলাম।

ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রথম বছর চারেকের অতি কঠিন সময় আর ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে উঠতেই ভাবছিলাম, নার্সিংহোম আর বাসস্থান একই জায়গায়। একই বাড়ির ওপরে নীচে থাকাটা বসবাসের পক্ষে খুব আদর্শ না। যদিও আমরা বছরে দু'বার করে এসে সপ্তাহ তিনেকের মতো বাড়িতে থাকি, কখনও আমি একা, কখনও ছায়া, বুবু-টোটার যে কোনও একজনকে নিয়ে, আর খুব কম সময়েই আমরা দু'জন একসঙ্গে। তাহলেও কাছাকাছির মধ্যে আর একটা ডেরা থাকলে একটু স্বস্তি পেতাম।

কিন্তু ভাবনাই সার। টাকা-পয়সার জোগাড়, উপযুক্ত জায়গায় ফ্ল্যাট পাওয়া, অন্য সব দায়দায়িত্ব সামলে চলা— এসব করতে করতেই বছরগুলো যেন এক এক করে এলো আর গেল। ইংল্যান্ডে আবার না গিয়ে যদি কলকাতাতেই থাকতাম, আমি জানি, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য হতে পারতাম। নিজেদের প্র্যাকটিস আর নার্সিংহোমের রোজগার থেকে। কিন্তু বুবু-টোটার এখন যা অবস্থান, মানসিকতা, তা কতখানি গড়ে উঠতো, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া টুটুলদের অবস্থা ফিরে গেছে। সেইজন্য আমাদের মনে কোনও দুঃখ নেই।

এটা তো ঠিকই যে, যে কোনও মানুষের মনুষ্যজন্মের আসল তুষ্টি, আনন্দ অনুভূত হয়, যখন ছেলেমেয়ে ঠিকমতো মানুষ হয়, শারীরিক, মানসিক ভাবে ভাল থাকে। আর ঠিক উল্টোটা হয়, যখন নিজে অনেক কিছু আহরণ করেও যদি দেখে ছেলেমেয়ে অমানুষ হয়েছে। আমি বেশ কিছু তথাকথিত খ্যাতিমান ধনী গ্ল্যামারাস উচ্চপদস্থ সংস্কৃতিবান সামাজিকভাবে পরিচিত মানুষকে চিনি এবং দেখেছি, যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব, গভীর আন্তরিক আপন সত্তার কাছে কি অসম্ভব দুঃখিত, পরাজিত, দীন, লজ্জিত, এমনকী ঘৃণিতও। এবং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ওপর ওপর নিজের জীবনে সব কিছু পেয়েও, ছেলেমেয়েকে ঠিকমতো মানুষ না করতে পারার জন্য, সীমাহীন শূন্যতার অনুভবে তারা চিরদীর্ণ। মুখে তাঁরা যাই বলুন, মনে মনে ঠিক বোঝেন, আসলে তাঁরা হেরো মানুষ। পেয়েছেন বলে একদিন যা ভেবেছিলাম, পরে দেখেন হারিয়েছেন তার থেকে অনেক বেশি।

হ্যাঁ, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর মানুষের সম্বন্ধে এসব কথা হয়তো খাটে না। কেননা, তাদের তো সেই বোধটাই নেই, যে বোধ মানুষকে মানুষ বলে চেনায়। আসলে তারাই হচ্ছে মানুষের চেহারায় পশু। আহার, নিদ্রা, মৈথুন — এই তিনটি জৈবিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যা কিছু করণীয়, সেটুকু করে তারা তুষ্ট থাকে। সুখের সঙ্গে শান্তির, স্বস্তির তফাৎ তারা করতে পারে না। যাক্‌গে।

আমাদের প্রকৃত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আমরা ততখানি বড়লোক বা ধনী হতে পারিনি।

কিন্তু যা হয়েছে, তাই বা খারাপ কি! ছেলেরা তো ঠিক আছে। আমাদের কোনও খেদ নেই সেই অর্থে।

আর একটা ব্যাপার আছে।

একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ফয়দা হিসাবে, নিজেরা ফুলেফেঁপে উঠিনি বটে, কিন্তু সেখান থেকে করে খায় পঁচিশ-ত্রিশটা মানুষ, অর্থাৎ অন্তত কুড়িটা ফ্যামিলি এবং রুনুদির পরিবারটা যে দাঁড়িয়ে গেল, সেটা কি কম কথা! হয়তো এটা ঠিক, যে যার নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে, জন্মায়, তাহলেও আমার মনে হয়, ভাগ্য ফলিত হয়ে ওঠার জন্য একটা আবহ, পরিবেশের

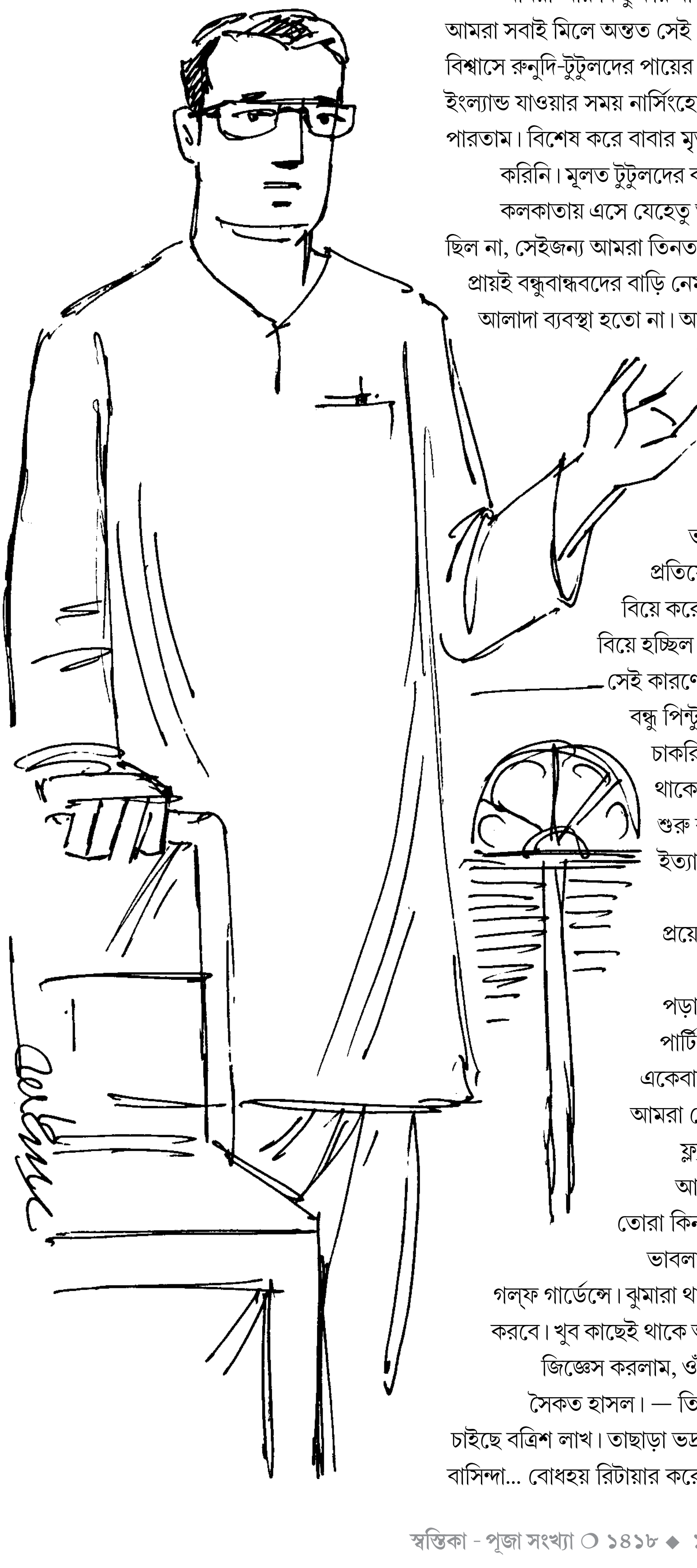

দরকার হয়, যা বিড়ম্বনা আর টানাপোড়েরে হাত থেকে ভাগ্যকেই রক্ষা করে।

আমরা আর কিছু করি বা না করি, কিন্তু আমাদের নার্সিংহোম, বাবা আমি ছায়া আমরা সবাই মিলে অন্তত সেই পরিবেশটা রচনা করেছিলাম, যা আশ্রয়ে প্রীতিতে বিশ্বাসে রুনুদি-টুটুলদের পায়ের নীচে মাটির অস্তিত্ব দিয়েছিল। আমরা তো ইচ্ছে করলে ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় নার্সিংহোম বন্ধ করে দিতে পারতাম, বিক্রি করে দিতে পারতাম। বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পর।

করিনি। মূলত টুটুলদের কথা মনে করেই করিনি। সে কথায় আসছি।

কলকাতায় এসে যেহেতু অল্প ক'দিন থাকি, এবং আমাদের রান্নাবান্নার পাট আর ছিল না, সেইজন্য আমরা তিনতলায় মা-রুনুদি, টুটুলদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতাম। প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি নেমন্তন্ন থাকতো, তাহলেও যে ক'দিন বাড়িতে খেতাম, আলাদা ব্যবস্থা হতো না। আসলে রুনুদি-টুটুলরাও করতে দিত না। সেটা ওদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

কিন্তু আমার ব্যাপারটা খুব একটা মনঃপূত হতো না। তবে ওদের সঙ্গে হৈহৈ করে কয়েকদিনের জন্য খাওয়াদাওয়া করতে ভালই লাগতো। ছোটখাট অসুবিধাগুলো মানিয়ে নিতাম। নীচেয় নার্সিংহোম ভালই চলছে। অন্যান্য ডাক্তাররা আসে, আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নেই বলে, বেশিই আসে। এরমধ্যে রাতুল বিয়ে করে, বউ মেয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে। পান্নাটার বিয়ে হচ্ছিল না, ওর ছোটখাট চেহারা আর একটা চোখে দেখে না, সেই কারণে। দু বছর আগে সে ব্যবস্থাও হয়েছে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিন্টুর ভাইঝির সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছি। মোটামুটি চাকরিবাকরি তো করেই। তার ওপর নার্সিংহোমের ওপরে থাকে বলে, ওদের তো হাজারটা সুবিধা। খাইখরচা থেকে শুরু করে যাবতীয় চিকিৎসার খরচ, বাড়ির ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি— সব নার্সিংহোমের খরচের খাতে চলে যায়। আমাদের চারতলা লাগোয়া বাড়িও, ওদের প্রয়োজনে কাজে লাগে।

আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত, টুটুলের ছেলের পড়াশুনা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা, কখনও ডাক্তারদের পার্টি— সবই আমাদের চারতলার ঘরে হয়। ও তো একেবারে সাজানো গোছানো বাড়ি বলা যায়। বারো বছর আমরা থেকেছি নিয়মিত।

ফ্ল্যাটের খবরটা দিল ঝুমা-সৈকত।

আমাদের কমপ্লেক্স-এ একজন ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেবে। তোরা কিনবি ওটা?

ভাবলাম জায়গটা আমাদের বাড়ি, নার্সিংহোম থেকে দূরে না। গল্ফ গার্ডেন্সে। ঝুমারা থাকে একই কমপ্লেক্সে, যখন থাকব না, ওরা দেখভাল করবে। খুব কাছেই থাকে আমার প্রিয় বন্ধু পিন্টু।

জিজ্ঞেস করলাম, ওঁরা বিক্রি করে দিচ্ছেন কেন?

সৈকত হাসল। — তিনুদা সাত বছর আগে পনেরোতে কিনেছিল, এখন দাম চাইছে বত্রিশ লাখ। তাছাড়া ভদ্রলোক ওড়িশায় ট্রান্সফার হয়ে গেছেন, ওখানকারই বাসিন্দা... বোধহয় রিটায়ার করে দেশেই থাকতে চান।

ওড়িয়া নাকি?

হ্যাঁ। তবে বাঙালিই হয়ে গেছেন। কিন্তু তোমাদের অসুবিধা কী!

বললাম, না-না আমাদের কী অসুবিধা? এমনিই খোঁজ নিচ্ছি।

মিস্টার মহান্তিকে আমি ভালই চিনি। সৈকত বলল। উনিও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করেন, সিনিয়র অফিসার। আর যাই হোক, ফ্ল্যাটের ব্যাপারে কোনও লিটিগেশনের প্রশ্ন নেই।

কিন্তু দামটা খুব বেশি না! একটু বারগেন করে দ্যাখো না।

সে তোমরা যদি কিনবে বলে মনস্থির করো... আমি কথা বলতেই পারি।

সব মিলিয়ে পছন্দ হয়ে গেল। এলাকাটা ভাল, তার চেয়ে কমপ্লেক্সের লোকজনগুলোকে পছন্দ হয়ে গেল বেশি। মহান্তি সাহেবও ভাল মানুষ, সোজাসুজি জানালেন, ফ্ল্যাট কেনাটা ছিল ওঁর ইনভেস্টমেন্ট। ত্রিশের নীচে নামলেন না। থ্রি-বেডরুম, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন এবং দুটো বাথরুম টয়লেট। আমাদের তার বেশি আর কী দরকার। থাকবো তো মেইনলি আমি আর ছায়া। বুবু ডাক্তার হয়ে বেরুবে পরের বছর। টোটা মাস-মিডিয়া নিয়ে পড়ছে কেমব্রিজে, পরে আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, এবার সোনাদি আর ঝুমাকে বাবার বাড়ির অংশের টাকা দিয়ে দেব। মা-র জীবদ্দশায় যদিও দেওয়ার কথা না, তাহলেও যেহেতু নার্সিং হোম ওখানে থাকবে, আগেভাগে দিয়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত, এবং ওরা তো খুশি হবেই।

রুনুদিরা এখনও মা-র সঙ্গে রয়েছে, তাইতে উভয় পক্ষেরই লাভ। মা, একা বিধবা মানুষ, তাঁর একটা কম্পানি হয়। সম্পর্কে মামিমা হলেও আসলে মা তো রুনুদির মায়েরই মতো। তবে টুটুলরা এখন দাঁড়িয়ে গেছে, ও যদি কোনও বাড়ি করে কিংবা ফ্ল্যাট কিনে রুনুদিকে নিয়ে চলে যেতে চায়, মাকে আমাদের রাখার কোনও অসুবিধা নেই। ঝুমা তো কবে থেকেই বলে রেখেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, রুনুদি এবং টুটুলরা নিজে থেকে এখনও আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা বলছে না বলেই আমরাও খানিকটা সংকোচবশত মুখ খুলতে পারছি না। তা নয়তো ঝুমা আর সোনাদিকে ওদের অংশের টাকা দিয়ে দিলে পুরনো বাড়ি নতুন বাড়ি সবটাই তো আসলে আমার আর ছায়ার। নার্সিংহোমটা তখন আরও বড় করতে পারি।

যাই হোক, আমরা গলফ্ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাট কিনে ফেললাম। ওখানেই থাকব মনস্থ করেছি। চারতলা থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। খাট-বিছানা-আলমারি, বাসনকোসন, গ্যাস সিলিন্ডার, ফ্রিজ, ফ্যান, বইপত্র, চেয়ারটেবিল— সবই তো রয়েছে। বাকি যা কিছু দরকার, কিনতে হবে। পিন্টু ইন্টারনাল ডেকরেটর— ওসব ব্যবস্থা ওই করবে।

টুটুল বলল, এটা একটা কাজের কাজ করেছো মামা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোনটা?

এই যে গল্ফ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাট কিনেছো এবং ওখানে গিয়ে থাকবে ঠিক করেছো এটাই। তোমরা না থাকলে চারতলা খালি হয়ে যাবে, তাহলে তোমাদের বাড়ির পুরোটা নিয়েই নার্সিংহোম এক্সটেন্ড করা যাবে। চারটে ফ্লোর, অনেকটা জায়গা।

আমি বললাম, আমার ইচ্ছে, ভবিষ্যতে পুরনো বাড়িও রেনোভেট করে, দুটো একসঙ্গে করে বড় কমপ্লেক্স তৈরি করা।

ও বলল, সেটা তো আমরা এখনও করতে পারি মামা। তুমি গ্রীন সিগন্যাল দিলে, আমি এখনই কাজ শুরু করতে পারি।

টুটুলের হাবভাবে নার্সিংহোম বাড়ানোর উৎসাহ আমি বেশ ভালই পড়তে পারি।

দশ বছরে অভিজ্ঞতা, রোজগার, পরিচিতি, পজিশন— সব মিলিয়েই ও পিকআপ নিয়েছে বেশ ভাল। আমাদের অনুপস্থিতিতে একটু একটু করে টুটুলই এখন গুডলাক নার্সিংহোমের তথাকথিত বস্ হিসাবে একটা জায়গা করে নিয়েছে। আমিও একটা তুষ্টি এবং উষ্ণতা অনুভব করি। বিলেত যাওয়ার সময় ওর অনুরোধকে গুরুত্ব দিয়ে যখন ছেড়ে গিয়েছিলাম ওর হাতে, তখন কম টেনশন ছিল না আমাদের। কিন্তু এখন বুঝি, টুটুলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। কেননা, ও ব্যবসা বুঝে গিয়েছে।

আমরা অবশ্য ওর হাতে ছেড়ে গেলেও ওকে তো কোনও আর্থিক দায়বদ্ধতায় রেখে যাইনি। প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত একটাও টাকা নিইনি ওর কাছ থেকে। লভ্যাংশের সবটাই বলেছিলাম ওকে নিতে। আমি জানি, টুটুল নিজেও তাইতে একইসঙ্গে আনন্দিত, নিশ্চিন্ত এবং বিস্মিতবোধ করেছিল। কেননা, সেই তখনই, আজ থেকে এগার বছর আগে, যে কোনও পার্টি আমাদের মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিতে চেয়েছিল এবং বছরে টেন পার্সেন্ট করে বাড়িয়ে যাবে বলেছিল। আমরা দিইনি। টুটুলদের দাঁড়াতে দিয়েছিলাম।

এখন অবশ্য আমরা ওর কাছ থেকে মাসে পঁচিশ হাজার করে নিই এবং ওটুকু দিতে পেরে ও সহজ বোধ করে আমি বুঝি।

ও নিজে থেকে আমাকে আবার বলল, দ্যাখো মামা, সবমিলে আমাদের এখন যতটা জায়গা হবে, কিছুটা এক্সটেন্ড করলেও তোমার অন্তত এখান থেকে মাসে এক লাখ টাকা রোজগার হওয়ার কথা। এসবদিকে এখন শুধু বাড়িই ভাড়া দেওয়া হয়, স্কোয়ারফুট হিসেব করে, তার ওপর নার্সিংহোমের প্রফিট কম হলেও কিছু তো হয়। তুমি একটু ভেবে আমাকে পার্মিশান দাও।

আমি বললাম, তাহলে তো তিনতলাটাও খালি করতে হবে, কিন্তু তোদের থাকার জায়গা...

আমাকে পুরোটা শেষ করতে না দিয়েই টুটুল বলল, আমি তো মামা... যে কোনও সময়েই মুভ করে যেতে পারি। মিতালীও মাঝেমধ্যেই বলে, কিন্তু দিদিমা, মা, পান্না, ওর বউ— ওদের নিয়ে এখনও যে...

আমি বললাম, দিদিমার জন্য ভাবনা কী! মাকে তো ঝুমা কবে থেকেই নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু রুনুদি-পান্নারা যাবে কোথায়? তাছাড়া তোর বাড়িঘরের ব্যবস্থা কিছু হয়েছে কি?

আমি একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করার চেষ্টায় রয়েছি মামা। মিতালীর বাবা ওদের ঠাকুরপাড়া রোডের বাড়ির সঙ্গেই যে প্লটটা আছে... তুমি নেক্সট টাইম এলে আমি দেখাতে নিয়ে যাব।

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, তুই কি করে, সেই কথাটা আগে বলবি তো! ভেরি গুড নিউজ।

নিউজের মতো কিছু নয় মামা... তাহলেও দেখি যদি দুখানা ঘর তুলতে পারি। নাহলেও আমরা ওদের বাড়িতে টেম্পোরারিলি...

থাক, তার দরকার নেই। আমি বললাম, ভাল করে বরং কর। তারপর রুনুদি, পান্নাকেও নাহয় তোর কাছে নিয়ে যাবি। নার্সিংহোম এক্সটেনশনের তো তাড়া নেই, ওদিকে ফ্ল্যাট কিনে এখন আমারও হাত ফাঁকা। তাছাড়া সোনাদি, ঝুমাকে টাকাটা দিতে হবে।

দু'দিন পরে বিকেলবেলা পিন্টু এলো।

ওর ভাইঝির সঙ্গে পান্নার বিয়ের পরে, পিন্টু এখন আমাদের আত্মীয়ও বটে। কিন্তু ওর প্রাথমিক পরিচয়টা আগের মতো, একই আছে। বয়সে একটু ছোট হলেও পিন্টু আমার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ এবং অনেকদিনের কাছের মানুষ। মা, রুনুদির সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প হল আমাদের চারতলায় বসে। একটু পরে ওরা চলে গেল।

চা খেতে খেতে পিন্টু বলল, তিনুদা তাহলে গল্‌ফ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে... সত্যি মুভ করবেন ঠিক করলেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেইরকমই তো ভেবেছি। তোমার আপত্তি আছে নাকি?

আরে নাহ্... কী যে বলেন! পিন্টু হেসে বলল, আমার কত কাছে চলে আসবেন... আমিই তো সব থেকে বেশি খুশি হবো।

তাহলে জিজ্ঞেস করছো যে!

এই... এমনিই। এখানে চারতলা বাড়ি, নার্সিংহোম। সব রয়েছে বলেই...।

সেসব যেমন আছে থাকবে। বড় করার কথাও ভাবছি, পুরনো নতুন দু'বাড়ি নিয়েই যদি করা যায়, একটা বড় কমপ্লেক্স হবে।

ইংল্যান্ড থেকে তখন ফিরে আসবেন তো?

দেখা যাক। আগে তো বাবার বাড়ির তিনতলাটা খালি হতে হবে। রুনুদি-টুটুল-পান্নারা রয়েছে।

ওরা তো টুটুলের বাড়িতে চলে যেতেই পারে!

দাঁড়াও.... সে বাড়ি হোক আগে, আজকেই একটুখানি শুনলাম টুটুলের কাছে, বিশেষ কিছু হয়নি তো এখনও।

টুটুলের বাড়ি তো প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনতলারও জানালা

দরজা বসে গেছে, দুটো ফ্লোর তো কমপ্লিট।

তিনতলা! আমি আকাশ থেকে পড়লাম। টুটুল অত বড় বাড়ি করছে নাকি? ও তো যা বলল...।

হয়তো সবটা বলেনি আপনাকে। সুন্দর প্ল্যান করে বাড়ি করেছে... ফার্নিচারও কিনে ফেলেছে।

আমি বিভ্রান্ত বোধ করেই চুপ করে রইলাম। একটু পরে বললাম, ওরা তাহলে নিজেদের বাড়িতে চলে যেতে পারে?

ইচ্ছে করলে পারবে না কেন! আরও আগেই চলে যেতে পারতো।

তাহলে শুধু শুধু পুরনো বাড়ির তিনতলাটা অকুপাই করে রেখেছে কেন!

বাহ্, নার্সিংহোমের সঙ্গে থাকা কত সুবিধার না! মাঝখান থেকে আপনিই নিজের বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে যাচ্ছেন, সেই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম।

টুটুল একলা তো নয়, পান্নারা আছে, রুনুদি রয়েছে, রাতুলও যাতায়াত করে। বড় রাস্তার ওপর নার্সিংহোম শুদ্ধ এতো বড় বাড়িতে থাকার এ্যাডভান্টেজ আছে না!

মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গণ্ডগোল পাকিয়ে যাওয়ার মতো মনে হল। এ্যাডভান্টেজ? ওরা তাহলে এখন এ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্যই আমাদের তিনতলা থেকে যাচ্ছে না! আমি তো এমনভাবে কখনও ভাবিনি! আমার তো ভাববার কথাও না। বিপদের দিনে ভেসে যাওয়ার সময় বাবা ওদের এনে তুলেছিলেন। তারপর থেকে আছে। মাও রয়েছে। আস্তে আস্তে ওরা দাঁড়িয়ে গেলে, নিশ্চয়ই নিজেদের ঘরবাড়ি করে চলে যাবে। যতই হোক, আশ্রিত হয়ে কে আজীবন থাকতে চায়!

কিন্তু এখন যে আমার কেমন একটা, যেন বিবমিষার মতো অস্বস্তি হচ্ছে। একটু উদ্বেগও যেন।

বাড়ির কথাটাও টুটুল আমায় খুলে বলল না। আমি যে নিজেকে ওর খুব প্রিয়জন বলেই জানি। তাহলে কেন এই গোপনীয়তা! ওর শরীরের ভাষা পরিবর্তনের অভিব্যক্তি আমি যেন এবার আরও স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছি। শুধু ওর না। এখন টের পাচ্ছি, বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যে পান্নাটারও হাবভাব যেন পাল্টে গেছে, একটু নিস্পৃহ রুনুদিও।

বুকের মধ্যে পাক দেওয়া যে কষ্টটা আমার হচ্ছে, কাউকে আমি তা বোঝাতে পারছি না।

পরেরবার কলকাতা গিয়ে আমরা গল্ফ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে চলে গেলাম। ইতিমধ্যেই টুটুলও ওর নিজস্ব বাড়িতে শিফ্‌ট করেছে, বউ, ছেলে নিয়ে। কিন্তু রুনুদি, পান্নারা যায়নি, তিনতলাতেই রয়েছে। টুটুল ওর বাড়ির একতলা দোতলা ভাড়া দিয়েছে।

লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরুলো বুবু।

আমি নিজে ডাক্তার হওয়ার পরেও আমার এতো আনন্দ হয়নি। ও যখন টেলিফোনে বলল, বাবা, আয়াম এ ডক্টর নাউ, শুনে আনন্দে আবেগে আতিশয্যে আমার কণ্ঠ বাক্‌রুদ্ধ আর চোখে জল এসে গেল। ছায়ারও এক অবস্থা। বুবু ডাক্তার। বাবার মুখ মনে পড়ল। আমাদের লিংকনশায়ারের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া, গানবাজনার পার্টি হয়ে গেল বন্ধুবান্ধব ডেকে।

আপাতত আমাদের একটা দায়িত্ব শেষ হল। টোটাও সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে।

আমার মনে সর্বদা একটা খচ্‌খচানি ছিল— সোনাদি আর ঝুমার বাড়ির অংশ নিয়ে। এবার সবথেকে আগে আমি সেটা মিটিয়ে দিলাম। বাবার কাছে আমার কথা দেওয়া ছিল। এতোদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকাও এক জায়গায় বসে নেই। ওদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের প্রত্যাশা জেনে নিয়ে, দু'জনকে তিন লাখ টাকা করে দিয়ে দিলাম। জানি, ওরা খুশি হয়েছে। কথা হল, আমরা কলকাতা যাওয়ার পরে দু'জনের অংশই আমাকে বিক্রি করেছে বলে উইলে সই করে দেবে।

আমার সত্যি শুধু নির্ভার নয়, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো উপশম বোধ হল। বিশেষ করে সোনাদির জন্য। ওদের অর্থাভাব না থাকলেও লালসার কথা আমরা বহু আগে থাকতে জানি। আমি আরও জানি, সোনাদি আভাসে ইঙ্গিতে বেশ কয়েকবারই বলার চেষ্টা করেছে, তিন তলাটা যেন ওর হাতছাড়াই হয়ে গেল। রুনুদিরা না উঠলে এবং মা মারা না গেলে ও কি আর টাকা পাবে!

মানুষের মন সত্যি এতো নীচু হয়!

বলতে নেই, সেইজন্যই কিনা কে জানে, যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও, ছেলে দুটো যাকে বলে শিক্ষিত মূর্খ, তাই হয়ে রইল। টিপলু আর জোজো দুটোই ইঞ্জিনিয়ার, মুখে বড় বড় মার্কসইজম, কমিউনিজম্-এর কথা বলে, কিন্তু আসলে সেই 'ওপরে কোঁচার পত্তন, আর নীচেয় ছুঁচোর কেত্তন'। দুটো ছেলেই চূড়ান্ত হিপোক্রেট। দেবুদা এখন শেয়ার মার্কেট আর টাকার হিসেব নিয়েই থাকে। সোনাদি নাকি নিজেকে সমাজসেবিকা বলে। টিপলু কোনও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ায়, শুনি পড়ানোর চেয়ে ইউনিয়ন করে বেশি। ওর ছেলেটা লায়েক হয়েছে, দাদু ঠাকুর্দার পয়সায় ফূর্তি করে, বউ ইন্সিওরেন্সের দালালি করার নামে দুনিয়া ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। জোজোও কোনও একটা প্রাইভেট কনসার্নে চাকরি করে। বিয়ে করেছে, বউ ছেলে মেয়েও আছে। কিন্তু ও নাকি আর একটি মহিলাকে নিয়ে দমদমের কাছে কোথাও থাকে।

তো সে থাকগে, ওদের ব্যক্তিগত জীবনযাপন, ওসব নিয়ে আমার আগ্রহ, প্রীতিময়তা উবে গেছে। তা সত্ত্বেও ওদের কথা মনে আসার একটা কারণ আছে এবং এবারই আমাকে সেটা বেশ

অবাক করল।

সোনাদি এবং ওর ছেলেরা বহুদিন ধরে দেখে আসছি, রুনুদি এবং টুটুলদের দু'চোখে দেখতে পারতো না, সেই নিখিল জামাইবাবু মারা যাওয়ার পরে, বাবা যখন রুনুদি আর তিন ছেলেকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, তখন থেকে আমি দেখেছিলাম, সোনাদির কি রাগ! বাবাও সে কথা জানতো, আমাকেও বলেছিল। আর যেহেতু বাড়ির তিনতলাটা সোনাদির নামে এবং রুনুদিরাও ওখানেই থাকতো, ওর সবসময় একটা আশংকা ছিল— রুনুদি-টুটুলরা যদি ওখান থেকে না ওঠে! নিশ্চয়ই ভাবতো, তাহলে আমিও আর ওদের টাকা দেব না।

কিন্তু এবার আমি কলকাতায় গিয়ে দেখলাম, অবস্থা পুরো ঘুরে গেছে।

আমার কাছ থেকে বাড়ি বাবদ টাকা পেয়ে যাওয়ার পরেই, রুনুদি—সোনাদির যেন গলায়-গলায় ভাব। এমনকী, যে টুটুলকে আমি নার্সিংহোম দেখাশোনার ভার দিয়েছিলাম বলে সোনাদিরা ক্ষেপে বারুদ হয়ে গিয়েছিল, সেই টুটুল যেন এখন ওদের হঠাৎ পরমাত্মীয় হয়ে গেছে। আমারে মনে হল, ওরা যেন কিছু একটা মতলব করে জোট বেঁধেছে। টিপলু-জোজোর সঙ্গেও টুটুলের নাকি ভাই-ভাই সম্পর্ক।

আগে এসব ব্যাপার আমার মাথায় আসতো না। কিন্তু গত দু-বছর ধরে মাঝেমাঝেই আমার অবচেতন মন একটা যেন আশংকা অশান্তির আবহ তৈরি হচ্ছিল, আর কড়া নাড়ছিল সতর্ক হওয়ার জন্য। আসলে সেই গোড়ায় যা বলেছিলাম, শরীরের ভাষা এবং তার পরিবর্তন— এসবই সেই কারণে। তাছাড়া মাঝখানে এতো বছর বিদেশে কাটিয়ে এবার আমি ফিরে এসে আবার নার্সিংহোমের হাল ধরবো। টুটুল হবে আমার ডান হাত, একটা বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো, এসব প্লান, ভাবনা মাথায় আছে বলেই আমি সবদিকের আইনকানুন, বিধি, লাইসেন্স, স্টাফদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ট্যাক্স ইত্যাদি সঠিক এবং সময়ানুগ করে দিতে চাই।

কিন্তু সোনাদি-রুনুদি এবং ওদের পরিবার টুটুল-পান্না-টিপলু-জোজোদের দহরম-মহরম দেখে, মিথ্যে বলব না, বারবার আমার কেমন একটা খট্‌কা লাগছে। মনে হচ্ছে, এতো বছর পরে হঠাৎ আমার ওদের মধ্যে এই আত্মীয়তা পাতানোর উদ্যোগ যেন এক অশুভ আঁতাতের ইঙ্গিত। আমরা গল্‌ফ গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করার সময় থেকে, পিন্টুও আমাকে কিছু বলতে চাইছিল বন্ধু হিসাবে। এখন মনে পড়ছে এসব।

একটু পিছন দিকে তাকিয়ে এখন দেখতে এবং ভাবতে গিয়ে টের পাচ্ছি, আমার উদ্বেগ বাড়ছে। আমারই বাড়ি-নার্সিংহোম সবকিছু নিয়ে যেন আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কিছু একটা চক্রান্তের জাল বোনা শুরু হয়েছে। অথচ আমি তো কাউকে অবহেলা করিনি, দূরে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবিনি। এমনকী এখনও পর্যন্ত কোনও আশংকা উদ্বেগের কথাও প্রকাশ করিনি। বরং টুটুলের প্রতি একটা অভিমান এখনও আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে বুঝি। ভালবাসায় বিশ্বাসের দোলাচল অনুভূত হলে তাইতো হওয়ার কথা।

রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, ঘৃণা নয়, শুধু বেদনাও নয়, অথচ সবকিছুর মিশ্রণ— অভিমান, যে শব্দটার কোনও ইংরিজি প্রতিশব্দ হয় না।

এবার আমি দেশে এসেছি তিনমাসের জন্য, লীভ উইদাউট পে নিয়ে। ঠিক করেছি উদ্বেগ ঝামেলা সব কাটানোর আয়োজন শেষ করে ফেলব। ইংল্যান্ডে ফিরে কয়েকমাস সব গোছগাছ সেরে দেশে চলে আসব। বুবু-টোটা একটু একটু করে নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ঝুমা তিনলাখ টাকা পেয়ে বেশ খুশি হয়েছে বোঝা গেল।

বলেই ফেলল, বুঝলি দাদা, এ টাকাটা তো অনায়াসে পাওয়া। তাহলেও বেশ একটা স্যাটিসফ্যাকশন আছে, মনে হয় যেন বাবার দেওয়া গিফ্‌ট্।

আমি বললাম, আসলে তাই তো। বাবা-ই তো দিয়েছে।

ও বলল, আমি অবশ্য পঞ্চাশ হাজারই এক্সপেক্ট করেছিলাম।

বারো বছর আগে বাবা তাই বলেছিল, কিন্তু আমার তো একটা বোধ আছে রে!

জানি রে! সোনাদি মাঝেমাঝে ওটা নিয়ে আমায় টেলিফোন করতো, আমি সত্যি বলছি, আমার কোনওদিন একটুও টেনশন ছিল না। কিন্তু ওরা খোঁচাতো।

ছেড়ে দে। আমি বললাম। ওটা যার যার মানসিকতা।

আমাদের দলিলের কাগজে সই করে দিতে দিতে ঝুমা জিজ্ঞেস করল, সোনাদি সই করে দিয়েছে?

এখনও করানো হয়নি। টাকাটা আমি আগেই দিয়েছি। এবার গিয়ে সই করিয়ে নেব।

ওটা ফেলে রাখিস না দাদা। সোনাদি-দেবুদারা যে কখন কি...।

জানি। তোদের দু'জনের সই না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির সবকিছু তো আমার নামে ট্রান্সফার হবে না। শিগ্‌গির যাব।

ও বলল, তাই তো। সবকিছু একজনের নামে না হলে সব সময়ই ঝামেলা লেগে থাকবে।

বললাম, আমি আর একটা ব্যাপার ভেবে রেখেছি ঝুমা। সেটা সবকিছু রেগুলারাইজ করার পরে রুনুদিরা তিনতলা থেকে চলে যাওয়ার পরে শুরু হবে।

সেটা আবার কী রে!

আমি বললাম, বাবার বাড়ি, আমাদের চারতলা সব মিলিয়ে ওটা তো একটা ইন্সটিটিউশন-এর মতো চলবে, ওখান থেকে বছরে কিছু টাকা তোরাও পাবি, সেটা এ্যামাউন্ট হিসাবে যাই হোক না কেন। বাবা–মা'র আশীর্বাদে আমার তো অভাব নেই, কিন্তু ওটা আমার স্যাটিসফ্যাকশন।

ঝুমা আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুই যে ওভাবে ভেবেছিস, তাতেই আমার অনেকটা পাওয়া হয়ে গেল। এ্যামাউন্টটা কোনও ব্যাপার নয়।

কাজকর্মগুলো সেরে নেওয়ার চেষ্টা করছি এক এক করে। বাড়ি, নার্সিংহোমেও যাই মাঝেমধ্যে।

মা তো রয়েছেই। রুনুদি-পান্নাদের সঙ্গেও দেখা হয়। কিন্তু কেন যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের বোধ আমার মাথায় আসে! মনে হয়, মা-ও যেন খুব স্বস্তিতে নেই ও বাড়িতে। অথচ নিজের ডেরা ছেড়েও নড়বে না। আমি থাকলে দু-চারদিন গল্‌ফ গার্ডেন্সে এসে থাকে। মা যেন এখন আর বাঁচতে চায় না। পঁচাশি বছর বয়স হলেও মাকে যেন এতোটা অবসন্ন মনে হয়নি আগে।

টুটুল দেখি নার্সিংহামে বেশ কিছু নতুন স্টাফ ঢুকিয়েছে ইদানীং। কথাবার্তা শুনে মনে হয়, এখন এরাই যেন সর্বেসর্বা। এমনকী আমার ভূমিকা, পরিচয়, উপস্থিতি সম্পর্কেও ওরা যেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং সচেতন নয়। পুরনো স্টাফরা অবশ্য দেখলেই উঠে দাঁড়ায়। আর একটা ব্যাপারও আমার নজরে এসেছে। স্থানীয় সিপিএম পার্টির সঙ্গে টুটুলের যোগাযোগ বড্ড বেশি। ওরা ক্ষমতায় আছে বলেই কি! কিন্তু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কোনওরকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব আমি তো বরদাস্ত করব না।

এইসব কিছু কিছু ঠিকঠাক করার জন্যই আমাকে এবার আরও বেশি উঠেপড়ে লাগতে হবে। নিশ্চয়ই বেশি ঢিলে দিয়ে ফেলিনি!

সোনাদিকে দিয়ে উইলে সই করাতে গিয়ে স্পষ্ট একটা ধাক্কা টের পেলাম। জল গড়িয়েছে বেশ কিছুটা।

আমাকে দেখেই সোনাদি যেন একটু চমকালো। বলল, তুই কলকাতায় এসেছিস নাকি! জানি না তো কিছু!

আমি ঠাট্টা করেই বললাম, আলাদা করে জানাব কেন, এই তো এসেই হাজির হয়েছি।

সেটা নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন আছে বলে!

প্রয়োজন! মনটা কেমন দমে গেল সোনাদির কথা শুনে। তাও হেসে অন্য কথা বলার মতো বললাম, কেন, নেমন্তন্ন করবি নাকি?

সোনাদি খুব নিরাসক্তের মতো বলল, বাব্বা তুই সাহেব মানুষ, আমি আর কী নেমন্তন্ন করবো! তার ওপর ডাক্তারের বাবা এখন।

কথাগুলো ট্যারা-ট্যারা। বললাম, ডাক্তারের বাবা হলে ল্যাজ গজায় নাকি রে!

ওর হীনমন্যতা আমি বুঝতে পারছিলাম। তারমধ্যেই দলিলের কাগজ বের করে বললাম, সোনাদি, টাকাটা পেয়েছিস বলে সই করে দে। ঝুমাও করে দিয়েছে। তারপর সব কাগজ নিয়ে আবার আমায় কোর্টে যেতে হবে।

কিসের সই, কাগজপত্র বল তো?

বললাম, তোরা যে তিন লাখ করে টাকা পেয়ে বাড়ির সত্ত্ব ছেড়ে দিচ্ছিস, সেই কাগজ। পড়ে দ্যাখ না।

ও বলল, পড়ার দরকার নেই। কিন্তু তিনতলা যে আমার নামে ছিল, সেটা তো খালিই হয়নি এখনও! সত্ত্ব ছাড়ার প্রশ্ন কোথায়?

আমি কেমন বিভ্রান্ত বোধ করলাম। খালি হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে সোনাদির কী সম্পর্ক! টাকা তো আমি দিয়েছি। সুতরাং আমায় লিখে দেবে যে ওই অংশে ওর কোনও দাবি নেই। তারপর আমি যা বোঝার বুঝে নেব, রুনুদি-টুটুলদের সঙ্গে।

একটু পরে আমি বললাম, শোন, টাকাটা এ্যাক্সেপ্ট করেছিস, তোর স্বত্ব ছেড়ে দিবি বলেই তো! রুনুদিরা, মা এখনও রয়েছে, থাক, তার সঙ্গে তো তোর কোনও সম্বন্ধ নেই। তোর আর ঝুমার সই হয়ে গেলে আমি কাগজে কলমে আমার নামে বাড়ি ট্রান্সফার করার জন্য কোর্টে এ্যাপিল করব।

হঠাৎ সোনাদি বলল, সে তুই যা করার কর, আমি ওসব সই-টই করার মধ্যে নেই।

আমি একেবারে হতবাক। আকাশ থেকে পড়লাম।

ঠিক সেইসময়েই লুঙ্গি পরা দেবুদা ঘরে ঢুকল। বলল, দ্যাখো তিনু, টাকাটা তোমার দিদি নিয়েছে, কিন্তু স্বত্ত্বটা এখনই ছেড়ে দেওয়াটা কি খুব যুক্তিযুক্ত হবে? ব্যাপারটা কি খুব জাস্টিফায়েড হচ্ছে?

আমি বিভ্রান্ত মুখেই বললাম, এসব বিচার বিবেচনা, ভাবনা, উইল.... সব তো বাবা-ই করে দিয়ে গেছেন।

সে চৌদ্দ-পনের কি কুড়ি বছর আগে উনি কি করেছিলেন জানি না। কিন্তু তোমার তো একটা দায়বদ্ধতা আছে!

আমার ক্ষোভ, বিরক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। বললাম, দায়বদ্ধতা কি না জানি না, কিন্তু একটা ফেয়ার চিন্তা আছে বলেই বাবা পঞ্চাশ হাজার বললেও আমি ওটাকে পাঁচগুণ বাড়িয়ে তিন লাখ করেছি। আর কী করতে পারি আমি? ঝুমা-সৈকতরাও সেটা এ্যাকসেপ্ট করেছে, সইও করে দিয়েছে। এবার রুনুদিরা উঠে গেলে নার্সিংহোম এক্সটেন্ড করার কথা ভাবছি। তখন দেখি...।

আমার কথার মধ্যেই দেবুদা বলল, ঠিক আছে, ওদের উঠিয়ে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করো, আমরা তো আর পালাচ্ছি না।

নাহ্, কোনও যুক্তিতর্কের মধ্যে ওরা গেল না। সোনাদি সইও করল না। মনে হচ্ছে, বাবার উইল ওরা মানতে চাইছে না। কিছু মতলব আঁটছে।

চূড়ান্ত হতাশা আর অবসাদের মধ্যে বাবার একটা কথাই মনে পড়ছে। লোভ মানুষকে কুবুদ্ধি দেয়। এবং সেটা যে আরও বিস্তৃত হয়েছে, তাও টের পেলাম কয়েকদিনের মধ্যে। ওদের কুবুদ্ধি পরিবর্তিত হয়েছে কু-চক্রান্তে।

উদ্বেগ, অস্থিরতা, প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও আমার বসে থাকার উপায় নেই। বুঝেছি, ওরা আমায় বিপদে ফেলার চেষ্টা রয়েছে।

মা-র সঙ্গে দেখা করতে গেছি। রুনুদি-পান্নার সঙ্গেও কথা

বলতে হবে। এরমধ্যে টুটুলরা গেছে হলিডে করতে।

তিনতলায় উঠে দেখি একেবারে মোচ্ছব শুরু হয়ে গেছে। পান্নার সব শালাশালীরা এসেছে। রীতিমত পান, ভোজন, গুলতানি চলছে। রান্নার সুগন্ধ বেরুচ্ছে। বোধহয় বিরিয়ানি হচ্ছে। নার্সিংহোমের নন্দ বলে যে রাঁধুনি আছে, সেই আরও দু'জন আয়াকে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি আয়োজন ফেঁদে বসেছে। রুনুদি টিভি খুলে বসেছে সিরিয়াল দেখতে।

আর মা-ই সব থেকে অবহেলিত বৃদ্ধা মানুষটা এবাড়ির। শোওয়ার ঘরে খাটের এক কোণে বসে রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড নিয়ে পড়ছে। আমারও ঢুকে মনে হল এবাড়ি যেন আমাদের না। বহিরাগতর মতো প্রবেশ করেছি আমি, আমাদেরই বাড়িতে।

রুনুদি আমাকে দেখে আপ্যায়ন তো দূরের কথা, উঠেও এলো না। সোফায় বসে যেমন টিভি দেখছিল, তেমনভাবে বসেই মুখ ঘুরিয়ে বলল, ও তিনু? আয়, বোস। আমি কাছে যেতেই যোগ করে দিল, টুটুলরা তো নেই, বেড়াতে গেছে।

আমি বললাম, জানি। ওর সঙ্গে আমার দরকার কিছু নেই এখন।

টিভির দিকে মুখ রেখেই রুনুদি বলল, ওহ্ আচ্ছা। তাহলে বোস। চা খাবি?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মা কোথায় গো?

দ্যাখ আছে কোথাও। শোওয়ার ঘরে নয়তো ঠাকুর ঘরে। আজকে আবার পান্নাদের বিবাহবার্ষিকী, ভেতর ঘরে ওরা সব রয়েছে তো।

আমি মা-র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে বললাম, রুনুদি আসছি পরে, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই মা-র অন্ধকার হয়ে থাকা মুখটায় যেন আলো ফুটল। — এসেছিস! ক'দিন ধরে ভাবছি..।

খাটের ওপর বসেই খানিকক্ষণ গল্প করলাম। সবার খবরাখবর দিলাম। নিলাম। মা একসময় বলেই ফেলল, শোন বাবা তিনু, এবার বাড়ি ঘরদোরের যা কিছু ব্যবস্থা সব মিটিয়ে যাস। পড়ে থাকলে এসবের সুরাহা হবে না। নিজের বাড়িঘর, বুঝেশুনে নে। ফেলে রাখিস না।

আমি বললাম, থাকবে না, মা। এবার সেইজন্যই বেশিদিনেরর জন্য এসেছি।

মা-র সঙ্গে কথা বলতে বলতেই খেয়াল করলাম,

সম্ভবত আমার উপস্থিতির কারণেই পান্নাদের ঘরের হৈচৈ হঠাৎ কমে, যেন কিছুটা নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে। কথাবার্তা চলছে অপেক্ষাকৃত চাপা স্বরে, বিলম্বিত লয়ে। কেন, কে জানে! আমি তো ওদের রসভঙ্গ করতে আসিনি!

মা-র সঙ্গে কথা বলে বাইরে এলাম। ছায়া আসার পরে মা গল্ফ গার্ডেনের ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকবে বলল।

আমাকে দেখেই রুনুদি বলল, বোস তিনু। সিরিয়ালটা চলছিল বলেই। কী দরকার আছে বলছিলি?

আমি সোজাসুজি কথায় এলাম। বললাম, রুনুদি, এবার তোমার তিনতলাটা খালি করার কথা ভাবো, টুটুলকেও আমি বলেছি। নার্সিংহোম এক্সটেন্ড করার প্ল্যান করেছি। এবাড়ি ওবাড়ি মিলিয়েই।

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই রুনুদি বলল, দাঁড়া, দাঁড়া তিনু। তিনতলা ছাড়ব কি রে! সোনাদিই তো বলল, তিনতলাটা ওর নামে, এবং এখন ছাড়ারও দরকার নেই। তবে এবার থেকে মাসে মাসে তিন হাজার টাকা ওকে যেন ভাড়া দিই। রাস্তার ওপর বাড়ির ভাড়া আরও অনেক বেশিই হয়, কিন্তু মাইমাও রয়েছে বলে...। তো পান্না-টুটুলরা নাকি সব কথাবার্তা বলে নিয়েছে সোনাদির সঙ্গে।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, বাড়ি আমার, কথাবার্তা বলছে সোনাদি-পান্না-টুটুল! সেটা আবার কিরকম ব্যাপার!

তার আমি কি বলব বল! এতো বছর ধরে রয়েছি, মামা বেঁচে থাকলেও কি উঠিয়ে দিত। এখন তোদের মধ্যে কী ভাগাভাগি আছে না আছে সেসব তুই সোনাদির সঙ্গেই বসে ফয়সালা কর। বড় দিদি হিসেবে, ওই তো আমায় ভরসা দিয়েছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অশুভ আঁতাত কথাটা মনে পড়ল। সোনাদিরা এক ধূর্ত চাল চেলেছে, পরিষ্কার বুঝে গেলাম।

নিঃসঙ্গ বিভ্রান্ত বেদনাহত প্রতারিত এবং ক্ষুব্ধ মন নিয়ে গল্ফ গার্ডেন্সে ফিরে গেলাম।

রাতে অনুভূতিটা হল ঠিক সেইরকম : কয়েকটা কুমীর উঠে এসেছে আমার বাড়ির উঠোনে, এবার আমায় তারা টেনে জলে নামাবে। তখনও জানতাম না, আমাদের ধরাশায়ী করার আরও চতুর, সুবিন্যস্ত, কুটিল আয়োজন টুটুলই করে রেখে ছুটি কাটাতে গেছে। সেটা রেজিস্টার্ড ডাক মারফৎ এলো দু'দিন পরে। উকিলের চিঠি।

টুটুলের ল'ইয়ারের মোটামুটি বক্তব্য এইরকম, আমার মক্কেল উক্ত ঠিকানায় দীর্ঘদিন যাবৎ একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসছেন এবং ভাড়াটে হিসাবে নিয়মিত নির্দিষ্ট ভাড়াও দিয়ে যাচ্ছেন। আমার মক্কেল স্থানীয় এলাকায় একজন সহৃদয় সমাজসেবী এবং দরিদ্রবন্ধু হিসাবে পরিচিত। আদালতের আগাম অনুমতিক্রমে যেহেতু তিনি উক্ত ঠিকানায় প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য স্বীকৃত, সেই হেতু তাঁকে উৎখাত অথবা উৎপীড়নের প্রচেষ্টা বেআইনী এবং অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। ইত্যাদি।

আমি কিছু না জেনেই চিঠিটা সই করে নিয়েছি। আমার নামেই তো এসেছে! ব্যালকনিতেই বসে পড়লাম।

পড়ার পরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় টের পেলাম, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।...

কতক্ষণ সেইভাবে ফ্ল্যাটের তিনতলার ব্যালকনিতে বসেছিলাম জানি না। ভাবনা, স্মৃতি, আবেগ— সবকিছু মিলেমিশে যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। আমি যেন উত্থানশক্তি-রহিত, স্থানু, দীর্ণ, অক্ষম, প্রহৃত একটি মানুষে পরিণত হয়েছি। আচম্বিতে কয়েকটি লুব্ধ শ্বাপদের আক্রমণে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি এক কর্দমাক্ত বিবরে, ক্লান্ত-আহত, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হচ্ছে কেঁপে কেঁপে। আর কিছুক্ষণ পর পর এক একটি শব্দ অগ্নিগোলকের মতো আছড়ে পড়ছে আমার বুকের মধ্যে... ভাড়াটে সহৃদয় সমজসেবী দরিদ্রবন্ধু উৎখাত...।

কখন অন্ধকার নেমে এসেছে খেয়াল করিনি।

হঠাৎ নিজেরই কোনও মানসিক চেতনায় যেন অনুভব করলাম, বাবা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। এক অলৌকিক স্নিগ্ধ স্পর্শে আমায় ভিজিয়ে দিতে দিতে বলছে, ওঠ তিনু, উঠে পড়। কী এমন হয়েছে যে এতো ভেঙ্গে পড়েছিস! বেশ কয়েক বছর ধরে বিদেশে একটা সভ্য দেশের নাগরিক হিসাবে রয়েছিস বলে, এখানকার এসব ব্যাপার তোর কাছে বাজছে বেশি। তার মতো এখানকার সমাজে সংসারে, চারপাশে তাকিয়ে দ্যাখ, ঘরে ঘরে এমন অশান্তি, আক্‌ছার ঘটছে, ক্ষোভ, ঈর্ষা, তঞ্চকতায় ভরে গেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চূড়ান্ত রাজনৈতিক দুর্নীতি। আজ যে অভিজ্ঞতায় কষ্টে, বেদনায় হয়তো অপমানেও বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত বোধ করছিস, জানবি সেটাই শেষ কথা নয়। যাদের একদিন উপকার করেছিস, তারা তোকে কষ্ট দেবে, এ আর নতুন কথা কী! তোকেও তো যুগোপযোগী হতে হবে, বাঁচতে হবে। জানবি, সবার অলক্ষ্যে কেউ একজন মনুষ্যজীবন ও কর্মে হিসেব-নিকেশ করে যান, ভাল এবং মন্দ দুইয়েরই। এসব আমাদের হিন্দু ধর্মের সার কথা। সেইজন্য আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করা সহজ, জীবনের ক্ষেত্রে মানা বড় কঠিন। তবু বিশ্বাসটা ধরে রেখেই চলার পথ খুঁজতে হবে। ... ওঠ, উঠে পড়, নিজের ভেতর বিশ্বাসটা জীইয়ে রাখ এবং কাজে নেমে পড়। তোর জয় কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।...

উঠে পড়লাম। ঠিকই তো! কেউ আমায় ঠেলে ফেলে দিয়েছে বলে পড়েই থাকবো নাকি! কী নেই, কোনটা নেই আমার!

অন্তর থেকে, মস্তিষ্ক থেকে, বাস্তব জীবন থেকে শক্তি, সাহস এবং সায় পেলাম, আমাকে উঠতে হবে, কাজে লাগতে হবে এবং নিজের মতো করেই আমাকে এ তঞ্চকতা, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করতে হবে। এ আমার দায়, এ আমার কর্তব্য।

আমি জানি, অন্ধকারে নিশাচর সরীসৃপের মতো যারা

আমাকে দংশন করতে চেয়েছে, আমার দান, দয়া, উদারতার সুযোগ নিয়ে আমাকেই বহিষ্কার করে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছে, এবার তাদের সংহারের সময় হয়েছে। আমার ঘৃণা, শক্তি, আলো, উত্তাপে তারা দগ্ধ হয়ে যাবে।

একা একা ছাদে উঠে গেলাম রাতে, আহ্!

স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় ভাসছে যামিনী। ঝিরঝির হাওয়া। ঈশ্বরের অপার করুণা আর নীল জ্যোৎস্নালোক আশীর্বাদের মতো ভরিয়ে দিচ্ছে আমাকে, ঝরে পড়ছে আমার মাথার ওপর। আমার কোনও গ্লানিবোধ নেই। কোনও মালিন্য আমায় স্পর্শ করছে না। এই নক্ষত্রখচিত আকাশ, আলো আমায় পথ দেখাচ্ছে, জয়টিকা এঁকে দিচ্ছে আমার কপালে। আমি অনৃণ্য, আমি নির্ভীক, আমি উদার সত্যের পথে হাঁটছি।

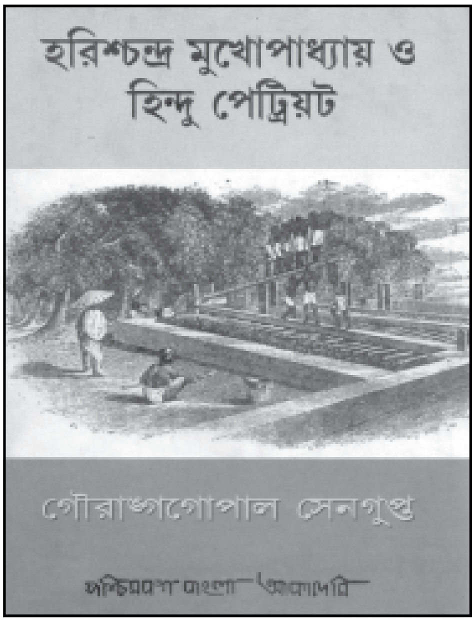

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত লিখিত
'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

হরিশ মুখোপাধ্যায়
নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রতীক

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে প্রতিবাদী চিন্তাভাবনা সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক সমিতি ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন ঘটে। ১৮৫১ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার পর এই প্রবণতা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে এবং এই সমিতির মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতবাসীর ন্যায্য দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল সংবাদপত্রের নির্ভীক ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''শ্লেষ বা ভীতি প্রদর্শনে আমি আপনার কর্তব্য ও অভ্রান্ত পথ থেকে মোটেই বিচ্যুত হব না। ... সেনাদল সাম্রাজ্য বিস্তারের ও দেশরক্ষায় সহায়তা করে, কিন্তু চিন্তার সেনাদল রক্তপাতহীন সংগ্রামের মাধ্যমে যুক্তি ও জ্ঞানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।'' কৃষ্ণদাস পাল যে কথাগুলি বলেছিলেন, তারই সার্থক প্রতিভূ ছিলেন তাঁর পূর্বতন হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ১৮৬১ সালের ১৪ জুন মাত্র ৩৭ বছর বয়সে হরিশচন্দ্রের প্রয়াণ হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিভাবে জনমত গঠন করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন হরিশচন্দ্র। তিনি নিছক কলম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না, নীল বিদ্রোহের সময় তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয় ও সদর্থক। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে হরিশচন্দ্রের অক্লান্ত জনসেবার কথা বিবৃত করেছেন।

১৮২৪ সালের এপ্রিলে হরিশচন্দ্র কলকাতার ভবানীপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামধন। দারিদ্রের জন্য তাঁকে বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। তবে নিজ অনুশীলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে ১৮৪৮ সালে মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে ২৫টাকা মাইনের চাকরি গ্রহণ করেন। ক্রমশ নিজ দক্ষতায় সহকারি মিলিটারি অডিটর পদে উন্নীত হন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। "Brahmo Samaj, its position and prospect" শীর্ষক ইংরেজি বক্তৃতা পাঠ করেন।

তবে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের চেয়ে রাজনৈতিক ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন কলকাতায় সমাজ জীবনে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে নতুন সামাজিক বিন্যাস গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার বিত্তশালী অভিজাত পরিবার-এর হাতে সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ ছিল শোভাবাজারের দেব পরিবার, রামবাগানের দত্ত পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, পাইকপাড়ার সিংহ পরিবার আর মল্লিক-লাহা-শীল পরিবার কলকাতার সমাজে দলপতির ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু নিছক বিত্ত নয়, ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে ভাল চাকুরি লাভ করে নতুন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ জীবনে দাগ কাটলেন। এমনটাই ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও তাঁর মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট-এর মাধ্যমে হরিশচন্দ্র কলকাতা তথা বাঙালী সমাজে সামাজিক মর্যাদালাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও নিজস্ব উদ্যোগে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ছিলেন একক সংগ্রামী।

হরিশচন্দ্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার প্রসঙ্গে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৫১ সালের অক্টোবরে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পাইকপাড়ার রাজা সভাপতি হলেন আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিছক জমিদার শ্রেণীর সংগঠন ছিল না, অভিজাততন্ত্র ও উৎকর্ষ দুইয়েরই সম্মেলন ঘটেছিল। তাই হরিশচন্দ্রের মতো সম্বলহীন ব্যক্তি এসোসিয়েশনে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। কথিত আছে ১৮৫৩ সালে চার্টার আইনের নবীকরণের সময় সমিতি যে প্রতিবাদী প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল, তার রচয়িতা ছিলেন হরিশচন্দ্র।

এবার আসি কীভাবে হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে বড়বাজারের মধুসূদন রায়ের ছাপাখানা থেকে পত্রিকাটি প্রথম বের হয়। প্রথমে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষের হাতে। তাঁরা দায়িত্ব থেকে সরে গেলে হরিশচন্দ্রের ওপর পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাল। ১৮৫৪ সালে হরিশচন্দ্র একটি ছাপাখানা বসিয়ে ভবানীপুর থেকে পত্রিকাটি চালাতে লাগলেন। ওই সময়ে বাংলায় দেশীয় মালিকানায় কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সি' নামে আর একটি ইংরেজি পত্রিকা ছিল। হরিশচন্দ্র ওই পত্রিকার অন্যতম লেখক ছিলেন। এরপর হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্রের স্ববিরোধিতা

হরিশ মুখার্জী হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় লর্ড ডালহৌসির অযোধ্যা রাজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু পেট্রিয়ট বিপরীতধর্মী অবস্থান গ্রহণ করে। 'দি কান্ট্রি অ্যান্ড দি গভর্নমেন্ট'— শীর্ষক লেখায় বলা হয়,— "এটি আর সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহমাত্র নয়, পরিণত হয়েছে এক গণ-অভ্যুত্থানে। বাংলার সেনাবাহিনীর এই অভ্যুত্থানের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। শুরু থেকেই বিদ্রোহীরা দেশবাসীর সহানুভূতিপুষ্ট। দেশবাসী তাঁদের একটি মহৎ জাতীয় উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ শহীদ বলে মনে করেন।"

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় রাজভক্তি প্রতিফলিত হলেও সম্পাদক হরিশচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহী সন্দেহে নির্বিচারে গণহত্যার কাণ্ড দেখাতে ভোলেননি। তিনি লিখেছিলেন, "If the present war be a war of revenge and extermination, then Lord Canning and the members of council should abdicate their functions in favour of a committee of butchers"। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসৃত প্রতিহিংসামূলক নরহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানালেন হরিশচন্দ্র।

স্মরণে রাখতে হবে, ১৮৫৭ সালের জুন মাসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। আর সংবাদ প্রভাকর সমেত প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে রাজভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। বৃটিশের দুঃসময়ে কলকাতার ধনী সম্ভ্রান্ত মানুষেরা সোচ্চারে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৭ সালের দুর্গা পূজায় জাঁকজমকে রাশ টানা হয়। এই পরিস্থিতেই হরিশচন্দ্র বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখালেও সরকারি নীতির দোষক্রটি সনাক্ত করতে ছাড়েননি।

হরিশচন্দ্র : নীল বিদ্রোহের বিবেক

আগেই বলেছি, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্রকে অবস্থার বিপাকে সংযত ভূমিকা নিতে হয়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা স্বার্থ রক্ষায় হরিশচন্দ্র সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আলোচ্য সময়ে নদীয়া, যশোহর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকর সাহেবরা দাদন প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষ শুরু করে এবং প্রজাদের উপর নানা ধরনের অমানবিক অত্যাচার চালায়। এর প্রতিবাদে ১৮৫৯ সালে প্রজারা আন্দোলনে সামিল হল। তারা জানিয়ে দিল, নীলচাষের জন্য দাদন নেবে না এবং নীল চাষ করবে না। এর ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা

তীব্রতর হল। যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণও প্রজাদের পক্ষ নিলেন। কিন্তু বৃটিশ প্রশাসন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মোকাবিলায় কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য হরিশচন্দ্র এগিয়ে এলেন এবং প্রজাদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রজাদের উপর অমানবিক অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় তীব্র জনমত গড়ে উঠল। হিন্দু পেট্রিয়ট "Anarchy in Bengal" শিরোনামে হরিশচন্দ্র সরকারি প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়, "They speak what is literally a truth who speak of the prevalence of anarchy in some of the districts of Bengal. It is anarchy when a few men, by the mere force of the strong arm lord it over millions, and bar them from the benefits of the government. The external show of courts, policemen and offcials, is a mockery in regions where the opprerssed man cannot approach the law but by permission of his oppressor."। পাঠকগণ বুঝতে পারছেন, পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এরকমই নৈরাজ্য ঘটেছিল। ন্যায় বিচার ছিল অধরা, পুলিশ, প্রশাসন দমন পীড়নের যন্ত্র। অবশ্য বৃটিশ সরকার দেশী গণতান্ত্রিক শাসকের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল ছিলেন। সরকার ১৮৬০ সালে সেটন-কার-এর নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠন করেন। হরিশচন্দ্র তখনও সরকারি সামরিক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন, তা সত্ত্বেও সরকার বিরোধী অবস্থান নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। হরিশের বলিষ্ঠ ভূমিকায় নীলকর সাহেবরা ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট-এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে। ভবানীপুর সুপ্রীম কোর্টের এলাকাভুক্ত নয় বলে এই মামলা টিকল না।

এদিকে সমস্ত বাংলায় নীলবিদ্রোহের প্রজাদের প্রতি সহানুভূতির ঝড় বইতে লাগল। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক লিখেছিলেন, ভারতবন্ধু ইংরেজ মিশনারি রেভারেন্ড জেমস্ লং নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশক হওয়ায় এক মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয় (জুলাই, ১৮৬১)।

জীবন মরণের সীমানা পেরিয়ে

এদিকে হরিশচন্দ্র-এর জীবনে অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল। রিক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ও কর্মক্লান্ত অবস্থায় মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ১৮৬১ সালের ১৪ জুন হরিশের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, অতিরিক্ত সুরা পান ও শিথিল জীবন যাপনে হরিশের শেষ জীবন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছিল। এর জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী হরিশের ধনী বিত্তবান সহচরদের অভিযুক্ত করেছেন। হরিশের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজন দুর্দশায় পতিত হলেন। তবে কৃতজ্ঞ দেশবাসীর চিত্তে হরিশের অকাল মৃত্যু গভীর ছাপ ফেলেছিল। সমকালীন একটি প্রচলিত ছড়ায় বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়।

"নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মল, বঙের হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।।"

দেশবাসীর স্বার্থে হরিশের আত্মবলিদান জাতীয় ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

> ১৮৫৭ সালের জুন মাসে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। আর সংবাদ প্রভাকর সমেত প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে রাজভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। বৃটিশের দুঃসময়ে কলকাতার ধনী সম্ভ্রান্ত মানুষেরা সোচ্চারে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ১৮৫৭ সালের দুর্গা পূজায় জাঁকজমকে রাশ টানা হয়। এই পরিস্থিতিতেই হরিশচন্দ্র বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য দেখালেও সরকারি নীতির দোষক্রটি সনাক্ত করতে ছাড়েননি।

কালবেলা

গোপাল চক্রবর্তী

অবশেষে কোর্ট থেকে ডিভোর্সের রায় বেরিয়ে গেল। চার বছর সংসার করেছিল রাজীব-অপর্ণা। গত এক বছর আগে সেপারেশান। তারপর থেকে অপর্ণা বাপের বাড়িতে থাকে দুই বছরের মেয়ে ঈশিতাকে নিয়ে। রাজীব একটি নামী কোম্পানির কলকাতার শোরুমের ইনচার্জ, মাইনেপত্র ভালোই পায়। রাজীবের ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন, মামা-মামীর কাছে পুত্র স্নেহে মানুষ হয়েছে। সখেরবাজারে মামার বাড়িতেই থাকে। এম বি এ করার পর বাইরে থেকেও কয়েকটা ভালো চাকরির অফার এসেছিল, কিন্তু মামা-মামী কলকাতা ছেড়ে যেতে দেননি। মামার একমাত্র মেয়ে সীমা কানপুরে থাকে, বর রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরী জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অফিসার। এয়ারপোর্ট রোডে ফ্ল্যাটে থাকে। বছরে একবার কলকাতায় আসে। মামা-মামীর দায়িত্ব রাজীবের উপর। চাকরি পেতে না পেতেই বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন মামা-মামী। মামার অফিসের এক বন্ধু সম্বন্ধটা এনেছিল, চেতলার এক বনেদি পরিবারের মেয়ে। তিন

ভাইয়ের এক বোন। বাবা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন, এখন রিটায়ার।

মামা-মামীর উপর বিয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি নির্ভর করেছিল রাজীব, কিন্তু বিয়ের রাতে রাজীব বুঝতে পারল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের টাকার গুমোরটা একটু বেশি মাত্রায়। রাজীবের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের ওরা পাত্তাই দিল না। মামার বন্ধুদের কয়েকজনের খাওয়াই হলো না। ওদের আচরণে মামাও যে খুব খুশি হলেন তা নয়। বৌভাতে কিন্তু ওরা আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখল না। অপর্ণার স্বভাব ভাইদের মতো ছিল না, সহজেই মামা মামীদের সঙ্গে মানিয়ে নিল। শ্বশুরবাড়িকে এড়িয়ে চললেও অপর্ণার সঙ্গে রাজীবের সম্পর্ক ভালই ছিল। যদিও রুচির পার্থক্য ছিল বিস্তর, যেমন রাজীব ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত, অপর্ণার পছন্দ প্রভুদেবা। রাজীব গল্প উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। অপর্ণার পছন্দ হিন্দি সিরিয়াল। তবুও চলছিল একরকম। বিরোধটা শুরু হলো অপর্ণার সাধের সময়। অপর্ণার যখন সাতমাস চলছে, তখন একদিন অপর্ণার মেজদা এলো রাজীবদের বাড়িতে। একথা সে-কথার পর একটা খামে ভরা দু'হাজার টাকা রাজীবের হাতে দিয়ে বলল— 'এটা মা পাঠিয়ে দিয়েছেন অপর্ণার সাধের জন্য'।

— টাকা দিয়ে কী হবে?

— আমাদের বাড়ি থেকে তো কেউ আসতে পারবে না। এই টাকাটা তাই মা পাঠালেন সাধের খরচের জন্য।

— দেখো, মেজদা, কেউ যদি আসতেই না পারলো তবে এই টাকা দিয়ে কি হবে? টাকার জন্য তোমার বোনের সাধ আটকে থাকবে না। নিয়ে যাও টাকাটা।

— দেখো, কে আসবে বলো? মায়ের শরীর ভালো নয়। বড় বৌদির অফিস। আর কে আছে যে আসবে?

— দেখো, আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোনও তর্ক করতে চাই না। তুমি টাকাটা নিয়ে যাও।

টাকাটা অবশ্য নিয়ে যায়নি অপর্ণার মেজদা বটকৃষ্ণ। অপর্ণার ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল। কিন্তু সাধের দিন কয়েক আগে রাজীব গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসার পরও ওবাড়ি থেকে কেউ আসেনি। কানপুর থেকে মামাতো বোন সীমা, তার বর শুভেন্দু এসেছিল। রাজীবের বন্ধু সমরেশ, গৌতম, সলিল ওরা অফিস ছুটি করে বউদের নিয়ে এসেছিল। মামা-মামী খুব খুশি, বাপের বাড়ির লোক না আসাতে হয়তো একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল অপর্ণা, তার চেয়েও বেশি হয়েছিল অপ্রস্তুত। কারণ, সবাই বাপের বাড়ির লোকের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। সীমা সব সময় পাশে পাশেই ছিল, সেই জবাব দিল।

— ওরা তো সব সময় আসছে। আজ মাসীমার শরীরটা খারাপ করেছে, আসতে পারেননি।

ভালোভাবেই সাধ হয়ে গেল। সীমার বরের ছুটি শেষ, আবার সীমার ননদ কাবেরীর পরীক্ষা। সে কানপুর ইউনিভার্সিটিতে হিস্ট্রি নিয়ে এম এ পড়ে। খুব ভালো মেয়ে, আসতে পারেনি বলে রাজীবের জন্য এক সেট লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি পাজামা পাঠিয়েছে। অপর্ণার জন্য একটা দামী শাড়ি আর একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে উপরে লেখা 'খোকা/খুকুর জন্মের পর খুলবে'। হয়তো কোনও খেলনা। ওটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হলো। সীমাদের টিকিট কাটা ছিল দুন এক্সপ্রেসের। রবিবার রাতে ট্রেন ছিল। রাজীব আর মামা গিয়ে তুলে দিয়ে এসেছে হাওড়ায়। সীমা বারবার বলে গেছে নার্সিং হোমে ভর্তি হবার আগে খবর দিতে। সে চলে আসবে আঁতুড় তুলে দিয়ে যাবে। এর মধ্যে একদিন অপর্ণা বাপের বাড়িতে ফোন করে মা'কে যাচ্ছেতাই বলেছে, সাধে কেউ না আসার জন্য। তাকে যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অপদস্থ হতে হয়েছে তাও বলতে ভুলল না। তার বাপের বাড়ির হয়ে সীমার সাফাই গাওয়াটা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো লেগেছে। তাও মাকে জানাল। তার দু-একদিন পরে এক বিকেলে হঠাৎ করে অপর্ণার মা আর বৌদি এসে হাজির। সাধের সময় এত করে বলার পর কেউ আসেনি, আজ হঠাৎ করে তাদের আসাতে রাজীবের মামা-মামী একটু অবাকই হয়েছিলেন। তবুও তাঁদের আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটিই করলেন না। একথা সেকথার পর অপর্ণার মা কথাটা পাড়লেন— 'দিদি, বলছিলাম, অপুকে এই সময়টা আমরা আমাদের কাছে রাখতে চাইছি। আপনাদের নাতি- নাতনী মাস দু'মাসের হলে পাঠিয়ে দেব।

রাজীবের মামীমা আরতি দেবী বললেন, — কিন্তু আমাদের যে নার্সিংহোম ঠিক করা আছে দিদি। যে ডাক্তারবাবু বৌমাকে দেখছেন, তাঁর নিজের নার্সিং হোম আছে।

— বেশ তো, অপু না হয় সেই নার্সিংহোমেই ভর্তি হবে। নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে দিলে আমাদের বাড়ি চলে যাবে।

— দেখুন, রাজুর সঙ্গে তো একটু কথা বলতে হবে। তাছাড়া ওর মামা কি বলেন!

— রাজু আবার কি বলবে, আপনারা যা বলবেন তাতেই তো ওর মত। আপনি বরং বেয়াইমশায়ের সঙ্গে কথা বলে আমাদের এখনই জানিয়ে দিন।

রাজীবের সম্পর্কে কথাটি যদিও আরতি দেবীর ভালো লাগল না। অপর্ণার মা হয়তো বোঝাতে চাইলেন রাজীবের নিজস্ব কোনও স্বাধীনতা নেই, মামাবাড়িতে সে মামা-মামীর হাতের পুতুল। তবুও সেই ভাবটা গোপন করে রাজীবের মামাকে ডাকলেন। মামা এসে বসলেন অপর্ণার বাবা-মা'র কাছে। অপর্ণার মা বললেন— বেয়াইমশাই আমরা অপর্ণাকে এই সময়টা আমাদের কাছে রাখতে চাইছি। আপনি কি বলেন? আপনাদেরও কোনও ঝামেলা থাকল না।

— দেখুন, আপনাদের মেয়ে, এই সময় আপনাদের কাছে রাখবেন, এটা হতেই পারে। কিন্তু আমাদের ঝামেলার কথা বলছেন কেন? নাতি আসুক আর নাতনি

আসুক, তার জন্য আমরা তো সবকিছু করতে প্রস্তুত। তা আমাদের কাছে ঝামেলা হবে কেন?

— না, আপনি কিছু মনে করবেন না, এটা আমি আপনাদের আঘাত দেওয়ার জন্য বলিনি।

অপর্ণার বাবা ব্রজবিহারীবাবু বললেন— ওই তো তোমার দোষ। কথার সময় খেই হারিয়ে ফেল।

মোটামুটি ঠিক হলো, অপর্ণা নার্সিংহোম থেকে বাপের বাড়িতেই যাবে। তারপর আঁতুড় তুলে এ বাড়িতে চলে আসবে। বাবা-মা দু'জন তখন গিয়ে বসল মেয়ের ঘরে। কী কথাবার্তা হলো তারাই জানে। ঘন্টাখানেক পর বেরিয়ে এসে ব্রজবিহারীবাবু বললেন— এবার আসি বেয়াইমশাই!

আরতিদেবী বললেন— সেকি! এখন আসবেন কি! কতদিন পরে এলেন, খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যাবেন। রাজুও আসুক।

— না, না। বাড়িতে বড় বৌমা একা। ওঁর আবার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে, আমার কী যে জ্বালা! আসি এখন, তাহলে ওই কথাই রইল অপু নার্সিং হোম থেকে আমাদের বাড়িতে যাবে।

ওরা চলে গেলে বিভাসবাবু, আরতি দেবী, অপর্ণা গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সেদিন রাজীব বাড়িতে আসার পর মামীমা বললেন— রাজু আজ তোর শ্বশুর-শাশুড়ি এসেছিলেন। ওরা অপর্ণাকে নার্সিং হোম থেকে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছেন।

— কেন?

— মেয়েরা এই সময় বাপের বাড়িতে থাকে। এটাই তো নিয়ম।

— অপর্ণার সাধের সময় একটা প্রাণী এদিক মাড়াল না। এখন আবার হঠাৎ করে কর্তব্যবোধ উথ্লে উঠল যে!

— দেখ বাবা, ওভাবে বলতে নেই। ওই সময় হয়তো কোনও অসুবিধার জন্য আসতে পারেননি। ওরা খুব করে বলেছেন।

— সে তোমরা যা খুশি করো গে, তবে অপর্ণা এই সময়ে ওখানে থাক্ তাতে আমার মত নেই।

— দেখ বাবা, আমরাও তো চাইছিলাম অপর্ণা আমাদের কাছে থাকবে, কিন্তু ওঁরা এত করে বলেছেন।

অপর্ণা কাছেই ছিল, সে বলল— ঠিক আছে মা ওর যখন ইচ্ছে নয়, তখন আমি ও বাড়িতে যাবো না।

— তা কি হয় মা! তোমার বাবা-মা'কে আমরা কথা দিয়েছি, তুমি ওদের কাছেই থাকবে। রাজু বললে তো হবে না।

❖ ❖ ❖

— মাতৃসদনে ভর্তি হলো অপর্ণা। নর্মাল ডেলিভারি হলো না। সিজার করতে হলো। মাতৃসদনে তখন রাজীব, মামা, মামী, সমরেশ, সমরেশের বৌ, অপর্ণার বাপের বাড়ি থেকে বড়দা, বড়বৌদি, অপর্ণার মেজদা, ছোটো ভাই সবাই আছে। নার্স খবর দিয়ে গেল মেয়ে হয়েছে। রাজীবও মনে মনে মেয়েই চেয়েছে। কিছুক্ষণ পর নার্স বাচ্চাটাকে দেখিয়ে নিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে নার্স ডাকল, অপর্ণাকে তখন বেডে দিয়েছে। পুরোপুরি জ্ঞান তখনও ফেরেনি, কিন্তু নার্স যখন জিভ বের করতে বলল অপর্ণা জিভ বের করল। নার্স আর একটা প্রেসক্রিপশান এনে রাজীবের হাতে দিল। রাজীব বাইরের দোকান থেকে ওষুধ, দুধ, ফিডিং বোতল সব নিয়ে এলো। অপর্ণার মেজদা বলল— টাকা লাগবে?

রাজীব বলল— না, না।

ওষুধপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি চলে গেল। যেতে যেতে মামা বললেন— তোর মা'ই এলো রাজু।

মামী বললেন— মুখখানা দেখেছ? অবিকল ঠাকুরঝি।

সেদিন রাতে আর রান্না হয়নি। সুবোধবাবুদের বাড়ি তো কোনও রকমে দুধ মুড়ি খেয়ে থাকল সবাই। সেই রাতেই কাপড় ছিঁড়ে ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করতে শুরু করলেন আরতি দেবী। অনেক রাতে কানপুর থেকে ফোন এলো সীমার। মেয়ে হয়েছে শুনে সেও খুব খুশি। অপর্ণা বাপের বাড়ি থাকবে শুনে সে আর আসেনি। অপর্ণা মেয়ে নিয়ে এবাড়িতে এলে আসবে। পরদিন সকালে নতুন জামা, তোয়ালে, মামীমার সেলাই করা কাঁথা নিয়ে নার্সিং হোমে গেল রাজীব। অপর্ণাকে তখন কেবিনের বেডে দিয়েছে, পাশে ছোট দোলনায় মেয়েটা। রাজীব ভালো করে চেয়ে দেখলো, হ্যাঁ, মুখখানা তার মায়ের মতোই বটে। অপর্ণার তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে। তার কাছে বসল রাজীব। বলল— কেমন আছ এখন?

— ভালো। তুমি তো মেয়েই চেয়েছিলে!

রাজীব কোনও কথা না বলে হাসল।

— মেয়ে হওয়াতে মামা মামীমারা খুশি হয়েছেন?

— হ্যাঁ। মামা তো বলছেন ও নাকি আমার মায়ের মতোই হয়েছে।

— তাই?

আয়া এসে একটা জামা পরিয়ে দিল মেয়েকে। কিছুক্ষণ পরে সমরেশ আর তার বৌ মাধুরীও এলো। কিছুক্ষণ থেকে সবাই চলে গেল। রাজীব অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে এক সপ্তাহের। সাতদিন কেটে গেল দেখতে দেখতে, আজ ছুটি অপর্ণার। সকালে একটা গাড়ি নিয়ে রাজীব নার্সিং হোমে গেল। মামা দুশো টাকা দিয়ে বলেছিলেন, অপর্ণার বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় মিষ্টি নিয়ে যেতে। বড় এক হাঁড়ি মিষ্টি গাড়িতে রেখেছিল রাজীব। নার্সিং হোমের পাওনা মিটিয়ে, নার্স আয়াদের বক্শিস দিয়ে, যখন সব গোছগাছ হয়ে গেছে তখনও অপর্ণার বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। রাজীব বিরক্ত হয়ে বলল— কি করব এখন? ওরা তো কেউ এলো না!

— আর একটু অপেক্ষা করো। আসবে নিশ্চয়।

— দেখো, ও বাড়ি থেকে কেউ না

এলে আমি কিন্তু তোমাদের ও বাড়িতে রাখতে যেতে পারবো না। আর কিছুক্ষণ দেখবো, তারপর সোজা আমাদের বাড়ি।

আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন ওবাড়ির কেউ এলো না তখন রাজীব বলল— না, ওরা আর আসবে না। কতক্ষণ আর বসে থাকবো? চলো বাড়ি চলে যাই।

মেয়েকে কোলে নিয়ে রাজীব নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এলো। নার্সিং হোমের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। অপর্ণা বলল, একবার বুথ থেকে ওবাড়িতে একটা ফোন করে দেখো না।

— দেখো, কিছু মনে করো না। ওই কাজটি আমি করতে পারবো না। ওদের যখন গরজ নেই তো যাবে না।

— গরজ না থাকলে বাবা-মা তোমাদের বাড়ি বয়ে যেতো না।

ঠিক এই সময় গলির মুখে অপর্ণার ছোট ভাইকে দেখা গেল। অপর্ণা যেন উল্লাসে চিৎকার করে উঠল— ওই তো বিল্টু এসে গেছে।

বিল্টু এগিয়ে এলো ট্যাক্সির দিকে।

— তোর এতো দেরি হলো? আমাকে এদিকে কত কথা শুনতে হচ্ছে।

— এছাড়াও তো আমার আরও অনেক কাজ আছে তো নাকি?

— ইনি বরাবরই একটু ব্যস্তবাগিশ এবং বাক্‌পটু। রাজীব তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। ড্রাইভারকে বলল— চেতলা যাবো। বিল্টু, তুমি রাস্তাটা চিনিয়ে দিও। ট্যাক্সি চলতে লাগল।

অপর্ণাকে ওই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই রাজীব চলে এলো। আসার সময় মিষ্টির হাঁড়িটা বড়বৌদির হাতে দিয়ে এলো। বাড়িতে আসতেই মামীমা জিজ্ঞাসা করলেন— ওরা কেমন আছে?

— ভালো।

মামা রাজীবকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন— হ্যাঁ রে রাজু, দিদিভাইয়ের একটা নাম ঠিক করলাম, তোর মামীর তো পছন্দ না, দেখ তো তোর পছন্দ হয় কিনা!

— কি নাম মামা?

— ঈশিতা।

— বাঃ, বেশ ভালো নাম তো!

— ঈশিতা শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য। আরও দুটো অর্থ অবশ্য হয়, একটা হলো সকলের উপর প্রভুত্ব। আমার দিদিভায়ের ক্ষেত্রে তিনটি অর্থই অবশ্য প্রযোজ্য। যেমন— ওই তো আমাদের ঐশ্বর্য, আর ছেলে মেয়েদের একটু ঐশ্বরিক ভাব থাকা ভালো। আর সকলের উপর প্রভুত্ব, ওতো আমাদের উপর প্রভুত্ব করবেই।

— একটা নাম ঠিক করবে, তার জন্য যেন ক'দিন ধরে বইপত্র নিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে।

— ও তুমি বুঝবে না, আমার নাতনির তো আর যা তা নাম রাখা যায় না।

পরদিন বিকেলে রাজীব ওদের দেখতে যাবে। মামা বললেন, তুই আজ দেখে আয়। আমি আর তোর মামী কাল যাবো।

রাজীব যখন চেতলা পৌঁছাল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। একটা তক্তপোষে শুয়ে আছে অপর্ণা, পাশে মেয়েটা। এই অঞ্চলের মশা বিখ্যাত, সেই ভর সন্ধ্যায় মশারি ছাড়া মা-মেয়ে শুয়ে আছে। মেয়ের গায়ে একটা কাঁথা ঢাকা আছে, কিন্তু মুখে মশা বসে কালো হয়ে গেছে। তা দেখে রাজীবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। সে চিৎকার করে বলল— একি! ওকে একসঙ্গে এতগুলো মশা খাচ্ছে, একটা মশারিও টাঙানো হয়নি?

অপর্ণা বলল— আমি তো টাঙাতে পারছি না।

— তুমি টাঙাতে যাবে কেন? অন্য কেউ টাঙিয়ে দিতে পারল না! এইটুকু বাচ্চা, ওকে যদি একসঙ্গে এতগুলো মশা ছেঁকে ধরে ও তো বাঁচবে না। ছিঃ ছি।

রাগে গজ গজ করতে করতে রাজীব বেরিয়ে গেল। কালীঘাটের বিছানার দোকান থেকে একটা বড় মশারি আর একটা বাচ্চার মশারি নিয়ে আবার চেতলায় অপর্ণার বাপের বাড়িতে গেল। তখনও মেয়েটা সেইভাবেই আছে, অপর্ণা মাঝে মাঝে হাত নাড়াচ্ছে। রাজীব বাচ্চার মশারিটা খুলে মেয়েটাকে ঢেকে দিল।

অপর্ণা বলল— তুমি কিনে আনলে?

— কি করবো? এ বাড়িতে তো একটাও মানুষ নেই। একটা বাচ্চাকে মশা খেয়ে ফেলছে, কারও হুঁস আছে?

রাজীবের গজগজানি শুনে আসে অপর্ণার মা। বলেন— কী হয়েছে অপু?

— অপু কী বলবে, আমি বলছি। মেয়েটাকে তো মশাতে খেয়ে ফেলল। এইটুকু বাচ্চাকে যদি একসঙ্গে এত মশা কামড়ায় সে বাঁচে? একটা মশারির আপনারা ব্যবস্থা করতে পারলেন না?

অপর্ণা বলল— মেজদা বলেছিল মশারির কথা।

— বাঃ। মেজদা মশারির কথা বলেছে আর তাতে সব মশা পালিয়ে যাবে!

অপর্ণার মা বললেন— একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি বাপু বড্ড চিৎকার করছো।

— এটা সামান্য ব্যাপার? আমি এসে তো দেখলাম মেয়েটার সারাটা মুখে মশা বসে রক্ত খাচ্ছে।

— কী হয়েছেটা কী, এত চিৎকার চেঁচামেচি কিসের? বলতে বলতে আসে অর্পণার ছোট ভাই বিল্টু। ব্যাঙ্কে চাকরি করে, প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার যুবক। চেহারার সঙ্গে মেজাজেরও একটা মিল আছে।

— চিৎকার কেউ এমনি এমনি করে না। একটা বাচ্চাকে বাড়িতে এনেছো। তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই? একটা ছোট মশারি পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারোনি?

অপর্ণার মা বললেন— করে কিনা সেটা দেখতে পারতে।

— দু'দিন তো হয়ে গেল, কবে আর করবে?

অপর্ণার মেজদা লাল্টুও চেঁচামেচি শুনে আসে। বলে— মা এসব হচ্ছেটা কি? এটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো না কি? এত চিৎকার চেঁচামেচিটা কিসের জন্য?

— ওই যে মশারি। ওর মেয়েকে

মশাতে খাচ্ছে।

— তার জন্য এত চেঁচামেচি? বলেছিলাম তো মশারি একটা নিয়ে আসবো।

রাজীব বলল— দেখুন, চেঁচামেচিটা কিন্তু আপনারাই করছেন। একটা বাচ্চাকে বাড়িতে এনেছেন, সামান্য একটা মশারির ব্যবস্থা করতে পারেননি। এইটুকু দায়িত্ববোধ আপনাদের নেই!

সাড়ে ছ'ফুট বলে উঠল— কাকে দায়িত্ব শেখাচ্ছ? অত যদি দায়িত্ববোধ, বৌ মেয়েকে নিজের কাছে রাখলেই তো পারতে। এখানে পাঠাতে গেলে কেন?

— আমরা পাঠাতে চাইনি। তোমাদের বাড়ি থেকে আদিখ্যেতা করে নিয়ে আসা হয়েছে। নয়তো তোমাদের মুরোদ আমার জানাই ছিল।

এবার লাল্টু বলল— তোমার মুরোদ আমাদের জানা আছে। নিজের তো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও নেই। থাকো তো মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে। তাও বুঝতাম নিজের যদি একটা বাড়িও থাকত।

— দেখুন, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে নাক গলাতে আসবেন না। আপনাদের মতো নীচু মনের মানুষের পক্ষে আমার মামা-মামীর সমালোচনা শোভা পায় না।

কথা বলতে বলতে আঙুল তুলছিল রাজীব। লাল্টু বলল— আঙুল নামিয়ে কথা বল।

এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় রাজীবের।

— এখন তো শুধু আঙুল তুলেছি। এরপর সংযত হয়ে কথা না বললে হাতও উঠে যেতে পারে।

— বেরো, বেরো বাড়ি থেকে।

সাড়ে ছ'ফুট চিৎকার করে উঠলে অপর্ণার মা বললেন— আঃ, মাথা গরম করিসনে বিল্টু।

রাজীব বলল— হ্যাঁ, বেরিয়ে তো যাবো তবে আমার বউ মেয়েকে নিয়েই যাবো। অপর্ণা চলো, এখানে আর নয়।

অপর্ণা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। — না আমি যেতে পারবো না। আমি উঠতে পারছি না, হাঁটতে পারবো না।

— আমি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসছি, তুমি একটু কষ্ট করে গাড়িতে উঠবে।

— না, আমি পারবো না। আমি মরে যাবো। আমি পারবো না।

অপর্ণার মা এসে অপর্ণার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোত বলেন— তুই কাঁদছিস কেন? কার সাধ্য তোকে নিয়ে যায়?

বাইরের গেটটা বন্ধ ছিল। সাড়ে ছ'ফুট গিয়ে দড়াম করে খুলে দিল। কিং কর্তব্য বিমূঢ় রাজীব মাথা নীচু করে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা-মামী রাজীবের দেরি দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। রাজীব বাড়িতে ঢুকলে রাজীবের চোখ মুখ দেখে ওরা ভয় পেয়ে যান। মামী বলেন—কি রে রাজু, কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি মামীমা।

— তুই মিথ্যা কথা বলছিস, বল কী হয়েছে?

— ওদের বাড়িতে আজ আমাকে সবাই মিলে খুব অপমান করেছে। মেয়েটাকে মশারি ছাড়া রেখেছিল আর মশা সব ওকে ছেঁকে ধরেছে। তাই নিয়ে আমি প্রতিবাদ করলাম, আবার নিজে কালীঘাট থেকে একটা মশারি কিনে এনে দিলাম। ওরা আমাকে যা অপমান করল, আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারবো না।

মামা বললেন— তুই অপর্ণা আর দিদিভাইকে নিয়ে চলে এলি না কেন?

— আমি বলেছিলাম, কিন্তু ও কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে বলল— ও উঠতে পারবে না, হাঁটতে পারবে না।

— কাল সকালে এখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওদের নিয়ে চলে আসবি।

— আমি আর ওই বাড়িতে যাবো না মামা, ওরা আমাকে একরকম বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

— ঠিক আছে, তুই না যাবি তো আমি যাবো। দেখি, ওদের কত বড় সাহস, কি করে ওরা বৌমা আর আমার নাতনিকে আটকে রাখে, আমি দেখবো।

পরদিন সকালে রাজীবই ফোনটা করল অপর্ণার বাপের বাড়িতে। অপর্ণার বাবা ধরল ফোন। রাজীব বলল— অপর্ণাকে দিতে। অপর্ণার বাবা বললেন— ও কি এতটা আসতে পারবে?

— বলুন, কষ্ট করে একবার আসতে, আমার একটা কথা ওকে বলার আছে।

— ধরো, দেখছি।

রাজীব ফোন ধরে আছে, বেশ কিছুক্ষণ পরে ওপাশে অপর্ণার গলা শোনা গেল।

— হ্যালো।

— হ্যাঁ, মন দিয়ে শোন, তোমার শরীর ভালো না। সিজার হয়েছে, সবই মানলাম, কিন্তু আমি নিরুপায়, একটা গাড়ি নিয়ে মামীমা যাচ্ছেন, তুমি মেয়েকে নিয়ে যেই অবস্থায় আছ চলে আসবে। এটা আমার শেষ কথা। আর কোনও কথা আমি বলব না।

— আজকেই?

— হ্যাঁ, এক্ষুনি। রাখলাম।

মামা গোঁ ধরেছিলেন ও বাড়িতে যাবেন বলে। মামীমা অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করলেন। ব্লাড প্রেসারের রুগী, মাথা গরম হলে কখন কী হয়ে যায়। মামীমা সমরেশের বৌকে নিয়ে একটা ভাড়া গাড়িতে গেলেন চেতলা। অপর্ণা তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। সমরেশের বউ ধরে ধরে গাড়িতে তুলল। ওই বাড়ির কেউ এগিয়ে দিতে পর্যন্ত এলো না। দুপুরের মধ্যে ওরা সখেরবাজার পৌঁছে গেল। মেয়েটার গা গরম, নাক দিয়ে জল ঝরছে। পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেখানো হল। ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন। এভাবেই দেখতে দেখতে মাস তিন কেটে গেল, অপর্ণার বাপের বাড়ি থেকে কেউ কোনও খোঁজ খবর করেনি। সেদিন হঠাৎ অপর্ণার মায়ের ফোন এল। ফোনটা ধরেছিল মামীমা। ওপার থেকে বলল— হ্যালো। আমি অপর্ণার মা বলছি। কে, বেয়ান? হ্যাঁ, শুনুন, মেজ ছেলের বিয়ের ঠিক হয়েছে,

সামনের মাসের চৌদ্দ তারিখে। আসবেন সবাই। আমি কাউকে পাঠাব। একটু অপর্ণাকে দিন।

মামীমা অপর্ণাকে ডেকে বললেন— বৌমা, তোমার মায়ের ফোন।

অপর্ণা ছুটে এসে ফোন ধরল— বলো মা। কতদিন পরে ফোন করলে।

— শোন্, লাল্টুর বিয়ে সামনের মাসের চৌদ্দ তারিখে। তুই চার পাঁচদিন আগে আসবি, আমি পাঠাব কাউকে। দিদিভাই ভালো আছে তো? রাখছি রে—

— মা, মেয়ের বাড়ি কোথায়? মা—মা,

ওদিকে ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে অপর্ণার মা। দিনকয়েক পরে ডাকে নিমন্ত্রণ পত্র এলো ওবাড়ির থেকে।

অপর্ণা বলল— কি সুন্দর কার্ডটা করেছে দেখুন, মা। এ আমার মেজদার কাজ, তাঁর রুচিটাই আলাদা।

সেদিন অপর্ণা রাজীবকে বলল— জানো তো, মেজদার বিয়ে!

— কার?

— মেজদার।

— ও।

— যাবে তো?

— কোথায়?

— বিয়েতে।

রাজীব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— না।

— কেন, যাবে না কেন?

— তুমি বলছো এই কথা! তুমি তো সব জানো, সব দেখেছো। তারপর তুমি কোন মুখে ওবাড়িতে যাওয়ার কথা বলছ?

— ওরকম রাগারাগি কি হয় না? তুমিও রেগে দু'কথা বলেছ, ওরাও না হয় দু'কথা বলেছে। তাই বলে রাগ করে বসে থাকতে হয়?

— আচ্ছা, তোমার কি মান সম্মান বোধ বলতে কিছুই নেই? তোমার দাদার বিয়ে। একটু নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি।

— কেন আমার মা ফোনে বলেছে। ডাকে চিঠি পাঠিয়েছে। এখন তো ফোনে ফোনেই নিমন্ত্রণ হয়। আর ওখান থেকে কে আসবে বলো, সবাই তো ব্যস্ত।

— ঠিক, সবাই ব্যস্ত, কারও আসার সময় নেই! আর আমাদের বাড়ি থেকেও কারো যাবার প্রয়োজন নেই।

— সে কি! ভাইয়ের বিয়েতে আমি যাবো না?

— না।

রাজীবের কণ্ঠস্বর শুনে আর কোনও কথা বলার সাহস পেল না অপর্ণা। তারপর কয়েকদিন আর এ নিয়ে কোনও কথা হয়নি। তবে ইদানীং রাজীব অফিসে থাকলে অপর্ণা প্রায় বাপের বাড়িতে ফোন করে। মামা-মামীমা দেখেও দেখেন না। বিয়ের দিন তিনেক আগে মেয়েটার জ্বর হয়েছে, রাজীব অফিসে যায়নি। বিকেলে অপর্ণার ছোট ভাই বিল্টু হঠাৎ হাজির। মামীমা আদর যত্ন করে বসালেন, মিষ্টি এনে খাওয়ালেন। একথা সেকথার পর বিল্টু বলল— পরশু মেজদার বিয়ে। আপনারা সবাই যাবেন, আর দিদি আজ আমার সঙ্গে যাবে। দিদি নে, তুই তৈরি হয়ে নে।

মামীমা বললেন— কিন্তু বৌমা আজ কি করে যাবে? মেয়েটার খুব জ্বর। যার জন্য রাজুটা আজ অফিস পর্যন্ত গেল না।

— ওই জ্বর-টর ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ডাক্তার দেখিয়ে নেব। নে, চট্ করে নে। আমার বসে থাকার সময় নেই।

অপর্ণা তৈরি হতে গেল। রাজীব এতক্ষণ কোনও কথা বলনি। এবার মুখ খুলল— অপর্ণা আজ যাবে না।

— কেন?

— শুনলে তো মেয়েটার শরীর ভালো না।

— ও ঠিক হয়ে যাবে।

— না, ঠিক হবে না। অন্তত তোমাদের বাড়িতে। আমার তো জানতে কিছু বাকি নেই, নিজের চোখে দেখেছি তো! একটা বাচ্চার মশারি যে বাড়িতে যোগাড় হয় না, সে বাড়িতে সব ঠিক হয়ে যাবে! বাচ্চাটার এখন একশ দুই জ্বর। তুমি নেবে ওর দায়িত্ব?

— দেখো রাজীবদা, তুমি কাকে দায়িত্ব শেখাচ্ছ? তোমার দায়িত্ব কে নেয় তার ঠিক নেই। মামা-মামীমার গলগ্রহ হয়ে আছ। নিজের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। তুমি আমাকে দায়িত্ব শেখাচ্ছ?

— বিল্টু এসব কি বলছো তুমি। রাজু আমাদের গলগ্রহ? ছিঃ ছিঃ। রাজু আমার ছেলের থেকেও বেশি। তাই ওকে আলাদা বাড়ি করতে দিইনি। আমাদের যা কিছু সব তো ওরই।

— হ্যাঁ, আপনারা মরার পর আপনার মেয়ে এসে যখন ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, তখন তো গাছতলা ছাড়া আর কোনও ঠাঁই হবে না।

— তুমি কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমার বাড়িতে এসে আমার মামা-মামীকে অপমান করার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?

এর মধ্যে শাড়ি পাল্টানো হয়ে গেছে অপর্ণার। সে ছুটে এসে বলল— চুপ কর বিল্টু, ওদের সঙ্গে কথায় পারবি না। আমার হয়ে গেছে, মেয়েটাকে নিয়ে আসি।

— না, তুমি কোথাও যাবে না। গর্জে উঠল রাজীব।

অপর্ণা বলল— আমার ভাইয়ের বিয়েতে আমি যাবোই। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

— আমারও শেষ কথা, তুমি যদি আজ যাও তো শেষবারের মতো যাবে। এই বাড়ির দরজা তোমার জন্য চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে।

— রাজু কি বলছিস তুই?

— ঠিক বলেছি মামা। ওরা ভেবেছে কি! আমরা মানুষ না, আমাদের কোনও মান-সম্মান নেই! ওরা যা খুশি তা করবে, যা ইচ্ছে তাই বলবে, কেন? কিসের এত অহঙ্কার?

অপর্ণা ঘরে গিয়ে এক হাতে মেয়েটাকে নিয়ে আরেক হাতে একটা সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে আসে। সুটকেসটা বিল্টুর হাতে দিয়ে বলে— চল্।

পথ আগলে দাঁড়ায় রাজীব— কোথায় যাচ্ছ? তুমি যাবে তো যাও, আমার

মেয়েকে আমি নিয়ে যেতে দেবো না।

মেয়েকে অপর্ণার কোল থেকে তুলে নিতে চায় রাজীব। অসুস্থ ছোট মেয়েটা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। মামা বলেন— ছেড়ে দে রাজু।

—না, তাহলে ওকে লিখে দিতে হবে যে ও চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছে।

— তাই দেবো। দাও কাগজ কলম।

—বৌমা, কি করছো তুমি? একবার ভালো করে ভেবে দেখো।

— আমি অনেক ভেবেছি। আপনাদের বাড়িতে থেকে আমি ঝি-এর মতো খাটতে পারবো না।

— বেশ তো, তোমরা অন্য জায়গায় থাকো।

— ওই মেরুদণ্ডহীন পুরুষটার যে সেই মুরোদ নেই, তা আমি ভালোভাবেই জানি। দিন কোথায় কি লিখতে হবে।

— তোমাকে কিছুই লিখতে হবে না বৌমা। তুমি যাও, যখন মন চাইবে ফিরে এসো।

— আপনাদের দয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা তিন ভাই মিলে একটা বোনকে চালাতে পারবো। বিল্টু বলল।

— কই দাও, কোথায় কি লিখতে হবে?

রাজীব কাগজ কলম এগিয়ে দিল। অপর্ণা খস্ খস্ করে লিখল— আমি অপর্ণা মিত্র, স্বেচ্ছায় স্বামী রাজীব মিত্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি।

—অপর্ণা মিত্র।

১০.০৩.১৯৯৯

মেয়েটাকে কাঁদিয়ে নিয়ে চলে গেল অপর্ণা। রাজীব আর মামা-মামী প্রস্তর মূর্তির মতো নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল।

❖ ❖ ❖

মামা-মামী অনেক চেষ্টা করেছিলেন ডিভোর্স এড়ানোর জন্য। মেয়ের টানে রাজীবও ডিভোর্স চায়নি, কিন্তু অপর্ণা আর তার বাপের বাড়ির লোকেদের একগুঁয়ে মনোভাবের জন্য কোর্টে যেতেই হলো। ওরা অবশ্য খোরপোষ দাবি করেনি। কোর্টে মেয়ের দাবি করেছিল রাজীব। কিন্তু নাবালিকা বলে সেই দাবি খারিজ হয়ে যায়। মামলার দিনগুলিতে মেয়েকে বাড়িতে রেখে আসে অপর্ণা। ঈশিতার বয়স এখন দেড় বছর, হাঁটতে শিখেছে, কথাও বলছে নিশ্চয়। বাবাকে হয়তো এখন চিনবে না ঈশিতা। একদিন মামী রাজীবকে বললেন— অপর্ণার সঙ্গে আমরা হয়তো ভালো ব্যবহার করিনি। সেকি আমাদের জন্য বাড়িতে থাকতে পারল না?

— না, মামীমা। ও এ বাড়িতে থাকতে পারল না ওর মা আর ভাইদের জন্য। আসলে ওরা সব বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ। যাক্, ওদের সম্পর্কে আলোচনা যত কম করা যায় ততই ভালো।

— আমার চিন্তা তো শুধু মেয়েটাকে নিয়ে, অতো বড় সংসারে মেয়েটার যত্ন আত্তি হবে তো?

— না যদি হয়, আমাদের তো কিছু করার নেই মামীমা।

মুখে যাই বলুক, অন্তরটা কিন্তু ফেটে যাচ্ছিল রাজীবের। অপর্ণার স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই। মা আর ভাইদের কথায় ওঠে বসে। নিজের ভালো মন্দটুকুও বোঝে না। নয়তো রাজীব কিংবা মামা-মামীর সঙ্গে এমন ঝগড়া কিংবা মতবিরোধ হয়নি যা ডিভোর্স অবধি গড়াতে পারে। মা এবং ভায়েদের পরামর্শে অপর্ণা ডিভোর্সে রাজি হয়েছে। ডিভোর্সের কথাটা রাজীবের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে আবার গায়ে পড়ে সান্ত্বনা দিতে আসছে। এসব রাজীবের অসহ্য লাগে, সে যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। অথচ দু'বার প্রমোশন নিয়ে কলকাতার বাইরে যেতে সে রাজি হয়নি। সেদিন রাজীব সরাসরি ফোন করল জেনারেল ম্যানেজারকে। জেনারেল ম্যানেজার গুজরাটি। কিন্তু পড়াশুনা করেছে কলকাতায়। প্রয়োজনে ভালো বাংলা বলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। রাজীবকে খুব স্নেহ করেন। রাজীবের বিয়ের সময় সপরিবারে এসেছিলেন। জি এম ফোন তুলতেই রাজীব বলল— গুড মর্নিং স্যার। আমি রাজীব মিত্র বলছি, পার্ক স্ট্রীট থেকে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো বলো।

— স্যার, আমি কলকাতার বাইরে যেতে চাই। যে কোনও জায়গায়।

— হোয়াই, কেন? সেবার কলকাতা ছাড়বে না বলে তুমি প্রমোশন ডিনাই করলে?

— কাইন্ডলি, যদি কোনও প্রভিশান থাকে, তবে একটু দেখবেন স্যার।

— আচ্ছা দেখছি।

তিনদিন পরে হেড অফিসে ডেকে পাঠালেন জি এম। রাজীব ঘরে ঢুকতেই বললেন— এসো, এসো। তোমার আপিলটা নিয়ে আমি ভাবছি। এ্যাট প্রেজেন্ট তোমার সেম্ পোস্টে দুটো ভেকেন্সী আছে। একটা দিল্লীতে, আরেকটি লক্ষ্ণৌতে। উইদাউট প্রমোশনে তুমি যদি ট্রান্সফার চাও তবে এর যে কোনও একটা পোস্টে আমি তোমার নাম রেকমেন্ড করতে পারি।

রাজীব বলল— স্যার, আপনি কাইন্ডলি আমাকে লক্ষ্ণৌতে দিন।

দিল্লী শহর রাজীবের কোনওদিনই ভালো লাগেনি। তুলনায় লক্ষ্ণৌয়ের মধ্যে যেন একটু প্রাণ আছে মনে হয়েছে। তাছাড়া লক্ষ্ণৌকে প্রেফার করার আর একটা কারণ, কাছেই কানপুরে থাকে সীমা। লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর ঘন্টা দুই আড়াইয়ের পথ। যখন খুশি সীমাদের কাছে আসা যাবে। তবে তার এই স্বেচ্ছা নির্বাসনের ইচ্ছাটি সবার কাছে গোপন রাখল, এমনকি মামা-মামীমার কাছেও। সবাই জানল, এটা রুটিন ট্রান্সফার। পরের মাসেই লক্ষ্ণৌ চলে গেল রাজীব। চাকরিতে জয়েন করে ফার্স্ট উইক এন্ডে চলে এলো কানপুরে সীমাদের

বাড়িতে। সীমার শ্বশুরবাড়ির লোকগুলি ভীষণ ভালো। হৈ হুল্লোড় করে কেটে গেল দুটো দিন, সোমবার আবার ভোরে উঠেই লক্ষ্ণৌ। সীমার ননদ কাবেরী লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এম ফিল করছে। এক একদিন রাজীবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আবার এক একদিন ফেরার পথে দু'জনে একসঙ্গে ফেরে। সেদিন কাবেরী বলল— রাজুদা, এক জায়গায় যাবে?

— কোথায়?

— যাবে কিনা বল?

— হুঁ, যাবো।

দুপুরে দু'জন বেরিয়ে পড়ল কানপুর স্টেশনের দিকে। কাউন্টার থেকে দুটো টিকিট কিনে ওরা চেপে বসল একটা ছোট লাইনের ট্রেনে। ছোট লাইন, ট্রেনও ছোট। কতক্ষণ পরে বাঁশি বাজিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের ট্রেন ছুটতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেনটা শহরের সীমানা পেরিয়ে চলতে লাগল মাঠের মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে ধানের ক্ষেত, সর্ষের ক্ষেত, যেন বাংলার কোনও গ্রাম। আবার কখনও বা গ্রামের পাশ দিয়ে। গ্রামে মেয়ে বৌয়েরা কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে তাকিয়ে আছে চলন্ত ট্রেনের দিকে। কাবেরী ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। একটা মেয়েও পাল্টা হাত নাড়ল। রাজীব জিজ্ঞাসা করে— আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কাবেরী বলল— ব্রহ্মাবর্ত, বিধুরে।

কানপুর শহর থেকে বিধুর গ্রাম মাত্র কুড়ি কিলোমিটার। এক ঘন্টারও কম সময়ে ওরা পৌঁছে গেল প্রান্তিক স্টেশন ব্রহ্মাবর্তে। যাত্রী বেশি নেই। ইতিহাসের ছাত্রী কাবেরী বলল— এই গ্রামটার নাম বিধুর, আসলে এর নাম ছিল বীরধোর। অপভ্রংশ হয়ে হয়েছে বিধুর। ইংরেজরা মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে পরাজিত করে সন্ধি করতে বাধ্য করে এই বিধুরে নির্বাসিত করেছিল বার্ষিক এক লক্ষ টাকার বৃত্তির বিনিময়ে। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর সেই বৃত্তির অধিকারী হন অপুত্রক বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেব। এই বিধুরের রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছিলেন আরও একজন মারাঠী মেয়ে লক্ষ্মীবাঈ। পরে তার বিয়ে হয়েছিল ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে। তিনি মহাবিদ্রোহের নেত্রী ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। লর্ড ডালহৌসির আমলে সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি অপুত্রক রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের দত্তক পুত্র নাবালক দামোদরকে বঞ্চিত করে ঝাঁসী কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহীদের মিলনতীর্থ। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ইংরেজরা এই প্রাসাদ ধ্বংস করে দিয়েছিল।

ওরা তখন এসে দাঁড়িয়েছে এক বিশাল ধ্বংসস্তূপের সামন। পর্বত প্রমাণ ইঁট পাথরের স্তূপ, তার ওপর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূরের দল। কাবেরী বলল— এই স্তূপ দেড়শো বছরেও কেউ সরায়নি। বৃটিশরা সরায়নি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য, আর স্বাধীন ভারত সরকার সরায়নি মহাবিদ্রোহের স্মৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে জাগ্রত রাখার জন্য। একটা বড় পাথরের ফলকে লেখা আছে মহাবিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আর এই প্রাসাদের গুরুত্ব।

ওরা একটা গাছের নীচে গিয়ে বসল। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে চমকে ওঠে রাজীব। কাবেরী হেসে বলল— ও কিছু না, ময়ূরের ডাক।

— এত সুন্দর পাখিটার এত বিশ্রী ডাক!

— চলো এবার ওঠা যাক।

ওরা বেরিয়ে এলো রাস্তায়, একটু হাঁটার পর গঙ্গা, ব্রহ্মবর্ত ঘাট। কিংবদন্তী আছে ব্রহ্মা এখানে বসে সন্ধ্যা আহ্নিক করতেন। সুন্দর বাঁধানো ঘাট। এখানে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। বেশ সাজানো নৌকার ভিতরে চাদর তাকিয়া পাতা। কাবেরী বলল— চলো নৌকায় বেড়িয়ে আসি।

— চলো।

এখানে গঙ্গা একস্রোতা হিমালয় থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ জল। অবশ্য আশপাশের শহরের আর কারখানার আবর্জনা এই জলের স্বচ্ছতা অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে। নদীর গভীরতা এখানে অনেকটা কম আর কলকাতার গঙ্গার মতো এখানে জোয়ার হয় না, সবসময়ই ভাঁটা।

কাবেরী বলল— জানো, এই জায়গার একটা পৌরাণিক মাহাত্ম্যও আছে। কিংবদন্তী এখানেই ছিল মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে যখন বনবাসে পাঠালেন, তখন তিনি এই বাল্মিকীর আশ্রমেই ছিলেন। এখানেই জন্ম হয়েছিল লব-কুশের। কাছেই একটা জায়গা আছে, ওখানে অশ্বমেধ ঘোড়ার জন্য লব-কুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল।

নৌকা তখন মাঝ নদীতে। বিধুরে প্রচুর মন্দির, পাশে একটা জেলেদের গ্রাম। ওই পারে গাছপালা এত বেশি যে মনে হয় গভীর অরণ্য। সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। সূর্যের লাল আভা এসে পড়েছে কাবেরীর চোখেমুখে, তাতে অপরূপ লাগছে কাবেরীকে। কাবেরীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রাজীব। কাবেরী বলে— অমন করে কি দেখছ?

— তোমাকে।

— আগে কখনও দেখোনি?

— দেখেছি, আজ যেন নতুন করে দেখলাম। কাবেরী?

— বলো।

রাজীব কাবেরীর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলে— কাবেরী তুমি কথা দাও, এমনি করে সারা জীবন তুমি আমার কাছে থাকবে। বলো, কথা দাও।

— এত তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু করলে তার ফল ভালো হয় না। তুমি আরও ভাব, আমিও ভেবে দেখি।

— আমি তোমার যোগ্য নই জানি। তবুও আমি তোমাকে ভালোবাসি। সেই ভালবাসার অধিকার নিয়ে আমি তোমার

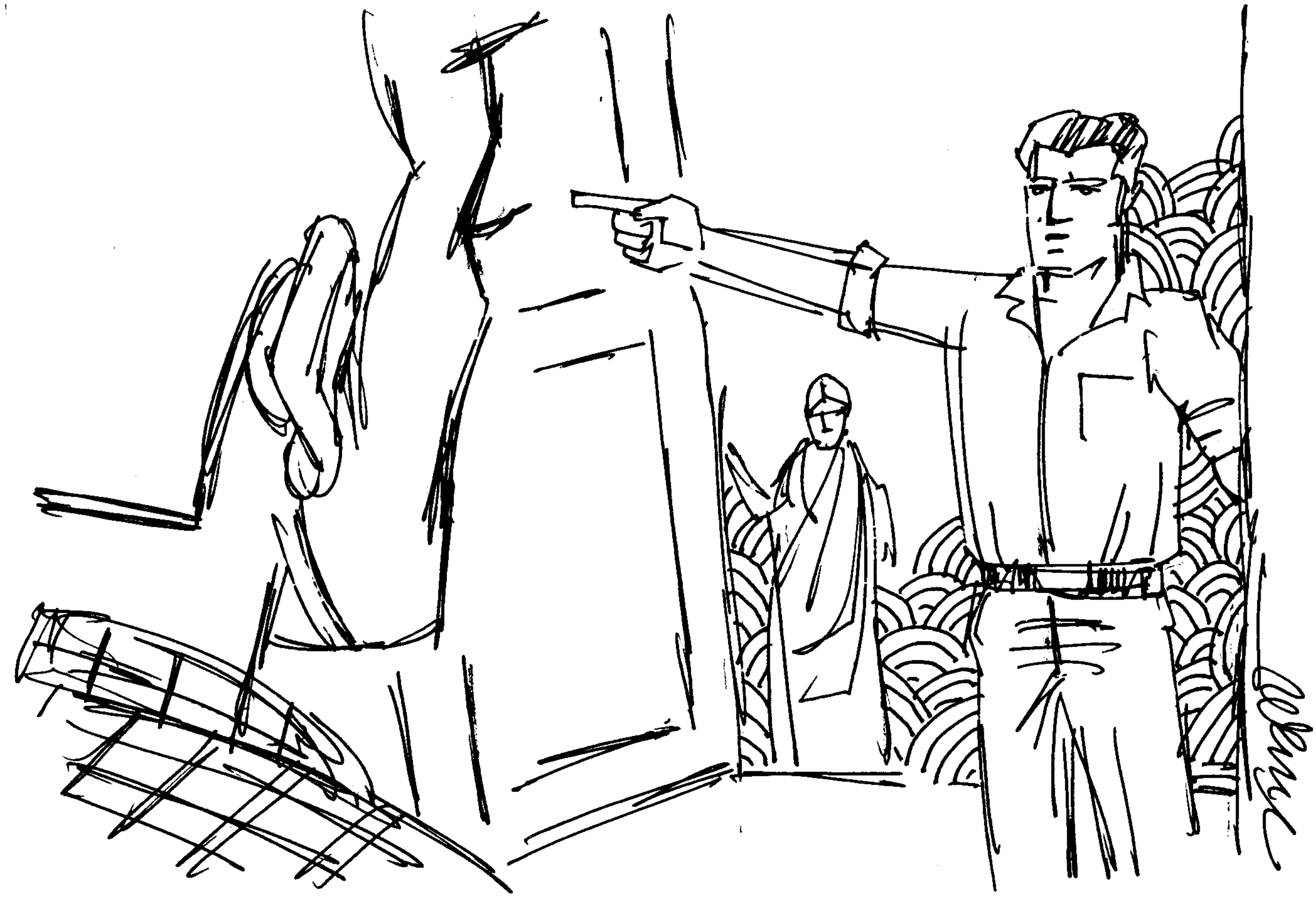

কাছে প্রার্থী। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

কাবেরী নিঃশব্দে রাজীবের হাতখানা তুলে নিজের চোখে মুখে গালে ঘষতে থাকে। নৌকা ততক্ষণে ঘাটে ফিরে এসেছে। বেড়ানোর সময় শেষ। ওরা দু'জন নামল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মন্দিরে মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। কাবেরী বলল— এখানে একটা বাঙালীর মন্দির আছে, সীতা মন্দির। বাংলার সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। বাল্মিকী আশ্রমের পাশে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবের আশ্রমে। আশ্রম চত্বরেই সীতাদেবীর মন্দির। মন্দিরে তখন আরতি চলছে, ওরা নাট মন্দিরে বসলো। আরতি শেষে পূজারী প্রসাদ দিয়ে গেল। ওখান থেকে বাল্মিকী আশ্রম, কথিত আছে, রামচন্দ্র বনবাসে পাঠালে সীতা এই আশ্রমেই ছিলেন। ক্রমে রাত বেড়ে চলেছে।

কাবেরী বলল— চল এবার ফেরা যাক। সেই ট্রেনে যাবে না অটোতে?

— ট্রেন পাওয়া যাবে?

— হ্যাঁ। হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে।

— তবে ট্রেনেই চলো।

ট্রেনে ভিড় ছিলই না। জানালার ধারে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। কাবেরীর একটা হাত ছিল রাজীবের হাতে। সময়টা শরৎকাল, একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে। ছোটো ট্রেন ছুটে চলেছে মাঠের মাঝখান দিয়ে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাবেরী মাথাটা রাখল রাজীবের কাঁধে।

❖ ❖ ❖

রাজীবের মানসিক চাপটা অনেকটা কেটে গেল কাবেরীর সান্নিধ্যে আসার পর। একদিন সীমা একা পেয়ে ধরল রাজীবকে।

— দাদাভাই একটা কথা বলব?

— বাঃ, তুই আবার পারমিশান নিয়ে কথা বলছিস কবে থেকে?

— না, বলছিলাম, আমাদের কাবেরীকে তোর কেমন লাগে?

— ভাল।

— কাবেরীকে তুই বিয়ে কর।

সেদিন কোনও কথা বলতে পারেনি রাজীব। চুপ করে থাকল কতক্ষণ। কয়েকদিনের মধ্যে সীমা সব ঠিক করে ফেলল। কলকাতায় বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলল। ওরাও খুশি, তবে ওরা চেয়েছিল বিয়েটা কলকাতাতেই হোক। কিন্তু রাজীব আর সীমা রাজি হয়নি। কানপুরে একটা বাড়ি ভাড়া করে বিয়ে

হবে। রাজীবও লক্ষ্ণৌতে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে গুলাব মার্গে। কাবেরীর ইউনিভার্সিটিও এখান থেকে কাছে হবে। কলকাতার বাড়িতে সিকিউরিটি বসিয়ে সীমার বাবা মা চলে এসেছেন। বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন, তবে খুব একটা বড় অনুষ্ঠান করা হবে না। মোটামুটি খুব ঘনিষ্ঠরা শুধু আমন্ত্রিত।

সেদিন কিছু পার্সোনাল জিনিস কেনার জন্য কাবেরী একটা শপিং কমপ্লেক্সে গিয়েছিল। কেনাকাটার পর যখন বেরিয়ে আসছে, তখন পেছন থেকে কে একজন হাত রাখল কাবেরীর কাঁধে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল কাবেরী— তুমি!

বেশ কয়েক বছর পর দেখা হলেও চিনতে ভুল হলো না কাবেরীর।

— চিনতে পেরেছ?

— হ্যাঁ।

— তোমার সঙ্গে আমার দু'একটা কথা আছে, একটু সময় দেবে?

— হ্যাঁ, বলো।

— চলো ওই রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে বসি।

ওরা দু'জনে গিয়ে বসলো। দু-একটা নয় প্রায় একঘন্টা ধরে তার অনেক কথা শুনতে হলো কাবেরীকে। বিল মিটিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার সময় কাবেরী বলল— তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও।

সে ঠিকানাটা লিখে দিল একটা কাগজে। কাগজটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো কাবেরী। তখন সে যেন অন্য মানুষ। কথাবার্তা কম। কিন্তু যখন যা করার নিঃশব্দে করে যাচ্ছে। বিয়ের দিন ক্রমে এগিয়ে আসছে। দু'পক্ষ মিলে অনুষ্ঠান হবে একটা। খাওয়া-দাওয়া একদিনে। প্রথমে কথা হয়েছিল, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হবে। সেই মতো প্রেসে দেওয়াও হয়েছিল। পরে সীমা বলল, থাক অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নিমন্ত্রিত তাতে আর চিঠির দরকার নেই। রাজীবের তখন সব সময় মেয়েটার কথা মনে হচ্ছে। এতদিনে কত বয়স হয়েছে মেয়েটার? বছর চার তো হবেই, কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে? পুরোহিত এসেছেন ফর্দ নিয়ে সীমা সব বুঝে নিচ্ছে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। রুদ্রপ্রসাদের ছুটি নেই, সীমাকেই সবকিছু সামলাতে হচ্ছে ক্যাটারিং, জুয়েলারি থেকে ক্যামেরা, ভিডিও পর্যন্ত। কাবেরীও তাকে যথেষ্ট সাহায্য করছে। দু'জনে চোস্ত হিন্দি বলতে পারে। ওরা যখন হিন্দি বলে তখন কে বলবে ওরা বাঙালি? দিন কয়েক একটু মনমরা থাকার পর কাবেরী আবার পুরোদমে কাজে লেগে পড়েছে। মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটিতেও যেতে হচ্ছে, যখন গাইড ডাকেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল পুরোহিত ডেকে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে, পরে ঠিক হলো পুরোহিতের দরকার নেই, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হলেই চলবে। রাজীব প্রথম থেকেই ধূমধাম আর আনুষ্ঠানিক বিয়ের বিরোধী ছিল। কিন্তু মামা-মামী চেয়েছিলেন একটু জাঁকজমক হোক। এবার তাঁরাও মেনে নিলেন। শেষপর্যন্ত বিয়ে বাড়িও বাতিল হলো। বিয়ে হবে সীমাদের ফ্ল্যাটে। বিয়ের অতিথি অভ্যাগতদের সংখ্যা পঁচিশ কিছুতেই ছাড়াবে না। রাজীব এলো একটা সাদামাটা অ্যাম্বেসাডারে, সঙ্গে মাত্র দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শেষপর্যন্ত পুরোহিত একজনকেও হাজির করানো হলো। মামাবাবু বললেন— দেখুন, ঠাকুরমশাই আমার ভাগ্নের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা টেকেনি। আমার মনে হয় সেইবার ঠাকুরমশাই ঠিক ঠিক মন্ত্রপাঠ করেননি, এইবার মন্ত্রটন্ত্রগুলো যেন সব ঠিক ঠিক হয়।

— আজ্ঞে, হবে হবে। আজ্ঞে আমি কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সংস্কৃত উচ্চারণ আমার ভুল হবে না। ধরুন, প্রায় হাজার দুই বিয়ে আমি দিয়েছি, কিন্তু একটাও ভাঙেনি। আমি তাহলে শুরু করি।

— করুন।

রুদ্রপ্রসাদ কন্যাকর্তা। সম্প্রদানও সেই করবে। বেশ ভালোভাবেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা চলছে। পঞ্চানন শর্মা সত্যি ভাল পণ্ডিত। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। এবার মেয়েকে নিয়ে আসুন। লাল বেনারসী পান দিয়ে মুখ ঢাকা কাবেরী এলো। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করলেন। এবার মুখচন্দ্রিকা।

সবাই চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, দু'জন মাথার ওপর একটা কাপড় টেনে ধরে আছে। কাবেরী ধীরে ধীরে মুখ থেকে পানটা সরালো। চমকে উঠল রাজীব, সভাস্থলে একটা গুঞ্জন উঠল। এ যে অপর্ণা। রাজীব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল— এসবের মানে কী?

— বছর পাঁচেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে আসে কাবেরী।

মানেটা আমি বলছি। আগে এই প্রেজেনটেশানটা নিয়ে নাও।

কাবেরী বাচ্চাটাকে রাজীবের কোলে তুলে দিয়ে বলল— আমি একদিন মহারাণী লছ্মীবাঈ শপিং কমপ্লেক্স থেকে শপিং করে ফিরছিলাম। হঠাৎ কাঁধে একটা হাত দিয়ে কে যেন ডাকল, ফিরে দেখলাম অপর্ণা বৌদি। আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ও আমাকে সব কথা খুলে বলল। ডিভোর্সের মাস কয়েকের মধ্যে সে বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে বেনারসে একটা অনাথ মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে আসে। মেয়েটাকে রেখেছে কানপুরের একটা স্কুলের বোর্ডিংয়ে। মাঝে মাঝে মেয়েকে দেখতে আসে। সেদিন মেয়ের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনতে ওই শপিং কমপ্লেক্সে এসেছিল। ও জানত, তুমি দিল্লিতে আছ। আর সব কথা শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিই, ওর ভাঙ্গা ঘরটা আবার নতুন করে সাজিয়ে দেব। বৌদির কাছে এসে সব কথা বললাম। বৌদি কলকাতায় মেসোমশায় মাসীমার সঙ্গে কথা বলল। মেসোমশায় বললেন, অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ওর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এবার ওকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার সময় এসেছে। কিন্তু আইনত তোমরা এখন আর স্বামী-স্ত্রী নও, আবার নতুন করে তোমাদের বিয়ে করতে হবে, তাই এই আয়োজনটা করতে হলো।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে অতিথিরা সবাই চলে যাওয়ার পর একটা ঘরে বসেছিল রাজীব, অপর্ণা, সীমা। ঈশিতা অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাবেরী ঈশিতাকে তুলে নিয়ে বলল— ও আজ আমার কাছেই শোবে। চলো বৌদি।

ঈশিতাকে কোলে তুলে নিয়ে সীমাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। কাবেরী যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল। রাজীব কোনও কথা বলল না। অপর্ণা হঠাৎ রাজীবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। রাজীব তাকে তুলে বসাল। তখন অপর্ণার চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। বলল— জানি আমি যে অপরাধ করেছি, তা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবুও মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

— কি হয়েছিল, তুমি হঠাৎ ও বাড়ি ছেড়ে চলে এলে কেন?

— তোমাদের ছেড়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম, কি সর্বনাশ আমি করেছি। আমার মেয়ের দুধ কেনার টাকাটাও কেউ দিতে চায় না। তারপর একদিন মেয়েটার খুব অসুখ করল, ডাক্তার ডাকা হলো, ডাক্তার অনেক ওষুধ, ইনজেকশান লিখে দিলেন। কিন্তু সেই ওষুধ কেনার টাকা আর কেউ দেয় না। অগত্যা বাজারের জুয়েলারি দোকানে আমার একটা আংটি বন্ধক রেখে ওষুধ কেনার টাকা যোগাড় করলাম। তার কিছুদিন পর ভায়েরা সব আলাদা হয়ে গেল। বাবা-মা পালা করে ভাইদের কাছে থাকবে। আমার ভার তো কেউ নেবে না। এক একবার ভেবেছি, ছুটে গিয়ে তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। হঠাৎ একটা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বেনারসের সেই স্কুলটায় একটা দরখাস্ত করি। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ওরা আমাকে দেখা করতে বলে। মেয়েকে নিয়ে চলে আসি সেই অজানা অচেনা জায়গায়। ভেবেছিলাম, যদি চাকরি না হয় তবে মেয়েটাকে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে নিজেকে শেষ করে দেব। এই মুখ আর কাউকে দেখাব না। কিন্তু ওখানে আমার চাকরিটা হয়ে গেল। ওরা যা মাইনে দেয়, দেখলাম তাতে মেয়েটাকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানো যাবে। আমার তো থাকা খাওয়ার খরচ কিছু নেই। মেয়েকে বোর্ডিংয়ে রেখে মন টিকত না, মাঝে মাঝে দেখতে আসতাম। হঠাৎ একদিন মেয়ের কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে শপিং কমপ্লেক্সে দেখা হলো কাবেরীর সঙ্গে। ও আমাকে ওখানে দেখে অবাক, ওকে সব কথা বললাম। ও আমার ঠিকানা নিয়ে এসেছিল। একদিন সীমাকে নিয়ে আমার স্কুলে গেল। আমাকে নিয়ে এল মেয়ের বোর্ডিংয়ে, আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। একদিন কলকাতায় ফোন করে মামা-মামীকে আমার সব কথা জানিয়েছিলাম। তারপর যা করার সব ওরাই করেছে, আমি শুধু তাদের নির্দেশ পালন করেছি।

❖ ❖ ❖

পরদিন সকালে রাজীবের ফোন বেজে উঠল। রাজীব ফোন তুলে দেখে জি এম-এর নম্বর।

— হ্যালো, গুড মর্নিং স্যার।

—মর্নিং, তোমার জন্য একটা গুড নিউজ আছে। আগে বলো তুমি কলকাতায় যেতে রাজি তো!

— হ্যাঁ, স্যার। এখন কলকাতায় যেতে আমার আর কোনও আপত্তি নেই।

— তাহলে শোন, কলকাতায় ডেপুটি ম্যানেজারের একটা পোস্ট খালি রয়েছে। কোম্পানি তোমাকে ওখানে চাইছে।

— থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আই অ্যাম ভেরি ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ।

পরদিন সন্ধ্যায় রাজীব, অপর্ণা, ঈশিতা, মামা, মামী কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। রাত ৯টায় ট্রেন। তৎকালে রিজার্ভেশান পাওয়া গেছে। রুদ্র, সীমা, কাবেরী ওদের কানপুর স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। ঈশিতা কিছুতেই কাবেরীকে ছাড়বে না, গলা জড়িয়ে ধরে আছে, কোল থেকে নামবেই না।

অপর্ণা কাবেরীর কানে কানে বলল, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে, আমরা একসঙ্গে থাকবো।

কাবেরী অপর্ণাকে চিমটি কাটে।

অপর্ণা অবার বলে— কথা দাও, তুমি আসবে তো?

— আসব।

ট্রেনের এনাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে। সাত নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন ঢুকলো। ওরা কম্পার্টমেন্ট খুঁজে নিয়ে উঠে পড়ল। কাবেরী উঠে ঈশিতাকে বাবা-মায়ের মাঝখানে বসিয়ে বলল— বাবা-মায়ের সঙ্গে যাও, শোনো, আমি এখান থেকে তোমার জন্য এত্তো খেলনা নিয়ে যাবো।

— ঠিক?

— ঠিক।

কাবেরী, রুদ্র আর সীমা নামতে নামতেই ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জানালার ধারে সিটে ওরাও হাত নাড়ছে। ধীরে ধীরে ওদের মুখ অস্পষ্ট হতে হতে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বৃত্তের বাইরে

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

ট্রেনটা রাইট টাইমেই ছিল।

বর্ধমান পর্যন্ত কোনও অসুবিধাই নেই, হাওড়া থেকে মেন আর কর্ড দু'দিকেরই লোকাল ট্রেন পাওয়া যায়, কিন্তু তারপরেই ব্রাঞ্চ লাইন ধরতে হয়।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে পেয়ে ঈশানী শুভ্রনীলকে প্রথমেই প্রশ্ন করেছিল— 'আরশিনগর, জেলা বর্ধমান। সেটা কোথায় গো?'

শুভ্রনীল তখন চেন্নাইতে, ওদের অ্যাড এজেন্সির কাজে। উত্তর না দিতে পেরে সে-ও পাল্টা প্রশ্ন করেছিল— 'মরেছে। সে আবার কোথায়?'

এদিকে চিঠি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই রিপোর্ট করতে হবে। নয়তো সার্ভিস কমিশনের রেকমেন্ডেশনের গুরুত্ব থাকবে না। এই চিঠিটা একটা প্রাথমিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আসল বা ফাইনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবে প্রিন্সিপাল, আরশিনগর কলেজ, জেলা বর্ধমান।

কিন্তু, সেটা কোথায়?

ফোনেই শুভ্রনীল বলেছিল— 'এই জন্যই বলেছিলাম, ওসব কলেজ-টলেজের জন্য অ্যাপ্লাই করো না। তার চেয়ে পি এইচ ডি-টা কমপ্লিট করো। কোথায় গ্রামে-গঞ্জে ছাগল চরাতে পাঠিয়ে দেবে। এখন বোঝ!'

ঈশানীর মুখ ভার হয়েছিল। যতই হোক, জীবনের প্রথম চাকরি। আর নীল কিনা এরকম হ্যাটা করছে!

— ঠিক আছে। তোমাকে খুঁজতে হবে না। আমিই খুঁজে নেব।

— এই দ্যাখো! চটে গেলে নাকি? আরে বাবা, তুমি আমি দু'জনেই কলকাতার, যাকে বলে, বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ। বেড়াতে যাওয়া ছাড়া হাওড়া ব্রিজের ওপারে পা রেখেছি কখনও?

— বকবক করো না তো! এখন জায়গাটা কিভাবে খুঁজে বার করা যায়, তাই ভাবো। হাতে আর মাত্র দিন চারেক টাইম আছে।

— ঠিক আছে। আমি তো কালই ফিরছি। ফ্লাইটে। একটু ওয়েট করো।

সার্ভিস কমিশনের চিঠিটার দিকে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঈশানী।

নীল কিছু খারাপ বলেনি। এ কোন অজ পাড়া গাঁয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা একটা কলেজ, যেখানে গিয়ে কি পড়াবে ঈশানী! যে নিজে আগাগোড়া লরেটোয় পড়েছে। লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকেও ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড! এক চান্সে কলেজ শিক্ষকতার জন্য বিশেষ পরীক্ষাতেও রেকর্ড নম্বর পেয়ে পাশ। ওর বন্ধু মানালি তো ওখানেই আটকে গেল। তারপর অবশ্য 'গোলি মারো' বলে দিল্লিতে ওর বাবা-মায়ের কাছে চলে গেল। বলল, আই এ এস-এর ট্রেনিং নেবে।

ঈশানীরও কি তাই করাই উচিত ছিল?

কিন্তু, মরে গেলেও যে নীলকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। যদিও ওদের লাভ ম্যারেজ নয়। কিন্তু তাতে কি? নীলকে যে বড্ড ভালবাসে। এতটাই, যে অ্যাড এজেন্সির কাজে নীলকে হিল্লি-দিল্লি করতে হলে তার খুব মন খারাপ করে। মাত্রই দেড় বছর বিয়ে হয়েছে ওদের। ঈশানী অবশ্য এ কথাটা কাউকে বলে না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও না। তাহলে সবাই হাসবে। বলবে— 'ব্যাকডেটেড'।

চিঠিটার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকতে থাকতে আরও একটা কথা মনে পড়ল ঈশানীর। সার্ভিস কমিশনের প্যানেলে তার নাম ছিল দুইয়ে। স্বচক্ষে দেখে এসেছে সে। অথচ, গত হপ্তায় গড়িয়াহাটের মোড়ে ওর সঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অলিভিয়ার দেখা হয়েছিল না? অনার্স পড়ার সময় একসঙ্গে টিউশন পড়ত ওরা। এখনও মোটামুটি একটা যোগাযোগ রয়ে গেছে। অলিভিয়া বলেছিল, ওর র‍্যাঙ্ক ফর্টি ফাইভ। মানে, পঁয়তাল্লিশ। অথচ ও কি করে কলকাতার কলেজে চান্স পেয়ে গেল?

যা বাব্বাঃ! এসব হচ্ছে কী?

রাতে নীলকে ফোন করতেই ও আবার হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। বলল— 'এরকমই তো হচ্ছে, সুইটি। কাগজ-টাগজ পড় না তো! খালি বৃটিশ কাউন্সিল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরি করে বেড়াচ্ছ।'

তা ঠিক।

লেখাপড়া ছাড়া সত্যিই কিছু জানে না ঈশানী। খুব মন দিয়ে পড়ে, ভাবে, তারপর লেখে। লিখতে লিখতে, কাগজে কলমেই হোক বা ওর নিজস্ব ল্যাপটপে, বারবার কাটে, যতক্ষণ পর্যন্ত না লেখা তার মনোমত হচ্ছে। টিউটোরিয়াল ক্লাসে ওর খাতা দেখে যাদবপুরের প্রোফেসর এস কে ডি বলেছিলেন— 'তোমার বয়েসে এরকম একটা আনসার আমি নিজেও বোধহয় লিখতে পারতাম না, ঈশানী।'

লেখাপড়া ছাড়া আর সে লেখে কবিতা। বাংলা ওর বড় একটা আসে না। ইংরাজিতেই লেখে। দু-চারটে প্রকাশিতও হয়েছে একটা ইংরিজি দৈনিকের রবিবাসরে।

আর বিয়ের পর যুক্ত হয়েছে নীল। নীলকে সে বড়ই ভালবাসে। কে জানে, বোধহয় অনেকটাই ওর বিপরীত চরিত্রের বলেই। ও একটা নামী অ্যাড কোম্পানির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। ভীষণ স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, চোখেমুখে কথা বলে। আসলে, ওদের কাজের জগৎটাই অন্যরকম। ঈশানীর সঙ্গে মিলবে না।

ঈশানীকে বলে— 'তোমার মতো গুডি গুডি টাইপের মেয়ের আজকের দিনে কিস্যু হবে না।'

ঈশানী শুনে রেগে যায়। বলে— 'শাট আপ্।'

নীল হ্যা-হ্যা করে হাসে। ওকে খুঁচিয়ে আনন্দ পায়। বলে— 'মডেল হবে নাকি আমাদের একটা অ্যাডে? তোমার যা কাটা কাটা ফেস্ আর চাবুক ফিগার।'

ঈশানী ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে থাকে।

নীল তবু দমে না। বলে— 'একমাত্র আমাদের জবেই কোনও পার্টিবাজি নেই, ম্যাডাম। কাজ দেখাতে না পারলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেবে। তোমার ড্যাড্‌কেই জিজ্ঞেস করে দেখো না? উনি তো নিজেই একটা কলেজের প্রিন্সিপাল। তাহলে কলেজ-টিচারের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে আমার সঙ্গে দিলেন কেন? ভালোই জানেন, কলেজ টিচার মানেই যত্ত অকর্মা, অপদার্থ গরু-ছাগলের দল। অন্তত, আমাদের এই স্টেটে।'

ঈশানী মুখ বাঁকিয়ে বলে— 'সাট্! কি ভাষা!'

নীল আবার হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে।

ও এখন এখানে নেই। চেন্নাইতে। তবুও রাতে একা শুয়েও যেন ওর সেই সবজান্তার হাসিটা শুনতে পাচ্ছিল ঈশানী। তবে কি ওই ঠিক? এত কাণ্ড করেও পোস্টিং সেই আরশিনগরে, জেলা বর্ধমান? জায়গাটাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ অলিভিয়া কলকাতার কলেজে!

পার্টিবাজি!

নীল মাঝে মাঝেই এটা বলে বটে। জিনিসটা ঠিক কি কোনওদিন তলিয়ে ভেবে দেখেনি ঈশানী। ওর স্কুল মানে লরেটো, কলেজ মানে লেডি ব্র্যাবোর্ন। দুটোই যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। শৈশব থেকে যৌবনের একুশটা বছর এরকম জায়গায় কাটালে ওসব কিছু বোধহয় বোঝাও যায় না। তার ওপর ঈশানী পড়ুয়া মেয়ে। পড়াশুনো ছাড়া কিছু জানে না। সেটাই তার গুণ, আবার

হয়তো সেটাই তার দোষ। যে বাস্তবকে চেনে না। যাদবপুরে পড়ার সময় অবশ্য স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ইলেকশনে সে ভোট-টোট দিয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ক্যান্টিনে বা অন্য কোথাও বন্ধুরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করলে ও হয় চুপ করে থাকত, নয়তো উঠে যেত সেখান থেকে। ... দূর! খালি ঝগড়া আর তর্কাতর্কি। মাঝেমাঝে হাতাহাতি, লাঠালাঠি পর্যন্ত। এসব ওর ভালো লাগে না।

ট্রেনে আরশিনগর আসতে আসতে জানালার ধারে বসে এইসব কথাই মনে আসছিল ঈশানীর। কলেজের খোঁজটা শেষপর্যন্ত বাবাই যোগাড় করেছিলেন। বাবার বন্ধু উৎপলকাকুকে ফোন করে। উনি এখন বর্ধমান ডিভিশনে পুলিশের খুব উঁচু পোস্টে কাজ করেন। সব শুনে নীল মাথা চুলকে বলেছিল, 'বাবা, এ তো বহুত দূর! গাড়িটা নিলে ভালো হয়।' তারপর অবশ্য বলেছিল— 'নাঃ, থাক। গেঁয়ো কলেজ তো। ওখানে সানগ্লাস আর হিল্ জুতো পরে গাড়ি থেকে নামলে সবাই তোমাকে দেখলে ভাববে, ফিল্ম স্টার।'

তা ঠিক।

জিন্স আর টপ্ সরিয়ে রেখে একটু সাদামাটা একটা সালোয়ার কামিজই পরে নিল ঈশানী। জুতোটাও পাল্টে নিল। একটু হিল অবশ্য আছে, তবে মারকাটারি কিছু নয়। এমনিতেই সে লম্বা। পাঁচ-চার। সানগ্লাসটা অবশ্য নিতেই হবে, নয়তো রোদে মাথা ধরবে। বেরোনোর আগে নীল বউকে একটু জরিপ করে নিয়ে বলল— 'মন্দ লাগছে না। মড্ ভাবটা একটু কমেছে। অবশ্য বয়কাট চুল, সিঁথিতে সিন্দুরও নেই, সতীলক্ষ্মী বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।... দ্যাখো, পার্টি কি বলে!'

ইশানী বলেছিল— 'এক থাপ্পড়।'... সব কথায় পার্টি-পার্টি করা নীলের একটা বদ অভ্যাস। কিসের পার্টি?

ট্রেনটা রাইট টাইমেই ছিল। কিছুদিন হল বর্ধমানের পর এই ব্রাঞ্চ লাইনেও ডি এম ইউ টাইপের লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে। কামরা থেকে নামার জন্য সিঁড়ি আছে। তাহলেও লাল মোরামের প্ল্যাটফর্মটা বেশ নিচুই। নীল হাত বাড়িয়ে ওকে নামানোর আগেই সিঁড়ি থেকে একটা লাফ দিল ইশানী। কিন্তু বুঝতে পারেনি প্ল্যাটফর্মটা এত নীচু। ভালোমতো একটা ঝাঁকানি লাগল শরীরে। অজান্তেই জিভ কাটল সে। বেশ কিছুদিন হল পিরিয়ড বন্ধ। নীলকে বলি বলি করেও বলা হয়নি। গড়বড় কিছু হয়ে বসেনি তো শরীরের মধ্যে?

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রিক্সার খোঁজ করতে গিয়ে শুনল, কলেজ এখান থেকে দেড় কিলোমিটার। সামনে বাসরাস্তা আছে বটে, কিন্তু বাস স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারে না। মোরামের রাস্তা, হাল ভালো নয়। রিক্সাও নেই। তবে ঠেলা-রিক্সা আছে। শেয়ারে গেলে দু-টাকা। নয়তো পাঁচ টাকা পার হেড। নীল পাঁচ টাকাতেই রাজি হয়ে ঠেলায় চড়ে বসল। পাশে ইশানী। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঠেলা চলেছে। দু'জনের মুখে কোনও কথা নেই। আসলে, দু'জনেই ভাবছে, এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা?

কলেজটা অবশ্য মোটামুটি বড়ই। দোতলা বিল্ডিং। পুরোটাই পাকা। ভেতরে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। তার ওপারে কিছু খুচরো বিল্ডিং।

প্রিন্সিপালের ঘর একতলায় দরজার সামনে গিয়ে নীল থমকে গেল। বলল— 'তুমি যাও। আমি আর যাব না।'

নেমপ্লেটটা দেখল ঈশানী। — রবিরঞ্জন মহাপাত্র। এম এস সি, পি এইচ ডি।

অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকে ঈশানী বলল— 'গুড ডে, স্যার। আয়াম ইশানী দত্তরায়। ফ্রম ক্যালকাটা।'

কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। রঙ বেশ কালো। পরনে একটা চেক হাফ শার্ট।

—ও, আচ্ছা, বসুন। সার্ভিস কমিশনের চিঠির কপি আমিও পেয়েছি। তা কি ঠিক করলেন?

— মানে, স্যার?

— থাকেন তো কলকাতা। এত দূরে চাকরি করবেন? নাকি মাঝে মাঝেই ছুটি নিয়ে হাওয়া হবেন?

...এ আবার কি ধরনের কথাবার্তা!

ইশানী অবশ্য নম্রভাবেই বলল— 'এই আমার প্রথম চাকরি। ছাড়তে চাই না, স্যার। ঘন্টা চারেকের পথ। যাতায়াত করব।'

— কিছু মনে করবেন না। আপনি কি খুব নিডি?

— মানে?

— মানে, বাড়িতে বেকার ভাই, দু দুটো বোন...

— না, না। আমি একই মেয়ে। আমার কোনও ভাইবোন নেই। বাবাও একটা কলেজের প্রিন্সিপাল।

— ঠিক আছে, বুঝলাম। তাহলে আর এতদূরে চাকরি করতে এলেনই বা কেন? আপনি কি ম্যারেড?

— ইয়েস স্যার।

— দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। লাভ-ম্যারেজ করেছেন? হাজব্যান্ড বেকার?

... ছিঃ ছিঃ এসব কি কথাবার্তা! ঈশানীর কান মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল।

কোনওক্রমে বলল— 'নো, স্যার।'

— শুনুন, যাতায়াত করে আমার এই কলেজে চাকরি করা যাবে না। মানে, আমি অ্যালাউ করব না। দশটার ক্লাসে দশটাতেই ঢুকতে হবে। বড় ক্লাস, নয়তো গোলমাল হবে।

জলতেষ্টা পাচ্ছিল ঈশানীর। ঢোঁক গিলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে বলল— 'ঠিক আছে, স্যার। হাওড়া থেকে ছটা দশের এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরে...

— নো, নো, নো, নো!

প্রিন্সিপালের স্বরের রুক্ষতায় চমকে উঠল ঈশানী।

— আমার এখানে চাকরি করতে হলে আমাদের লেডিজ

হস্টেল আছে, সেখানে থাকতে হবে। সোম থেকে শুক্র থাকবেন, স্যাটারডে অফ ডে। কলকাতা যেতে চান যাবেন, আবার ফিরে আসবেন সানডে নাইটে।

সর্বনাশ! লোকটা বলে কী?

এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে! পি এইচ ডি-র কাজ তো মাথায় উঠবে। তাছাড়া নীলকে ছেড়েই বা ও থাকবে কিভাবে? অন্যদিকে যতই হোক, জীবনের প্রথম চাকরি।

তাছাড়া, লোকটা যেন কেমন একটু ভয় দেখাচ্ছে। যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে। যেন, চাকরিটা না নিলেই সে খুশি হয়। চিরকালের পড়ুয়া গুডি গুডি মেয়ে ঈশানীর মনেও যেন একটা জেদ চাপছে। ... ঠিক আছে, না পোষালে ছ'মাস পরে সে ছেড়েই দেবে। কিন্তু এখনই এই লোকটাকে সে খুশি করতে পারবে না।

গা-ঝাড়া দিয়ে ইশানী বলল— ওকে স্যার। আমি জয়েন করব।'

লোকটা দৃশ্যতই বিরক্ত হল। টংটং করে ঘন্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বলল— 'শৈলেনবাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

গুডি গুডি মেয়ে ঈশানীর ঠোঁটেও তখন মুচকি হাসি। কেমন জব্দ!

শৈলেনবাবু লোকটি মধ্যবয়স্ক। মাথায় চুল কম। ধুতি-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির পকেটে চশমা।

উনি ঘরে ঢুকতেই প্রিন্সিপাল বললেন— 'আপনার স্টাফ এসে গিয়েছে। ওকে স্টাফরুমে নিয়ে যান। ঈশানী দত্তরায়। খাস কলকাতা। ম্যাডাম, এটা আপনার জয়েনিং রিপোর্ট। সই করে দিন। দশ মিনিট ওয়েট করুন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিচ্ছি।'

ঘরের বাইরে এসে শৈলেনবাবু বললেন— 'তুমি কোরেই বলছি। আশাকরি, কিছু মনে করবে না। তুমি আমার মেয়ের বয়সী।'

— না, না। বলুন।

— লোকটা তোমাকে এককথায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিল?

ঈশানী মাথা নাড়ল— না।

— তাহলে?

— এখানে থাকতে হবে বলে জোর করছিলেন।

— ঠিকই ধরেছি। এসব বলে ও অলরেডি দুটো ক্যান্ডিডেটকে তাড়িয়েছে। তোমাকেও ট্রাই করেছিল। পারল না। তুমি দেখছি খুব সাহসী মেয়ে।

ঈশানী হেসে ফেলল। বলল— 'মোটেই না। কখনও কলকাতার বাইরে পা রাখিনি। কিছুই জানি না, চিনি না।

— আস্তে আস্তে সবই চিনবে, জানবে। তোমার হাসিটাই বলে দিচ্ছে, তুমি এখনও খুব ইনোসেন্ট।

— আচ্ছা, উনি এরকম করেন কেন?

— কেন আবার! এই পোস্টে ওঁর দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নিকে ঢোকাতে চাইছেন। এই নিয়ে সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে ওর গোলমালও হয়েছে। লাস্ট ট্রাই হিসাবে কমিশন তোমাকে পাঠিয়েছে। তুমি পালিয়ে গেলে কমিশনও ওকে আর ঘাঁটাত না। এখানকার পার্টি থেকেও ও ব্যাপারটা পাশ করিয়ে রেখেছে।

— পার্টি!

ঈশানীর শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। আবারও সেই পার্টি!

শৈলেনবাবু বললেন— 'এখানে পার্টিই সব। ক্রমে বুঝবে। তবে আমি ভাবছি, কলকাতার মেয়ে হয়ে তুমি এখানে থাকবে কিভাবে?

— কেন? ওই যে উনি বললেন লেডিজ হস্টেল...

— এখানে দিনের আঠারো ঘন্টাই কারেন্ট থাকে না। কলেজ জেনারেটরে চলে। তার ওপর লো ভোল্টেজ। ইয়াং মেয়ে তুমি, পি এইচ ডি করো নিশ্চয়ই? পড়াশুনো করবে কি করে?

ঈশানী আবারও ঢোঁক গিলল। জেদের বশে ভুলই কি করে ফেলল সে?

— ওই ছেলেটি কে? দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে আছে? তোমার বয়ফ্রেন্ড?

— না, হাজব্যান্ড।

— একটু কনসাল্ট করে নিলে পারতে। যাকগে... ফিরবে কি করে?

— কেন, ওই ঠেলা রিক্সায় চেপে...

— পাগল নাকি? ওইভাবে কেউ যাতায়াত করতে পারে? বিশেষত কলকাতার লোক। এক কাজ করো, সামনে বড় রাস্তা থেকে বাস ধরে সোজা চলে যাও আরশিনগরের আগের স্টেশন বাতাসী-মঞ্জিল। ওখান থেকে ট্রেন ধরে নেবে। ওখানে বাস রাস্তা থেকে স্টেশন পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গিয়েছিল। হাতে নিয়ে ঈশানী বলল— 'তাহলে আজ আসি? .. আজ তো ফ্রাইডে, মনডে থেকে...

— এসো। কলেজের পাশেই আমার বাড়ি। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তুমি প্রথম দিনটা আমার ওখানেই থেকো।

ঈশানী একটু হেসে বলল— 'থ্যাংকস্।'

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে সব শুনে নীল অবশ্য বউকে শুধু মারতে বাকি রাখল। বলল— 'ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এটা একটা কলেজ? আর এই প্রিন্সিপাল! কি পড়াবে তুমি এখানে? এর চেয়ে কলেজের দীঘিতে জাল ফেলে মাছ ধরা প্র্যাকটিস করো।'

বাস এল মিনিট দশেক পরে। দাঁড়াল আবার একটু দূরে। নীল ছুটল বাস ধরতে, ঈশানীও ছুটতে যাবে, হঠাৎ রাস্তার পশের একটা আটচালা থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল— 'দিদি, শুনুন।'

ঈশানী বলল— 'কিন্তু, বাসটা....'

— ও যাবে না। আমি হাত দেখিয়েছি।

— আপনি...?

— অনাদি মৌলিক। এই কলেজের ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমিই টাইপ করেছি।

— ও, আচ্ছা।

— সোমবার থেকে শাড়ি পরে আসবেন।

ঈশানীর মাথাটা চট্ করে গরম হয়ে গেল। ক্লার্ক হয়ে লোকটা টিচারকে ফরমান দিচ্ছে!

— কেন?

— এখানে একটা ড্রেস-কোড আছে। শাড়ি ছাড়া কিছু চলে না। যান... বাসটা হর্ন দিচ্ছে।

বাসে জগদ্দল ভিড়। ছাদে লোক, ভেতরেও ঠাসাঠাসি। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তবু তারই মধ্যে নীল জিজ্ঞেস করল— 'লোকটা কে?। কি বলছিল?'

মাথা নাড়ল ঈশানী— 'কিছু না।'

মিনিট পনের ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতির পর বাস এসে দাঁড়াল বাতাসী-মঞ্জিল স্টেশনের কাছে। ধস্তাধস্তি করে কোনওক্রমে নামা।

নেমেই বাড়িতে ফোন করার জন্য ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল ঈশানী। ... কিন্তু, একি?

আর্তনাদ করে উঠল ঈশানী। — 'আমার মোবাইল?'

নীল এসে ব্যাগটা নেড়েচেড়ে ঈশানীকে দেখাল। একটা সাইড কাটা। ভিড় বাসে কেউ ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে।

।।২।।

সকাল ছ'টায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিজেই এক কাপ লিকার চা বানিয়ে বাইরের ব্যালকনিটায় এসে বসেন শুভাশিস। একটু পরে কাগজ এসে যায়। কাগজটা পড়েন সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। তারপরই শুরু হয়ে যায় ব্যস্ততা। স্নানাহার সেরে সাড়ে ন'টার মধ্যে অফিস। বিশেষ কোনও কাজ থাকলে আরও আধঘন্টা আগে। ফেরার কোনও ঠিক থাকে না। কমের দিকে আটটা, বেশির দিকে আরও ঘন্টাখানেক পর।

গড়িয়াহাটা মোড় পেরিয়ে বিজনসেতুর ওপারেই শিসমহল অ্যাপার্টমেন্ট। দশতলা। এখানেই পাঁচতলায় শুভাশিসের ফ্ল্যাট। তবে একটা নয়, দুটো। পাঁচতলাতেই ঠিক মুখোমুখি। দুটোই ন'শো স্কোয়ার ফিটের। এই দ্বিতীয় ফ্ল্যাটটা নিয়ে মধুশ্রীর সঙ্গে একটু মন কষাকষি হয়েছিল শুভাশিসের। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরেননি শুভাশিস।

প্রায় বছর দশেক হতে চলল। নীল তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তখনও ওই অঞ্চলে দু-দুটো ফ্ল্যাট ধরে নেওয়া খুব সহজ ছিল না। ব্যাঙ্কের চাকরি বলেই পেরেছেন। লোন, ইন্টারেস্ট অনেক কম। তাছাড়া তখন তিনি চৌরঙ্গী ব্রাঞ্চে লোন সেকশনের ইনচার্জ ছিলেন। প্রোমোটার যশবীর সিংকে লোন পাওয়ার ব্যাপারে কিছু সুবিধা করে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে যশবীরও ওঁর জন্য স্কোয়ার ফুট রেট কিছু কমিয়ে দেয়।

চাকরির আর দু-বছর বাকি। দু-বছর হল শুভাশিস লেক রোড ব্রাঞ্চের সিনিয়র ম্যানেজার। মাইনেও যেমন, দায়িত্বও অনেক। এই ব্রাঞ্চে যিনি ম্যানেজার ছিলেন, জগজ্জ্যোতি মজুমদার, প্রেসার আর সুগারের রুগী হয়ে তো চাকরিই ছেড়ে দিলেন। শুভাশিসের সার্ভিস রেকর্ড বরাবরই ভালো। কর্তৃপক্ষ ওঁকেই প্রোমোশন দিয়ে এই ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিলে। জগজ্জ্যোতি দুম্ করে ছেড়ে দেওয়ায় ব্রাঞ্চটা ডুবতে বসেছিল।

এই দু-বছরে ব্রাঞ্চের হাল ফিরিয়ে দিয়েছেন শুভাশিস। যা বুঝেছেন, চাকরির আরও দু'বছর তাঁকে আর বোধহয় কোথাও পাঠাবে না কর্তৃপক্ষ। এই আটান্নতেও শুভাশিস যথেষ্ট হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, কথাবার্তায় চৌখস। এই সব ক'টা গুণই নীল পেয়েছে। শুভাশিস চেয়েছিলেন, ছেলে অধ্যাপক হোক। শুভাশিসের বাবা ছিলেন হেডমাস্টার। শুভাশিস নিজেও কিছুদিন কলেজে পড়িয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্রই বাইশ। বছরখানেক পর ছেড়ে দেন। কলেজের চাকরিতে তখনও মাইনে কম, তার ওপর অনিয়মিত।

নিজের পেশায় শুভাশিস ষোল আনার ওপর আঠারো আনা সফল। তবুও তাঁর মনে একটা আফশোস থেকে গিয়েছে। শিক্ষকতার সঙ্গে কি কোনও পেশার তুলনা হয়? নিজের বাবাকে দেখেছেন। আগাপাস্তলা সৎ, নির্লোভি, আদর্শবান একজন মানুষ। এখনও বাবার কোনও ছাত্র শুভাশিসকে চিনতে পারলে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে— 'আপনি আমাদের হেডস্যার অবিনাশবাবুর ছেলে!'

নীলকে দিয়ে সেই আশা মেটানোর চেষ্টা করেছিলেন শুভাশিস। মেটেনি। কিন্তু সেই আশা মেটার সম্ভাবনা একটু অন্যভাবে আছে বুঝতে পেরে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি শুভাশিস। গত দু-বছরে লেক রোড ব্রাঞ্চের অনেক লাভ করিয়েছেন শুভাশিস। কিন্তু এই ব্রাঞ্চে এসে তাঁর নিজের একটা খুব বড় লাভ হয়েছে। ... ঈশানী। অমন মেয়ে হয় না। যেদিন ওকে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিনই শুভাশিসের মনে হয়েছিল, তাঁর কিঞ্চিৎ বেপরোয়া, উদ্দাম ছেলেটির জন্য এরকম শান্ত, ভদ্র, শিক্ষিত মেয়েই তাঁর চাই।

মধুশ্রী এসে পাশের চেয়ারটায় বসলেন। হাল্কা রাত-পোশাক, চুল কিছুটা এলোমেলো। একটা হাই তুলে বললেন— 'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। রাতে ঘুমটাও ভালো হল না।'

স্ত্রীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শুভাশিস বললেন— 'জ্বরটর হয়নি তো?'

কিঞ্চিৎ উদাসীন মুখে মধুশ্রী বললেন— 'জ্বর হলেই বা কি করা আছে? রান্নাঘরে তো সেই ঢুকতেই হবে।'

শুভাশিস চুপ করে রইলেন। ইঙ্গিতটা ধরতে তাঁর অসুবিধা হল না। দেড় বছর ধরে এরকমই দেখছেন। ঈশানীকে মেনে নিতে পারেননি মধুশ্রী।

এটা বোধহয় শাশুড়ি আর বউমাদের চিরকালীন সমস্যা। শুভাশিসের মা ছিলেন খুবই নিরীহ প্রকৃতির মহিলা। তবুও মধুশ্রী প্রায় কোনওদিনই ঘর করেনি তাঁর সঙ্গে। বদলির চাকরিতে শুভাশিসের সঙ্গে ঘুরেই বেড়িয়েছেন। মা বরাবরই থাকতে বাধ্য হয়েছেন ছোট ভাইয়ের কাছে। কলকাতায় যতদিনে থিতু হয়েছেন শুভাশিস, ততদিনে মা প্রয়াত।

এইজন্যই এই অ্যাপার্টমেন্টে একটা নয়, দুটো ফ্ল্যাট ধরেছিলেন শুভাশিস। ছেলে-বউ আলাদাই থাকুক। কিন্তু কি আশ্চর্য! চিরকাল স্বামীর সঙ্গে আলাদা থাকলেও নিজের ছেলেবউয়ের আলাদা থাকার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি মধুশ্রী। বরাবরই বলেছেন— 'খামোকা পয়সা নষ্ট।' এখনও যে ছেলের ফ্ল্যাটের লোন শুভাশিসই শোধ করে চলেছে, সেটাও পছন্দ নয় মধুশ্রীর। বলেছেন— 'এসব তোমার আস্কারা।'

নীল অবশ্য ব্যাপারটাতে কোনওদিন মাথা গলায়নি। —'দিচ্ছ, দাও'— এরকমই ছিল ওর মনোভাব। কিন্তু ঈশানী নাকি জানতে পেরে নীলকে বলেছিল— 'তোমার লজ্জা করে না? এখনও আঙ্কেলের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছ!'

পুরনো অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি ঈশানী। এখনও শুভাশিসকে আঙ্কেলই বলে।

সারা জীবনে মাত্রই দু'বার স্ত্রীর অবাধ্য হয়েছেন শুভাশিস। ছেলে-বউয়ের জন্য আলাদা ফ্ল্যাট কেনা আর ঈশানীকে পুত্রবধূ করে আনা। দুটোই অবশ্য খুবই মারাত্মক অবাধ্যতা। দুটোর কোনওটার জন্যই স্বামীকে ক্ষমা করেন না মধুশ্রী।

ফাঁক পেলেই ঈশানীর নিন্দেমন্দ করেন। বলেন— 'ঘরদোরের কি ছিরি! এত সুন্দর একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে, সাজিয়েও রাখতে জানে না। কিস্‌সু শেখায়নি বাবা-মা। এক মেয়ে, শুধু পড়াশুনো করেছে। বাচ্চাকাচ্চা হলে সামলাবে কি করে? পারে শুধু ল্যাপটপ ঘাঁটতে আর মোবাইল কানে গুঁজে ইংরিজিতে ফটর ফটর করতে। রান্না যা করে, অখাদ্য! মুখে তোলা যায় না।'

শুভাশিস চুপ করে শুনে যান। শুধু একটা জিনিস বোঝেন, স্ত্রীর সব অভিযোগ মিথ্যে না হলেও ওরা দুজনে কিন্তু খুব হ্যাপি। সবার সব গুণ থাকে না। তবুও শুভাশিসের চোখ ভুল করেনি। মধুশ্রী যতই বলুন, সারাদিন ঘরের মধ্যে বারমুডা আর টপ্ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বউ বলে মনেই হয় না।' কিংবা 'কাজ আর কি, আমি এখনও হাঁড়ি ঠেলছি, আর উনি শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছেন।' শুভাশিসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তাঁর কিঞ্চিৎ বেপরোয়া, উদ্দাম ছেলেটিকে এই মেয়ে বেঁধে ফেলেছে। বাবা হয়ে শুভাশিস এটা বোঝেন, আর মা হয়ে মধুশ্রী বোঝেন না? খুব বোঝেন! আর যত বোঝেন, ততই ক্ষেপে যান।

ঈশানীর বাবা-মা, সোমনাথ আর অলকানন্দাকে আগে থেকেই চিনতেন শুভাশিস। লেক রোড ব্রাঞ্চে আসার পরই ওঁদের সঙ্গে আলাপ। ওঁরা বলতেন— 'আপনি আগের ম্যানেজারদের মতো নন। ওঁদের সঙ্গে তো কথা বলা যেত না।' শুভাশিস শুনে হাসতেন। বলতেন— 'আমার চেম্বার সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। তার ওপর সোমনাথবাবু একটা কলেজের প্রিন্সিপাল। আমার বাবাও হেডমাস্টার ছিলেন। আপনাকে দেখলে আমার বাবার কথা মনে পড়ে।' সোমনাথ ওঁর ঘরে ঢুকলে উঠে দাঁড়াতেন শুভাশিস। অলকানন্দা হাসতেন। বলতেন— 'আপনি যে কি করেন না! আপনি ওঁর ছাত্র?'

ঈশানী ইংলিশে এম এ পাশ করার পর ওকে নিয়ে এসেছিলেন ওর মা। জিন্‌স-টপ্ পরা, ববকাট চুল, এক নজরে দেখে মনে হবে মড্ টাইপের মেয়ে। কিন্তু কথা শুরু করে বুঝতে পেরেছিলেন শুভাশিস, মেয়েটি অন্যরকম। ও তখন স্টেট্‌সে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ওখানে পি এইচ ডি করবে। এডুকেশনাল লোনের ব্যাপারে খোঁজ করতে এসেছিল। ইচ্ছে করেই অলকানন্দা, অর্থাৎ ওর মাকে শুভাশিস বলেছিলেন— 'যা যা পেপার্স বললাম, সেসব নিয়ে মেয়েকে একাই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তবে চারটের পর। তখনই আমি একটু ফ্রি থাকি।'

এভাবেই শুরু। প্রথম প্রথম ঈশানী ওঁকে স্যার বলত। শুভাশিস নিজেই বলেছিলেন— 'তোমাদের বয়সী মেয়েরা অনেকেই আমাকে আঙ্কেল বলে। এই তো, দুটো মেয়ে বাইক-লোন নিয়ে চলে গেল। তুমিও আমাকে আঙ্কেলই বোলো।'

চারটের পরেই আসত ঈশানী। আর ওকে বসিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুভাশিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন ওদের পারিবারিক ইতিহাস।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওদের পৈতৃক বাড়ি। দাদুর করা। উনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের নাম করা প্রোফেসর। অনেক বইপত্র লিখেছেন, বিদেশেও গিয়েছেন বহুবার। ঠাকুমা সেই আমলেও সংস্কৃতের এম এ। ওর কাকা স্টেট্‌সের ইয়েন ইয়েন ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের প্রোফেসর। কাকিমা বিদেশিনী। মা অলকানন্দা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিকে পি এইচ ডি। ঈশানীর নিজেরও চোখধাঁধানো রেজাল্ট। কিন্তু এতটুকু গর্ব নেই, সরল, আন্তরিক ব্যবহার।

নিজের ছেলেকে এই মেয়ের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করেছেন শুভাশিস। উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট ভালোই, কিন্তু তারপর ইকনমিক্সে অনার্স পড়তে পড়তে কলেজই ছেড়ে দিল সে। ওসব নাকি ওর ভালো লাগে না। খালি নোট মুখস্থ করা আর উগ্‌রে দেওয়া। পাতি সিস্টেম। কলেজের মধ্যে পার্টিবাজি, দুর্নীতি, টিচাররা অর্ধেকের ওপর হয় ফাঁকিবাজ নয় অপদার্থ।

হেডমাস্টারের ছেলে হয়ে এসব শুনতে ভালো লাগত না শুভাশিসের। কিন্তু নীল বেপরোয়া। ছোটবেলা থেকেই ভালো

ছবি আঁকত, হাতের কাজও জানত ভালো। চলে গেল আর্ট কলেজে। সেখান থেকে অবশ্য দারুণ রেজাল্ট নিয়ে পাশ করে বেরোনোর পরেই চাকরি পেয়ে গেল বিখ্যাত অ্যাড কোম্পানি টোয়াইনাইটে। তখন ওর বয়স চব্বিশ। চার বছর যেতে না যেতেই এখন ওই কোম্পানির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর।

ভালোই, তবে অন্যরকম জীবন। খুব কম্পিটিশান, টেনশান, তার সঙ্গেই আছে কমবেশি মদ্যপান, পার্টি, সুন্দরী মডেলদের সঙ্গে ওঠাবসা, ঘনিষ্ঠতা। এ ছেলেকে বাঁধবে, এমন মেয়ে কোথায়? ঈশানীও তো স্টেটসে যাওয়ার তোড়জোড় করছে, ওর কাকা আছেন ওখানে, লোনের কাগজপত্রও রেডি হয়ে আসছে, তাহলে?

হঠাৎই সেইসময় একদিন ঈশানীকে নিয়ে অলকানন্দা শুভাশিসের ঘরে এসে বললেন— 'আপনাকে একটা দারুণ খবর দিতে এলাম।'

— বলুন, বলুন। কি ব্যাপার?

অলকানন্দা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'আঙ্কেলকে বলো।'

ঈশানী একটু হেসে বলল— 'আমি যাদবপুরেই পি এইচ ডি-র চান্স পেয়ে গেছি।'

— তাহলে তোমার বিদেশে যাওয়া?

অলকানন্দা বললেন— 'আপাতত না। এখানেই পি এইচ ডি করুক, বিয়েটিয়েরও ব্যবস্থা করি, কি বলেন?'

শুভাশিস সংক্ষেপে বলেছিলেন— 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

ওঠার সময় অলকানন্দা মিষ্টির একটা বাক্স এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— 'এটা নিতে হবে কিন্তু।'

— এ আবার কি! কিছুই তো করলাম না।

— তা বললে হবে? মেয়ে তো আঙ্কেল বলতে অজ্ঞান!

— সে ওর ছেলেমানুষি। আসুন না একদিন আমার বাড়িতে, সোমনাথবাবুকে নিয়ে। আপনাদেরও মিষ্টি পাওনা রইল।

অলকানন্দা রাজি হয়েছিলেন। পরের রবিবারে আসবেন।

সেই ফাঁকে মধুশ্রীর কাছে কথাটা পেড়েছিলেন শুভাশিস। জানতে চেয়েছিলেন, ছেলের কি কোনও নিজের পছন্দ আছে! মধুশ্রী বলেছিলেন — 'তার আমি কি জানি। আলাদা ফ্ল্যাট দিয়ে ছেলেকে তো তুমি আলাদাই করে দিয়েছ।'

খোঁচাটা হজম করেও স্ত্রীর কাছে নিজের ইচ্ছেটা প্রকাশ করেছিলেন শুভাশিস। পরে একদিন স্ত্রীকে নিয়েও গিয়েছিলেন ঈশানীদের বাড়ি। ফেরার পথে জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'কেমন লাগল মেয়েটিকে?'

মধুশ্রী এককথায় স্বামীর পছন্দকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন— 'কাঠ কাঠ চেহারার পড়ুয়া মেয়ে। বাবুনের বউ হবে ভাবাই যায় না। বাবুন কত হ্যান্ডসাম।'

তবুও হাল ছাড়েননি শুভাশিস। একটু কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। বলেছিলেন— 'ঠিক আছে, ওঁদের কাছে প্রস্তাবটা তো পেশ করি। ওঁদের যদি আপত্তি না থাকে, বাবুন মেয়েটির সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করুক। তারপর ওরও যদি ইচ্ছে না হয়...

এই প্রস্তাবটায় অবশ্য না করেননি মধুশ্রী। সম্ভবত ওঁর মনে আশা ছিল, গ্ল্যামারের দুনিয়ায় অনেক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ছেলের ওরকম স্কলার মেয়েকে কখনোই পছন্দ হবে না।

বাস্তবে হয়েছিল ঠিক উল্টো।

মাস দুই যেতে না যেতেই মধুশ্রী একদিন খুব ঠাণ্ডা গলায় স্বামীকে জানালেন— 'তোমার ছেলে তো ওই ঈশানী না কি যেন নাম, ওকেই বিয়ে করতে চাইছে।'

শুভাশিস কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। স্ত্রী যে খুশি হয়নি, সেটা বুঝতেই পেরেছিলেন। সংক্ষেপেই বলেছিলেন— 'ঠিক আছে, তাহলে....'

দেড় বছর হল ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা সুখী, কিন্তু এই বিয়েকে কেন্দ্র করে শুভাশিসের সঙ্গে মধুশ্রীর একটা চাপা মন কষাকষি থেকেই গিয়েছে।

প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। উঠেই পড়লেন শুভাশিস ব্যালকনি থেকে। স্নান করে তৈরি হতে হবে। মধুশ্রীর শরীরটা যখন ভালো নেই, তখন আজকের লাঞ্চটা না হয় তিনি ব্যাঙ্কের ক্যান্টিনেই সেরে নেবেন।

দাড়ি কামিয়ে সাওয়ারটা খুলতে যাবে, হঠাৎই ডোরবেলটা বেজে উঠল তারস্বরে।

কে এল? ... বাবুনের গলা না? কি ব্যাপার?

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন শুভাশিস। মধুশ্রী সাতসকালে ছেলেকে দেখে বললেন— 'কি ব্যাপার?'

— সানু কেমন রেস্টলেস হয়ে পড়েছে।

— সে কি রে! কি হয়েছে?

— বমি করছে বারবার।

শুভাশিস ব্যস্ত হয়ে বললেন— 'কতক্ষণ এমন হয়েছে? ডাকিসনি কেন আমাদের?'

— ও বারণ করেছিল।

— চুপ কর। তোর একটা কোনও সেন্স নেই? বললাম, অত দূরের রাস্তা, গাড়িটা নিয়ে যা, গেলি না। ফেরার পথে মোবাইল টোবাইল হারিয়ে মেয়েটা কেঁদেকেটে একসা'... গজগজ করতে করতে ছেলের ফ্ল্যাটে এসে ঢোকেন শুভাশিস। পেছনে মধুশ্রী।

বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে ঈশানী। শুভাশিস কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে ডাকলেন— ' কি হয়েছে, মাদার?'

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য! ফিক করে একটু হাসল ঈশানী। বলল— 'কিছু না আঙ্কেল। তুমি স্নান করে অফিসে যাও।'

— তা বললে হয়? ডাক্তার মিত্রকে খবর দিই।

ফোন করে ডাক্তারকে খবর দিয়ে স্নান সেরে একটু ব্রেকফাস্ট করেই অফিসে বেরিয়ে গেলেন শুভাশিস। লাঞ্চটা আজ অফিসেই করে নেবেন।

লাঞ্চের সময় ঈশানীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন—

'এখন কেমন আছো, মাদার?'

— ও কে। বিলকুল ও কে। তুমি কখন আসছ, আঙ্কেল?

— আটটা হবে। কিছু খাবি, খেতে কিছু ইচ্ছে করছে?'

ঈশানী আদুরে গলায় বলল, 'হুঁ'।

— কি খাবি, বল? নিয়ে যাব তোর জন্য।

—বলব?... না, এখন থাক। তুমি আগে বাড়ি এসো।

—পাগলি মেয়ে!

এবারে স্ত্রীকে একটা ফোন করলেন শুভাশিস। আগের ফোনের কথাটা চেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— 'ডাক্তার মিত্র এসেছিলেন?'

মধুশ্রী গম্ভীর গলায় বললেন— 'হুঁ।'

— কি বললেন?

— কিসব টেস্ট-ফেস্ট করাতে হবে।

— সে কি! কেন?

— কেন আবার? বাচ্চা হবে তোমার বউমার। সকালে ফিক ফিক হাসি দেখেই বুঝেছি।

হাত থেকে মোবাইল সেটটা আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল শুভাশিসের।

।।তিন।।

নিজের ঘরে বসে কাজ করতে করতে মাঝেমাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন সোমনাথ।

ভাবেন, সমাজে এখনও মাস্টারমশাই বলে যে সম্মান ওঁদের দেখানো হয়, সত্যিই কি ওঁরা তার যোগ্য?

দু-বছর হল তিনি এই রাধানগর কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছেন। আর পাঁচ বছর চাকরি আছে। এর আগে প্রায় আঠাশ বছর চাকরি করেছেন কলকাতারই একটা কলেজে। সেখানকার অনাচার দেখতে দেখতে দমবন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর। বেঁচে গেছেন এই রাধানগর কলেজে এসে।

জায়গাটা কলকাতার একটু বাইরে। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে এক ঘন্টার জার্নি। সব মিলিয়ে যেতে আসতে দু'ঘন্টা করে মোটামুটি ঘন্টা চারেক লাগে। তবুও বেঁচে গেছেন এখানে এসে।

জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। স্থানীয় লোকেরা বলে, রমেনবাবুর কলেজ। পুরো নাম রমেন্দ্রমোহন চৌধুরী। ওঁর পূর্বপুরুষ রাধামোহন চৌধুরীর নামেই জায়গার নাম রাধানগর। ওঁরা এখানকার রাজ পরিবার। বলা বাহুল্য, রাজত্ব এখন নেই, তবে কলকাতার বিভিন্ন ব্যবসার দৌলতে বিষয় সম্পত্তি এখনও কিছু কম নয়। তার সঙ্গে আছে দাপট। সেই দাপটের কাছে ম্লান হয়ে

গিয়েছে আজকের সমাজের অন্যতম একটি শক্তি। যার নাম পার্টি।

কলেজটা হয়েছে বছর দশেক হল। রমেনবাবুরই করা গার্লস কলেজ। খুব বড় নয়। সাত আটটি বিভাগ আছে। সায়েন্স নেই। শুধুই আর্টস। তবে প্রত্যেকটাতেই অনার্স পড়ানো হয়। রমেনবাবুই এই কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। বয়স এখন প্রায় আশি। ছ'ফুট লম্বা, এখনও মজবুত স্বাস্থ্য। দীক্ষা নেননি, তবে স্বামী বিবেকানন্দের খুব ভক্ত। ওঁর সঙ্গে সবসময় দুটি জিনিস থাকে। একটি স্বামীজীর ছবি। সেটা থাকে তাঁর বুকপকেটে, মানিব্যাগের মধ্যে। অন্যটা থাকে তাঁর ধুতির খুঁটের আড়ালে, কোমরে। এই দ্বিতীয় জিনিসটা দেখে সোমনাথ একদিন হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। একটা রিভলভার।

লোকে বলে, ওঁর নাকি মাথার পিছনেও দুটো চোখ। এই রাধানগরে তো বটেই, কলকাতার শহরেও নাকি ওঁর নিজস্ব গুপ্তচরবাহিনী আছে। সেই বাহিনীর কাছ থেকে খবর পেলে তবেই তিনি এখানে টিচার বা প্রিন্সিপাল হিসেবে কাউকে ঢুকতে দেবেন। পার্টির সঙ্গে সামান্যতম যোগাযোগও যদি থাকে, রাধানগর কলেজ তার জন্য নয়।

লোকবল এবং অর্থবল দুই-ই তাঁর যথেষ্ট। এখানকার এম এল এ, এম পি-ও তাঁকে সমঝে চলেন। ঘাঁটায় না। অবশ্য, ওঁরা অন্য পার্টির। সে বিশেষ একটি পার্টির বিরুদ্ধে প্রায় পরশুরামের মতো কুঠার তুলে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন রমেনবাবু, কঠিন প্রতিরোধের সামনে পড়ে এখানে তার শক্তি নেহাতই নগণ্য।

প্রথম যেদিন এলেন, আশ্চর্য হয়ে সোমনাথ দেখেছিলেন, তাঁর কলকাতার কলেজের অনেক খবরই রমেনবাবুর নখদর্পণে। এমনকি তাঁর পরিবারের খবরও ভদ্রলোকের অজানা নয়। বলেছিলেন, 'যা বুঝেছি, রাজনীতির নামে দলবাজি করে আপনারা টিচাররা প্রায় মুক্ত পুরুষ হয়ে উঠেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। এই তিন গেলে মানুষের মুক্তি হয়। তা আপনাদের না আছে লজ্জা, না আছে ঘেন্না। শুধু আছে ভয়। পার্টিকে।'

সোমনাথ চুপ করে ছিলেন। কি বলবেন?

রমেনবাবু বলেছিলেন— 'লোকে বলে, আপনারা নাকি মানুষ গড়ার কারিগর। নিজেরা মানুষ হয়েছেন যে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবেন? আপনার কলেজে অধিরথ বসু কাজ করেন না? পার্টির খুব বড় লিডার। বটেশ্বর নাগ আপনাদের প্রিন্সিপাল তো? আপনি নিজে ওদের কি মনে করেন? ওরা কি মানুষ?'

সোমনাথকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রমেনবাবু বলেছিলেন— 'আপনাকে কিন্তু আমি এখানে কাজ করার জন্যই এনেছি। গৌতম আপনাকে হেল্প করবে। আলাপ করিয়ে দেব। শিক্ষিত, ভদ্র বংশের ছেলে আপনি। অথচ পার্টি এবং আপনাদের গুণধর প্রিন্সিপালকে চটিয়ে বার্সার পোস্টে যাওয়ার কারণে ওরা আপনার বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের চার্জ এনেছিল। ...ঠিক বলছি কিনা? শেষটায় রিজাইন করে প্রাণে না হোক মানে বাঁচেন আপনি।'

ওঃ! সেই ভয়ঙ্কর ছ'টা মাসের কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় সোমনাথের। ওঁর বোধহয় একটা বড় দোষ, উনি এমন ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে খুব একটা কথা বলেন না। আসলে তাঁর খুব লজ্জা হয়। বিশেষত লজ্জা হয় মেয়ে ঈশানীর সামনে এসব কথা বলতে। পড়াশুনা ছাড়া ও মেয়ে জানে না কিছু। দাদুর কথা শুনে, বাবাকে দেখে সে নিজেও শিক্ষিকা হতে চায়। কি করে শিক্ষা জগতের এইসব কদর্য কাণ্ডকারখানা মেয়ের সামনে তুলে ধরবেন? এ তো চিৎ হয়ে শুয়ে নিজেরই মুখে থুতু ছেটানো।

অথচ এখন মনে হচ্ছে, একটু ভুলই করেছেন। মেয়েকে আরও বাস্তববাদী করে তোলা উচিত ছিল।

এত দূরের একটা কলেজে চাকরি নিতে মেয়েকে বারণই করেছিলেন সোমনাথ। শুনল না। এ বাস্তববোধেরই অভাব। তার ওপর কাল বাড়ি ফিরে স্ত্রী অলকানন্দার মুখে যা শুনেছেন, তাতে ওঁর মাথা আরও ভোঁ ভোঁ করছে। এরপর কি হবে?

পর্দা তুলে লম্বা, ফর্সা চেহারার এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন— 'আসতে পারি, স্যার?'

— আরে গৌতমবাবু! আসুন, আসুন।

এই ভদ্রলোকের সামনেও প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসে থাকতে লজ্জা হয় সোমনাথের।

রাধানগর থেকে দুটো স্টেশন পরে বিশপনগর। সেখানে একসময় খৃস্টানদের আধিপত্য ছিল। সেই সূত্রে ওখানে ওদের একটি কলেজ আছে। পুরনো কলেজ, বড় এবং মোটামুটি নাম আছে। ভদ্রলোক সেখানে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। ওখানেই বাড়ি, ওই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। রণজিৎ মণ্ডল ওই কলেজের শিক্ষক-নেতা। সোমনাথও ওঁকে একটু আধটু চিনতেন। কলকাতায় কলেজ শিক্ষকদের ইউনিয়ন অফিসে দু-একবার দেখেছেন। ধুতি পাঞ্জাবি পরেন, মুখে আইনের কথা বলেন, কিন্তু কাজে সবরকম আইন ভাঙাকে প্রশ্রয় দেন, বিশেষত যদি তার পেছনে পার্টির হাত থাকে।

গৌতমবাবু একসময় ওঁর মোটামুটি অনুগতই ছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে দু'জনের ঠোকাঠুকি লাগতে থাকে। নিজের মেয়ের মার্কশিট জাল করে ধরা পড়েছিলেন ইকনমিক্সের অধ্যাপক ডি পি এস। রণজিৎবাবুর প্রশ্রয়ে প্রিন্সিপাল ক্রিস্টোফার বিশ্বাস তাঁর টিকিও ছুঁতে পারলেন না। উল্টে পার্টির ছেলেদের দিয়ে একদিন ক্রিস্টোফারকে টানা দশ ঘন্টা ঘেরাও করে রেখে এমন ভয় পাইয়ে দিলেন যে, হার্টের রুগি ক্রিস্টোফার এখন রণজিৎবাবুর কথায় ওঠে-বসে।

রণজিৎবাবুর প্রশ্রয়েই কলেজের একজন শিক্ষার্থী, সন্তোষ মালাকার, ক্রিস্টোফারের সই জাল করে কলেজ ফান্ড থেকে বিশ হাজার টাকা স্রেফ ঝেড়ে দিল। গৌতমবাবু তখন বার্সার।

কলেজের টাকা পয়সার দিকটা তিনিই দেখেন। পুলিশ দিয়ে তদন্ত করিয়ে সন্তোষ মালাকারকে যখন হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন, তখনই 'কলেজে পুলিশী জুলুম চলবে না, চলবে না' স্লোগান দিয়ে রণজিৎবাবুর প্রশ্রয়েই পার্টির ছেলেরা বার্সার অফিসে ঢুকে লাঠি মেরে কম্পিউটার ভেঙে সমস্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে কুচি কুচি করে দেয়। সোমনাথের মতোই গৌতমবাবুকেও বার্সার পদ ছেড়ে দিতে হয়। তারপরেও ভদ্রলোক অন্তত চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যেদিন মেয়ের মার্কশিট জাল করার দায়ে অভিযুক্ত সেই ডি পি এস-কেই প্রিন্সিপাল ক্রিস্টোফার রণজিৎবাবুরই চাপে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল করে দিলেন, সেদিন আর পারলেন না। আরও মাস চারেক চাকরির বাকি ছিল। এবারে চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন।

রাধানগরে বসে সব খবরই রাখতেন রমেনবাবু। গৌতমবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন— 'আমি আপনার জন্য এই কলেজে সেক্রেটারির একটা পোস্ট তৈরি করে দিচ্ছি। সরকার অবশ্য এই পোস্ট মানবে না। মানার দরকারও নেই। আপনার মাইনে আমিই দেব। যা পেতেন ততটা অবশ্য দিতে পারব না, তাহলেও যতটা পারি দেব।'

সেই থেকে গৌতমবাবু আছেন। মানুষটি অতি ভদ্র, কাজও করেন খুব ভালো। সোমনাথের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের মধ্যে কোনও টানাপোড়েন নেই, দুজনেই দুজনকে মেনে নিয়েছেন।

গৌতমবাবুর হাতে বেশ কয়েকটা ফাইল। সোমনাথের টেবিলে নামিয়ে বললেন— 'একবার দেখবেন নাকি, স্যার'!

— কি ব্যাপার বলুন তো?

— বিল্ডিং কমিটির পেপার্স। ইস্ট ব্লকের দোতলাকে তিনতলা করতে হবে।

— ও, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। তা কত টাকার প্রোজেক্ট দিচ্ছেন?

— দশ লাখের কমে হবে না, স্যার।

সোমনাথ একটু হাসলেন। বললেন— 'আপনার হিসেব ঠিকই আছে। বি এড কোর্স চালু করতে হলে ক্লাসরুমের সঙ্গে বড় লাইব্রেরিও লাগবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রোজেক্টটা সরকার পাশ করবে তো? দশ লাখ টাকা তো কম নয়!'

— আপনি বার্সার মনোরমা ম্যাডামকে নিয়ে একবার সরকারের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, স্যার।

— ঠিক আছে। নেক্সট উইকে দেখছি।

— আরেকটা কথা আছে।

— বলুন!

— কথাটা রমেনবাবু শুধু আপনাকেই জানাতে বলেছেন। যদি কোনওভাবেই সরকার দশ লাখ টাকা গ্র্যান্ট না করে, তবে পাঁচ লাখ, অর্থাৎ ফিফ্‌টি পার্সেন্ট দিলেই চলবে।

— আর বাকিটা?

— ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে কলেজ দেবে।

— কিন্তু কলেজ ফান্ড থেকে অত টাকা... এখনও কনস্ট্রাকশনের অনেক কাজ বাকি...।

— ফান্ড থেকে নয়, রমেনবাবু নিজেই দেবেন।

— সেকি!

গৌতমবাবু ঠোঁটে আঙুল বেঁকিয়ে বললেন— 'কিন্তু চুপ! কথাটা পাঁচকান করবেন না। রমেনবাবুর এক কথা, টাকার জন্য কলেজের কাজ আটকে থাকবে না।

সোমনাথ একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। এরকম লোক এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে কেন আরও কয়েকটা হয় না!

গৌতমবাবু বললেন— 'আসলে ওঁর টার্গেট খুব ফিক্সড্। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই কলেজকে বিশপনগরের কলেজের চেয়েও ফেমাস করে ছাড়বেন উনি।'

— কিন্তু, সেটা কি সম্ভব? অত বড় এবং পুরনো একটা কলেজ...

— আপনার মতো প্রশ্নটা আমিও করেছিলাম। উনি তার উত্তরে কি বললেন জানেন?

— কি?

— ক্রিস্টোফার ওর কলেজে পার্টিকে ঢুকিয়েছে। আমি ঢুকতে দিইনি। পার্টি হল ক্যানসারের মতো। ক্রিস্টোফার মরবে। আমি জিতব। .. ফাইলগুলো তাহলে....

— রেখে যান। দেখে রাখছি।

গৌতমবাবু চলে যাচ্ছেন, হঠাৎই সোমনাথ পেছন থেকে ডেকে বললেন— 'আরেকটু শুনুন।'

— কিছু বলবেন?

— আচ্ছা, আরশিনগর কলেজ, নাম শুনেছেন কখনও?

গৌতমবাবু মাথা নেড়ে বললেন— 'শুনেছি। বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট তো?'

— হ্যাঁ।

— মারাত্মক জায়গা। জ্ঞানরঞ্জন না রবিরঞ্জন... কি যেন নাম প্রিন্সিপালের...

— রবিরঞ্জন।

— তা হবে। ডেঞ্জারাস লোক। পারে না এমন কোনও কাজ নেই। আগাপাস্তলা পার্টির প্রোটেকশানে আছে।

সোমনাথের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। কোনওক্রমে বললেন— 'বলেন কি?'

— কিন্তু আপনি ওই কলেজটার খোঁজ করছেনই বা কেন?

— কারণ, আমার মেয়ে সদ্য ওই কলেজেই জয়েন করেছে।

— আপনার মেয়ে!

— হ্যাঁ।

— ছেড়ে দিতে বলুন। ওখানে চাকরি করতে পারবে না।

— তাছাড়া— সোমনাথ ঢোঁক গিলে শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললেন— 'রিসেন্টলি ওর

প্রেগন্যান্সিও ডেভেলপ করেছে...'

— বলছি তো, চোখকান বুজে ছেড়ে দিতে বলুন।

সোমনাথ এবার দৃশ্যতই একটু ভেঙে পড়লেন। অসহায় গলায় বললেন— 'আমি যে কি করব, কি বলব বুঝে পাচ্ছি না। বিবাহিত মেয়ে, জোর করতেও পারছি না।'

— বিচলিত হবেন না। যদি খুব সমস্যা হয়, আমাকে জানাবেন। আমি একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব।

— কে বলুন তো?

— যার ওপরে ওই প্রিন্সিপাল কথা বলতে পারবে না।

— কিন্তু আপনি যে বলছেন, ডেঞ্জারাস লোক...

গৌতমবাবু একটু হেসে বললেন— 'কিন্তু বাপেরও তো বাপ থাকে। আপনি অরুণেন্দু মৈত্রর নাম শুনেছেন?'

— উনি তো, যতদূর মনে পড়ছে, একজন এম পি।

— হ্যাঁ। আপনাদেরই কলকাতা থেকে। তবে ওর আরও একটা বড় পরিচয়, খুব বড় সায়েন্টিস্ট।

— আপনি ওঁকে...

— সায়েন্স কলেজে এম এস সি পড়ার সময় অরুণেন্দু আমার ক্লাসমেট ছিল। এখনও ফোনে বা ই-মেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

— কিন্তু ওঁর সঙ্গে ওই কলেজের কি সম্পর্ক?

— উনি ওখানকার গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। দাপুটে লোক। ওর পার্টিও ওকে ভয় পায়।

— তাই নাকি!

— দরকার হলে বলবেন। দুশ্চিন্তা করবেন না।

সেদিন ট্রেনে ফেরার পথে দুশ্চিন্তা কিন্তু আরও বেড়েই গেল সোমনাথের। যতবারই মোবাইলে ফোন করেন মেয়েকে, এক কথা, সুইচ্‌ড অফ।

আশ্চর্য! এই মোবাইলটাও চুরি-টুরি হয়ে গেল নাকি?

বাড়িতে ঢুকতেই অলকানন্দা বললেন— 'কি ব্যাপার বলো তো? সেই সন্ধে ছ'টা থেকে শানুকে ফোন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, দু'ঘন্টা হতে গেল, এখনও সেই একই কথা, সুইচ্‌ড অফ।'

— সেকি! আমিও তো...

— থাকতে না পেরে শুভাশিসদাকে ফোন করেছিলাম, যদি উনি লাইন পেয়ে থাকেন, কিন্তু নাঃ!

— বাবুনকে জানিয়েছ?

— ওদের বাড়িতেও দিদিকে ফোন করেছি। কাউকে বাদ রাখিনি। কি ব্যাপার বলো তো? আমার কিছু ভালো লাগছে না। একটা মেসেজ পর্যন্ত করছে না মেয়েটা।

সোমনাথ প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে ট্রাউজার্সে পা গলাতে গলাতে গজগজ করতে থাকেন— 'কি দরকার ছিল ওই চাকরি নেবার? ঘর সংসার ছেড়ে সাতদিন ধরে ওখানে পড়ে থাকা... এদিকে শরীরের এই অবস্থা....

— শুভাশিসদা তো বাবুনের ওপরে খুব চোটপাট করছেন, তুই তো সঙ্গে ছিলি, কি করে ওকে অ্যালাউ করলি...

— থাম তো! দোষ তোমার মেয়ের। বাবুনকে জিজ্ঞেসই করেনি। এত ইমপ্র্যাক্টিক্যাল! ঘর-সংসার, শরীর, রিসার্চ সব কিছু এবার ডকে উঠবে... ছি, ছি! কোনও মানে হয়?

গৌতমবাবুর কাছে যা শুনেছেন, সেসব আর স্ত্রীর কাছে ভাঙলেন না সোমনাথ। আর টেনশন বাড়িয়ে কাজ নেই। নিজের ওপরও রাগ হচ্ছে তার। হোক বিবাহিত মেয়ে, বাবা হিসেবে আরও একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল তাঁর।

হঠাৎই ল্যান্ড ফোনটা বেজে উঠতে রিসিভার তুলে নিলেন অলকানন্দা।

— আমি শুভাশিসদা বলছি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন। কোনও খবর পেলেন?

— কিছু না। আমি বাড়িতে ঢুকেই ওদের কলেজের নাম্বারে ফোন করেছি। কিন্তু...

—কিন্তু?

— রিং হয়ে গেল, কেউ ধরল না। সোমনাথভাই বাড়ি ফিরেছে?

— এই তো ঢুকল সবে। কি হবে দাদা? বাবুন ফিরেছে?

— ওর অফিস মিটিং চলছে। ফিরতে দশটা হবে।

— তাহলে?

— আপনি এত আপসেট হবেন না। দেখছি, কি করা যায়।

সোমনাথ আর পারছিলেন না। সারাদিনের পরিশ্রম, যাতায়াতের ধকল, তার ওপর এই টেনশন।

বাথরুমে ঢুকে সবে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েছেন, অলকানন্দা দরজায় ধাক্কা মেরে বললেন— 'শুনছ? শানু একটা মেসেজ পাঠিয়েছে।'

সোমনাথ চমকে উঠে বললেন— 'কি বলেছে?'

— বলেছে, ভালো আছি। ভেবো না।

— ওকে রিং ব্যাক করোতো।

— করেছি। সেই এক কথা বলছে।

— তাহলে মেসেজটা কি করে এল?

— একটা অচেনা নাম্বার থেকে এসেছে।

— সেকি!

— হ্যাঁ।

সোমনাথ আর পারছিলেন না। বাথরুমের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন— 'যা জেনেছ, ও বাড়িতে জানিয়ে দাও।'

।।চার।।

আজ কি পূর্ণিমা?

কলকাতার আকাশেও কি চাঁদকে এত বড় দেখায়? নাকি কলকাতার আকাশটাই এত বড়, এত ছড়ানো নয়?

সন্ধে থেকে লোডশেডিং হয়ে বসে আছে।

হাতঘড়ি দেখল ঈশানী। রাত প্রায় ন'টা হতে চলল। সোমবার থেকে আজ শুক্রবার পর্যন্ত এরকমই দেখছে। সারাদিনে কতক্ষণ কারেন্ট থাকে বলা মুসকিল। যখন থাকে, তখনও লো ভোল্টেজ। পাম্পে জল ওঠে না, পাখা ঠিকমত ঘোরে না, টিউবলাইট জ্বলে না।

সত্যিই এখানে চাকরি করা যায় না।

আজ বিকেল থেকে আবার মোবাইলটাও অফ হয়ে গিয়েছে। চার্জ নেই। কারেন্ট নেই। চার্জ দেব কেমন করে?

রোজই সন্ধের দিকে বাড়িতে মাকে ফোন করে ঈশানী। আজ করা হল না। নিশ্চয়ই সবাই খুব চিন্তা করছে। শেষপর্যন্ত এই লেডিজ হোস্টেলে ওর রুমমেট হিস্ট্রির জুলিয়ার মোবাইল থেকে একটা মেসেজ করতে পেরেছে।

নামেই লেডিজ হোস্টেল। দোতলা বাড়ির বেশিরভাগটা জুড়েই ছাত্ররা থাকে। নিচের তলায় কয়েকজন ছাত্রী থাকে। আর তিনটে রুমে দু'জন করে ওরা ছ'জন লেডি টিচার থাকে।

এই অন্ধকারেও কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দমবন্ধ ঘরে জুলিয়া আর অনুরাধা টিউশান পড়াচ্ছে। কি করবে? এ কলেজে সময়মতো মাইনে হয় না। কখনও পনের তারিখে হয় তো কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারও কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। পাঁচ হাজার হতে পারে, আট হাজারও হতে পারে। পুরোটাই প্রিন্সিপালের মর্জি। কিছু বলার উপায় নেই। বললেই নাকি বাঁধা গৎ আওড়াবেন— 'আমার নিজেরও তো মাইনের ঠিক নেই।' কিন্তু ওঁর বয়েস পঞ্চাশের ওপর, দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, স্ত্রী বর্ধমানে সরকারি অফিসে চাকরি করেন, বাড়িও কাছেই, যাতায়াতের এক পয়সাও খরচ নেই। বাড়ির অবস্থাও নাকি বেশ ভালো, আর মাইনের ঠিক থাক আর নাই থাক, যাতায়াতের জন্য কলেজের গাড়ির ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু জুলিয়ার চলে না। ওর বাবা নেই, বাড়িতে মা আর বেকার ভাই, ওকে মাসে মাসে ঠিকঠাক টাকা পাঠাতে হয়। অনুরাধার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে, এক ছেলে আর মেয়েকে বাপের বাড়িতে রেখে আসতে হয়, টাকার দরকার ওরও আছে। আর বাকি তিনজন, অঞ্জলি, জয়তী আর বহ্নির তো কথাই নেই। ওরা কন্ট্রাক্ট টিচার। থোক পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে প্রিন্সিপাল ওদের দিয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করায়। এই তো দীঘির ওপার থেকে জেনারেটরের ঘটর ঘটর শোনা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে অফিসের ঘরে। ক্লার্করা বাড়ি চলে গিয়েছে কখন! ওদের আটকানোর ক্ষমতা প্রিন্সিপালের নেই। অথচ ওই তিনটে মেয়ে অফিসে বসে পে-বিল তৈরি করছে। এই বিল সরকারি অফিসেও ওরাই গিয়ে জমা দিয়ে আসে। বিল ক্লিয়ার না হলে মাইনে হয় না, কোথাও ভুলচুক হলে বা অন্য কোনও কারণে দেরি হলে প্রিন্সিপাল তো বটেই, অফিসের ক্লার্করা পর্যন্ত ওদের অকথ্য গালিগালাজ করে।

এর নাম শিক্ষকতা? এরকমই এই চাকরি? এজন্যই নীল ঈশানীকে এত হ্যাটা করে?

এসবের কিছুই জানা ছিল না ঈশানীর। যেমন সে আকাশে এত বড় চাঁদ কখনও দেখেনি। দেখেনি বিশাল দীঘি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আলো আঁধারির এক রহস্যময় জগতে ততোধিক রহস্যময় দূরে পথের ওই বাঁক, তেমনই দেখেনি এত অব্যবস্থা, এত অনিয়ম, অনাচার কিংবা অভাব!

জীবনটা কি তবে এখানে এসে পূর্ণ হচ্ছে ঈশানীর, নাকি শূন্য? ঠিক বুঝতে পারে না সে।

কাল বিকেলে নীল ফোন করেছিল। বলল— 'তোমার ছাগল চরানো শেষ হল?'

ছাগল-চরানো! হয়তো তাই।

প্রথমদিনই ক্লাসে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিল ঈশানী। এটা অনার্স ক্লাস? ভুল করে অন্য রুমে ঢুকে পড়েনি তো?

থিক্‌থিক্ করছে ছাত্র-ছাত্রী। কয়েকজন জানালায় বসে পা দোলাচ্ছে। অনভ্যস্ত শাড়ির আঁচল সামলে ঈশানী সবে বলেছে— 'গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্টস'। অমনি চতুর্দিক থেকে হাহা-হিহি হাসি! তারপর যেই না বলেছে 'আই শ্যাল ডিল উইথ শেক্সপীয়রস্ পোয়েট্রি', অমনি সামনের বেঞ্চ থেকে দুটো ছেলে উঠে না দাঁড়িয়েই দাঁত বার করে বলল— 'বাংলায় বলুন দিদিমণি।'

বাংলায়! ইংরাজি অনার্সের ক্লাস বাংলায়! এক ধাক্কায় যেন অথৈ জলে পড়ে গেল লরেটো, লেডি ব্র্যাবোর্ন থেকে ঝক্‌ঝকে রেজাল্ট নিয়ে পাশ করা ঈশানী দত্তরায়!

রোল-কল করতে করতে আশপাশ থেকে আসা দু-এক টুকরো অস্পষ্ট মন্তব্যে ফর্সা না হলেও কান লাল হয়ে উঠছিল তার। ... ফিগারটা দেখেছিস? ... চাবুক, মাইরি।.... মাল কোত্থেকে এল বল্‌তো? .... কলকাতা?.... চুলের কাটটা দেখেছিস? রাত আটটার সিরিয়ালে হেমা গুপ্তার মতো....'

আজ পাঁচ দিন হল এরকমই চলছে। কাকে পড়াবে ঈশানী? কারও কাছে একটা বইও নেই। ব্যাগের মধ্যে হয়তো একটা আধটা খাতা কিংবা নোটবুক আছে, তাও বার করে না। ইংরিজিতে কিছু বলার চেষ্টা করলেই রব তোলে— 'বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন।'

বলতে ইচ্ছে করে না, তবুও কাল নীলকে এসব না বলে থাকতে পারল না ঈশানী।

সঙ্গে সঙ্গে নীল বলল— 'খাস কলকাতাতেও এরকম অনেক কলেজ আছে, মাই ডিয়ার। তুমি জানতে না। সেইজন্যই তো আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম। ফালতু জায়গা। খালি পার্টিবাজি। ঝাড়ুদার থেকে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত সব পার্টির লোক। স্টুডেন্টস ইউনিয়নেরও শুধু একটাই কাজ। চাঁদা তোলা আর মাঝে মাঝে ফালতু কারণে প্রিন্সিপালকে দু-চার ঘন্টা ঘেরাও করে রাখা।

কোয়ালিটির কিস্যু দাম নেই।'

একটা জিনিস ঈশানী ভালোই বুঝতে পারে। তার এই চাকরির প্রতি নীলের সামান্যতম সম্মানও নেই। বুঝে তার খুব কষ্ট হয়।

চাকরিটা অবশ্য সে কালকেও ছেড়ে দিতেই পারে। হয়তো কোনওদিন ছেড়েও দেবে। তার অবস্থা জুলিয়া বা অনুরাধার মতো নয়। তাছাড়া এখানে থাকলে পি এইচ ডি-র কাজ ডকে উঠবে। তার ওপর শরীরের ভেতরেও একটা গড়বড় হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় ফিরেই ডাক্তার মিত্রর দেওয়া টেস্টগুলো করাতে হবে। নীল অবশ্য এরই মধ্যে ওর পেছনে লেগে চলেছে। কালকে ফোনেও বলেছে— 'হাই, মাদার অফ টুইন বেবি।' ঈশানীও সঙ্গে সঙ্গে বলেছে— 'শাট আপ্, পাজি।'

কিন্তু তবুও ওর ভেতরে একটা কষ্ট হয়। এই চাকরি ছাড়লেও কোনওদিন কোথাও কি একটা সম্মানজনক চাকরি জুটবে? একটু ভদ্র, একটু পরিচ্ছন্ন পরিবেশে? এত ভালো রেজাল্ট করে কি লাভ হল তাহলে?

এর মধ্যে একদিন যাদবপুরে ওর রিসার্চ গাইড জে বি এসের সঙ্গেও কথা বলেছিল ঈশানী। উনিও ওকে কলকাতায় ফিরে আসতে বলছেন। বলছেন— 'তোমার মতো স্টুডেন্টের পোস্ট ডক্টরেটও করা উচিত। তুমি ফরেনে চলে যাও ঈশানী।'

— ফরেনে!

এখনই ওসব ভাবতে পারে না ঈশানী। নীলকে ছেড়ে অত দূরে গিয়ে সে থাকতে পারবে না। অত অ্যাম্বিশান ওর নেই। তারপর, সত্যিই যদি টুইন বেবি...

ধ্যাৎ! নিজের মনেই হেসে উঠল ঈশানী। কি সব ভাবছে সে!

ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। একটু দূরে দামোদর নদী। সেখান থেকেই বাতাস আসছে কী? বাতাসে কেমন একটা সুগন্ধ। কলকাতার বাতাসে এরকম সুগন্ধ কখনও পায়নি ঈশানী। এরই নাম বুঝি প্রকৃতি? মাথার ওপর ছড়ানো আকাশ, চোখের সামনে ছড়ানো প্রান্তর, অন্ধকারে আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হয়ে ওঠা জ্যোৎস্না। নিস্তব্ধ, রহস্যময় এক অচিন পৃথিবী। সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে!

ভাবতে ভাবতে একটু হেসেই ফেলল ঈশানী। সে কি প্রেমে পড়ে যাচ্ছে এই জায়গাটার সঙ্গে? আসলে জায়গাটা দিনে একরকম, রাতে অন্যরকম। দিনে কদর্য, কিন্তু রাতে মায়াবী।

জুলিয়া ধড়মড় করে ছাদে উঠে এসে বলল— 'তোমার একটা কল... আমার মোবাইলে।'

নিজের মোবাইলটা হাতের মুঠোয় নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে আছে। বেচারি জুলিয়া! কলটা ধরাতে ওকে ছাদে ওঠা-নামা করতে হল।

— হ্যালো!

— কেমন আছো মাদার? কি করছ?

— আঙ্কেল!

— ফোন করোনি কেন? আমরা সবাই চিন্তা করছি।

কারণটা বলল ঈশানী।

— কলেজ ঠিক চলছে?

আঙ্কেলকে মিথ্যে বলতে ওর খারাপ লাগে। আবার এটাও জানে, টিচারদের উনি খুবই সম্মান করেন। ব্যাঙ্কে ওঁর চেম্বারে বাপি ঢুকলে উনি উঠে দাঁড়াতেন। ঈশানী নিজেও সেটা দেখেছে।

— ঠিকই আছে, আঙ্কেল।

— আর তোমার শরীর?

এবারে একটু লজ্জা পেল ঈশানী। আঙ্কেলও কি ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন?

— ঠিকই আছে।

— তুমি নেই, বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

চুপ করে রইল ঈশানী।

এই মানুষটার জন্য তার খুব কষ্ট হয়। সে ভালোই জানে, আন্টির ওকে পছন্দ হয়নি। একমাত্র ছেলের বউ আন্টি হয়তো নিজেই পছন্দ করে আনতেন। আরও সুন্দরী, আরও হয়তো অনেক কিছু। ঈশানী তো সুন্দরী নয়।

এই নিয়ে আঙ্কেলের সঙ্গে আন্টির একটা চাপা মন কষাকষি থেকেই গিয়েছে। বোধহয় কোনওদিনই মেটার নয়। কখনও চেঁচামেচি করেন না আন্টি। অথচ ব্যবহার একটা আশ্চর্য শীতলতা আছে। হাসেন কম, কথা বলেন আরও কম।

আচ্ছা... উনি কি বরাবরই এরকম? আঙ্কেল তো কত স্মার্ট, কত মিশুকে। নীলকে জিজ্ঞেস করেছিল ঈশানী। নীল একটু গা-এড়ানো উত্তর দিয়েছিল।— 'মা ওইরকমই।'

এজন্যই ওই ফ্ল্যাটে খুব বেশি যায় না ঈশানী। কেমন দমবন্ধ লাগে। আঙ্কেলও যেন আন্টির সামনে একটু গুটিয়ে থাকেন। অথচ কোনওদিন যদি গিয়ে দেখেছে, আন্টি নেই, মার্কেটিংয়ে বা অন্য কোথাও, আঙ্কেল একা, সেদিন অন্যরকম। আবার আন্টি ফিরে এসে ওকে দেখে ভুরু কুঁচকে বলেছেন— 'এভাবে বারমুডা পরে এখানে এসেছ কেন?'

ঈশানীর মুখ শুকিয়ে যেত। শুকনো গলায় বলত— 'স্যরি, আন্টি।'

সত্যিই বোধহয় সে কিছু বোঝে না। আঙ্কেলকে তো সে বাপির মতই দেখে। তাই বাপির কাছেও বারমুডা পরে যেতে যেমন তার লজ্জা হয় না, আঙ্কেলের কাছেও হয় না। অথচ...

এইসব নানা কারণে ঈশানী ওই ফ্ল্যাটে খুব কমই যায়। এমনও হয়েছে, মুখোমুখি ফ্ল্যাটে থেকেও দু'জনে শুধু ফোনে কথা বলেছে। ঈশানী বুঝতে পেরেছে, আঙ্কেল একা। তবুও বলেনি— 'আঙ্কেল, আসব?' আঙ্কেলও ডাকেনি ওকে। ঈশানী হয়তো এইটুকু জানতে চেয়েছে— 'চা খাবে আঙ্কেল? বানিয়ে দেব?' আঙ্কেল বলেছে— 'না, থাক। তার চেয়ে আয় না, আমরা একটু গল্পই করি?'

নাঃ, কারেন্ট বোধহয় আজ রাতে আর আসবেই না। ন'টা বেজে গেল। এবার তো উঠতেই হয়।

ছাদের দরজাটা বন্ধ করতেই সিঁড়ির মুখটা গুমোট হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে পেটটা কেমন গুলিয়ে উঠল ঈশানীর। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

এ আবার কি!

দু'হাতের মুঠোয় দুটো মোবাইল। নিজের আর জুলিয়ার। সিঁড়িতে বসে পড়ে মোবাইল সমেত দুটো হাত দিয়েই নিজের মাথাটা চেপে ধরল ঈশানী। চোখের সামনে অন্ধকারে যেন রাশি রাশি জোনাকি পোকা উড়ছে।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল ইশানী— 'জুলিয়া, জুলিয়া...'

।। পাঁচ ।।

একটা মানুষের জীবনের সব স্বপ্ন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে আর বেঁচে থাকলেও আসলে বেঁচে থাকে না।

নিজের স্বামীর দিকে তাকালে আজকাল এরকমই মনে হয় রত্নার।

শৈলেন নামে যে টগবগে যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন রত্না, আজকের আরশিনগর কলেজের এই মধ্যবয়স্ক, হতাশ লোকটির সঙ্গে তাকে মানানো যায় না।

অথচ এরকমই কি হওয়ার কথা ছিল?

চোখ বুজলে এখনও যেন আঠাশ বছর আগের একটা মায়াবী বিকেল দেখতে পান রত্না।

বিশাল প্রান্তরের দিকে হাত তুলে শৈলেন নামের ছাব্বিশ বছরের যুবকটি বলেছিল — 'এই জমিতেই কলেজটা গড়ে উঠবে।'

আর বাইশ বছরের যুবতী রত্না বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করেছিল— 'এই পুরো জায়গাটাই আপনাদের?'

শৈলেন গর্বভরে বলেছিল— 'হ্যাঁ।'

রত্না মজা করে বলেছিল— 'তাহলে তো আপনারা জমিদার?'

পার্টির টগবগে নবযুবক শৈলেন বলেছিল— 'জমিদার আর জোতদার দুটো শব্দকেই আমরা ঘৃণা করি।'

রত্না জিজ্ঞেস করেছিল— 'কিন্তু এখানে কলেজ তৈরি হলে আপনি কি করবেন?'

শৈলেন আবারও বেশ গর্বভরে উত্তর দিয়েছিল— 'কলকাতার কলেজের চাকরি ছেড়ে দেব।'

রত্না বলেছিল— 'ইস্‌স! তাহলে আমাকে পড়ানোর কি হবে?'

শৈলেন বলেছিল— 'এখনও এই কলেজ চালু হতে আরও বছর দুয়েক লাগবে। ততদিনে তোমার এম এ কমপ্লিট হয়ে যাবে।'

রত্না বলেছিল— 'আর তারপর?'

শৈলেন একটু চুপ করে গিয়েছিল।

রত্না ছাড়তে চায়নি। ঠোঁট টিপে হেসে বলেছিল— 'বলুন না, তারপর?'

এবারে শৈলেন বলেছিল— 'অতটা আশা করতে আমার ভরসা হয় না।'

তাই, বছর দুয়েক পরে সত্যিই যখন কলেজটা চালু হল, রত্না নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড অশান্তি হয়েছিল বাড়িতে। মা, বাবা, দাদা প্রত্যেকের ভীষণ আপত্তি। কলকাতার মেয়ে ওই অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন কাটাবে কি করে?

বাবা শৈলেনকে ডেকে বলেছিলেন— 'তোমার কি কলকাতার কলেজের চাকরিটা না ছাড়লেই নয়?'

নবযুবক শৈলেন গর্বভরেই উত্তর দিয়েছিল— 'মাপ করবেন। পার্টির নির্দেশ। আমাকে আমার গ্রামেই ফিরে যেতে হবে।'

মেজাজ হারিয়ে বাবা ধমকে উঠেছিলেন— 'নিকুচি করেছে তোমার পার্টির। তোমার পার্টির দায় তুমি আমার মেয়ের ওপর চাপাচ্ছ কোন্ সাহসে?'

শৈলেন জানিয়েছিল— 'কারণ, আপনার মেয়েও আমাদের পার্টির সদস্য হয়ে গিয়েছে।'

রাগে বাবার বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই শুরু।

পার্টি অফিসে রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে দু'জনে চলে এলেন এই আরশিনগরে। দু'চোখে অনেক স্বপ্ন, মনে আদর্শের ঢেউ, সন্তানের মত তিল তিল করে গড়ে তুলবেন সদ্যোজাত এই কলেজটিকে।

সেই সময় রত্না বিনা বেতনেই এই কলেজে ক্লাস নিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন বেশি নয়। তাছাড়া, বারীনবাবু নামে যে ভদ্রলোক প্রথম প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিলেন, তিনি বলতেন— 'কোয়ালিটির জন্য আমি কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করব না।'

বয়স্ক মানুষ, অবিবাহিত, পার্টির নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। তখনও পার্টিতে খুঁজলে এরকম মানুষ পাওয়া যেত। এঁদের মতো মানুষেরাই ছিলেন শৈলেন আর রত্নার প্রেরণা। পাঁচ বছর ছিলেন, কলেজের যেটুকু উন্নতি, প্রায় সবটাই তাঁর আমলে। তারপর যা উন্নতি হয়েছে, তা ছিঁটেফোঁটা। এক টাকার উন্নতি হলে বাকি নিরানব্বই টাকা ভাগাভাগি হয়ে ঢুকেছে এর-ওর পকেটে।

এই কলেজের প্রথম শনি অনাদি মৌলিক। বছর পনের-যোল হবে এখানে ঢুকেছে। জেলার পার্টি সেক্রেটারি তখন থেকেই দীনেশ সামন্ত। অনাদি ওরই হাতের লোক। কলেজে

ঢোকার পর থেকেই বলত— 'দীনেশ সামন্ত বললে আমি সব কিছু করতে পারি। খুন করতে বললে খুন করতে পারি, কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে বললে আগুনও লাগাতে পারি।'

অধঃপতনের সেই শুরু।

রত্না জানেন, শৈলেন অনেক চেষ্টা করেছেন। টাকা খেয়ে ছাত্রভর্তি করত অনাদি মৌলিক। পিলপিল করে কলেজে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল। পার্টির শাখা সংগঠন থেকে শুরু করে জেলা সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত— কোথায় না এই অনাচারের বিরুদ্ধে দরবার করেছেন শৈলেন! কেউ কানই দেয়নি। উল্টে দীনেশ সামন্ত শৈলেনকেই শাসিয়ে বলেছেন— 'ছাত্রভর্তিতে বাধা দিলে ছাত্ররাই আপনাকে ধরে পেটাবে। সেটা ভালো হবে?'

আরও অনেক কেচ্ছা আছে। পার্টির নির্দেশে পরপর সব অপদার্থ, নিকৃষ্টদের প্রিন্সিপাল করে পাঠানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন তো অনাদি মৌলিককে স্যার স্যার করতেন। ততদিনে একমাত্র মেয়ে মনামী বড় হয়ে উঠছে। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে দেখে লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে পড়াশুনোর জন্য প্রথম কয়েকবছর বাপের বাড়িতেই রাখতে হয়েছিল রত্নাকে। তারপর অবশ্য একটু বড় হলে, হস্টেলে পাঠিয়ে দেন। আগাগোড়া কলকাতাতেই লেখাপড়া করে মনামী এখন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে। এদেশে এলেও আরশিনগরে আর আসে না। শৈলেন-রত্নাকেই কলকাতায় গিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে হয়।

কি পেলেন সারা জীবনে? সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্নের জলাঞ্জলি। পার্টিতে এখন শৈলেন-রত্না খরচের খাতায়। কলেজে, কর্মস্থলে শৈলেন কোণঠাসা। অথচ কত ভালোই না রেজাল্ট ছিল মানুষটার। আর কি সুন্দর পড়াতেন। ওঁর পড়ানোর গুণেই না রত্না ওঁর প্রেমে পড়ে যান। সেই মানুষটা আজকাল পড়াতে পর্যন্ত পারেন না। পরিবেশই নেই!

টুকটুক করে কে কড়া নাড়ল কোয়ার্টার্সের দরজায়। দরজা খুলে রত্না বললেন— 'ওমা, ঈশানী! এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

— দাদা নেই বউদি?

— একটু ব্যাঙ্কে গেছেন। আজ তো অফ ডে।

— ও, হ্যাঁ।

— কিছু বলবে?

ঈশানী চুপ করে রইল।

রত্না কাছে এসে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন— 'কি

হয়েছে, আমাকে বলো? শরীর খারাপ লাগছে?

— কাল রাতে শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ লাগছিল। সকাল থেকে মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু...

— এখন এরকমই হবে। তুমি কিছুদিন ছুটি নাও ঈশানী।

— ছুটি! আমি বোধহয় আর এখানে চাকরিই করতে পারব না, বউদি।

— কেন? কি হয়েছে?

— আপনি শোনেননি কিছু?

— না তো!

— কলেজে আজ আমার ক্লাসে ভাঙচুর হয়েছে।

— ও মা, সেকি!

— হ্যাঁ।

— কি হয়েছিল? ছি, ছি, একি কাণ্ড!

— এক গ্লাস জল দেবেন, বউদি?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করল ঈশানী। কলেজ থেকে প্রায় দৌড়ে এখানে চলে এসেছে সে। অনাদি মৌলিকের ফতোয়ায় এখানে শাড়ি পরে চলাফেরা করতে হয়। আরেকটু হলে তাড়াহুড়োতে শাড়িতে পা আটকে পড়েই যাচ্ছিল সে। জুতোর স্ট্র্যাপটাও ভালো করে বাঁধতে পারেনি।

— এবারে বলো তো কি হয়েছে।

একটু দম নিল ঈশানী। তারপর বলল— 'আমাকে ক্লাসে পড়াতে দেবে না, বউদি। প্রত্যেকদিন নতুন ফন্দিফিকির বার করে আমাকে জ্বালিয়ে মারে। একদিন প্রিন্সিপালকে বললাম, শুনে উনি বললেন, স্টুডেন্টরা তো আপনার পাঁঠা। ল্যাজে কাটবেন কি মুড়োয় কাটবেন, সে তো আপনার ব্যাপার।... এসব কি ধরনের ভাষা, বউদি! আমার বাবাও তো একটা কলেজের প্রিন্সিপাল।'

— ওঁর কথা ছাড়ো। উনি ওরকমই। তোমার দাদা তো বলেন, ও কি মানুষ? শেয়াল কুকুরেরও অধম।

— প্রত্যেকদিন ক্লাসে ঢুকলেই একদল ছেলে-মেয়ে চিৎকার করতে থাকবে, বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন। আচ্ছা, বলুন তো, ইংলিশ অনার্সের ক্লাসে বাংলায় আমি কি পড়াব? তারপর আজকে দশটা পঁয়তাল্লিশের ক্লাসে যেই ঢুকেছি, অমনিই একদল স্টুডেন্ট চিৎকার করতে লাগল, বাংলায় পড়ান, আবার আরেকদল চিৎকার করতে লাগল, না দিদি, ইংরিজি বলুন।

— এ তো রীতিমত র‍্যাগিং।

— আজকে আর আমি মেজাজ ধরে রাখতে পারিনি। গোটা ক্লাসকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে রুম থেকে বেরিয়ে আসি।

— তারপর?

— তারপরেই ওরা দুমদাম করে বেঞ্চ পেটাতে থাকে। আশপাশের রুম থেকে অন্য টিচাররা বেরিয়ে এসে দেখেন, ওরা ঘরের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ সব উল্টেপাল্টে তছনছ করে দিয়েছে। হোল্ডার থেকে বাল্বগুলো খুলে ছুঁড়ে খানখান করছে, সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলো বাঁকিয়ে দিয়েছে, ভুল করে আমার নোটবুকটা টেবিলের ওপর ফেলে এসেছিলাম, সেটাকে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে দিয়েছে।

— বুঝলাম। সত্যিই তুমি এ কলেজে চাকরি করতে পারবে না, ঈশানী। ওরা তোমাকে চাকরি করতে দেবে না।

— জানি। দাদা আমাকে প্রথম দিনেই বলেছিলেন। আমার পোস্টে প্রিন্সিপাল ওঁর এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নিকে ঢোকাতে চাইছেন।

— সব ওই প্রিন্সিপাল আর শয়তান অনাদি মৌলিকের কীর্তি। পারে না এমন কোনও কাজ নেই। স্টুডেন্টদের নিয়েও রাজনীতি করে। দু-দশজন যে ভালো নেই, তা হয়তো নয়, কিন্তু ওরা ভয়ে মুখ বুজে থাকে। ... ওই শোনো...।

ঈশানী কান পাতল।

হ্যাঁ, সমুদ্রের মতোই গর্জন শোনা যাচ্ছে। বিশাল একটা মিছিল বার করেছে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। শোনা যাচ্ছে, 'ঈশানী ম্যাডাম, গো ব্যাক.... পড়ানোর নামে র‍্যাগিং করা চলছে না, চলবে না... অপদার্থ ঈশানী ম্যাডাম দূর হটো, দূর হটো....' ইত্যাদি।

— দাঁড়াও, তোমার দাদাকে একটা ফোন করি।

কিন্তু তার আগেই অন্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সমুদ্রের গর্জন একটু একটু করে নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিল। এবারে এসে ঘা মারল সোজা কোয়ার্টার্সের দরজায়।

চোখের ইঙ্গিতে ঈশানীকে ভেতরের ঘরে যেতে বলে দরজা খুলে দিলেন রত্না।

বাইরে থিক্‌থিক্ করছে ছেলেমেয়ের দল। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে— 'অপদার্থ ঈশানী ম্যাডামের শাস্তি চাই, শাস্তি চাই।'

দলের পাণ্ডাকে ভালোই চেনেন রত্না। নাম ফটিক। দু-বার ফেল, অনাদি মৌলিকের শিষ্য। কিছুদিন আগে একবার প্রিন্সিপালের ঘরেও ভাঙচুর চালিয়েছিল।

— কি ব্যাপার? এখানে তোমাদের কি চাই?

— ম্যাডাম কলেজ থেকে পালিয়ে আপনাদের কোয়ার্টার্সে এসে লুকিয়ে আছেন। ওঁকে বার করে দিন।

— বাজে কথা। এখানে কেউ আসেনি।

— আলবাত এসেছেন। নয়তো উনি গেলেন কোথায়?

— তার আমি কি জানি? এতদূর সাহস বেড়েছে তোমাদের যে কোয়ার্টার্সে এসেও হামলা করছ?

— হামলার কি আছে? ওঁকে বার করে দিন, আমরা চলে যাই।

— এখানে কেউ আসেনি।

— এসেছে! এ্যাই, বাঞ্ছা, চাঁদু তোরা গোটা কোয়াটার্সটা ঘিরে ফেলতো। মাল যেন পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে না পারে।

— ছি, ছি, ছি। তোমরা স্টুডেন্টস? টিচারকে মাল বলছ?

— কেন বলব না? আপনি জানেন, গোটা ক্লাসকে আজ উনি বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?

— বেঞ্চের ওপর নয়, এমনিই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

—আপনি জানলেন কি করে?

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন রত্না। তারপর বললেন— 'ম্যাডাম একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলেন।'

— জানেন, গোটা ক্লাসকে উনি সোয়াইন, স্কাউন্ড্রেল বলেছেন?

— তুমি জানলে কি করে? তুমি তো আর এখন এই কলেজের ছাত্র নও।

হাত তুলে ভিড়টা দেখাল ফটিক। বলল— 'যারা ক্লাসে ছিল, তারাই বলেছে। ওরা কি মিথ্যে কথা বলবে?'

— কে সত্যি, কে মিথ্যে আমি জানি না। এখানে কেউ নেই। তোমরা চলে যাও।

— চলে যাব?— বলে দরজার পাল্লাদুটো নিজের বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল ফটিক। তারপর ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা মেয়েদের লক্ষ্য করে বলল— 'এ্যাই, বান্টি, ডলি, মেঘনা, তোরা এগিয়ে আয় তো।'

তিনটে মেয়ে সামনে এগিয়ে আসতেই ফটিক ওদের বলল— 'ভেতরে ঢুকে যা। সার্চ কর।'

— কি?

অবাক হয়ে গেলেন রত্না।

— এরা কারা?

এরাই কি সেই আরশিনগর কলেজের ছাত্রছাত্রী, যেখানে ভালোবেসে একদিন বিনা বেতনে ক্লাস নিয়েছেন রত্না! নিজের যৌবনকে উৎসর্গ করেছেন এই কলেজকে গড়ে তুলতে! বাপের বাড়ি, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও দ্বিধা করেননি!

মেয়ে তিনটে সামনে এসে রত্নাকে বলল— 'সরুন ম্যাডাম।'

ফটিক বলল— 'ঢুকে যা, ঢুকে যা! না সরলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দে।'

ততক্ষণে ভেতরের ঘরে উঠে দাঁড়িয়েছে ঈশানী। অনেক হয়েছে, আর নয়!

শাড়িটা একটু গুছিয়ে নিল ঈশানী, জুতোর স্ট্র্যাপটা ভালো করে বেঁধে নিল। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা জান্তব চিৎকারে আরশিনগরের আকাশ-বাতাস প্রায় কেঁপে উঠল।

রত্না চমকে উঠে বললেন— 'একি ঈশানী! তুমি বেরিয়ে এলে কেন?'

— না, বউদি। এভাবে হয় না। যা হবার হোক।

— তুমি যেও না, ঈশানী। অন্তত তোমার দাদাকে আসতে দাও।

—না, বউদি।

মেয়ে তিনটের সামনে এসে দাঁড়াল ঈশানী। বলল— 'আমি তোমাদের সোয়াইন, স্কাউন্ড্রেল, এসব বলেছি?'

ওরা চুপ করে রইল।

পিছন থেকে ভিড়টা চিৎকার করে উঠল—'হ্যাঁ, হাঁ, বলেছেন, বলেছেন।'

ঠিক সেইসময় রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হন অনাদি মৌলিক। ধমকের সুরে বলল— 'এ্যাই, তোরা এখানে কি করছিস? যা, যা সব পালা। .... এই তো ম্যাডাম। আপনাকেই খুঁজছি। চলুন, প্রিন্সিপাল ডাকছেন।'

অনাদির ইঙ্গিতে মিছিল আবার সগর্জনে কলেজের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ঈশানী রত্নাকে বলল— 'আসি, বউদি।'

রত্নার চোখের জল আর বাঁধ মানল না। ঈশানী যেন তাঁরই হারিয়ে যাওয়া যৌবন। তাঁর নিজের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সমস্ত বিশ্বাস, স্বপ্ন আর আদর্শ।

ঈশানী জড়িয়ে ধরল রত্নাকে। বলল— 'কাঁদছ কেন, বউদি? কেঁদ না। আমার যা হবার হবে।'

অনাদি মৌলিকের সঙ্গে কলেজে এসে ঢুকল ঈশানী। ভিড়টা ততক্ষণে প্রিন্সিপালের ঘরের দরজায় এসে জমেছে। পর্দা তুলে ঘরের ভেতরটা দেখল ঈশানী। সেখানেও ভিড়। গোটা কলেজই ভেঙে পড়েছে। ঈশানী জিজ্ঞেস করল— 'আসব স্যার?'

।। ছয়।।

একেই বলে ভানুমতীর খেল্!

প্লেনে আসতে আসতে এরকমই মনে হচ্ছিল শুভ্রনীলের।

কাল মাঝরাতে হঠাৎ চেয়ারম্যানের ফোন। সকাল সাড়ে ছ'টার ফ্লাইটে চেন্নাই যেতে হবে।

কিছুদিন ধরেই সাউথের দিকে আইস্-কুল নামে একটা সফ্ট ড্রিঙ্ক বাজার বেশ গরম করে রেখেছে। ওদের আগের অ্যাড্টা ওরা চেঞ্জ করতে চায়। নতুন অ্যাড করার জন্য শুভ্রনীলদের টোয়াইনাইট ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটা অ্যাড এজেন্সি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কয়েক লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট। যে যার মতো মরিয়া চেষ্টা করে চলেছে। টোয়াইনাইটের তরফ থেকে উঠতি তামিল ফিল্মস্টার মনোরমাকে দিয়ে অ্যাডটা করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আইস-কুলের মালিক গোষ্ঠী তাতে হঠাৎই রাজি হয়ে গিয়েছে। মনোরমা নিজেও নাকি বেশ ইন্টারেস্টেড। সে নাকি আজকেই শুটিং-স্পট দেখবে।

কাল রাতে চেয়ারম্যানের পরেই সুব্রামনিয়মের ফোন। ও টোয়াইনাইটের চেন্নাই ব্রাঞ্চের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। কলকাতায় যেমন শুভ্রনীল। অ্যাড্টা দুটো ভাষায় হবে। তামিলে আর

ইংরেজিতে। তামিল স্ক্রিপ্টটা তৈরি করবে সুব্রামনিয়ম, আর ইংরেজি স্ক্রিপ্ট করবে শুভ্রনীল।

শুটিংস্পটও সুব্রামনিয়ম দেখে রেখেছে। চেন্নাই এয়ারপোর্ট থেকে ত্রিচি হাইওয়ে ধরে আরও বিশ কিলোমিটার। জায়গাটা বেবাক ফাঁকা। তাতেও অবশ্য শুটিং-এর দিন রিস্ক নেওয়া যাবে না। ওখান থেকে শহরাঞ্চল কিছুটা হলেও খুব দূরে নয়। পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। মনোরমা এখন উঠতি হিরোইন। তবে আজ নাকি সে একটা ভাড়া ট্যাক্সিতে চড়ে প্রায় ছদ্মবেশে আসছে।

ফোনে সুব্রামনিয়ম বলছিল— 'খুব মুডি। পাহাড় দেখালে সমুদ্র দেখতে চায়, আবার সমুদ্র দেখালে বলে পাহাড়ে নিয়ে চলো।'

সেরেছে!

শেষটায় যদি বলে, মেরিনা বিচে যাব, তাহলেই চিত্তির! ঝাড়া চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাকে আসতে হবে।

একেই বলে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড।

এখানে সবাই সব সময় ছুটছে। কখনও কিছু পাচ্ছে, কখনও পাচ্ছে না।

লড়াই এখানে কিছু কম নয়। আর অনেক সময়ই তা ন্যায়নীতির ধার ধারে না। টাকার চোরাস্রোত বয়ে চলেছে। যে যার সুবিধামতো তাতে ঝাঁপ দিয়ে মুঠো মুঠো টাকা তুলে আনছে। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, আইস-কুলের সবচেয়ে তেজী কম্পিটিটর ইগলু মনোরমাকে হাত করার চেষ্টা করছিল। আইস-কুল স্রেফ আরও টাকার অফার দিয়ে দিদিমণিকে ভাঙিয়ে নিয়েছে।

তবু এই ভালো। এখানে অন্তত ভণ্ডামি অনেক কম। প্রায় সব কিছুই খুল্লামখুল্লা। তাছাড়া কাজের মর্যাদা আছে। অপদার্থের স্থান নেই। ফাঁকিবাজিও চলবে না। শুভ্রনীল ভালোই জানে, এই অ্যাড্‌টা হিট করিয়ে দিতে পারলেই তার এবং মানি অর্থাৎ সুব্রামনিয়মের স্যালারি আর পার্কস দুটোই কলকাতার ট্যাক্সির মিটারের মতোই লাফিয়ে চড়ে যাবে। নয়তো টোয়াইনাইটকে টা টা! আরও পাঁচটা কোম্পানি ওদের হাতে পাওয়ার জন্য মুখিয়ে বসে আছে।

এজন্যই ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েও ছেড়ে দিয়েছিল শুভ্রনীল। দূর দূর! ওখানে কিস্স্যু নেই। থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। শুধু বেকার আর বড় জোর কেরানি তৈরির পাঠশালা। তার ওপর আছে ফালতু রাজনীতি। এটা সেটায় ছুটি, ধর্মঘট, ক্লাস বয়কট। প্রিন্সিপাল মানে বলির পাঁঠা। একদল ফাঁকিবাজ টিচার। আদ্দেক দিন কামাই, আর বাড়িতে বসে ব্যাচের পর ব্যাচ টিউশান করে যাওয়া। সেখানেও পড়ানো তো ঘোড়াড্ডিম, খালি নোট কেনাবেচার ব্যবসা।

শুভ্রনীল জানে, তার এইভাবে কলেজ ছেড়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হবার ডিসিশানটা বাবা খুব মেনে নিতে পারেননি। দাদু ছিলেন হেডমাস্টার। বাবা নিজেও চাকরির গোড়ায় কলেজে পড়িয়েছেন। তাই হয়তো চাইতেন, ছেলেও পড়াশুনার লাইনে থাকুক। ছেলেকে দিয়ে সেটা পূরণ হয়নি, তাই হয়তো ঈশানী।

ঈশানী!

বাবার কথায়, স্কলার মেয়ে।

আজকালকার দিনে প্রায় কেউই বাবা-মায়ের কথায় বিয়ে করে না। শুভ্রও করার কথা নয়। বিশেষত, যে দারুণ স্মার্ট, হ্যান্ডসাম, অফিসে আহেরী, লোপা, ইলিনা থেকে শুরু করে মডেল চাঁদনী, উজালা, ফরিস্তা তো প্রায় তার গায়ে লেপটেই থাকে।

তবুও বাবা যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন— 'তুমি কি নিজে কাউকে বিয়ে করতে চাও?' শুভ্রনীল মাথা নেড়ে জানিয়েছিল, না।

কারণ, সত্যিই না।

গ্ল্যামার-ওয়ার্ল্ডকে বাড়িতে নিয়ে আসার কোনও ইচ্ছে তার নেই।

প্রত্যেকদিন বিরিয়ানি খাওয়া যায় না। পেট খারাপ হয়।

বাবার ইচ্ছেয় সে ঈশানীকে বিয়ে করেনি। সেটা হয় না। এমনকি মায়ের অনিচ্ছাকেও সে গুরুত্ব দেয়নি। সে যা করেছে, বুঝেসুঝেই করেছে। ঈশানীকে দেখেই তার মনে হয়েছিল, অনন্ত ছুটে চলা ঝুঁকির যে জীবন সে বেছে নিয়েছে, সেখানে বল্গা টেনে ধরতে পারে এই পড়ুয়া মেয়েটারই রোগাসোগা নরম-সরম হাত।

হয়তো বাবারও তাই ইচ্ছে ছিল। কাকতালীয়ভাবে সেটা তার নিজের ইচ্ছের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।

যে জানে, তার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে অফিসের মেয়েরা চাপা গলায় ফিসফিস করে বলেছে— 'হোয়াট আ চয়েস!... মোস্ট অর্ডিনারি।'

বলুক।

কিন্তু শুভ্রনীল জানে, তার বউটা মোটেও অর্ডিনারি নয়। অন্যরকম, একদম অন্যরকম। একটু আদুরে, একটু ক্ষেপি, আবার ভীষণই সিরিয়াস। সারাদিনের চোখ ধাঁধানো আলোর পরে মৃদু, নীলাভ, রাত-বাতি।

কি যে একটা ছাতামাথা কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেল বউটা। আসলে একটু ক্ষেপি আছে তো, তাই। এই নিয়ে একটু মন কষাকষিও হয়ে গিয়েছে ওদের। প্রথম দিনেই মোবাইল-টোবাইল চুরি হয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। তখনই শুভ্রনীল বলেছিল— 'ছেড়ে দাও, জায়গাটা অপয়া।'

শোনেনি ঈশানী। মুখ ভার করে বসে ছিল। তারপর বলেছিল— 'আসলে তুমি আমার চাকরিটাকে রেসপেক্ট করো না।'

শুভ্র আর কিছু বলেনি। কারণ, কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যিই এই চাকরিটাকে রেসপেক্ট করে না সে। উল্টে তার মনে হয়, সমাজে এখনও এই চাকরির যে মর্যাদা আছে, সেটা এর প্রাপ্য নয়। স্রেফ ফাঁকি মেরে আর ফালতু রাজনীতি করে একটা সম্প্রদায় টিকে আছে। ঈশানীর মতো মেয়ের যোগ্য চাকরি এটা নয়। সত্যি বলতে কি, মন দিয়ে রিসার্চ কমপ্লিট করে ওর বিদেশে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু... তাহলে শুভ্রর নিজের কি হবে?

সোমবার সকালে আরশিনগর চলে যায় ঈশানী। শুক্রবার

রাতের আগে ফেরে না। কলকাতায় থাকলে এই ক'দিনের বিরহও তো সহ্য হয় না শুভ্রনীলের।

সারাদিন অফিসে কিভাবে কেটে যায় সে টের পায় না। কিন্তু রাতে বাড়ি ফেরার সময় সে জানে, ঈশানী আছে। গিয়ে দেখবে, খুব মন দিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে হিজিবিজি কাটছে, আর মাথা নাড়ছে। কোনদিকে মনই নেই।

বিয়ের পর গোড়ায় গোড়ায় মা এসে ঘরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে বলতেন— 'এ আবার কি? এখনও ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছ? বাবুনকে চা-টা করে দাও।'

ধড়ফড় করে উঠে বসত ঈশানী। শুভ্র বলত— 'ওসব লাগবে না। একেবারে ডিনার করে নেব।'

মা চলে যাবার পর ঈশানী জিভ কেটে বলত— 'সত্যিই আমি কিছু বুঝি না। তুমি রাগ করেছ?'

শুভ্র গম্ভীরভাবে বলত— 'হুঁ।'

— ঠিক আছে, আমি ল্যাপটপ বন্ধ করে দিচ্ছি।

শুভ্র অমনিই ওর হাত চেপে ধরে বলত— 'না।'

—মানে?

— মানে, তুমি যা করছ, তাই করো। কেউ কাজ করছে, এটা দেখতেই আমার ভালো লাগে।

সেই ঈশানী তার কাজকর্ম ছেড়ে একটা অকাজের জায়গায় চলে গেল। আরশিনগর কলেজ! সেখানে লেখাপড়া কিছু হয়? হতে পারে? এইজন্যই রাগ করেছিল শুভ্রনীল। ঈশানী সেটা বুঝল না। বুঝল না, কোথায় তার লাগছে।

আজকাল রাতে আবারও একটু আধটু ড্রিঙ্ক করে বাড়ি ফিরছে শুভ্র। ঈশানী নেই, রাতের অন্ধকার যেন ফিকে লাগে। নেশার ঝোঁকে যেটুকু ঘুম হয়, তারপর বাকি রাত আধোঘুমে কাটে। ঈশানী নেই, নেই তার নিরাভরণ শরীরের স্পর্শ, ঘ্রাণ, কণ্ঠমূল পর্যন্ত চুম্বনের মদির আস্বাদ। রাতের ঈশানী অন্যরকম। নিজের সবটুকু দিয়ে সবটুকু আদায় করে নিত সে। ফলে যা হবার হয়ে গিয়েছে। সেদিন শুভ্রনীল বলেছিল— 'ইউ আর নট সো গুডি গুডি।' নিজের নিরাভরণ শরীরকে অন্ধকার বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে কুলকুল করে হাসছিল ঈশানী। আর বলছিল— 'নয়ই তো! নটি.... ভেরি নটি।'

ত্রিচি হাইওয়ে দিয়ে প্রায় ঘন্টায় আশি কিলোমিটার গতিতে এয়ারপোর্ট থেকে ছুটে চলা ট্যাক্সিটা হঠাৎই একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ঝিমুনির ভাবটা কেটে যেতেই শুভ্র দেখল, সামনে গাড়ির সারি। সর্বনাশ! ম্যাডাম মনোরমার আগমনবার্তা কি ঘোষিত হয়ে গেল নাকি?

পকেট থেকে মোবাইল বার করে বোতাম টিপল শুভ্রনীল। ওধার থেকে মানি, অর্থাৎ সুব্রামনিয়ম বলল— 'তুমি কোথায়?'

আশপাশের দোকানের সাইনবোর্ড থেকে জায়গাটার নাম বলল শুভ্রনীল।

— অল রাইট। আর হার্ডলি দশ মিনিট।

— তুমি পৌঁছে গেছ?

— কখন!

— রাস্তায় এত জ্যাম কেন? ম্যাডামের খবর কি লিক হয়ে গিয়েছে নাকি?

— না, না। ম্যাডাম তোমার পেছনে পেছনেই আসছেন। একটা ভাড়া অ্যাম্বাসাডারে। সঙ্গে শুধু ওর সেক্রেটারি পেরুমল। আর কেউ নেই।

— পুলিশকে ইনফর্ম করেছ?

— পাগল! কাকপক্ষীও জানে না। এখানে শুধু আমি, আইসকুলের দু'জন হর্তাকর্তা, আর তুমি।

জ্যামটা সামান্য কেটেছে। একটু একটু করে এগোচ্ছে ট্যাক্সিটা। ফোনটা ছাড়ার আগে শুভ্র জিজ্ঞেস করল— 'সাইটে তো তাহলে লোকজন বেশি নেই। আমি চিনতে পারব তো?'

মানি বলল— 'একটা মোবাইল ফোনের বড় হোর্ডিং টাঙ্গানো আছে। ওখানে ট্যাক্সিটা থামিয়ে আমাকে ফোন করো।'

আরও একটু এগিয়ে শুভ্রনীল দেখল, মাঝরাস্তায় একটা অয়েল ট্যাঙ্কার খারাপ হয়ে আছে। এইজন্যই জ্যামটা হচ্ছিল। কিন্তু পেছনে ম্যাডামের গাড়িটা আবার ফেঁসে যাবে না তো? মুড বিগড়ে গেলে দিদিমণি হয়তো গাড়িতে বসেই ফোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিলেন।

ভয়ে ভয়ে সাইটে পৌঁছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতেই শুভ্র দেখল, মানির কানে মোবাইল গোঁজা আর মুখে একগাল হাসি। তার মানে, খবর শুভ।

ফোনে তামিলেই কথাবার্তা হচ্ছিল, শুভ্রর পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। তবে দু-এক মিনিটের মধ্যেই ফোন ছেড়ে শুভ্রর দিকে ডানহাতের পাঞ্জা তুলে বরাভয় মুদ্রা দেখাল মানি। অর্থাৎ ম্যাডাম আসছেন, জ্যামে পড়ে বিগড়ে যায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়াল। জানলার কাঁচ কালো। বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যায় না। দরজা খুলে প্রথমে নেমে এল সেক্রেটারি পেরুমল, তারপর ম্যাডাম।

চট্ করে চেনা যাচ্ছে না। নীল জিন্স, সাদা টপ, পায়ে স্নিকার্স। মাথায় একটা লাল টুপি, কপাল পর্যন্ত। কালো চশমা মুখের অর্ধেকটা আড়াল করে রেখেছে। ডান হাতে একটা বাহারি ছড়ি।

মানি শুভ্রর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ম্যাডাম বললেন— 'হা-ই।'

আইস-কুলের দুই হর্তাকর্তাও ডগোমগো।

চোস্ত ইংরিজিতে ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন— 'ইজ দিজ দ্য স্পট?'

মানি বলল— 'ইয়েস ম্যাডাম।'

— ওহ্! ইটস্ সো নাইস!

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল সবার।

ম্যাডামের ইঙ্গিতে পেরুমল ততক্ষণে জায়গাটার ফটো

তুলতে শুরু করেছে।

জায়গাটা রুক্ষ, পাথুরে। মাঠেরই মতো, তবে ঘাস খুব অল্প। চারিদিকে অনুচ্চ পাহাড়। মাটির রং লালচে। ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত কিছু নারকেল গাছ। আকাশ নীল, পরিষ্কার।

একটু দূরে মাঠের কোণে একটি বড়সড় ছাতা। তার নীচে একটা টেবিল আর তাকে ঘিরে কয়েকটা চেয়ার।

ম্যাডামকে সেখানে বসিয়ে নিজের ল্যাপটপ চালু করল মানি। কম্পিউটার গ্রাফিক্সে অ্যাড-এর শট্‌টা বোঝানো হয়েছে।

ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে তৃষ্ণার্ত এক পথিক। পায়ের নীচে রুক্ষ মাটি, চতুর্দিকে বন্ধ্যা পাহাড়। ক্লান্ত পথিক সেরকমই একটি পাহাড়ের নিচে হাঁটু মুড়ে আঁজলা পেতে বসেছে। আর তখনই কি আশ্চর্য! পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে নেমে আসছে ঝর্ণাধারা, আর সেই ধারাই পরমুহূর্তে হয়ে উঠেছে সবুজ রঙের ঠাণ্ডা পানীয়র স্রোত— আইস-কুল। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হচ্ছে পথিকের। — 'আঃ! দ্যাটস্ আইস-কুল!'

ম্যাডাম বললেন— 'ফ্যান্টাস্টিক!'

যাক্ বাবা! বাঁচা গেল।

— হু মেড ইট— মে আই নো?

মানি শুভ্রর দিকে আঙুল তুলে বলল— 'উই ডিড ইট জয়েন্টলি।'

— উড ইউ লাইক টু পুট অ্যা ফিউ ওয়ার্ডস? অ্যান্ড আ গুড ক্যাপশান?

— ইয়েস ম্যাম্। মাই ফ্রেন্ড উড রাইট ইংলিশ, অ্যান্ড...

— ইউ ইন তামিল! ওকে। মেক ইট ফাইনাল। আই উইল শুট নেক্সট উইক।

আইস-কুলের দুই কর্তা আবারও ডগোমগো।

ফেরার সময় মানির সঙ্গে টোয়াইনাইটের চেন্নাই সিটির অফিসে চলে এল শুভ্র। দু'জনে মিলে কপিটা তৈরি করে ফেলতে হবে। টেকনিশিয়ানদের দিয়ে আজই সাউণ্ড লাগিয়ে সিডিটা কমপ্লিট করে ম্যাডামকে পাঠিয়ে দিতে হবে। দেরি করা যাবে না।

দু-তিনটে শব্দের বেশি কিছু প্রয়োগ করা যাবে না। তবে সেইসব শব্দ হতে হবে একেবারে মোক্ষম। তৃষ্ণার ভাবটা যেন পরিষ্কার ফুটিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া চাই দুর্দান্ত একটা ক্যাপশান। তবেই না সব মিলিয়ে খোলতাই হবে অ্যাডটা।

একেই বলে কাজ।

লাঞ্চের আগে পর্যন্ত মাথা খাটিয়ে

দু'জনে যা তৈরি করল, তা সরাসরি নাকচ করে দিল অফিসেরই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্।

লাঞ্চে গিয়ে শুভ্র মানিকে বলল— 'লেট্স রিল্যাক্স, বুঝলে? নয়তো মাথা জ্যাম হয়ে যাবে। বেটার, ইউ কল ইওর ফিয়াসেঁ অ্যান্ড আই মাই ওয়াইফ।'

মানি বলল— 'নট ব্যাড।'

লাঞ্চ খেতে খেতেই ফিয়াসেঁর সঙ্গে তামিলে বকবক জুড়ে দিল মানি। কিন্তু শুভ্র যতবারই ঈশানীকে ফোন করে, শোনে— সুইচড্ অফ।

তাহলে কি ক্লাস করছে ঈশানী! দূর! আরশিনগর কলেজ, তার আবার ক্লাস!

খেতে খেতে বার চারেক চেষ্টা করেও লাইন না পেয়ে বেশ একটু দমে গেল শুভ্র। ওদিকে মানিকে বেশ উদ্দীপ্ত মনে হচ্ছে। তামিলে বকবক করছে খুব।

খাবার পর হাল ছেড়েই দিল শুভ্র। কিন্তু... এভাবে সে কাজ করবে কিভাবে? মুডটাই তো আসছে না।

দুটো টেবিল পরে লাঞ্চ খাচ্ছিল জুনিয়র কপিরাইটার উর্বা। শুভ্রকে দেখে অনেকক্ষণ ধরেই মিটিমিটি হাসছিল। এবারে হাত নেড়ে বলল— 'হা-ই।'

চকিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল শুভ্র। লাঞ্চের পর উর্বার রুমে একটু সময় কাটানো যেতে পারে। মেয়েটা তাকে পছন্দই করে।

টেবিল ছেড়ে উঠে ওর টেবিলের সামনে গিয়ে সামান্য ঝুঁকে শুভ্র জিজ্ঞেস করল— 'আর ইউ ফ্রি?'

ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁত বার করে উর্বা খিল্‌খিল্ করে হাসল। বলল— 'ফর ফিফটিন মিনিটস্।'

— মে আই কাম টু ইওর রুম?

— ওয়েলকাম!

পনের মিনিটের জায়গায় আরও পাঁচ-সাত মিনিট বেশিই সময় দিয়েছিল উর্বা। ওর রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে বেশ ফ্রেশ লাগছিল শুভ্রর। এরকম আগেও তাকে কয়েকবার করতে হয়েছে, কলকাতায় নিজের অফিসেও। তার একটা সুবিধা এই যে, সে যথেষ্ট স্মার্ট, হ্যান্ডসাম। মহিলা-সঙ্গ পেতে তার অসুবিধা হয় না। এবং এজন্য তার মধ্যে কোনও বিবেক দংশনও নেই। যে পুজোর যে নৈবেদ্য। এটা কাজের জায়গা। যেভাবেই হোক, তোমাকে কাজটা তুলে দিতে হবেই। অন্যথায় তুমি আউট। সাফ কথা!

ঠাণ্ডা ঘরে বসে শিস্ দিতে দিতে কাজটা হয়ে গেল ঝটাপট। ইন্টারকমে মানিকে ধরতেই সে বলল— 'ফাইভ মিনিটস্।'

ঠিক হ্যায়! এই পাঁচ মিটি রকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে ঈশানীকে আরেকবার ট্রাই করা যেতে পারে। ছাগল-চরানো স্কলার বউ! কি করছে?

আশ্চর্য! এখনও সুইচড্ অফ!

মেসেজের ইনবক্স খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল শুভ্র। নাঃ, কোনও মেসেজও নেই।

এরকম তো কখনও হয় না!

বাড়িতে মাকে ফোন করে লাভ নেই। মা'র সঙ্গে ঈশানীর কোল্ডওয়ার কোনওদিনই মিটবে না। অবশ্য শাশুড়িকে করা যেতে পারে। কিন্তু ... তাহলে তো উনিই দুশ্চিন্তায় পড়বেন!

কি করবে ভাবছে, এমন সময় মানি দরজায় ন্‌ক করল।

পরের এক ঘন্টা কেটে গেল প্রায় ঝড়ের গতিতে। ইট্স ওকে। এক্ষুণি সিডি ম্যাডামের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুভ্রর ফ্লাইট রাত আটটায়। আশা করা যায়, তার আগেই ম্যাডামের রিপোর্ট এসে যাবে। আপাতত শুভ্র গেস্ট হাউসে চলে যাক, রেস্ট নিক।

মানি ওর গাড়িতে শুভ্রকে নামিয়ে দিয়ে গেল। রুমে ঢুকে টিভিটা চালিয়ে দিল শুভ্র। অ্যাডটা উতরে হয়তো গেল, তবু কেন যেন কিছু ভালো লাগছে না।

রিমোট টিপে অন্যমনস্ক ভাবে এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল করতে করতে হঠাৎই একটা জায়গায় এসে থমকে গেল শুভ্র। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে একটা বিধ্বস্ত ক্লাসরুম।

ব্যাপারটা কি?

সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে দিতেই শুভ্র শুনতে পেল, বর্ধমান জেলার আরশিনগর কলেজে প্রবল ছাত্রবিক্ষোভ। বিক্ষোভের কারণ ওই কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা ঈশানী দত্তরায়।

ঈশানী দত্তরায়!

খট্‌ করে একটা শব্দ হতে চমকে উঠল শুভ্র। তার শিথিল মুষ্টি থেকে রিমোটটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে। পর্দায় তখন প্রবল ছাত্রবিক্ষোভের দৃশ্য।

।। সাত।।

চুপ করে নিজের চেম্বারে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন সোমনাথ।

টেবিলের ওপর খোলা আছে খবরের কাগজ। সেখানে এগারো পৃষ্ঠায় ছবিসমেত ছাপা হয়েছে খবরটা।

কেলেঙ্কারির আর বাকি কিছু রইল না। প্রথমে টিভি, তারপর খবরের কাগজ।

যা বোঝার বুঝে গিয়েছেন সোমনাথ। নিজের কর্মক্ষেত্রকে তিনি হাতের তালুর মতোই চেনেন। বেশ আঁটঘাট বেঁধেই পেছনে লাগা হয়েছে।

কেরিয়ারের শুরুতেই ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল মেয়েটা।

নিজে একটা কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েও কিছু করতে পারলেন না সোমনাথ। ... কিচ্ছু না!

অসম্মান আর অসহায়তার এই লজ্জা তিনি লুকোবেন কোথায়?

কালকের দিনটা যে কিভাবে কেটেছে ভাবতেই এখনও শিউরে উঠছেন সোমনাথ।

দুপুর থেকেই মেয়ের মোবাইল সুইচড্‌ অফ। প্রথমে অবশ্য অতটা গা করেননি সোমনাথ। কাজেও ব্যস্ত ছিলেন।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ হঠাৎই জামাইয়ের ফোন। চেন্নাই থেকে।

শুনেই চমকে উঠেছিলেন সোমনাথ। — সেকি!

পরক্ষণেই বাড়ি থেকে স্ত্রী অলকানন্দার ফোন। হাউ হাউ করে কাঁদছে। টিভিতে খবরটা সেও দেখেছে।

আর ঈশানীর মোবাইল? তখনও সুইচড্‌ অফ।

কি করবেন বুঝতে না পেরে গৌতমবাবুকে নিজের ঘরে ডেকেছিলেন সোমনাথ। সব শুনে কিছুক্ষণের জন্য ওঁরও বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। নিজের কর্মক্ষেত্রকে সোমনাথের মতো গৌতমবাবুও ভালোই চেনেন। এর নাম শিক্ষাক্ষেত্র। এখানে মানুষ গড়ে তোলা হয়!

তবুও মাথা খাটিয়ে গৌতমবাবুই রমেনবাবুকে ফোন করে সব জানান। রমেনবাবু ফোন করেন রাধানগরের এস ডি পি ও-কে। ঘন্টাখানেক পর খবর আসে, এস ডি ও-র মধ্যস্থতায় বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে আপাতত ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে অধ্যাপিকা ঈশানী দত্তরায়কে। সদাশয় এস ডি ও সাহেব একটি গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সেই গাড়িতেই কলকাতা ফিরে আসছে ঈশানী। সঙ্গে আছেন হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন ম্যাডাম।

ততক্ষণে অবশ্য ঈশানীর মোবাইল চালু হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দুশ্চিন্তা কাটেনি। কথা প্রায় বলতেই চাইছে না ঈশানী। শুধু সংক্ষেপে জানিয়েছে, আজকের রাতটা সে সোমনাথদের কাছেই থাকবে।

রমেনবাবুর নির্দেশে গৌতমবাবু সেদিন সোমনাথকে আর ট্রেনে কলকাতা ফিরতে দেননি। গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ফিরতে ফিরতে কলকাতার কলেজে নিজের হেনস্থার কথা মনে পড়ছিল সোমনাথের। উঃ! কি ভয়ঙ্কর সেইসব দিন। পার্টিকে চটিয়ে বার্সার হওয়ার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনে হাজতবাস করানোর চক্রান্ত হয়েছিল। অতটা বয়েসেও সেই ধাক্কা সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সোমনাথকে। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা দেখে শিহরিত হয়েছিলেন। সোমনাথ বুঝতে পারছেন, মেয়েও খুব আঘাত পেয়েছে। বয়েস কম, তাই আঘাতটা আরও মর্মান্তিক।

ঠিকই বলেছিলেন গৌতমবাবু— 'ডেঞ্জারাস জায়গা। মেয়েকে ওই চাকরি ছেড়ে দিতে বলুন।'

তবু মন্দের ভালো, ওকে ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। একে তো প্রেগনেন্সির আর্লি স্টেজ, কখন কি হয় তার ঠিক নেই, তারপর মনের এই অবস্থা।

সোমনাথ বাড়িতে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরে বাড়ি এল ঈশানী। মেয়ের মুখ দেখে চমকে উঠেছিলেন সোমনাথ। বিধ্বস্ত চেহারা। শরীর-মনের ওপর দিয়ে যেন ঘূর্নিঝড় বয়ে গিয়েছে।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ঈশানী। অলকানন্দা অনেকবার 'শানু, দরজা খোল, দরজা খোল, বলেও দরজা খোলাতে পারেননি।

সোফায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন সোমনাথ। আর সামনে বসে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলেন অলকানন্দা। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসবে না তো মেয়েটা? তাহলে তো সর্বস্ব যাবে, মান-সম্মান, এমনকি একমাত্র মেয়ের জীবনটাও।

সাড়ে আটটা নাগাদ শুভাশিস এলেন। চেন্নাই থেকে ফ্লাইট ছাড়ার আগে বাবুন, অর্থাৎ শুভ্র তাঁকে সব জানিয়েছে। সোমনাথের তখন মুখ তোলার মতো অবস্থা নেই। এই সেই মানুষ, ব্যাঙ্কে যাঁর চেম্বারে সোমনাথ ঢুকলে উঠে দাঁড়াতেন। বলতেন— 'আপনি শিক্ষক। জানেন, আমার বাবাও হেডমাস্টার ছিলেন।'

তবুও শুভাশিস আসায় একটা উপকার হল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মেয়ে। বলল— 'আঙ্কেল, তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন? আমি ঠিক আছি।'

শুভাশিস বললেন— 'বাবুনকে আমি এয়ারপোর্ট থেকে

এখানে আসতে বলে দিচ্ছি। সোয়া দশটা নাগাদ ওর ফ্লাইট নামবে।'

তবু ভালো। মনে মনে সেরকমই চাইছিলেন সোমনাথ আর অলকানন্দা। শুধু মুখ ফুটে বলতে পারেননি।

আজ বাবুনও ছুটি নিয়েছে। কাল রাতে কিছুই খেতে পারেনি ঈশানী। বার দুই বমিও করেছে। আজ সকালে ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছেন। বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই। সি নীড্স রেস্ট। কমপ্লিট রেস্ট। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

গৌতমবাবু এসে ঢুকলেন।

সামনের চেয়ারটায় বসে বললেন— 'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি।'

সোমনাথ বললেন— 'আমি আপনার এবং রমেনবাবুর কাছ কৃতজ্ঞ।'

— ছি, ছি, এসব বলবেন না। কালকের ওই অবস্থায় আপনাকে একা ট্রেনে ছেড়ে দেওয়া যায়? মেয়ে আজ কেমন আছে?

হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টালেন সোমনাথ। বললেন— 'আর মেয়ে! আঘাতটা হয়তো ওর বেশি, তবে লজ্জাটা বেশি আমার। জামাইয়ের কাছে, বেয়াইয়ের কাছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না ওদের দিকে। এই আমাদের শিক্ষাজগৎ!

গৌতমবাবুও একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেললেন। সত্যিই এই জগৎটা আর ভদ্রলোকের যোগ্য নয়।

মুখে অবশ্য বললেন— 'এত ভেঙে পড়বেন না।'

সোমনাথ বললেন— 'আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন। ওই চাকরি ওর ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল।'

গৌতমবাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— 'আসলে কি জানেন, আমরা সবাই সব কিছু মেনে নিই, ছেড়ে দিই। এটা এক ধরনের কম্প্রোমাইজ। আপনার মেয়ের বয়স কম। ও হয়তো সেটা করে উঠতে পারেনি।'

— কিন্তু তাতে লাভ কি হল বলুন? উল্টে নিজেই ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল।

গৌতমবাবু আবারও একটু চুপ করে থেকে বললেন— 'আসলে দল একটা শক্তি। তার কাছে একা মানুষ অসহায়। আমি পারিনি, আপনি পারেননি, আপনার মেয়ে তবু হয়তো একটা চেষ্টা করেছিল।'

— শুধু দলের কথা কেন বলছেন? ওর কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি পর্যন্ত ওর পক্ষে দাঁড়াননি।

— দাঁড়াবেন না। এখন আমরা যে যার নিজের মতো। আপনার বিপদে আমি দাঁড়াব না, আমার বিপদেও আপনি দাঁড়াবেন না।

সোমনাথ অস্থির হয়ে বললেন— 'তাহলে সমাজটা চলবে কি করে বলুন তো? সব জায়গায় তো আর রমেনবাবুর মতো মানুষ নেই।'

গৌতমবাবু হাসলেন। বললেন— 'চলছে আর কোথায়? চলছে না। আমরা সবাই টিকে আছি এইমাত্র, বেঁচে আছি বলা যায় না।'

— মেয়েকে এখন কলেজ থেকে ছুটিতে থাকতে বলা হয়েছে। ভাবছি, আর ওকে ওখানে ফেরত পাঠাবো না। রিজাইন করতে বলব।

— ও কি পি এইচ ডি করছে?

— হ্যাঁ। মন দিয়ে সেটাই করুক। তারপর... সি ইজ অরলেডি প্রেগনান্ট।

— তাহলে অবশ্য রিজাইন করাই ভালো। এতদূর থেকে যাতায়াত করাও উচিত হবে না। .... মেয়েকে বলেছেন কিছু?

— এখনই কিছু বলিনি। তবে আজ সকালে জামাইয়ের সঙ্গে একটু কথা হয়েছে। অত দূরে চাকরির ব্যাপারে ওর আগাগোড়াই অমত ছিল। এখন তো আর ফেরত পাঠাতেই চাইছে না। আমার স্ত্রীও বলছেন, এবারে মান গিয়েছে, পরে প্রাণটাও যাবে। খুব ভুল কিছু বলেনি, কি বলেন?

গৌতমবাবু একটু হেসে বললেন— 'এই লাইনে চট্ করে কেউ কাউকে অবশ্য খুন-টুন করে না। তবে যা করে সেটাকে বলা যায় স্লো পয়জনিং। একটু একটু করে আপনাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়াটা শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

সোমনাথ অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বললেন— 'কিন্তু আমি মেয়ের এই অপমান সহ্য করতে পারছি না।'

— বুঝতে পারছি।... ঠিক আছে, আপনি আমাকে দু-একটা দিন টাইম দেবেন?

সোমনাথ চমকে উঠে বললেন— 'কেন? আপনি কি করবেন?

গৌতমবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন— 'দেখি, কি করতে পারি।'

।। আট ।।

খাস কলকাতার বুকে যে এরকম একটা প্রাসাদ আছে তা কে জানত।

এখন তো চতুর্দিকে শুধু ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাট। তারই মধ্যে এরকম একটা বাড়ি!

জায়গাটা অবশ্য অভিজাত। আলিপুর। কলকাতার মধ্যেও একটু অন্যরকম। নিরিবিলি, ফাঁকা ফাঁকা। আশপাশে বেশ কিছু বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে বাগান। এই বাড়িটারও সামনে

বাগান আছে। দেখে মনে হয়, পরিচর্যাও করা হয়।

একটু আগেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে ঈশানী। পায়ে হেঁটেই বাড়িটা খুঁজে বার করল সে। গেটে নেমপ্লেট আছে। ঠিকানাটাও মিলিয়ে নিল সে।

সাতদিন পর এই প্রথম বাড়ি থেকে বেরোল ঈশানী। এই সাতদিন ধরে সে অনেক ভেবেছে। এর মধ্যেও টিভি আর খবরের কাগজের লোকেরা মাঝেমাঝেই জ্বালাতন করেছে ওকে। বিরক্ত হয়ে মোবাইলের পুরনো সিমটা খুলে রেখেছে ঈশানী। বাড়িতেই আরেকটা বাড়তি সিম ছিল। সেটা ভরে নিয়েছে।

এখনও বাপের বাড়িতেই আছে সে। নীল মাঝে মাঝে এসে রাতটা কাটিয়ে এখান থেকেই অফিস যায়। কাল আবার চেন্নাই চলে গেল। ওখানে আইস-কুল নামে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের অ্যাডের শুটিং হবে। যাওয়ার আগে পর্যন্ত অবশ্য পইপই করে বলে গিয়েছে— 'ওই চাকরিতে তুমি আর ফিরবে না বলে দিচ্ছি।'

ফিরবে না। সত্যিই আর ফিরবে না ঈশানী। ওখানে সে কাজ করতে পারবে না, বুঝে গিয়েছে। কাজ করতে দেওয়া হবে না তাকে। তাহলে কাজ না করে মাইনেই বা কেন নেবে? ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করতে চায় না সে। যাদের উপায়ন্তর নেই, তারা ওখানে চাকরি করুক, কিন্তু ঈশানীর সেরকম অবস্থা নয়। ভাগ্যিস পি এইচ ডি-র ফেলোশিপটা ছেড়ে দেয়নি সে। এজন্য অবশ্য গাইডের কাছে সে কৃতজ্ঞ। মুচকি হেসে বলেছিলেন— 'গ্রামেগঞ্জের চাকরি! দ্যাখো, করতে পারো কিনা। এখনই কাউকে কিছু জানানোর দরকার নেই। যদি ফেলোশিপ ছাড়তেই হয়, প্রথম মাসের মাইনেটা পেয়ে ছেড়ো।'

সুতরাং সেদিকটা ঠিকই আছে। ঠিক আছে শরীরটাও। না, অঘটন ঘটেনি কিছু সেদিনের দুর্ঘটনার সূত্রে। আঙ্কেল রোজই ফোন করেন।— 'কেমন আছ, মাদার?' এই একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলতেও চোখে জল এসে যায় ঈশানীর। টিচারদের এখনও উনি এত রেসপেক্ট করেন! নয়তো, সেদিনের সেই চূড়ান্ত হেনস্থার পরেও মা-বাবা কারো কাছে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি ঈশানী। না, নীলের কাছেও নয়। শুধু গুম হয়ে বসে ভেবেছে, চাকরি না হয় সে ছেড়েই দেবে, কিন্তু, এত বড় অসম্মানের শোধ তুলবে কিভাবে? কোথায় যাবে? কার কাছে প্রতিকার চাইবে? কোর্টে যাবে, না শিক্ষামন্ত্রীর কাছে?

শৈলেনদাই নামটা বলেছিলেন, বলেছিলেন— 'তুমি একবার ওঁর কাছে চাও।' একই কথা বলেছিলেন রত্না বউদিও। — 'তুমি একবার যাও।' ওঁকে সব বলো। সব উনি জানেন না। জানানোও হয় না। তবু একবার যাও। এত অন্যায় আর সহ্য করা যাচ্ছে না।'

কিন্তু, উনিও তো পার্টিরই লোক?

শৈলেনদা একটু হেসে বলেছিলেন— 'তা ঠিক। তবে পার্টিও ওঁর সুনাম আর ব্যক্তিত্বকে ভয় পায়।'

ঠিকানাটা মোটামুটি বলতে পেরেছিলেন শৈলেনদা। কিন্তু ফোন নাম্বারটা দিতে পারেননি।

তাই বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই আসতে হল।

নেমপ্লেটটা আরও একবার ভালো করে পড়ল ঈশানী। ঠিকই আছে— ডক্টর অরুণেন্দু মৈত্র, এম পি। বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট। যাদবপুরেও ওঁকে দু-একবার দেখেছে ঈশানী। এই মাপের একজন আরশিনগরের মতো একটা অখ্যাত কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট! ভাবা যায় না।

গেটেই একজন উর্দিপরা পাহারাদার বসে ছিল। ঈশানীকে দেখেই গেটের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল— 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

ঈশানী শুকনো মুখে মাথা নাড়ল— 'নেই।'

— তাহলে দেখা হবে না।

— উনি কি আছেন?

— আছেন, তবে দেখা হবে না।

ঈশানী বলল— 'আমি খুব বিপদে পড়ে ওঁর কাছে এসেছি। আরশিনগর কলেজের শৈলেনবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন। এই আমার নেমকার্ড। দয়া করে একটিবার ওঁকে খবরটা দিন না। উনি না বললে চলে যাব।'

পাহারাদার কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ কুঁচকে পড়ে দেখল। তারপর ঈশানীকে দাঁড়াতে বলে গেটের পাশের খুপরি ঘরে ঢুকে ইন্টারকমের বোতাম টিপতে লাগল।

কয়েক মিনিট পর বাড়ির ভেতর থেকে ঈশানীরই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলে বেরিয়ে এল। পাহারাদার তার হাতে কার্ডটা দিয়ে নিচু গলায় কিসব বলল। ছেলেটি কার্ডটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

এক মিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট। ঈশানীর বুক ধক্‌ধক্ করছে। এমন সময় ছেলেটি আবার বেরিয়ে এসে ঈশানীকে বলল— 'আসুন।'

পাহারাদার গেটের তালা খুলে দিতেই ঈশানী ঢুকে পড়ল ভেতরে। বাগান পার হয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে ছেলেটি বলল— 'বসুন। স্যার দোতলায় আছেন।'

বেশ বড় ঘর। একটা বড় সেন্টার টেবিলের চারধারে অনেকগুলো চেয়ার। তারই একটিতে ঈশানী বসল। ভেতরের দিকের দরজার পর্দা টেনে দিয়ে ছেলেটি চলে গেল সম্ভবত দোতলায়।

গোটা বাড়িটাই নিঝুম। মাঝে মাঝে শুধু কোথা থেকে বোধহয় কোনও একটা পোষা পাখির ডাক ভেসে আসছে। ঘরের এক কোণে এ্যাকোয়ারিয়াম। সময় কাটানোর জন্য ঈশানী গালে হাত দিয়ে সেদিকেই চেয়ে বসে রইল। সেখানে তখন নানা রঙের মাছ খেলা করছে।

উনি কি এত বড় বাড়িতে একাই থাকেন? খুব আবছাভাবে কোথায় যেন শুনেছিল ঈশানী, ওঁর ছেলে বিদেশে থাকেন। স্ত্রীও মাঝে মাঝে চলে যান ছেলের কাছে।

প্রায় দশ মিনিট গালে হাত দিয়ে ঠায় বসে রইল ঈশানী। কে জানে, ঢুকতে দিলেও দেখা হবে কিনা। তারপর হঠাৎই পর্দা তুলে সেই ছেলেটি মুখ বাড়িয়ে ঈশানীকে বলল— 'আপনি দোতলায় আসুন, স্যার ডাকছেন।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যে ঘরটিতে ঈশানীকে ঢোকার ইঙ্গিত করল ছেলেটি, দরজার পাশে কাঠের ফলকে লেখা সেই ঘরের পরিচিতি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঈশানী। ফলকে লেখা আছে— 'লাইব্রেরী।'

ছিঃ ছিঃ! এরকম একজন মানুষকে পড়াশুনার সময় এসে ডিস্টার্ব করল সে!

ছেলেটি ঈশানীর ইতস্ততভাবে দেখে একটু হেসে বলল— 'কিছু ভয় নেই। যান।'

পর্দা সামান্য ফাঁক করে ঈশানী দেখল বিশাল ঘরের চারধারে কাঠের র‍্যাকে থরে থরে সাজানো অজস্র বইয়ের সম্ভার। মাঝে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সামনে গদি আঁটা একটি চেয়ার। উল্টোদিকেও সাজানো আরও কয়েকটি চেয়ার। তবে আসল মানুষটি সেখানেও নেই। দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তিনি বসে আছেন ঘরের কোণে রাখা অন্য একটি চেয়ারে। সামনে টেবিলে খোলা আছে কম্পিউটার। নিবিষ্ট মনে সেখানে কি যেন দেখছেন।

ঈশানীর গলা শুকিয়ে গিয়েছে। কোনওক্রমে বলল— 'আসব স্যার?'

হাতের ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে আসতে বলে মানুষটি আবার ডুব দিলেন কম্পিউটারে। ফলে ভেতরে ঢুকে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈশানী। কোথায় বসবে বুঝতে পারছিল না। বুকটা ভীষণই ধক্‌ধক্ করছে।

আর ঠিক তখনই চেয়ার ঘুরিয়ে ঈশানীর মুখোমুখি হলেন মানুষটি। কাঁচা-পাকা চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, পরনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উল্টোদিকে একটি চেয়ার দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'বসুন।'

— থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

— বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আমি কাউকে অ্যালাউ করি না।

ঈশানী মুখ নিচু করে বলল— 'স্যরি, স্যার।'

—ইন ফ্যাক্ট, দু-একদিনের মধ্যে আমি নিজেই আপনাকে ডেকে পাঠাতাম।

শুনে ঈশানী চমকে উঠল। — 'মানে?'

— আপনার বাবা রাধানগর কলেজের প্রিন্সিপাল?

ঈশানী মাথা নাড়ল। — 'হ্যাঁ।'

— ওই কলেজ থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল।

ঈশানী কম্পিতস্বরে জিজ্ঞেস করল— 'কে ফোন করেছিলেন? আমার বাবা?'

— না। ওঁরই এক সহকর্মী। গৌতমবাবু। আমার সহপাঠী এবং বিশিষ্ট বন্ধু। ওর মুখ থেকেই ঘটনাটা শুনেছি। টিভি, খবরের কাগজ আমার দেখা হয়নি। ঘটনার দিন আমি ফ্লাইটে ছিলাম। ইউ এস এ থেকে একটা কনফারেন্স সেরে ফিরছিলাম।

ঈশানী চুপ করে রইল।

— তারপর আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে ফোনে কথা বলি। আপনার এগেনস্টেও অনেক চার্জ আছে। ভালোই হয়েছে, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলেও আপনি এসেছেন। একথা কি ঠিক, আপনি ক্লাসে পড়াতেই পারতেন না?

ঈশানীর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। তবু এই তার শেষ সুযোগ। নিজেকে শক্ত করে সামলে নিয়ে বলল— 'আমাকে পড়াতে দেওয়াই হয়নি, স্যার।'

— মানে?

ঈশানী পুরো ব্যাপারটা বলল।

অরুণেন্দু মৈত্র কম্পিউটারের সামনের চেয়ারটা ছেড়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনের চেয়ারটায় ঈশানীর মুখোমুখি এসে বসলেন।

তারপর বললেন— 'এরকম কখনও হতে পারে?'

ঈশানী বলল— 'হয়েছে স্যার।'

— বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ঈশানী চুপ করে রইল। সত্যিই সে অসহায়। তার তো কোনও সাক্ষী নেই।

— আপনি প্রিন্সিপালকে জানিয়েছিলেন?

ঈশানী মাথা নাড়ল— 'না।'

— সেকি! কেন?

— ওঁকে বলে কোনও লাভ হত না। কারণ, উনি চাননি আমি ওই কলেজে জয়েন করি। আমার পোস্টে উনি ওঁর এক আত্মীয়াকে ঢোকাতে চাইছিলেন।

— আপনার কথার কোনও প্রমাণ আছে?

— আমাকে আমার ডিপার্টমেন্টের হেড শৈলেনবাবু একথা বলেছিলেন।

— সেটা কোনও প্রমাণ নয়।

— আপনি সার্ভিস কমিশনে খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমার আগে অন্তত দু'জন ক্যান্ডিডেটকে উনি এটা- সেটা বলে প্র্যাকটিক্যালি তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। শুধু আমিই জেদ করে জয়েন করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, ভুল হয়েছিল।

— আপনার একথারও কোনও প্রমাণ নেই। আগের ক্যান্ডিডেটরা স্বেচ্ছায়ও ছেড়ে দিতেই পারেন। কলকাতা থেকে অত দূরের কলেজে চট্ করে কেউ জয়েন করতে চায় না।

ঈশানী মরিয়া হয়ে বলল— 'কিন্তু সেদিন আমার চূড়ান্ত হেনস্থা হয়েছে, একটু তো মানবেন?'

— তার জন্য তো আপনিই দায়ী।

— আমি!

— হ্যাঁ। প্রিন্সিপালের মুখে শুনলাম, আপনি স্টুডেন্টদের গালাগাল করেছেন।

ঈশানীর কানদুটো আবারও ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। বোঝা গেছে। এই ভদ্রলোককেও বোঝা গেছে। যত বড় সায়েন্টিস্টই হোন, পার্টির ওপরে এঁরা উঠতে পারেন না।

একটু হাসল ঈশানী। তারপর বলল— 'যদি আমার কথার প্রমাণ না থাকে স্যার, তবে প্রিন্সিপালের কথারও কোনও প্রমাণ নেই।'

— তবুও আপনাদের দু'জনের মধ্যে প্রিন্সিপালের কথাকেই আমি বেশি গুরুত্ব দেব।

— কেন স্যার?

— বিকজ হি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল।

ঈশানীর মুখ দিয়ে অজান্তেই একটা শব্দ ছুটে বেরিয়ে এল— 'বাঃ!'

— এতে অবাক হবার তো কিছু নেই! স্টুডেন্টরা বলেছে আপনি ওদের গালিগালাজ করেছেন। প্রিন্সিপাল ওদের কথা শুনে আমাকে সেই রিপোর্টটাই দিয়েছেন।

— আমি গালাগালি করিনি স্যার। ওরা রোজ ঝামেলা করত। সেদিন রেগে গিয়ে গোটা ক্লাসকে দাঁড় করিয়ে আমি রুম ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

— তার মানে, আপনি ইনএফিসিয়েন্ট। প্রিন্সিপাল তো ঠিকই বলেছেন। পড়াতেই পারেন না।

ঈশানী উঠে দাঁড়াল। আর এখানে বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না। সমাজটা কি সত্যিই এরকমই হয়ে গিয়েছে? কারও কাছে কোনওরকম প্রতিকার পাওয়ার আশা নেই?

হয়তো তাই। ক্লাসরুম, লাইব্রেরি আর নিরিবিলি সংসারের ঘেরাটোপে থাকায় ঈশানী কিছুই টের পায়নি।

— থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গুড বাই। স্যরি, আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।

— হ্যাভ আই আস্কড ইউ টু লিভ? আমি কি আপনাকে চলে যেতে বলেছি?

— না, স্যার। তবে আমার মনে হচ্ছে....

কথার মাঝেই তীব্র শব্দে টেবিলের পাশের বেলটা বাজিয়ে দিলেন অরুণেন্দু মৈত্র। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে হাজির হল আগের দেখা সেই কমবয়েসী ছেলেটি।

অরুণেন্দু বললেন— 'বিকাশ, টেক দিস ইয়াং লেডি টু দ্যা নেক্সট রুম। ... আপনি এর সঙ্গে পাশের ঘরে যান।'

ঈশানী অবাক হয়ে বলল— 'কেন, স্যার?'

— ওঘরে কম্পিউটারে বসে আপনার যাবতীয় অভিযোগ টাইপ করুন। বিকাশ... দু'কপি প্রিন্ট নিয়ে নেবে। এক কপি ওঁর, আর এক কপি আমার, পুরো নাম সাইন করিয়ে নেবে।

এ আবার কি অত্যাচার?

ঈশানীর আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সে বলল— 'স্যর, আমি বাড়ি গিয়ে যা হয়...'

অরুণেন্দু কড়া সুরে বললেন— ‘নো। যা বলছি, তাই করুন। পরশু আমি দিল্লি চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে চলে যাব সিঙ্গাপুর। যা বলছি, তাই করুন গিয়ে।’

ঈশানী ভয় পেল না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষের আর ভয় থাকে না।

স্থির গলায় বলল— ‘আর কিছু লিখতে আমার ইচ্ছে করছে না, স্যার। তবে আপনি যখন বলছেন, তখন আমার রেজিগনেশন লেটারটাই লিখে দিয়ে যাচ্ছি।’

অরুণেন্দু মৈত্রও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন— ‘সেটাও লিখে দিয়ে যেতেই পারেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, লিখিত অভিযোগ না দিলে আপনার রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট করা হবে না।’

— তার মানে আমাকে....

— হ্যাঁ, লিখতেই হবে। যান, ওঘরে যান, যা বলা হয়েছে করুন গিয়ে।

ঈশানী চলে যাবার পর এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অরুণেন্দু। তারপর মোবাইলের বোতাম টিপতে লাগলেন।

— হ্যালো, গৌতম? অরুণেন্দু বলছি।

— হ্যাঁ, বলো। মেয়েটিকে খবর পাঠিয়েছ?

— খবর পাঠাতে হয়নি। নিজেই চলে এসেছে।

— তাই নাকি? কি বুঝলে ব্যাপারটা?

— অরুণেন্দু হাসলেন।

বললেন— ‘যা বোঝার সবই বুঝেছি। যা করার করব। তবে একটা রিকোয়েস্ট। তুমি এখনই মেয়েটির বাবাকে বোলো না কিছু।’

ও প্রান্তে গৌতমও হাসলেন।

যা বোঝার তিনিও বুঝে গিয়েছেন।

।। নয় ।।

আগে বলতেন, কেল্লা ফতে।

এখন বলেন, অপারেশন সাকসেসফুল।

কথাটা অনাদি মৌলিকই শিখিয়েছে তাঁকে। এখন কোনও কাজ মনোমত সারতে পারলে নিজের মনে একথাটাই আওড়াতে থাকেন আরশিনগর কলেজের প্রিন্সিপাল রবিরঞ্জন মহাপাত্র।

যা করতে চেয়েছিলেন, করতে পেরেছেন। তাড়িয়ে ছেড়েছেন কলকাতার ময়না ওই ঈশানী দত্তরায়কে। অনাদি মৌলিকই তাঁকে শিখিয়েছে, হাতে মাথা না কাটলে আবার প্রিন্সিপাল কিসের? কোনওরকম নিয়ম নীতি বা আইন কানুনের তোয়াক্কা করার দরকার নেই, তিনি প্রিন্সিপাল, তাঁর ইচ্ছাই শেষ কথা। তিনি চাইছেন না, অতএব ঈশানী দত্তরায় থাকবে না। আবার তিনি চাইছেন, তাই ওই পোস্টে যোগ দেবে তাঁরই দূর সম্পর্কের ভাগ্নি। বিপদ? কিসের বিপদ? তেমন কিছু হলে পার্টি দাঁড়াবে।

অনাদি মৌলিকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। বলতে কি, তাঁর সাহস আর আত্মবিশ্বাস দুটোই এই ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে বেড়ে গেছে। সেইজন্য মাঝে মাঝেই তিনি অনাদিকে বলেন— ‘আপনিই তো আসল প্রিন্সিপাল, আমি তো নাম কা ওয়াস্তে।’

দিব্যি চলছিল। হঠাৎই কাল রাতে কলকাতা থেকে গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ডক্টর অরুণেন্দু মৈত্রের টেলিফোন। আজই বেলা বারোটায় গভর্নিং বডির একটা ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকতে হবে। বিষয়, অধ্যাপিকা ঈশানী দত্তরায়ের অভিযোগপত্র।

মানে? কিসের অভিযোগপত্র?

একজন টিচার পড়াতে পারতেন না। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ করেছে, ওদের বয়স কম, তাই কলেজে কিছু ভাঙচুর, অশান্তি হয়েছে, আরও বেশি যাতে অশান্তি না হয় সেজন্য প্রিন্সিপাল তাঁকে ছুটিতে থাকতে অনুরোধ করেছেন। এই তো। এর বেশি তো কিছু নয়!

কিন্তু ফোনে প্রেসিডেন্ট খুব শান্তভাবেই বলেছেন, মিটিং ডাকতেই হবে, আর যা বলার প্রিন্সিপাল যেন মিটিংয়েই বলেন। আর হ্যাঁ, ওই মিটিংয়ে যেন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের বর্তমান হেড শৈলেনবাবুকেও ডেকে নেওয়া হয়।

খবরটা কাল রাতেই অনাদি মৌলিককে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল নিজে। গভর্নিং বডিতে অনাদি শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি। আজ সকালেই অনাদি জানিয়েছে, পার্টির নির্দেশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে প্রেসিডেন্টের কাছে। ওই অভিযোগপত্র খারিজ করে দিতে হবে। প্রেসিডেন্ট যত বড় সায়েন্টিস্টই হোন, আসলে তো পার্টির এম পি। পার্টির নির্দেশ তিনি মানতে বাধ্য।

সুতরাং প্রিন্সিপাল মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় মিটিং শুরু হওয়ার ঠিক আধঘন্টা আগে, প্রেসিডেন্টের নাকের ডগায় একপশলা ছাত্রবিক্ষোভ হয়ে গিয়েছে। অনাদিই ব্যবস্থাটা করেছিল। প্রেসিডেন্টকে স্লোগান শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে— ‘অপদার্থ ঈশানী ম্যাডাম, গো-ব্যাক, গো-ব্যাক।’ কলেজের দেওয়ালে ইতিউতি লাগানো হয়েছে পোস্টার।

প্রেসিডেন্ট সবই দেখেছেন, সবই শুনেছেন। কিন্তু একটিও মন্তব্য করেননি। শুধু একবারই প্রিন্সিপালকে বলেছেন, ‘আশপাশে যাই হোক না কেন, মিটিং যেন ঘড়ি ধরে বারোটাতেই শুরু হয়।’

তাই হয়েছে, আর মিটিংয়ের শুরুতেই প্রেসিডেন্ট একটা খাম প্রিন্সিপালের হাতে ধরিয়ে বলেছেন— ‘এটা রাখুন।’

— এটা কি?

— আপনার কপি। প্রোফেসর ঈশানী দত্তরায়ের অভিযোগপত্র।

অনাদি মৌলিকের চোখের ইঙ্গিতে ছাত্র সংসদের প্রতিনিধি

সুরঞ্জন প্রামাণিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল— 'আমাদেরও অভিযোগপত্র আছে। ওঁর বিরুদ্ধে।'

— দেখি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন ডক্টর অরুণেন্দু মৈত্র। তারপর পকেট থেকে কলম বার করে কয়েকটা দাগ দিয়ে চিঠিটা শৈলেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'আমি সায়েন্সের লোক, ইংলিশের লোক তো নই, তবু মনে হচ্ছে, এক পাতার চিঠিতে অন্তত পাঁচটা বানান ভুল। একটু দেখুন তো।'

সুরঞ্জনের মুখ শুকিয়ে গেল। অনাদির মুখের দিকে তাকাল। অনাদি তড়িঘড়ি বলল— 'কিন্তু, অভিযোগগুলো তো আর মিথ্যা নয়। মোট কথা, ঈশানী দত্তরায় পড়াতে পারতেন না।'

অরুণেন্দু শৈলেনবাবুর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন— 'আপনার কাছে জানতে চাইছি, কথাটা কি ঠিক?'

শৈলেন মনস্থির করেই এসেছিলেন। অনেক হয়েছে, আর নয়। মাথা নেড়ে বললেন— 'বাজে কথা। মেয়েটিকে পড়াতেই দেওয়া হয়নি।'

সুরঞ্জন মুখিয়ে উঠল— 'আপনি কি করে জানলেন? আপনি কি ওই ক্লাসে ছিলেন?'

শৈলেনও পাল্টা বললেন— 'তুমি নিজেও কি ছিলে? তুমি তো ছ-বছর আগে এই কলেজ থেকে পাশ করে গিয়েছ।'

— তার মানে আমরা মিথ্যে বলছি?

অরুণেন্দু বললেন— 'আপনার চিঠিতে ছাত্রছাত্রীদের সই নেই কেন? ঈশানী ম্যাডাম ঠিকমত পড়াতে না পারলে ওরাই তো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। তা ওদের সই কোথায়?

— আমি ওদের প্রতিনিধি। আমার সই-ই যথেষ্ট।

অরুণেন্দু একটু হেসে মাথা নেড়ে বললেন— 'বোধহয় না। শৈলেনবাবু ঠিকই বলেছেন। আপনি তো আর ওঁর ক্লাসে ছিলেন না।'

বেগতিক দেখে অনাদিই হাল ধরে বলল— 'কিন্তু উনি স্টুডেন্টদের গালাগাল করেছেন, সোয়াইন, বাস্টার্ড আরও কি কি সব বলেছেন।'

অরুণেন্দু প্রিন্সিপালকে বললেন— 'ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে অন্তত পাঁচজনকে ডাকুন। আমি নিজে ওদের জিজ্ঞেস করব।'

হচ্ছেটা কি? প্রিন্সিপালের মুখ শুকিয়ে গেল। পার্টির নির্দেশ কি তাহলে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছায়নি? গোড়া থেকেই সব যেন বেসুরে বাজছে!

সুরঞ্জন বলল— 'মিটিংয়ের মধ্যে এভাবে স্টুডেন্টদের ডাকার নিয়ম নেই।'

অরুণেন্দু আবারও একটু হেসে বললেন— 'সে তো অনেক কিছুই নিয়মে নেই। অনার্সের ক্লাসে চল্লিশ জনের জায়গায় দেড়শোজনকে ভর্তি করানোও তো নিয়মে নেই।'

আশ্চর্য! এসব উনি জানলেন কি করে? বছরে দুটো-তিনটের বেশি মিটিংয়ে তো ওঁকে পাওয়াই যায় না। ভাইস প্রেসিডেন্টকে দিয়ে মিটিং চালাতে হয়।

অরুণেন্দু চোখ থেকে পুরু কাঁচের চশমাটা খুললেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে ধীরে সুস্থে কাঁচটা মুছতে মুছতে বললেন— 'ভাবছেন, কি করে জানলাম? সবই জানি। কিভাবে তা অবশ্য বলব না। প্রথমত, আমি সায়েন্টিস্ট, সব কিছু খুঁটিয়ে দেখা এবং জানাই আমার স্বভাব। আর দ্বিতীয়ত, আমি এম পি। সোর্স এবং পাওয়ার দুটোই কিন্তু আমার আছে।'

দু-এক মিনিট কারও মুখেই কথা নেই।

নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে অরুণেন্দুই বললেন— 'শুধু একটা কথাই জানতে পারিনি। তখন আকাশপথে উড়ছিলাম। কলেজে প্রেস আর টিভিকে কে ডেকে আনলেন?.... আপনি?'

নিজেরই অজান্তে চমকে উঠল অনাদি মৌলিক। অরুণেন্দু সেটা লক্ষ্য করলেও ভাবলেশহীন স্বরে বললেন— 'ভবিষ্যতে এই কলেজে আমার পারমিশান ছাড়া এই কাজ যেন আর কেউ না করেন। কথাটা মনে রাখবেন।'

অবস্থা খুবই খারাপ দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন— 'ঠিক আছে। আমরা না হয় মেয়েটিকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি।'

— তার আর দরকার হবে না।

— মানে?

পকেট থেকে আরেকটা খাম বার করে প্রিন্সিপালের দিকে এগিয়ে দিয়ে অরুণেন্দু বললেন— 'আপনার কপি। মেয়েটি রিজাইন করেছে।'

— ও!

— দয়া করে আজকের মিটিংয়েই এটা অ্যাকসেপ্ট করুন। আর হ্যাঁ, মেয়েটি এখানে কতদিন কাজ করেছে?

প্রিন্সিপাল কর গুণে বললেন— 'বারো দিন।'

— আলমারি খুরে স্যালারি চেকবুকটা বার করুন। অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছেন?

প্রিন্সিপাল ঘাড় নাড়লেন। আছেন।

—পোস্টডেটেড চেকে বারো দিনের মাইনে হিসেব করে লিখে দিতে বলুন। এক্ষুনি। হাতে সময় নেই আমার।

প্রিন্সিপাল বেল বাজিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডাকলেন। অ্যাকাউন্ট্যান্টকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়া হল।

অরুণেন্দু বললেন— 'এই ফাঁকে রেজলিউশানটা তৈরি করে ফেলুন।'

এক লাইনের রেজলিউশান। প্রোফেসর ঈশানী দত্তরায়ের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

অরুণেন্দু বললেন— 'সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আমার বন্ধু। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, আমাকে না জানিয়ে ঈশানী দত্তরায়ের পোস্টে যেন কোনও ক্যান্ডিডেট না পাঠানো হয়।'

প্রিন্সিপালের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনওক্রমে

বললেন— 'ও, আচ্ছা।'

অ্যাকাউন্ট্যান্ট চেক নিয়ে এসেছেন। সইসাবুদ হয়ে যাওয়ার পর অরুণেন্দু চেকটা হাতে নিয়ে শৈলেনবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'মেয়েটিকে পৌঁছে দেবেন। মিটিং শেষ। আসুন আপনারা।'

।।দশ।।

''আমি খুব ভালো বাংলা লিখতে পারি না। চিঠিপত্র লেখার তো একেবারেই অভ্যেস নেই। আজকাল কে-ই বা লেখে বলুন? আমরা এস এম এস করি। কিংবা ই-মেল। কিন্তু আপনার ই-মেল আই-ডি আমি জানি না। শুধু অ্যাড্রেসটা জানি। সেদিন আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে নেমপ্লেট থেকে আপনার ঠিকানাটা মেলাচ্ছিলাম। তাই ওটা আমার মনে আছে।

আপনি যেন কোথায় যাবেন বলেছিলেন। ফিরে এসে হয়তো আমার চিঠিটা পাবেন। আপনার ফোন নাম্বারও জানি না। তাই হয়তো আর কোনওদিনও আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগও হবে না।

শৈলেনদার মুখে আমি সবই শুনেছি। কাল আমাদের বাড়িতে এসেই উনি আমার বারোদিনের স্যালারি চেক দিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে গভর্নিং বডির রেজলিউশানের একটা কপি। আমার রেজিগনেশান অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে।

ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে ছোট করব না। তবে সত্যিই সেদিন আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি। খুব রাগ হয়েছিল আপনার ওপর। মনে হচ্ছিল, জবরদস্তি করতে আপনিও কিছু কম নন।

আমি ওখানে চাকরি নিয়েছিলাম সবার অমতে। আমার মা-বাবার অমতে, আমার হাজব্যান্ডের অমতে। এমনকি, আমার শ্বশুরমশাই, যিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন, আমার কোনও কাজে বাধা দেন না, তিনিও দোনামোনা করেছিলেন। তাছাড়া ওখানে জয়েন করার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার প্রেগন্যান্সি ধরা পড়ে। তাই অতদূরের চাকরি আমি করতে পারতাম না। প্রিন্সিপাল আমাকে ছুটিও দিতেন না। সব মিলিয়ে বুঝতে পারছিলাম, ওই চাকরি আমাকে ছাড়তেই হত।

কিন্তু যা আমি মানতে পারিনি, সেটা আমার অকারণ হেনস্থা। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ। এত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই আমি আপনার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। নয়তো, দু-লাইনের রেজিগনেশান লেটার আমি পোস্টেই পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

আপনি শুনে খুশি হবেন, আমি আবার আমার পি এইচ ডি-র কাজে ফেরত যাচ্ছি। এখন মন দিয়ে শুধু এই একটা কাজই করব। তারপর কি হবে জানি না, যদি কোনওদিন কোথাও মানসম্মান নিয়ে চাকরিই করতে পারি, করব।

তবুও আরশিনগরে এই অল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা আমি বোধহয় কোনওদিনই ভুলব না। এতদিন আমি যেন একটা ঘেরাটোপের মধ্যে ছিলাম, লেখাপড়া ছাড়া কিছুই জানতাম না। বুঝতাম না। আমার চারদিকে আমি যা কিছু দেখেছি, তার প্রায় সব কিছুই ভালো। মন্দ আমি দেখিনি। কষ্ট দেখিনি, অভাব দেখিনি। এমনকি, কলকাতার মেয়ে বলে ভালো করে প্রকৃতিও দেখিনি। আরশিনগর এক এক করে আমাকে সবই চেনাল। নিজেকে এখন যেন কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছে।

আপনাকে জানাই, বারোদিনের ওই স্যালারি-চেকটা আমি শৈলেনদার হাতেই আবার ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। ভেবে দেখলাম, ওই টাকায় আমার কোনও অধিকার নেই। যে কোনও কারণেই হোক, পড়াতে তো পারিনি। না পড়িয়ে টাকা নেব কেন?

আপনার কাছে রোজ তো কত চিঠিও আসে। তবুও একটু সময় করে আমার চিঠিটা পড়বেন। আপনি ব্যস্ত মানুষ, তাই উত্তরের আশা করি না।

প্রণাম নেবেন।।'' ঈশানী

চিঠিটা পড়ে একটু হাসলেন অরুণেন্দু মৈত্র।

একটু আগেই তিনি একটা ফোন পেয়েছিলেন। ফোনটা করেছিলেন কলকাতা থেকেই পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। খুবই বিনীতভাবে তিনি জানিয়েছেন, অনিবার্য কিছু কারণবশত আগামী নির্বাচনে পার্টি আর তাঁকে প্রার্থী করতে পারছে না।

তখনও এরকমই একটু হেসেছিলেন ডক্টর অরুণেন্দু মৈত্র।

এক স্বয়ংসেবকের কথা

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

বিজয় আঢ্য

না, বড় গণ্ডগোল হয়ে গেছে।
কেন, কী হলো?
আরে আমার পকেটে চারটে পয়সা ছিল। তার মধ্যে একটা অচল। আমি সেই পয়সাটাই সব্জিওয়ালা বুড়িকে দিয়ে এসেছি। ওই বুড়ি কি ভাববে বলো তো? চলো, ওকে ঠিক পয়সাটা দিয়ে আসি।

সব্জিওয়ালি বুড়ি তো প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। যখন বুঝল, তখন বলল, আরে তোমার অচল পয়সা এখন কে খোঁজে? যা দিয়েছ, দিয়েছ, এখন যাও।

কিন্তু বুড়ির কথা শোনে কে? বুড়ির থলি থেকে নিজেই খুঁজে সেই অচল পয়সাটা বার করল। তারপর পকেট থেকে একটা ভালো পয়সা বার করে বুড়িকে দিল।

বুড়ির চোখ দুটো কেমন যেন ছলছল করে উঠল। বললে, তুই বড় ভালো রে বেটা। ভগবান তোর মঙ্গল করবে।

ঘটনাটা ১৯৪০ সালের। এর মধ্যে এমন আরও অনেক ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু কখনও একটা ঘটনার কথাও বলেননি। একালে এরকম ব্যবহার কেউ করে না— এই অহঙ্কার স্পর্শ করতে পারেনি। এই মহত্ত্ব যেন সহজাত!

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে নানাজী দেশমুখ ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করেছেন। দীনদয়ালজী তখন আগ্রায় এস এস সি পড়তে এসেছেন। একটি ঘর ভাড়া করে নানাজীদের সঙ্গেই রয়েছেন। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবনাবসানের পর পরেই উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের প্রসারের জন্য তখন নানাজী ও জুনাদেজীকে আগ্রায় পাঠানো হয়েছিল। এরপর তো গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার ছোট একটা গ্রাম। নাম নগলা চন্দ্রভান। চারদিকের সবুজের সমারোহের মাঝে ছোট্ট গ্রামটিকে বেশ দেখায়। এই গ্রামের পাশ দিয়েই একটা রাস্তা চলে গিয়েছে সেই ফরহ পর্যন্ত। সেখান থেকে সামান্য দূরেই মথুর-আগ্রা রোড। এই গ্রামেই বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত হরিরাম উপাধ্যায়ের বাড়ী। কিন্তু বিধির বিধান এমনই, যিনি অপরের ভাগ্য বাৎলে দিতেন, অকালে ভাগ্যদোষে তিনিই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।

পরের প্রজন্মের পুরুষেরাও বেশিদিন পৃথিবীতে থাকেননি। হরিরামজীর তিন পুত্র— ভূদেব, রামপ্রসাদ আর রামপ্যারাও অকালে চলে গেলেন। রইলেন তাঁদের বিধবারা আর বংশে বাতি দেবার জন্য রামপ্রসাদজীর একমাত্র পুত্র ভগবতী প্রসাদ।

দিন তো আর কারও জন্য বসে থাকে না। ভগবতী প্রসাদজীও বড় হলেন। রামপেয়ারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়েও হলো। কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। তাই বুঝি রেলদপ্তরে চাকরিও পেলেন। কিন্তু চাকরি হলে কী হবে, তাঁকে বেশিরভাগ সময়টা বাইরেই থাকতে হোত। যখন পুত্রমুখ দেখলেন, তখন আর্থিক কষ্ট যতই থাক না কেন, আনন্দের কোনও পরিসীমা রইল না। তিথিটা ছিল, আশ্বিন, কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। নাম রাখলেন— দীনদয়াল। আদর করে ডাকতেন— দীনা। জ্যোতিষীরা কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন, দীনা খুব বড় হবে বটে, তবে বৈরাগী হবে। সংসারধর্ম তার কপালে নেই। পুত্র সিদ্ধার্থের কোষ্ঠীবিচার শুনে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের যেমন মনে হয়েছিল, ভগবতী প্রসাদেরও বোধহয় তাই হলো। তাহলে বংশে বাতি দেবে কে? দ্বিতীয় পুত্র শিবদয়াল রামপেয়ারী দেবীর কোলে আসাতে সে আশঙ্কা অবশ্য কেটেছিল। কিন্তু বিধাতার লীলা কী সহজে বোঝা যায়!

পারিবারিক কলহ-ঝঞ্ঝাটের কারণে ভগবতী প্রসাদ ছেলেদের নিয়ে স্ত্রী রামপেয়ারী দেবীকে নানিহালে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজে মা-কাকিমাকে নিয়ে জলসরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেসময় সেখানে তিনি সহকারী স্টেশন মাস্টার ছিলেন। দীনাদের মামার বাড়ির পরিবার বেশ বড়। মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে করতে বেলা যে কখন বয়ে যেত দীনার তা খেয়াল থাকত না। এমন সময়েই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবরটা এসে পৌঁছাল। ভগবতী প্রসাদ আর নেই। রামপেয়ারী দেবীর কাছে তখন সব কিছুই শূন্য মনে হলো। দীনার বয়স তখন তিন। আর ভাই পিনুর এক।

কথায় আছে, বিপদ একা আসে না। শোকে-দুঃখে রামপেয়ারী দেবীর শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ল। শরীরে বাসা বাধল ক্ষয় রোগ। তারিখটা ৮ আগস্ট, ১৯২৪। রামপেয়ারী দেবী চোখ বুজলেন। বাবা যখন গেলেন, দীনারা তখন খুবই ছোট। বোঝার বয়স হয়নি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুতে দু'ভাই বিমূঢ় হয়ে গেল। সাত বছর বয়স হয়ে গেলেও দীনার পড়াশোনার কোনও ব্যবস্থা তখনও হয়নি।

চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দাদু চুন্নীলাল নানিহালেই ফিরে এলেন। দিদিমা আর মামীমার স্নেহের স্পর্শে দু'ভায়ের মন আবার ফিরল। বাড়িতে তাঁদের লেখাপড়া শেখানোর একটা ব্যবস্থা হল বটে, তবে তাতে কাজের কাজ কিছু হল না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলতে খেলতেই তাদের সময় কেটে যায়।

এসময়েরই একটি ঘটনা। রাত তখন এগারোটা। তখন কেউ ঘুমোতে যায়নি। বরং মামীমা আর কয়েকজন দিদি-মাসির সঙ্গে গল্প করছেন। দীনা মামীমার কোল ঘেঁষে বসে সেসব শুনছে। হঠাৎ জনা দশ-বারো ডাকাত বাড়িটা ঘিরে ফেলল। একটা ডাকাত তো মামীমার কাছ থেকে দীনাকে কেড়ে নিয়ে বুকের ওপর বসে হুঙ্কার ছাড়ল, এখনই যা আছে তা দে। নইলে এই বাচ্চাটাকেই শেষ করে দেব।

বড়দের প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে গেলেও দীনা কিন্তু ভয় পায়নি। আসলে ছোটরা যা শোনে, তাই বলে। দীনাও তাই বলে উঠল, আরে, শুনেছি ডাকাতরা বড়লোকদের টাকা লুঠ করে গরীবদের বিলোয়। আর তোমরা আমাদের মতো গরীবদেরই মারছো! তোমরা কেমন ডাকাত?

কথাটায় ফল হয়েছিল। ডাকাত সর্দার এরপর আর থাকেনি। দলবল নিয়ে চলে গিয়েছিল।

দীনার বয়স তখন নয় হবে। গ্রামের শনি দেবতার পূজারী ছিলেন গেন্দালালজী। তাকে উত্যক্ত করে দু'ভাই খুব মজা পেত। কখনও পুজোর থালা কখনও পাগড়ি, কখনও বা শনিদেবতার মূর্তিটি লুকিয়ে রাখত। এতে গেন্দালালজী বেশ হয়রান হতেন। এতেই দু'ভাইয়ের মজা। গেন্দালালজী এমনিতে বেশ ভাল মানুষ। ওদের দুষ্টুমিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। কিন্তু সেদিন দীনার মামার মুখোমুখি পড়ে যাওয়াতেই ব্যাপারটাকে আর আড়াল করা গেল না। ঘন্টাখানেক খুঁজেও শনিদেবতার বিগ্রহটি তখনও তিনি পাননি। একটু ঘেমেও গেছেন। মামাকে তাই ভাগ্নেদের দুষ্টুমির কথা বলতেই হলো গেন্দালালজীকে। রোজ শনিবারই দু'ভাই এরকম তার জিনিসপত্র, এমনকী দেবমূর্তি পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে।

এমনিতে মামা রাধারমণ দীনাদের শাসন করতে গেলেই দিদিমা বাধা দিতেন। বলতেন, আহা, ওরা মা-মরা ছেলে, ওদের বকছিস কেন? আর কখনও এমন করবে না। দেখিস না, দীনা কত বড় হবে। কত পড়াশোনা শিখবে।

সেদিন দিদিমা কোথাও গেছিলেন। বাড়ি ছিলেন না। দীনার কান ধরে এনে গালে এক থাপ্পড় কষালেন মামা রাধারমণ। ধমক দিয়ে বললেন, আর কখনও যেন শনিদেবতার মূর্তিতে হাত না দেয়। তারপর পূজারী গেন্দালালজীকে শনিদেবতার মূর্তিটি এনে ফিরিয়ে দিলেন।

মামার কাছে বকুনি বা মার খাওয়া এটাই শেষ। মামাকে দীনা আর কখনও সে সুযোগ দেয়নি।

এই মামাই একসময় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন। দীনার বয়স তখন সবে এগারো। গাঁয়ের ডাক্তাররা জবাব দিয়েছেন। তাই লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? শেষমেশ দীনাই বলল, চলো মামা, তোমাকে আমিই নিয়ে যাই। আর কাউকে না পেয়ে মামা রাধারমণজী দীনার সঙ্গেই লক্ষ্ণৌতে এলেন। মাসখানেক লক্ষ্ণৌতে চিকিৎসার পর মামাকে নিয়ে দীনা আবার নানিহালে ফিরে এলেন। স্কুলের পরীক্ষার তখন মাত্র এক মাস বাকি। কিন্তু তাতে দীনার খুব একটা কিছু এসে যায়নি। ক্লাসে সে প্রথমই হয়েছিল। এরপর কোটাতে এসে দীনা ভর্তি হয়েছিল ক্লাস ফাইভে। তবে কোটাতেও দীনাকে বেশিদিন থাকতে হয়নি। রাজগড়ে আর এক মামা শ্রীনারায়ণ শুক্ল থাকতেন। তিনি ছিলেন সেখানকার রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার। তাঁর বেশ বড় সংসার। পাঁচ ছেলেমেয়ে। কিন্তু হঠাৎ স্ত্রী মারা যাওয়াতে তিনি একেবারে অকূলে পড়লেন। সংসারের হাল-হকিকৎ জানিয়ে তিনি দাদা রাধারমণের শরণাপন্ন হলেন। এখন সেই নারায়ণ মামার সংসার সামাল দিতেই বড় মামীমা সুভদ্রার সঙ্গে দীনাকেও রাজগড়ে আসতে হলো। তবে এখানেও দীনাকে দু-বছরের বেশি থাকতে হয়নি। সীকরে মামা বদলি হয়ে যাওয়াতে দীনাকেও সেখানে যেতে হয়েছিল।

রাজগড়ের স্কুলের মাস্টারমশায়েরা এতে খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, দীনা তাদের স্কুলের সম্মান বাড়াবে। দীনার মেধা আর সরলতা দুই-ই তাঁদের আকর্ষণ করেছিল। দীনা নাইনে পড়লেও ক্লাস টেনের সব প্রশ্নেরই উত্তর সহজে দিতে পারত। শুধু তাই নয়, তাঁর উত্তর লেখার ভঙ্গিটিও ছিল ভারী চমৎকার, একেবারেই তার নিজস্ব। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোত, প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তর না দিয়ে এভাবে দিল কেন, তখন দীনা বলত, সেভাবে তো সে দিতেই পারতো। তাই নতুন পদ্ধতিতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আসলে প্রভাত সূর্যই তো দিনের হাল-হকিকতের আভাস দেয়।

রাজগড় স্কুলের একটা নিয়ম ছিল। স্কুলের সবাইকেই মাথায় পাগড়ি বেঁধে আসতে হোত। দীনার এসব অভ্যেস ছিল না। প্রায় পাগড়ি খুলে যেত। অন্যের বেলায় এতে সকলে হাসলেও দীনার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্য। সহপাঠিরাই বরং এগিয়ে এসে দীনার পাগড়ি ঠিকভাবে আবার বেঁধে দিত। সবাইকে কাছ টেনে নেওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দীনার।

দীনার পড়াশোনার এত আগ্রহ থাকলে কী হবে, ভাই শিবদয়ালের সেদিকে কোনও নজর ছিল না। সারাটা দিনই সে খেলাধুলা নিয়ে থাকত। স্কুল পালিয়ে বেড়াত। তবুও ভাইকে দীনা খুবই ভালবাসত। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সেই ভাইও সামান্য ক'দিনের টাইফয়েডের জ্বরে মারা গেল। দীনা তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র।

সীকরের কল্যাণ হাইস্কুল থেকেই আজমীঢ় বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হলো দীনা। শুধু তাই নয়, আজমীঢ় বোর্ডে এরকম নম্বর এর আগে কেউ কখনও পায়নি। দীনার জ্যামিতির উত্তর লেখাটা এতই চমৎকার হয়েছিল যে, বোর্ড সেই খাতাটা বেশ কয়েক বছর যত্ন করে রেখে দিয়েছিল।

সীকরের মহারাজার কাছেও এই সংবাদ পৌঁছেছিল। কল্যাণ হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইও তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। মহারাজার কাছে দীনার ডাক পড়েছিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার বাবা কি করেন?

আজ্ঞে, আমার বাবা-মা কেউ এখন বেঁচে নেই। মামা-মামীমাই আমাকে বড় করেছেন। তাঁরাই আমার বাবা-মা।

ওঃ! আচ্ছা বল, তোমার কী চাই?

আপনার আশীর্বাদ। দীনা উত্তর দিয়েছিল।

দীনার উত্তরে সীকরের মহারাজা সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যতদিন পড়তে চাও পড়। যতদিন পড়বে ততদিন মাসিক দশ টাকা করে ছাত্রবৃত্তি পাবে। শুধু তাই নয়, মহারাজ দীনাকে একটি স্বর্ণপদকও দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে বইপত্র কেনার জন্য আরও দুশো পঞ্চাশ টাকা।

মোট দুটো স্বর্ণপদক দীনার সংগ্রহে এল। একটি মহারাজের আর অন্যটি আজমীঢ় বোর্ডের দেওয়া। সালটা ১৯৩৫। মামা রাধারমণ খুশি হয়েছিলেন। আর দিদিমার তো আনন্দের কোনও পরিসীমা ছিল না। বললেন, বলেছিলাম না, দীনা আমার খুব বড় হবে। কিন্তু নাতির সৌভাগ্য আর বেশিদিন তিনি দেখে যেতে পারেননি। সে বছরই তাঁর স্বর্গবাস হয়েছিল।

।। দুই।।

দীনা এখন দীনদয়াল উপাধ্যায়। পিলানি কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। গভীর রাতে পড়াশোনা করাই ছিল তাঁর অভ্যাস। তাঁর পড়াশোনার জন্য কেউ অসুবিধায় পড়ুক এটা তিনি চাইতেন না। তাই লাইট না জ্বালিয়ে হ্যারিকেনের আলোতেই পড়াশোনা করতেন। এভাবে রাত জেগে পড়ার আরও একটা কারণ ছিল। কেননা, দিনের বেলায় অনেকটা সময়ই যেত তার সহপাঠিদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে। এতে অবশ্য তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। পরীক্ষায় এবারেও তিনি প্রথম হয়েছিলেন। সীকরের মহারাজার মতো ঘনশ্যামদাস বিড়লাও তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে চাকরিও দিতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য চাকরি নয়, আরও

পড়াশোনা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। তবুও বিড়লাজী বলেছিলেন, তোমার জন্য প্রস্তাবটা দেওয়া রইল। যখনই আসবে, তখনই পাবে। দীনদয়ালজীর জীবনে অবশ্য এরকম সময় কখনও আসেনি।

একটু লেখাপড়া শিখে রেলে চাকরি নিয়ে সংসার করাটাই ছিল মামা রাধারমণের ধারণা। কিন্তু দীনদয়ালজীর মেধা আর আগ্রহ দেখে তাঁর পড়াশোনাতে তিনি উৎসাহই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যতদূর পড়তে চাও পড়। মামার পরামর্শ মতোই কানপুরের বিখ্যাত সনাতন ধর্ম কলেজে এসে ভর্তি হন তিনি। থাকার ব্যবস্থা হলো এক ছাত্রাবাসে। এসময় মামাতো ভাই প্রভুদয়ালও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি এই কলেজ থেকেই বি এ পাশ করেছিলেন। আর আগের পরীক্ষাগুলিতে যে মর্যাদা তাঁর ছিল, এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

কানপুরে কলেজে পড়ার সময়েই দীনদয়ালজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্কে এসেছিলেন। সেটা ১৯৩৭ সাল। বলবন্ত মহাশিদে আর সুন্দর সিং ভাণ্ডারী তখন তাঁর সহপাঠী। তাঁরাই সঙ্ঘের এক বৈঠকে দীনদয়ালজীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম সঙ্ঘের সংস্পর্শে এলেন তিনি। ভাউরাও দেওরসের উপস্থিতিতেই সেই বৈঠক হয়েছিল। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের নির্দেশেই সঙ্ঘকাজের বিস্তারের জন্য ভাউরাওজী তখন নাগপুর থেকে উত্তরপ্রদেশে এসেছিলেন।

দেশবিরোধী শক্তি এদেশে কেমন সঙ্কট সৃষ্টি করেছে ভাউরাওজী সেই বৈঠকে তা তুলে ধরেছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রহমত আলি পাকিস্তান তৈরির জন্য এদেশের মুসলিমদের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়টিও ওই বৈঠকে চর্চা হয়েছিল। আর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের নামে মুসলিম তোষণ নীতি যে কতখানি আত্মঘাতী হতে পারে এই বিষয়টিও ভাউরাওজী ওই বৈঠকে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছিলেন। মেধাবী দীনদয়াল তাঁরই সমবয়স্ক এক যুবকের কথা সহজে মেনে নিয়েছিলেন, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু দুই যুবকের, পরবর্তীকালে সামান্য থেকে অসামান্য ব্যক্তিত্বে যাঁদের উত্তরণ ঘটেছিল— সম্পর্কের সূত্রপাত সেখানেই হয়েছিল।

কানপুরে তখনও সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়নি। তবে কাশীতে হয়েছিল। ১৯২৮-২৯ নাগাদ ডাঃ হেডগেওয়ার ও ভাইয়াজী দানীর (পরবর্তীকালে যিনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহ হয়েছিলেন) প্রচেষ্টায় কাশীতে সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে কাশীতে শীতকালীন শিবির হয়। কাশীতে সেই প্রথম শিবির। লক্ষ্ণৌ আর কানপুর থেকে কয়েকজন সেই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই স্থির হয়েছিল, ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে কানপুর (কর্ণপুরম) শাখার ধ্বজপ্রাপ্তি উৎসব হবে।

কানপুর সনাতন ধর্ম কলেজের কাছে আজাদ নগরের এক মাঠে মকর সংক্রান্তি তিথিতেই শাখার ধ্বজপ্রাপ্তি উৎসব হলো। সঙ্ঘের প্রচারক পরম্পরার অগ্রদূত বাবাসাহেব আপ্টে সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন দীনদয়ালজীও। শুধু ছিলেনই নয়, শাখা শুরুর কাজে তিনিও ছিলেন একজন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সতওয়ালকরজীর উপস্থিতিতে সেই পুণ্য তিথিতেই দীনদয়ালজী সঙ্ঘের প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর আর পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে হিন্দু রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে সর্বস্ব সমপর্ণের যে ব্রত আজীবন পালনের প্রতিজ্ঞা তিনি সেদিন করেছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই তিনি তা পালন করে গেছেন।

আলাপ-পরিচয়ের পর ধীরে ধীরে ভাউরাওজীর সঙ্গে দীনদয়ালজীর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ শিক্ষা নেওয়ার জন্য তিনি নাগপুরে গিয়েছিলেন। তখন ছিল চল্লিশ দিনের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। ওই শিক্ষাবর্গেই তিনি সঙ্ঘ কি ও কেন তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে মারাঠি ভাষা শেখার সুযোগটাও নিয়েছিলেন।

দীনদয়ালজী এরপর এম এ পড়ার জন্য আগ্রাতে এসেছিলেন। ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন সেন্ট জনস্ কলেজে। প্রথমবর্ষের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এসময়ই তাঁর মামাতো বোন রামাদেবী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাকে আগ্রায় নিয়ে আসা হল। ফলে পড়াশোনা, সঙ্ঘের কাজ আর বোনের সেবা— একই সঙ্গে তিনটি কাজ তাঁর ওপর এসে পড়ল। ফলে এম এ ফাইনাল পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়ে উঠল না।

মামা রাধারমণজী এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। দীনদয়ালজীকে এজন্য বেশ তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা নীরবে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। শেষমেশ মামীমার আগ্রহে তাঁকে একটা সরকারি চাকরির পরীক্ষাও দিতে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁকে একটা ঝঞ্ঝাটের মুখে পড়তে হয়। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে তো কোট-প্যান্ট পরে যেতে হবে। তখন এটাই প্রচলিত রীতি। প্রশ্ন হলো, এখন তিনি কী করবেন! অনেক ভাবলেন। স্যুট পরে যদি যেতেই হয়, তবে তার জন্যও তো টাকা দরকার। সেই টাকাও তো তাঁর নেই। এখন তো সেই ছাত্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অগত্যা মামীমার কাছ থেকেই পঁচিশ টাকা চাইতে হলো। তা দিয়েই দর্জির কাছে স্যুট তৈরি করতে দিলেন। কিন্তু অবস্থা এমনই হলো— ইন্টারভিউর দিন পর্যন্ত দর্জি তা তৈরি করে উঠতে পারল না। তাই যে পোষাকে অভ্যস্ত, তা পরেই তিনি ইন্টারভিউ দিতে গেলেন।

ইন্টারভিউর পরিবেশে তিনি একেবারেই বেমানান। সবাই স্যুট-বুট পরে এসেছেন। তাঁরই শুধু দেশীয় পোষাক। বুঝতে পারছেন, সবাই তাকে দেখে হাসি-ঠাট্টা করছে। আরে পণ্ডিতজী এসেছেন— বলে টিপ্পনী কাটছে। এসব তো এহ বাহ্য। যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, তিনি একজন খাস ইংরেজ। অতএব ইন্টারভিউর ফল কী হবে তা দীনদয়ালজীর বুঝতে আর বাকি রইল না। কিন্তু ফল যখন বেরোল, তখন তিনি একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এই ইন্টারভিউতেও প্রথম হয়েছেন।

খবরটা মামা-মামীমাকে জানিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। মামা যা রেগে গিয়েছিলেন। এবারে অন্তত শান্ত হবেন। তবে সেইসঙ্গে এটাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সরকারি চাকরি তিনি করবেন না।

পরিবর্তে বি টি পড়তে প্রয়াগে যাবেন। সেইমতো তিনি প্রয়াগের গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দীনদয়ালজী সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন (১৯৪১)। পরে তৃতীয় বর্ষও। নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে--- তখনকার সঙ্ঘের পরিভাষায় 'ওটিসি' (অফিসার ট্রেনিং ক্যাম্প)--- শারীরিক শিক্ষায় উৎকর্ষের পরিচয় দিতে না পারলেও বৌদ্ধিক বিভাগে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রয়াগে গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের কাছে কোনও শাখা ছিল না। তিন মাইল দূরে দ্বারিকা প্রসাদ কলেজের মাঠে শাখায় তিনি যেতেন। এদিকে গভর্ণমেন্ট কলেজের নিয়ম ছিল খুব কড়া। ছাত্রাবাসের দরজা সন্ধ্যার পরই বন্ধ হয়ে যেত। সঙ্ঘের বৈঠক ইত্যাদি সেরে ছাত্রাবাসে ফিরতে তাঁর প্রায়ই রাত হোত। তাই ছাত্রাবাসের পেছনের দিকে নিজের ঘরের খোলা জানালাটাই ছিল রাতের প্রবেশদ্বার। আর যতই দিন এগিয়েছে, রাতে ফেরার সময়ও তত পেছিয়েছে— সঙ্ঘের কাজে ততই তিনি মগ্ন হয়েছেন।

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দীনদয়ালজীর প্রতি।

দীনদয়ালজীর দুই মামাতো ভাই ছিল। তবুও মামা-মামীমা তাঁকে এত ভালবাসতেন যে বলতেন, তাদের তিন ছেলে। দীনদয়ালজীও বলতেন, তারা তিন ভাই। তাঁর মামার ইচ্ছা ছিল, তাদের দীনা কোথাও অধ্যাপনা শুরু করুক। তারপর তার বিবাহ দেওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে দীনদয়ালজী বিটি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছেন। মামা-মামীমা তাই আরও তৎপর হলেন। কিন্তু বিধি বাম হলে যা হয়। দীনদয়ালজীর জন্মকোষ্ঠী দেখে জ্যোতিষীরা মাথা নাড়লেন। বললেন, এ ছেলের বিবাহ হলে ওর স্ত্রীকে শীঘ্রই বিধবা হতে হবে। অগত্যা সেই চেষ্টায় ছেদ টানতে হল।

বিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ভাউরাওজীর কাছে দীনদয়ালজী মনের কথাটা খুলে বলেছিলেন— 'আমি সঙ্ঘের কাজ করতে চাই। আপনি যেখানে পাঠাবেন, সেখানেই যাব।' ভাউরাওজী পরে বলেছেন, সঙ্ঘের কাজে প্রচারক হিসেবে আত্মনিয়োগ করার কথা দীনদয়ালজীকে কেউ কখনও বলেননি। তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর জেলার গোলা গোকর্ণতে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচারক হিসেবে প্রথম আত্মোৎসর্গ করার শ্রেয়ও তারই প্রাপ্য।

১৯৪২। গোলা গোকর্ণেই দীনদয়ালজীর সঙ্ঘের প্রচারক জীবন শুরু হয়েছিল। বড় কঠিন ছিল সেসময়। সারা দেশ জুড়ে তখন শুরু হয়েছে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। আর এরকম পরিস্থিতিতে হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গোকর্ণে পৌঁছেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম তখন কেউই প্রায় জানে না। পকেটে পয়সা-কড়িও বেশি নেই। তাই ছোলা সিদ্ধ আর জল— এদিয়েই পেট ভরাতে হোত। কোনওরকমে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই অবশ্য মিলেছিল। এমনি করেই গোকর্ণে সঙ্ঘের কাজের শুরু হয়েছিল। স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি দীনদয়ালজীর এই জীবনচর্যা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। একজন শিক্ষিত যুবক কেন এমনভাবে থাকছে? কি করতে চায় সে? সারা দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন তার দূরে থেকে কী এমন এরা দেশের কাজ করবে? কৌতূহলবশেই তাই একদিন তিনি দীনদয়ালজীর কাছে তা জানতে চাইলেন। দীনদয়ালজী বললেন, আপনি ঠিক কথাই জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু আপনিই বলুন, ইংরেজদের দেশ ছাড়া করার পর আর যে কেউ এদেশ দখল করবে না, এর গ্যারান্টি কোথায়? এর আগেও তো আমরা শক-হুন-মোঘলের মোকাবিলা করেছি। কিন্তু তার পরেও তো ইংরেজরা এদেশ দখল করেছে। ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতেই হবে— এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই দেশ, এই জাতির দিকে আর কেউ কখনও বাঁকা চোখে তাকাতে সাহস না করে সেই শক্তিটাই আগে দরকার। আর শক্তির জন্য যে সংগঠন চাই, এ তো কোনও নতুন কথা নয়। তাই হিন্দু সংগঠনই প্রথম কাজ। সেই কাজটাই তাই আমরা প্রথম করছি। না, এভাবে কখনও ভাবেননি সমাজের গণ্যমান্য সেই ব্যক্তিটি। যত দিন যেতে লাগল, ততই তার হৃদয় বেদনায় ভরে গেল। তিনি দীনদয়ালজীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ক্রমে থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। আর শেষপর্যন্ত তিনি শুধু নিজের বাড়ির দুয়ার নয়, হৃদয়-দুয়ারও দীনদয়ালজী এবং সঙ্ঘের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। গোকর্ণের এই ধনাঢ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিটি হলেন কুঞ্জবিহারীলাল রাঠী। পেশায় ছিলেন তিনি আইনজীবী। পরবর্তীকালে যিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের উত্তরপ্রদেশ শাখার সম্পাদক হয়েছিলেন।

কুঞ্জবিহারীজীর সহায়তায় আর দীনদয়ালজীর পরিশ্রমের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই গোলা গোকর্ণতে শাখা শুরু হয়েছিল। স্থানীয়

বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রদের সঙ্গে এতটাই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যে কোনও কোনও সময়ে ক্লাস নেওয়ার জন্যও তাঁকে ডাকা হোত। তাঁর শিক্ষকতা শুধু সেখানকার শিক্ষক-ছাত্রদের নয়, কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ মিশ্রের যখন অবসর নেওয়ার সময় হলো, কর্তৃপক্ষ তখন দীনদয়ালজীকে মাসিক আড়াইশো টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। দীনদয়ালজী সেই প্রস্তাব হাসতে হাসতেই এড়িয়ে গেলেন— আরে ভাই, দুটো ধুতি আর জামা, সঙ্গে দুবেলা দু-চারটে রুটি— এজন্য আড়াইশো টাকা কেন? আমার তো তিরিশ টাকা হলেই চলে যায়।

ওই বছরেই অর্থাৎ ১৯৪২-এর গরমের ছুটিতে উত্তরপ্রদেশে প্রথম সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হলো। কয়েকজন স্বয়ংসেবককে নিয়ে লক্ষ্ণৌর সেই বর্গে দীনদয়ালজী গিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের পরই লখিমপুর জেলা প্রচারক হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হলো।

।। তিন ।।

১৯৪২-এর ২১ জুলাই লখিমপুর থেকে মামাকে লেখা চিঠিটা এভাবেই শুরু করেছিলেন দীনদয়ালজী—

শ্রদ্ধেয় মামা,

সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। পরশু আপনার পত্র পেয়েছি। দেবীর অসুখের খবর জেনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আপনি যা লিখেছেন, তা ঠিকই লিখেছেন। এর কি উত্তর দেব— আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার পত্র পেয়ে অবধি মনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।

আপনি যেমন লিখেছেন, সেরকম আমিও ভেবেছিলাম। কোনও একটি স্কুলে শিক্ষকতা করব আর সেইসঙ্গে সঙ্ঘেরও কাজ করব। একথা ভেবেই লক্ষ্ণৌতে এসেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্ণৌর এখনকার পরিস্থিতি আর ভবিষ্যতে কাজের বিস্তারের সম্ভাবনা দেখে একটি নগরের বদলে একটি জেলায় কাজের বিস্তারের জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে কোনও একটি স্থানে দু-চার দিনের বেশি থাকা বা চাকরি করা— কোনওটাই সম্ভব নয়। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকের কাছে সমাজ ও দেশের কাজই আগে। ব্যক্তিগত কাজ তার পরে। তাই সমাজের কাজের জন্য যে নির্দেশ পেয়েছি, সেটাই এখন করছি।

আমি জানি, আমার একাজের জন্য আপনি ব্যথা পেয়েছেন। কিন্তু আপনার মতো বিবেচক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও যদি এজন্য কষ্ট পান, তাহলে সমাজের কাজের জন্য কারা এগিয়ে আসবেন? সঙ্ঘের সম্বন্ধে আপনি বিশেষ কিছু জানেন না বলেই সম্ভবত আপনি চিন্তিত হয়েছেন। কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সঙ্ঘের কোনও সম্বন্ধ নেই। কোনও রাজনৈতিক কাজকর্মেও সঙ্ঘ অংশগ্রহণ করে না। সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো হিন্দুদের সংগঠিত করা। গত ১৭ বছর ধরে সঙ্ঘ একাজই করে চলেছে। সারা ভারতবর্ষে এখন ১০০০-এরও বেশি শাখা চলছে। দু'লাখের ওপর স্বয়ংসবেক রয়েছে। আমার মতো তিনশোরও বেশি কার্যকর্তা রয়েছেন যাঁরা শুধু সঙ্ঘেরই কাজ করেন। তাঁরা সবাই শিক্ষিত আর ভদ্র ঘরের সন্তান। বেশিরভাগই বি-এ, এম-এ কিংবা এল এল বি। এই যে এত শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সমাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তার একমাত্র কারণ, সমাজের উন্নতি ছাড়া ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব নয়— এই বোধ। ব্যক্তি যতই উন্নতি করুক না কেন, যতক্ষণ না সমাজের উন্নতি হচ্ছে, ততক্ষণ ব্যক্তির উন্নতির কোনও মানে হয় না। এই কারণেই আমাদের দেশের বিশিষ্ট নেতারা বিদেশে গিয়ে অপমানিত হন। .... আমাদের দেশে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। নৌকায় ফুটো হয়ে গেলে আপনি আপনার জিনিসপত্র যত উঁচুতেই তুলে ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গেই তা ডুববে। আজকের হিন্দু সমাজের অবস্থা এরকমই। ঘরে আগুন লেগেছে, কিন্তু যে যার নিজের ঘর নিয়েই ব্যস্ত। আগে যে সেই আগুন নেভাতে হবে সে বিষয়ে কারও লক্ষ্য নেই। এরকম অবস্থায় আপনি কি নিজেকে সুরক্ষিত মনে করেন? আপনার কি মনে হয়, আপনি বিপদে পড়লে সমাজ আপনার জন্য এগিয়ে আসবে? না, তা হবে না। কেন না, আমাদের সমাজ সংগঠিত নয়। একারণেই দুর্বৃত্তরা আমাদের মা-বোনেদের নির্যাতন করতে পারছে, কারও তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্য দিবালোকেই অত্যাচারের স্পর্ধা দেখাচ্ছে। আর সমাজে যারা নিজেদের অভিজাত বলে মনে করে, তার চোখ বুজে বসে আছে। এসব প্রতিকারের দিকে তাদের কোনও লক্ষ্য নেই। খুব বেশি হলে এসব খবর আমরা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিই কিংবা মহাত্মাজী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। কেন, আমাদের হিন্দু সমাজে কি এমন বলবান ব্যক্তির অভাব আছে, যারা এই দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করতে পারে? না, এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম নেই। আসলে এই বিশ্বাস নেই যে এগিয়ে গেলে সমাজ তাকে সাহায্য করবে। সত্য হলো, তাদের মনে এনিয়ে কখনও ব্যথা জাগে না। দেহের কোনও অংশে প্রচণ্ড আঘাত পেলে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমাদের সমাজও এমন চেতনাহীন হয়ে পড়েছে। যতই কষ্ট হোক না কেন তার প্রতিকারের কোনও চেষ্টা হয় না। তখনই শুধু প্রতিকারের চেষ্টা করে, যখন তার নিজের ওপর আঘাত লাগে। আমাদের সারা শরীর মোটা হলে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি শুধু পা-ই মোটা হতে শুরু করে তবে তা ফাইলেরিয়ার লক্ষ্মণ বলে গণ্য হবে। একারণেই এত কার্যকর্তা নিজেদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে সমাজের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। সংগঠনের অভাবই আমাদের পতনের কারণ। অন্যান্য যে দুরবস্থা অশিক্ষা ইত্যাদি রয়েছে তা তো পরাধীন অবস্থার লক্ষ্মণ মাত্র। একারণে সংগঠনই হলো সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, সঙ্ঘ আর কিছুই করতে চায় না। আপনি যদি কখনও আগ্রাতে আসেন তাহলে সঙ্ঘের ব্যবহারিক রূপ কেমন তা দেখতে পাবেন। আমার মনে হয়, সঙ্ঘের ব্যবহারিক রূপ দেখে ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বোঝার পর আপনি এই ভেবে আনন্দ পাবেন যে, আপনার এক পুত্র এমন মহান কাজকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে। শ্রীভগবান আমাদের সব রকমের ক্ষমতা দিয়েছেন।

আমরা কি আমাদের এক পুত্রকে দেশের জন্য সমর্পণ করতে পারি না? একাজের জন্য তো মৃত্যুর কোনও ভয় নেই। জেলে যাওয়ার কোনও কষ্ট নেই, না খেতে-পরতে পেয়ে মরার সম্ভাবনাও নেই। শুধু যা টাকা রোজগারই করা যাবে না। নিজের খরচ করার পর কিছু সঞ্চয় করা যাবে না। বাকি রইল ব্যক্তিগত নাম-যশের ব্যাপার। আর আপনি তো জানেন, যারা পরাধীন তাদের কাছে নাম-যশের কি মূল্য? আর শিক্ষকতা করলে তারই বা কি মর্যাদা? আপনি আমাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। আপনি কি আমাকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করতে পারেন না? যে সমাজের কাছে আমরা এত ঋণী! এটা তো কোনও ত্যাগ নয়, একরকমের বিনিয়োগ মাত্র। সমাজরূপী চাষের জমিতে সার দেওয়ার মতো। আজ আমরা শুধু ফসল কাটতেই জানি, জমিতে সার দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছি। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জমি উর্বরতা হারিয়ে ফেলবে। যে সমাজ ও ধর্মের রক্ষার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন, রাণাপ্রতাপ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, শিবাজী সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের ছোট ছোট দুই ছেলেকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য আমরা কি আমাদের জীবনের সুখ-সুবিধা, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখ ত্যাগ করতে পারি না? আজ সমাজ হাত পেতে আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছে। আর আমরা যদি এরকমই উদাসীন থাকি, তাহলে এমন এক দিন আসবে, যেদিন আমাদের প্রিয় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ছাড়তে বাধ্য হব। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যদি আপনি আগে থাকতে সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে পরিচিত থাকতেন, তাহলে আপনার মনে কোনও আশংকাই থাকত না। আপনি বিশ্বাস রাখুন, আমি এমন কোনও কাজ করব না যাতে কেউ আপনার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে পারে। বরং আপনার গর্ব হবে যে আপনি দেশের জন্য এক পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। শুধু কর্তব্য পালনের জন্যই তো আপনি আমাকে লালন-পালন করেছেন। কি সেই কর্তব্য পালনে আপনি পিছু-পা হবেন? আপনার কর্তব্য এতদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার পর্যন্ত সীমিত ছিল। এখন তা পুরো হিন্দু সমাজের জন্য বিস্তৃত হলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার কর্তব্যের এটা বিকাশ মাত্র। অধিকারবোধের থেকে কর্তব্যের স্থান সব সময়েই উঁচুতে। অনেকেই তো আনন্দের সঙ্গে নিজের একমাত্র পুত্রকে সমাজের কাজের জন্য সমর্পণ করেছেন। আর আপনার তো তিন তিনজন পুত্র। তাদের মধ্যে একজনকে কি আপনি সমর্পণ করতে পারবেন না? আমি জানি, আপনি না বলবেন না।

আপনি হয়তো ভাববেন কী এতসব উপদেশের কথা লিখেছে। আসলে এসব লেখার আমার ইচ্ছাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না। এতসব এজন্য লিখলাম, যাতে আপনি সঙ্ঘকে ঠিকমতো বুঝতে পারেন। কোনও কাজের ভালোমন্দ তার উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখেই বিচার করা যায়। যাঁর অভিভাবকত্বে আমি এখন রয়েছি, তিনি এখানকার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। তাঁর নাম পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ মিশ্র। সুতরাং আমার পক্ষে কোনও দায়িত্বহীন কাজ করা বেশ মুশকিল।

অন্যান্য সব কিছু ভালই, প্রত্যুত্তর পাঠাবেন। আমার তো মনে হয়, দেবীর অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে হোমিওপ্যাথি করাই ভাল। যদি আপনি দেবীর রোগের বিবরণ ইত্যাদি লিখে পাঠান, তাহলে এখানে অনেক ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ পাঠিয়ে দেব। ভাইসাহেব ও বৌদিকে নমস্কার আর দেবী ও মহাদেবীকে স্নেহাশীষ জানাবেন। ভাইসাহেব তো কখনও চিঠিই লেখেন না।

আপনার
দীনা

মামা অবশ্য আর বেশিদিন বাঁচেননি। অসুস্থ মামাকে সেবার জন্য কয়েকদিন পিলভীতে এসেছিলেন দীনদয়ালজী। তবে সঙ্ঘের কাজের চাপ থাকায় বেশিদিন থাকতে পারেননি। ভাই বনওয়ারীজীর ওপরই ভার দিয়ে নিজের কার্যক্ষেত্রে দীনদয়ালজীকে ফিরে যেতে হয়েছিল। ১৯৪৪ সালেই মামা প্রয়াত হয়েছিলেন। নিজের পিতাকে হারিয়ে মানুষ যে ব্যথা পায়, দীনদয়ালজীরও তাই হয়েছিল।

সেইসময় ভাউরাওজী তাঁকে লখিমপুরের সঙ্গে সীতাপুর আর হরদোই জেলার কাজও দেখতে বলেছিলেন। তখনও সঙ্ঘের কাজের বিভাগ, জেলা ইত্যাদি স্তরের সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। সঙ্ঘের কাজের বিস্তারের জন্য যে পাঁচ-ছ'জন কার্যকর্তা ঘোরাফেরা করতেন, তাঁদের নিয়ে বছরে এক-দু'বার ভাউরাওজী বৈঠকে বসতেন। পরে এই স্তরের কার্যকর্তাদেরই বিভাগ প্রচারক বলা হোত। ১৯৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশের সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে দীনদয়ালজীকে নিযুক্ত করা হলো। সারা দেশে প্রান্ত স্তরে তিনিই প্রথম অ-মহারাষ্ট্রীয় প্রচারক। সেসময় উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজের দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাপুরাও মোঘে, ভাইয়াজী সহস্রবুদ্ধে, নানাজী দেশমুখ, বাপু যোশী প্রমুখ।

সঙ্ঘের কাজে তখন দীনদয়ালজীর অন্যান্য সহযোগিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং, রামনাথ ভাল্লা, সত্যব্রত সিন্‌হা, বীরেনভাই, ডঃ কৃষ্ণবিহারী, জজ ও করনঞ্জকর ভায়েরা, কৃষ্ণদত্ত শর্মা, গোপালকৃষ্ণ কালাস্ত্রি, রজনীকান্ত লাহিড়ী, রাধেশ্যাম কাপুর, ডাঃ পি কে ব্যানার্জী, দেওলেজী, গোপালরাও কালিয়া, জয়গোপালজী, অনন্তরাও গোখলে, পণ্ডিত সাবন সিং, সতীশ সাক্সেনা, মধুসূদন বাপট, বিজয় মুঞ্জে, মনোহর আটাওলে, রাজভাউ সাভারগাওলকর, গোয়ালিয়রের ডাঃ গুণে প্রমুখের মতো কার্যকর্তারা।

রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৭ সালে। এই প্রকাশনের পক্ষ থেকেই 'রাষ্ট্রধর্ম', সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' ও দৈনিক 'স্বদেশ' প্রকাশিত হতে শুরু করে। শেষ দুটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁকে কিছুদিন নিতে হয়েছিল। সম্পাদনার কাজে তাঁকে যাঁরা সহযোগিতা করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন মহাবীরপ্রসাদ ত্রিপাঠি, রাজীবলোচন অগ্নিহোত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, গিরিশচন্দ্র মিশ্র, যাদবরাও দেশমুখ ও বচনেশ ত্রিপাঠি। আর প্রকাশনের ম্যানেজিং

ডাইরেক্টর ছিলেন নানাজী দেশমুখ। তবে তখন অবস্থা এমনই ছিল, যিনি যে পদেই থাকুন না কেন, তাঁকে সব কাজই করতে হোত। কম্পোজ, ভাঁজাই এবং পত্রিকা পাঠানোর কাজেও দীনদয়ালজীকে মাঝেমধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর কথা মতো বলা যায়, এতদিন সঙ্ঘ ছিল শ্রুতির পর্যায়ে। দীনদয়ালজীর প্রচারক জীবন শুরু হওয়ার পরই সঙ্ঘের 'স্মৃতি' যুগে প্রবেশ ঘটল "RSS entered the smriti stage"।

'রাষ্ট্রধর্ম' আর 'পাঞ্চজন্য'-এ এসময়ে (১৯৪৭-৪৯) বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছিলেন। যেমন, ভারতীয় রাষ্ট্রধারা কা পুণ্য প্রবাহ, ভগবান কৃষ্ণ, চিতি, রাষ্ট্র জীবন কী সমস্যা, লোকমান্য তিলক কী রাজনীতি, বিজয়া দশমী, ভারতীয় সংবিধান পর এক দৃষ্টি, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি।

সহ-প্রান্ত প্রচারক হিসেবে দীনদয়ালজীকে সারা উত্তরপ্রদেশই ঘুরতে হোত। একবার বুন্দেলখণ্ডের কোঞ্চ নামের এক জায়গায় যাওয়ার কথা। কানপুর থেকে যে ট্রেন যাওয়ার কথা, তা ধরা যায়নি। অথচ কার্যক্রমে ঠিক সময় উপস্থিত হতে হবে। তাই মোটর সাইকেলে যাওয়াই স্থির হলো। তিনি মোটর সাইকেলের পিছনে বসে পড়লেন। রাস্তা অনেকটাই— একশো পঁচিশ মাইলের মতো। ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, তাই মোটর সাইকেলের গতিও বাড়াতে হলো। আর এর ফলে মোটর সাইকেলের সাইলেন্সরও গরম হয়ে উঠতে লাগল। পায়েও তার আঁচ লাগল। দীনদয়ালজী কিন্তু গতি কমাতে বললেন না। ফলে তাঁর পা একেবারে ঝলসে গেল। কোঞ্চ থেকে কার্যক্রম সেরে যখন লক্ষ্ণৌতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর পায়ের অবস্থা দেখে সবাই শিউরে উঠলেন। অথচ দীনদয়ালজীকে দেখে বোঝার কোনও উপায় ছিল না।

১৯৫০ সালের একটা ঘটনা। শাহজহাঁপুরের নাম বদল করে শাহজীপুর রেখেছিল স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা। সেই নাম বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। এমনকী চিঠিপত্রও আসতো। সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ওই জায়গায় সঙ্ঘের কাজ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দীনদয়ালজী ব্যাপারটা জানতেন। সেসময় সঙ্ঘের এক বৈঠকে একজন নিজেকে শাহজীপুরের স্বয়ংসেবক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। দীনদয়ালজী তখন বলেছিলেন, দেখো ভাই, তুমি যে নিজেকে শাহজীপুরের স্বয়ংসেবক বলে পরিচয় দিচ্ছ, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। নিজেদের শক্তি থাকলে নাম বদল করা যেতে পারে। শুধু নাম বদল করে কিছু হবে না। যদি সত্যিই নিজেকে শাহজীপুরের স্বয়ংসেবক হিসেবে পরিচয় দিতে চাও, তবে সেখানকার সঙ্ঘের কাজকে আগের অবস্থায় নিয়ে এসো। কি, তা পারবে? সেই স্বয়ংসেবক বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই দীনদয়ালজীর কথায় সম্মতি জানিয়েছিল। কোনও উল্লাসের বার্তায় হাততালি দিয়ে সমর্থনের রেওয়াজ সঙ্ঘে নেই, স্মিত হেসেই সম্মতি জানানোর প্রথা। বৈঠকে বাকি স্বয়ংসেবকদের স্মিত মুখে ফুটে উঠেছিল দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

এই সময়েরই আশপাশের একটা ঘটনা। কানপুরে স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরজী এসেছেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় বি এন এস ভি কলেজে সভার আয়োজন হয়েছে। খবর পেয়ে দীনদয়ালজীও সেই সভায় গিয়েছেন। সভা শেষ হলে সাভারকরজীর সঙ্গে দীনদয়ালজী দেখা করলেন। সঙ্ঘের জন্য কিছু সময় দেওয়ার জন্য সাভারকরজীকে অনুরোধ জানালেন।

সাভারকরজী বললেন, এবারে তো আর সুযোগ হল না। পরে যখন আসবো, তখন যাব।

আপনি যদি আমাদের সকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সময় দেন তাহলেই হবে।

সাভারকরজী একটু অবাক হলেন। অত সকালে প্রোগ্রাম। রাজী হলেন তিনি। তাঁর ট্রেন সকাল সাতটায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়িতে কি হবে এটা ভেবেই তিনি একটু আশ্চর্য হলেন। তাই বললেন, আমি না হয় যাব, কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে কি? মনে হয়, আপনাদের পরিশ্রমটাই ব্যর্থ হবে। কেননা, অত সকালে লোক হবে না।

দীনদয়ালজী বললেন, আপনি যদি সময় দেন তো বাকিটা আমরা দেখে নিতে পারবো।

দীনদয়ালজীর আগ্রহে সাভারকরজী সম্মতি দিয়েছিলেন।

ওইদিন রাতে বলতে গেলে দীনদয়ালজীর আর শোওয়াই হলো না। নানা ব্যবস্থাতেই কেটে গেল রাত। ওই রাতেই স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি সূচনা পৌঁছে দেওয়া হলো— সাভারকরজী কাল শাখায় আসবেন। তাই পূর্ণ গণবেশে ভোর পাঁচটার আগেই শাখায় উপস্থিত হতে হবে। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককেও সেদিন আমন্ত্রণ জানানো হলো।

পরের দিন ভোর পাঁচটায় যথারীতি শাখা শুরু হলো। পূর্ণ গণবেশ পরে ২৮ জন স্বয়ংসেবক সেদিন উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকজন নাগরিকও ছিলেন। সাভারকরজী এলেন। শাখার সব কার্যক্রম দেখলেন। শেষে তিনি বললেন, "আমি শুনেছিলাম ডাঃ হেডগেওয়ার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটাও শুনেছি, নাগপুরে শাখা চলছে। কিন্তু নিজের চোখে শাখা এই প্রথম দেখলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে খবর পেয়ে সবাই এসেছে। যে শৃঙ্খলার সঙ্গে সব কার্যক্রম হলো তাতে আমার বিশ্বাস, একাজ জাতিকে শক্তিশালী করবে। সঙ্ঘের কাজ সারা দেশে বিস্তারিত হোক— এটা আমি চাই।"

।।চার।।

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময় একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। মুসলিম তোষণ নীতির বিরুদ্ধে নেহরু সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলেন। একজন বিশিষ্ট বাগ্মী ও সাংসদ হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ সারা দেশেই সুপরিচিত। একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য তিনি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন। সেই সূত্রেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)-এর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হলো। ডঃ

মুখার্জী এই নতুন দল গঠনের জন্য শ্রীগুরুজীর কাছে কয়েকজন কার্যকর্তা চাইলেন। অনেক ভাবনাচিন্তার পর শ্রীগুরুজী একজন কার্যকর্তাকে রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রে কাজের জন্য স্থির করলেন। সেই একজন কার্যকর্তা হলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। তিনি তখন উত্তরপ্রদেশে সঙ্ঘের সহ-প্রান্ত প্রচারক।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ার লক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে এবার দীনদয়ালজীও উদ্যোগী। একাজেই তিনি উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য গেলেন। এসময়ে তাঁদেরই একজন তাঁকে বললেন, আপনি যাই করুন না কেন, এই হিন্দু সমাজ আর কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

ভদ্রলোকের এই নিরাশার কারণ বুঝতে দীনদয়ালজীর অসুবিধা হয়নি। গত হাজার বছর ধরে নিরন্তর সংগ্রামের ফলে হিন্দুরা ক্লান্ত। স্বাধীনতা পেলেও দেশভাগের রক্তাক্ত পরিণতিতে নিরাশ। দেশের মানুষের এই মর্মবেদনার কথা দীনদয়ালজীর অবিদিত ছিল না। তাই কথা প্রসঙ্গে তিনি একটি পুরাণের গল্প শোনালেন। একবার দেবরাজ ইন্দ্র ঘোষণা করে দিলেন যে, বারো বছর বাদে শিব যখন শঙ্খ বাজাবে তখনই বৃষ্টি হবে। তার আগে নয়। ইন্দ্রের একথা শুনে সব কৃষকই চাষ বন্ধ করে বসে রইলেন। বৃষ্টিই যখন হবে না, তখন শুধু শুধু খেটে লাভ কি? একজন কৃষক কিন্তু তার কাজ বন্ধ রাখল না। সে যথারীতি জমিতে হাল দিতে থাকল। দেবর্ষি নারদ একদিন এই দৃশ্য দেখলেন। কৃষকটির কাছে এসে নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, তুমি কি দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোষণা শোননি?

কৃষক বলল, হ্যাঁ, শুনেছি।

তবে হাল দিচ্ছ কেন?

হাল? সে তো অভ্যাসটা বজায় রাখার জন্য দিচ্ছি। বারো বছর পর বৃষ্টি হলে তখন যদি তা না পারি, তবে তো সব কিছুই জলে যাবে।

নারদ এরপর সেকথা গিয়ে দেবাদিদেব শিবকে জানালেন। শিব ভাবলেন, কথাটা ঠিক তো। বারো বছর যদি শাঁখ না বাজান, তাহলে তিনি নিজেও তো শাঁখ বাজানো ভুলে যাবেন। সুতরাং শিব তখন নিজের শাঁখ বাজিয়ে অভ্যাসটা বজায় রাখতে চাইলেন। আর যেই শিব শাঁখ বাজালেন, তখনই বৃষ্টি শুরু হল। আর ইন্দ্রের ঘোষণার সময়সীমা বারো বছর আগেই তা হল।

গল্পটা গল্পই। কিন্তু সারার্থ হল, আমরা যদি নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকি, তবে আমাদের সমাজও একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। আসলে, নিরন্তর পরিশ্রম ছিল দীনদয়ালজীর সহজাত এক বৈশিষ্ট্য।

এই সময়েরই আর একটি ঘটনা। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তাদের একটি অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বামপন্থী আর সমাজবাদী ছাত্ররা কিন্তু ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারল না। তারা জোর শোরগোল তুলল। এসব দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তো বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ইউনিয়ন তখন ছিল বিদ্যার্থী পরিষদের দখলে। তারাও ঠিক করে রইল, যেমন ভাবেই হোক শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতেই এই অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানের শুরুর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো প্রাঙ্গণটাই উত্তেজনায় টানটান। দু'পক্ষই যেন সম্মুখ সমরের জন্য তৈরি। দীনদয়ালজীও তখন সেখানে ছিলেন। সেসময় একজন ভদ্রলোককে (বিনায়ক রাও শিন্ডে) মোটর সাইকেলে চেপে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে দেখে বিরোধী পক্ষ তাকেই গুরুজী মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। দীনদয়ালজী কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন? তিনিও লাঠি হাতে বিরোধীদের দিকে দৌড়তে শুরু করলেন। শেষমেশ পরিষদেরই একজন ছাত্র দীনদয়ালজীকে জোর করে টেনে আনলেন। তার পরে যা ঘটল, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। পুরো চত্বর একদম সাফ। শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতেই পুরো অনুষ্ঠান হল। শারীরিক দিক থেকে অতটা মজবুত না হলেও সংকটের সময় নির্ভয়ের সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর যে কোনও দ্বিধা নেই এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

জনসঙ্ঘ শুরুর আগে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে ১৯৫১ সালের ৫ মে কলকাতায় পিপুলস্ পার্টি তৈরি হয়েছিল। এর দিনকয়েক পরে জলন্ধরে এবং তারপর দিল্লিতে ছিল বিভিন্ন প্রদেশের প্রমুখ কার্যকর্তাদের এক বৈঠক। সর্বভারতীয় দল হিসাবে জনসঙ্ঘকে গঠন করা যায় কিনা— এটাই ছিল বৈঠকের আলোচ্য। সেই মতো দিল্লিতে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। ২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে দিল্লির রাঘোমল আর্য হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হলো। সেই প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই দীনদয়ালজী ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

ওইসময়েরই এরকম আর একটা ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে দীনদয়ালজী গিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। দীনদয়ালজীই প্রথম শুরু করলেন— চলো ভাই, আমাদের 'ট্রায়াল' শুরু হোক। অর্থাৎ আপনাদের মনে যেসব প্রশ্ন জাগছে, তা জিজ্ঞেস করতে পারেন। কিন্তু না, কাউকেই প্রশ্ন করতে দেখা গেল না। এরকমভাবেই এক-দু'মিনিট কাটলো। শেষপর্যন্ত দীনদয়ালজীই নিস্তব্দ্ধতা ভঙ্গ করলেন— আরে ভাই, আপনাদের তো কোনও প্রশ্ন নেই। তাহলে বরং আমিই জিজ্ঞাসা করি।

কিন্তু দীনদয়ালজী প্রশ্ন করার আগেই একজন স্বয়ংসেবক উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো জনসঙ্ঘের নেতা। তাহলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবিরে কেন এসেছেন? সঙ্ঘের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?

দীনদয়ালজী প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন— আরে ভাই, একথা ঠিক যে, আমি জনসঙ্ঘের নেতা। কিন্তু আমি হিন্দুও তো! হিন্দুত্ব নিয়ে আমি গর্ব করি। হিন্দু হওয়ার ও হিন্দুত্ব সম্বন্ধে গর্বের কারণে আমি কি সঙ্ঘে আসতে পারি না?

তারপর একটু থেমে দীনদয়ালজী আবার বললেন, আমি

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক এবং জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকও। জীবনে এই ভূমিকা প্রত্যেককেই কমবেশি পালন করতে হয়। দেখুন না, আমি জনসঙ্ঘের নেতা, আবার একজনের পুত্রও বটে। এখন আপনারই বলুন, জনসঙ্ঘের নেতা আর পুত্র হওয়ার মধ্যে অন্তর্বিরোধ কোথায়? বাস্তবিক কোনও বিরোধ নেই। আমি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সেইসঙ্গে জনসঙ্ঘের সম্পাদকও। তাই এর মধ্যে কোনও অন্তর্বিরোধ নেই।

একবার বিহারের দ্বারভাঙ্গায় সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে এধরনের আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। দীনদয়ালজীর পরিচয় করাবার সময় বলা হলো, আজ আপনাদের সামনে যিনি বলবেন, তাঁর নাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। তিনি আগে সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। এখন জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক।

দীনদয়ালজী এবার বলতে উঠলেন। বললেন, আমার পরিচয় করানোর সময় একটা ছোট ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি সঙ্ঘের প্রচারক ছিলাম, একথা ঠিক নয়। আমি আজও সঙ্ঘের প্রচারক।

একবার দিল্লিতে জনসঙ্ঘের বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু দুপুরে ভোজনের সময় দেখা গেল, ব্যবস্থা ঠিক মতো হয়নি। তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। কিন্তু কোনও হোটেলে একসঙ্গে শ' দেড়শো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। দীনদয়ালজী জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বললেন, দেখ, চারদিকে অত দৌড়াদৌড়ির দরকার নেই। চল, ঝাণ্ডেওয়ালায় সঙ্ঘের কার্যালয়ে যাই। সেখানে যা জুটবে তাই সবাই মিলে খাওয়া যাবে। তারপর একটু থেমে বললেন, ঝাণ্ডেওয়ালাতেই যাওয়া ভাল। ওখানে গিয়ে শুধু খাওয়া নয়, নিজেদের মাথাটাও ঠিক রাখা যাবে। সঙ্ঘ আর দীনদয়ালজী এমনই একাত্ম ছিলেন। আর এই কারণেই জনসঙ্ঘ কিভাবে চলবে তার পথনির্দেশ দিতেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তাঁর নির্দেশিত সেই ত্রিসূত্রী সিদ্ধান্ত হল :

(১) অখণ্ড ভারত শুধু একটা তত্ত্ব নয়, বিচার বিবেচনা করে গৃহীত একটি সংকল্প। কিছু লোক দেশ বিভাজনকে ভিত্তিরেখা বলে মনে করে। এভাবে বিচার করা ঠিক নয়। মাতৃভূমির প্রতি প্রকৃত ভক্তির অভাবই এটা প্রমাণ করে। এই ধরনের লোকেরা শুধু নিজেদের ইতিহাসকে ভুলে যায়নি, সেইসঙ্গে তাদের ইতিহাস সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাও নেই। মুসলমানদের রাজত্বের সময় এই দেশ অনেক টুকরো হয়েছে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে স্থায়ী বলে মেনে নেয়নি। তাঁরা অখণ্ড ভারতের জন্যই সংগ্রাম করেছেন।

(২) জনসঙ্ঘের দ্বিতীয় মূলীভূত সিদ্ধান্ত হল :— এক রাষ্ট্রবাদ। এক জাতি। জাতির মধ্যে সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর প্রশ্ন উঠতে পারে না। শরীরে একটি নাক আর দুটি চোখ আছে। এজন্য আমরা নাক অল্প সংখ্যক আর চোখ সংখ্যাগরিষ্ঠ— এমনভাবে ভাবি না। কেননা, এ দুই-ই শরীরের অঙ্গ।

(৩) তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল— এক সংস্কৃতি। ভারতে খৃস্টান ও মুসলমানদের কোনও পৃথক সংস্কৃতি নেই। উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নেই। দেশের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক। মুসলমানদের কাছে কবীর, জায়সী, রসখানই আদর্শ। ভারতে ভারতীয় হয়ে থাকতে চায় এমন মুসলমানদের কাছে কবীরের জীবন অনুকরণীয়। আজ মুসলমানদের ভক্তির কেন্দ্র ভারতবর্ষের বাইরে রয়েছে। মুসলমানদের এই ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার।

তাঁর এই 'ভিশন', এই 'দ্রষ্টা' রূপের পরিচয় পেয়েই জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, যদি আমি আর দু'জন এরকম দীনদয়াল পেয়ে যাই, তাহলে দেশের অবস্থা বদলে দিতে পারব।

দিল্লিতে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৬ মার্চ কাশ্মীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। ইতিমধ্যে মাধবরাও মূলে, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক, ডাঃ ওমপ্রকাশজী, প্রেমনাথ ডোগরা প্রমুখের প্রচেষ্টায় জম্মুতে প্রজা পরিষদ গঠিত হয়েছে। এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধানের দাবিতে শুরু হয়েছে আন্দোলন। জম্মুর ছাত্ররা ৩৫ দিন অনশন সত্যাগ্রহ করেছেন। প্রজা পরিষদের নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশের গুলিতে ১৬ জন শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। এরকমই এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্যামাপ্রসাদ জম্মুতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ১১ মে জম্মুতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। প্রায় ১১ হাজার সত্যাগ্রহী সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এর পরের ঘটনা তো সবারই জানা। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

কাশ্মীর সত্যাগ্রহ ছিল দীনদয়ালজীর জীবনে প্রথম জন-আন্দোলন। এই আন্দোলন চলেছিল প্রায় এক মাস। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন খবর এল, দীনদয়ালজী বেশ জখম হয়েছেন। যারা তাঁর গোপন আস্তানার কথা জানতেন, স্বাভাবিকভাবেই তারা সেখানে গিয়েছিলেন। দীনদয়ালজী একটি সতরঞ্জির ওপর শুয়েছিলেন। শরীরের অকেটাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একজন জিজ্ঞেস করলেন, খুব ব্যথা লাগছে, না? দীনদয়ালজী একটু হাসলেন। বললেন, রোজ সত্যাগ্রহীরা যে পুলিশের ডাণ্ডা খাচ্ছে, এই আঘাতটা কি তার চেয়েও বেশি?

এরপর বিভিন্ন প্রশ্নে ও বিভিন্ন স্তরে অনেক আন্দোলনেরই তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। একজন প্রকৃত লোক-শিক্ষক ও কুশল সংগঠক হিসেবে তিনি সেইসব আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরকম সময়েরই একটা ঘটনা। বেরিলি স্টেশনে তিনি ট্রেন ধরার জন্য এসেছেন। অনেকেই স্টেশনে তাঁকে বিদায় জানাতে পৌঁছেছে। তাদেরই মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা দীনদয়ালজী, আপনি কি বলতে পারেন ক্ষমতা পাওয়ার পর জনসঙ্ঘও কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত হবে না?

প্রশ্নটা শুনে দীনদয়ালজী স্মিত হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, কথায় আছে— ক্ষমতা সাধারণভাবে দুর্নীতিগ্রস্তই করে। আমাদের সব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি এরকম ঘটে তবে দ্বিতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি করবো। প্রয়োজন হলে তৃতীয়, চতুর্থও। ভগবান পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় রাজাদের সংহার করেছিলেন। শেষে আদর্শ ক্ষত্রিয়

নরেশ রূপে শ্রীরামচন্দ্রকে পেয়ে তিনি বনে চলে গিয়ছিলেন। আর এরপরই আমরা রামরাজ্য লাভ করেছি। নিজেদের তৈরি প্রতিষ্ঠানের প্রতি এত মোহ কেন? কোনও বাচ্চাকে গাজর নিয়ে খেলতে দেখনি? গাজরটাকে নিয়ে সে লোফালুফি করে, কখনও ছুঁড়ে ফেলে, কুড়িয়ে আনে, আবার সেই গাজরকে খেয়েও ফেলে। নিজেদের তৈরি প্রতিষ্ঠান যদি রাষ্ট্রের পক্ষে অহিতকর হয়, তাহলে ধ্বংসই তো তার ধর্ম। রাষ্ট্র হলো সবার উপরে, প্রতিষ্ঠান নয়।

১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে গোয়া মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। 'আজাদ গোমন্তক দল'-এর ব্যানারে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিনায়করাও আপ্তে। দাদরা-নগর হাভেলির স্বাধীনতাই হলো সেই আন্দোলনের লক্ষ্য। গোয়ার রাজধানী পানাজির সেক্রেটারিয়েটে ১৫ আগস্ট ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন হেমন্ত সোমন। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতি নিয়েই জগন্নাথরাও যোশী ১৯৫৫ সালের ২৩ জুন গোয়ায় প্রবেশ করেন। রাজাভাউ মহাঙ্কল এই আন্দোলনে শহীদ হন। এই সবারই প্রেরণার উৎস ছিলেন দীনদয়ালজী। যে কোনও আন্দোলনেই দীনদয়ালজীর পথনির্দেশ ছিল সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর বিচার-বিবেচনার ফল।

আবার একারণেই অন্যদিকে এক বিপরীত চিত্র। দীনদয়ালজীর মতো প্রতিভাবান কার্যকর্তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাওয়াতে একজন স্বয়ংসেবক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ঘটনাটা বেরিলির সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের। তার বক্তব্য, তাহলে সঙ্ঘের কাজ বাড়বে কিভাবে?

দীনদয়ালজী তার কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কয় ভাই?

পাঁচ।

সবচেয়ে বড় ভাই কি করেন?

ইঞ্জিনিয়ার।

তারপর?

তারপর আমি। শিক্ষকতা করি।

সবথেকে ছোট?

সে এখনও পড়াশোনা করে।

বাবা কি করেন?

তিনি আমাদের সব দেখাশোনা করেন।

উত্তরটা শুনে দীনদয়ালজী হেসে ফেললেন। বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছ না?

আপনি তো এ পর্যন্ত কিছুই বলেননি।

তোমাদের সব ভাই এদিক-ওদিক কাজ করাতে পরিবারের অবস্থা ভাল হয়েছে কি হয়নি?

আগের থেকে ভালো হয়েছে।

তাহলে আমি বা আমার মতো কয়েকজন যাঁরা অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করছেন, তাহলে সঙ্ঘের অবস্থা খারাপ হবে কেন? আমরা কেউই যাইনি। আরও কিছু লাভের জন্যই কাজ করছি। ওইসব ক্ষেত্রেও তো দেশভক্তির ভাব জাগাতে হবে। কিন্তু আপনারা যদি ঠিক করেন, আমি আবার সঙ্ঘের কাজে ফিরে আসি, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যদি সঙ্ঘের কাজেরই ক্ষতি হয়, তাহলে সব কিছুই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটু ভেবেচিন্তে বল, তোমার আদেশ কি!

সেই স্বয়ংসেবক কি আর আদেশ দেবে! হাসি-মজার মধ্যে দিয়ে বাকিরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

।। পাঁচ ।।

ভারতের সীমান্তে চীনাদের গতিবিধি তখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ বিষয়টি সংসদেও উত্থাপন করেছে। কিন্তু 'পঞ্চশীল' নীতির দোহাই দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সরকার বালিতে মুখ গুঁজে বসে আছেন। দিল্লিতে কার্যকর্তাদের এক সমাবেশে দীনদয়ালজী এই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ছিল, যারা আজ জনসঙ্ঘের বক্তব্য সমর্থন করছেন না, তাঁদের শত্রু ভাবা ঠিক হবে না। বরং তাঁদের ঠিক ঠিক যদি বোঝানো যায় তাহলে তারা একসময় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবেনই।

বস্তুত ঘটনার গতিপ্রকৃতি সেই দিকেই মোড় নিয়েছিল। যখন সত্যিই জনসঙ্ঘের আশংকা সত্য হলো, ১৯৬২-তে চীন ভারত আক্রমণ করল, তখন কংগ্রেস বন্ধুত্বের হাত বাড়াল বা বাড়াতে বাধ্য হলো। যে নেহরু সরকার ১৯৪৮ সালে আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, এখন তারাই সঙ্ঘকে দেশভক্ত-র সার্টিফিকেট দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আমন্ত্রণ জানালো।

এই প্রসঙ্গেই তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন। যখন তিনি দিল্লিতে থাকতেন, তখন আজমেঢ় গেট থেকে ঝাণ্ডেওয়ালাতে যাওয়ার পথে পাহাড়গঞ্জ পর্যন্ত টাঙ্গায় (ঘোড়ার গাড়ি) যেতেন। পাহাড়গঞ্জে মোড়ের মাথায় এক মুচি বসে থাকত। যখনই টাঙ্গা থেকে নামতেন, তখনই মুচি জিজ্ঞাসা করত, বাবুজী, জুতো পালিশ করে দেব? অনেক বছর ধরেই এরকম চলেছে। মুচি জানত, জুতো পালিশ তিনি করেন না। তবুও সে ভাবতো, এক দিন না একদিন তার কাছ জুতো পালিশ তিনি করাবেন। ঘটনাটা বলে দীনদয়ালজী হাসতেন এবং হেসেই বলতেন, এমন মুচির মতোই হওয়া দরকার। যারা চলার পথের সঙ্গী নন, তাদের কাছে বারবার গিয়ে সংগঠনের কথা বলা দরকার। তাঁর ভাবনাচিন্তা শোনা উচিত। একদিন অবশ্যই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

একটা অতি সহজ সরল ব্যাপার। অথচ কী গভীরভাবেই না তিনি ভেবেছেন এবং অন্যদের ভাবিয়েছেন।

১৯৫৭ সালে সম্ভবত মার্চ মাসে দীনদয়ালজী নাগপুর থেকে ওয়ালটার যাচ্ছিলেন। রায়পুর স্টেশনে সেখানকার কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সাধারণ নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি আছে। এর আগের নির্বাচনে (১৯৫২) প্রাপ্ত ভোটের

নিরিখে নির্বাচন কমিশন ভারতীয় জনসঙ্ঘকে সর্বভারতীয় দল হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৫৭ সালে নির্বাচন কমিশন এই স্বীকৃতি বজায় রাখার জন্য প্রাপ্ত ভোটের হার আরও বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন। এতে দলের কয়েকজন ক্ষুব্ধ হয়ে এর বিরোধিতা করার জন্য দীনদয়ালজীর কাছে দাবি জানালেন। দীনদয়ালজী কিন্তু তাদের সোজাসুজিই বলে দিলেন, আমরা এর বিরোধিতা করব না। এরপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, শাসক কংগ্রেস দল আমাদের প্রাপ্ত ভোট আরও বাড়ানোর জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাদের সেই ইচ্ছা আমরা পূরণ করব। বস্তুত ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে জনসঙ্ঘ ১৯৫২ সালের নির্বাচনের তুলনায় দ্বিগুণ ভোট পেয়েছিল।

এই দূরদর্শিতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং সৌজন্যের মেলবন্ধন তাঁর ব্যক্তিত্বকে এক অসাধারণ মর্যাদায় তুলে ধরেছিল। একবার পাঞ্জাব প্রবাস সেরে দিল্লিতে ফেরার পর অটলবিহারী বাজপেয়ীকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। অটলজী তখন দলের শীর্ষ নেতাদের একজন। সামান্য একটা দুটো কথার পর দীনদয়ালজীও তা টের পেলেন। অটলজী বেশ রাগের সঙ্গেই বললেন, থাক, অনেক হয়েছে। এখন সব বন্ধ। আর কোথাও যাওয়া নয়।

অটলজীর এমন ভাব দেখে সকলেই বেশ একটু হতভম্ব। সবাই দীনদয়ালজীর দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। খুব শান্তভাবেই দীনদয়ালজী সেই গুমোট পরিবেশটা সহজ করে দিলেন— আরে ভাই, প্রথমে স্নানটা তো সারো। তারপর কি করা যায় দেখা যাবে।

অটলজী স্নান করতে চলে গেলেন। এদিকে দীনদয়ালজী নিজেই রুটি, ডাল-তরকারি তৈরি করে ফেললেন। আগ্রহের সঙ্গেই অটলজীকে তা খাওয়ালেন, নিজেও খেলেন। আর এর কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট কর্মসূচী মতো অটলজী আবার রওনা দিলেন।

১৯৫৯ সালের কথা। বোম্বাইয়ে জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর বৈঠক হচ্ছে। দীনদয়ালজীই সেই বৈঠক পরিচালনা করছেন। কোনও একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছে। কিন্তু অধ্যাপক বলরাজ মাধোকের বক্তব্য বেশ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিল। দীনদয়ালজী তাই তাঁকে বক্তব্য সংক্ষেপে করতে বললেন। এতে বলরাজজী একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। 'আমার ভাষণের সময়ই এটা হয়' বলে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি বসে পড়লেন।

পরের দিনের অধিবেশনে কে কোথায় যাবেন তার পরিভ্রমণ সূচী ঠিক হচ্ছিল। দীনদয়ালজী জিজ্ঞাসা করলেন, বলরাজজী, আপনি কোথায় যাবেন? বলরাজজীর ক্ষোভ তখনও কমেনি। বললেন, আমার আবার দরকার কি?

দীনদয়ালজী আগের মতোই শান্তভাবে বললেন, মাদ্রাজ, কেরলের মতো রাজ্যে ইংরাজীতে বললে ভালো হয়। আর জনসঙ্ঘের ভূমিকা ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলার মতো শুধু আপনিই তো রয়েছেন। ওদিকে তাই আপনি গেলেই ভালো হয়।

দীনদয়ালজীর এই একটা কথাতেই কাজ হল। বলরাজজী এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

খুবই সব ছোট বিষয়। সংগঠনের প্রবীণ কার্যকর্তাদেরও ব্যবহার ও ভাবনা যাতে সঠিক দিশায় পরিচালিত হয়, জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত ছিল তাঁর লক্ষ্য। উত্তরপ্রদেশে তখন (১৯৬৭-৬৮) কোয়ালিশন সরকার। সেই সরকারে সামিল জনসঙ্ঘও। নিজের দলের মন্ত্রীদের দিয়ে কিছু সুবিধা আদায় করে নেওয়ার অভ্যাস জনসঙ্ঘের কর্মীদের মধ্যেও যে ছিল না তা নয়। আর এটা যে কিছু খারাপ তা মনে করারও কোনও কারণ ছিল না। কেননা, কংগ্রেসের শাসনকালে এটাই রীতিই ছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের খুর্শীদবাগ কার্যালয়ে শচীন্দ্রনাথ বক্সী তখন কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। একদিন গ্রাম থেকে এক কার্যকর্তা এসে হাজির। তাদের গ্রামের এক স্কুলে তিনি পরিচালন সমিতির সদস্য। কিন্তু তাকে ওই সমিতি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এতেই তার রাগ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রক তখন জনসঙ্ঘের মন্ত্রীর অধীনে। ওই স্কুলের অনুমোদন যাতে শিক্ষা মন্ত্রক বাতিল করে দেয়— এটা ছিল তার দাবি। ব্যাপারটা নেহাৎই ব্যক্তিগত পর্যায়ের। তবুও তিনি তার দাবি থেকে সরতে রাজি নন। জেদ ধরেই আছেন। শেষপর্যন্ত শচীনবাবু আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন, সত্যি বলতে কি, এজন্য আপনার লক্ষ্ণৌতে আসার দরকারই ছিল না। শ'-দুশো লোক যোগাড় করে স্কুলটা দখল করে নিলেই পারতেন। কিছু মারপিট হত, এক-দু'জনের মাথা ফাটত, আর সরকার তখন নিজেই ব্যাপারটা তদন্ত করতে আদেশ দিতেন।

শচীনবাবুর কথায় ভদ্রলোক তো আরও রেগে গেলেন। রাগের চোটে দু-চার কথা শুনিয়েও দিলেন।

ঘটনা হল, সেদিন ওই কার্যালয়েরই অন্য একটা ঘরে দীনদয়ালজীও ছিলেন। তিনি সবই শুনেছেন। সন্ধেবেলা শচীনবাবুর সঙ্গে চা খেতে খেতেই তিনি কথাটা পাড়লেন— দাদা, সবাই যদি উচিত-অনুচিত বুঝে কাজ করত, তাহলে তো হয়েই যেত। তা তো হয় না। রাগ-লোভ এসব কমবেশি সবারই আছে। এটা ঠিক, নিয়ম মতো কাজ করতে গিয়ে কখনও কখনও কাউকে রূঢ় কথাও বলতে হয়। তবে কি জানেন, প্রত্যাখানও মিষ্টি কথায় করা যায়। আমরা তো কার্যকর্তা। আমাদের তো এটা বোঝা উচিত। তাই লোকে দূরে সরে যাবে এমন ভাষা নাই বা বললাম। কারোর মনে যেন দুঃখ না হয়।

দীনদয়ালজী, কতবার তো বোঝালাম। শোনে কই! শেষপর্যন্ত তো মারপিটের ভাষাটাই সে বুঝলো।

আরে দাদা, ও তো আপনার ছেলের বয়সী। একটু বুঝিয়ে বললে কি ও মানতো না?

শচীন্দ্রনাথ বক্সী পরে নিজেই স্বীকার করেছেন, ব্যবহার কেমন হওয়া দরকার সেদিন যেন তার একটা দিশা পেয়ে গেছিলাম।

কানপুরে সঙ্ঘের ওটিসি হচ্ছে। সঙ্ঘের ক্যাম্পে সেই ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সব কার্যক্রমই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। হাসিঠাট্টা গালগল্পের যাকে বলে একেবারে আগ মার্কা গ্যাজানোর অবকাশ খুব কম। এরই ফাঁকে একে অন্যের সঙ্গে মজা করার সুযোগ খোঁজে। খাওয়ার পর থালাবাসন মাজার জন্য লাইন দিতে হোত। কলের নীচে যদি কেউ বাসন রাখত, অমনি একজন তা তুলে ফেলে

দেওয়ার চেষ্টা করত। হাসির হুল্লোড় উঠত। সেই লাইনে এরকমই এক স্বয়ংসেবক দাঁড়িয়েছিলেন। নেহাতই সাদাসিধে। কলের নীচে ধোওয়ার জন্য রাখতেই তার থালাটাও কে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাসির হুল্লোড় উঠল। বেচারা! দূর থেকে থালা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আবার লাইনে তাকে দাঁড়াতে হলো।

সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে সাধারণত দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ বৌদ্ধিক হয়। অর্থাৎ সঙ্ঘের কোনও বরিষ্ঠ অধিকারী তখন ভাষণ দেন। পুরো পরিবেশটাই তখন পাল্টে যায়। ধীরে ধীরে শান্ত, প্রতিদিনের মতো এদিনও বর্গে সর্বাধিকারী প্রধান বক্তার পরিচয় করিয়ে দিতে উঠলেন। বললেন, আজ আপনাদের সামনে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভাষণ দেবেন।

কিন্তু এ কী! ইনি তো সেই সকালের সাদাসিধে মানুষটা। যাঁর থালা ফেলে দিয়ে বেশ মজা করা হয়েছিল। লজ্জায় অনুতাপে যে থালাটি ফেলে দিয়েছিল সে একেবারে মরমে মরে গেল। চোখ দুটো তার বারবার জলে ভরে উঠল। বারবারই তাঁর মনে হতে লাগল, এমন নিরহংকারীও মানুষ হয়!

বর্ধমানের মহন্তস্থলে বাংলার সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গে এসেছেন দীনদয়ালজী। সেটা ১৯৬৩ সাল। সেখানে শিক্ষার্থীদের এক বৈঠকে বাংলার কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। কয়েকজন বেশ চটপটই উত্তর দিয়েছিল— কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, তারকেশ্বর, তারাপীঠ, নবদ্বীপ....।

দীনদয়ালজী জিজ্ঞাসা করলেন আর—

একটু ভেবে এক-দু'জন বলল, গঙ্গাসাগর, মাহেশ, জল্পেশ....

আর—

এবার আর মুখ থেকে কথা বেরুচ্ছে না। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে সব। একজন নীচু গলায় বলার চেষ্টা করল, বর্ধমানের ১০৮ শিবমন্দির।

আর— দীনদয়ালজীর আবার জিজ্ঞাসা

পুরো হলঘরটাই যেন একেবারে মূক হয়ে গিয়েছে। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন দীনদয়ালজী নিজেই— কেন, তোমাদের কি ঢাকার রমনা কালীবাড়ির কথা মনে পড়ছে না? চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ শিবের বা চট্টেশ্বরী দেবীর কথা? সেগুলিও তো আমাদের বাংলায়। এর মধ্যেই ভুলে যাচ্ছ?

ভারতবর্ষের সঙ্গে কী একাত্মতা! কী মমত্ব বোধ। অখণ্ড ভারত ভাবনায় কী গভীর প্রত্যয়! এমন মানুষই তো প্রেরণার উৎস।

।। ছয় ।।

নাগপুরে গেলে তিনি সাধারণত সঙ্ঘের কার্যালয়েই থাকতেন। জনসঙ্ঘের বড় নেতা হওয়ার জন্য কোনও আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। পুরো কার্যালয়েই একবার চক্কর দিতেন। তাতে রান্নাঘরও বাদ যেত না। রান্নাঘরের বড় রাঁধুনি ছিলেন তখন মঙ্গল— মঙ্গল প্রসাদ।

কেমন আছো মঙ্গলদা?

এত বড় রাজনৈতিক দলের নেতা তাঁকে দাদা বলে ডাকছেন, মঙ্গল প্রসাদ খুব খুশি হতেন— একটু বা লজ্জাও। তবুও বলতেন, পণ্ডিতজী, আপনার জন্য কি রাঁধবো?

না, না। আমার জন্য আলাদা কিছু করতে হবে না, মঙ্গলদা। সবার জন্য যা রাঁধবেন, আমিও তাই খাব।

কখনও কখনও মঙ্গলদার কাছে খবর আসত— পণ্ডিতজী আজ খাবেন না। মঙ্গলদা অবশ্য তাতে দমতেন না। পণ্ডিতজীকে অন্তত এক গ্লাস দুধ খাওয়ানো তার চাই।

মঙ্গলদার মতো মুম্বাইয়ের এক গৃহিনীর অভিজ্ঞতাও একইরকম। মুম্বাই গেলে সাধারণত সেই বাড়িতেই দীনদয়ালজী উঠতেন। সেই গৃহিনীর কথা হলো— আমাদের বাড়িতে অনেক নেতাই আসতেন। কারও কারও ভালোভাবে দেখা শোনার জন্য ভাবনা হতো। কিন্তু দীনদয়ালজীর জন্য এসব হোত না। মনে হোত বাইরে কাজ থেকে ফিরে নিজেরই কোনও ভাই এসেছে।

একবার দীনদয়ালজী বারানসী থেকে বালিয়া যাচ্ছেন। সাধারণত তিনি ট্রেনের থার্ড ক্লাসেই (তখন থার্ড ক্লাস ছিল) যাতায়াত করতেন। সেদিন থার্ড ক্লাসে এত ভীড় ছিল যে, একটা পিঁপড়ে ঢোকাও ছিল অসাধ্য। বাধ্য হয়েই দীনদয়ালজীকে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে হলো। বালিয়াতে নেমে টিকিট চেকারকে জিজ্ঞেস করলেন— বারানসী থেকে বালিয়ার সেকেণ্ড আর থার্ড ক্লাসের মধ্যে ভাড়ার ফারাক কত? টিকিট চেকার তা জানালে তিনি তা দিতে চাইলেন।

আরে দাদা, আপনি যান। কে দেখছে যে আপনি থার্ড না সেকেণ্ড ক্লাসে এসেছেন। টিকিট চেকারের তিরিশ বছরের চাকরি জীবনে এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি।

একজন নাগরিক হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের আইন মেনে চলতেন। রোজ দু'বেলা রেডিওতে খবর শোনা ছিল তাঁর অভ্যাস। এজন্য সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকত একটি ট্রানজিস্টার রেডিও। সেইসময় ট্রানজিস্টার রেডিওর জন্য লাইসেন্স লাগত এবং নিয়মিত লাইসেন্সের টাকা জমা দিতে হোত। একবার দীনদয়ালজী ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন, যথারীতি তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ট্রানজিস্টার রেডিও। তাঁর উল্টোদিকের আসনে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর কাছেও ছিল একটি রেডিও। তিনি তার রেডিওতে বিবিধ ভারতী এবং অন্যান্য চটুল সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনছিলেন। দিল্লির খবরের সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, দীনদয়ালজী তত উসখুশ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না। যখন খবরের সময় হলো তিনি ভদ্রলোককে বলেই ফেললেন— আপনার রেডিওতে একটু কেন্দ্রীয় সমাচার শোনাবেন?

ভদ্রলোক প্রথমে দীনদয়ালজীর কথার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে যেমন শুনছিলেন তেমন শুনতে থাকলেন। দীনদয়ালজী আবার তাকে একই অনুরোধ করলেন। এবার ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়েই বোধহয়

কেন্দ্রীয় সমাচার চালালেন। দীনদয়ালজী অত্যন্ত মন দিয়ে পুরো খবর শুনলেন। খবর শেষ হবার পর ভদ্রলোককে অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। এইবার ভদ্রলোক তার বিরক্তি আর চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা আপনার সঙ্গে তো রেডিও রয়েছে, তবে আপনি আমার রেডিওতে খবর শুনতে চাইলেন কেন, আপনি কি আপনার রেডিওর ব্যাটারি বাঁচাচ্ছেন?

দীনদয়ালজী ভদ্রলোকের উষ্মার কারণ বুঝলেন এবং স্মিত হেসে বললেন— আজ্ঞে না। আসলে গতকাল আমার রেডিওর লাইসেন্স রিনিউ করার তারিখ ছিল। কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি লাইসেন্সের টাকা জমা দিতে পারিনি। এখন তো এই রেডিওতে কোনও অনুষ্ঠান শোনা বেআইনী, তাই নিরুপায় হয়েই আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। তবে খবর শোনানোর জন্য এবং এই প্রশ্ন করার জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ। একথা শোনার পর ভদ্রলোক আর কী বলবেন! তিনি তখন লজ্জায় নিজের মুখ লুকাতে পারলে বাঁচেন এমন অবস্থা। সততা এবং নিয়মনিষ্ঠার এইরকম দৃষ্টান্ত আজকের জগতে সত্যিই বিরল।

সেবছর (১৯৬০) গুজরাটের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ রাজকোটে হচ্ছে। দীনদয়ালজীর টিকিট ফার্স্ট ক্লাসের। সঙ্গী সুমন ভাই পারেখের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পাওয়া যায়নি। যথারীতি তিনি থার্ড ক্লাসেই যাচ্ছেন। ব্যাবর বলে এক স্টেশনে স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা তাঁর কাছে খাবার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।

সুমন ভাই তো অবাক। দীনদয়ালজী তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসছেন। তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন— পণ্ডিতজী আপনি এত কষ্ট করছেন কেন?

আরে ভাই, একা একা কী খাওয়া যায়? তাছাড়া খাবারের এই পাত্রগুলো আজমীঢ় স্টেশনে ফেরত দিতে হবে। তুমি তো আর আমাদের কামরায় যেতে পারবে না। সেটা তো বেআইনী। কিন্তু আমি তো তোমার কামরায় নিশ্চিন্তে বসতে পারি।

যাতায়াতের সময় ব্যবস্থার কারণে কেউ প্রথম, কেউ তৃতীয় শ্রেণীতে যেতেই পারে। কিন্তু সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার এমন সফল নেতৃত্ব— এক নির্মল আনন্দে সুমন ভাইয়ের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠেছিল।

সে বছরেরই একটা ঘটনা। ৬০-এর ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে কৃষক সম্মেলন হচ্ছে। সকাল ৯টার সময় মিছিল শুরু হবে। যা ভাবা গিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি লোক এসে পড়েছে। এদিকে পুলিশ আবার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এই মিছিলে দীনদয়ালজীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। অথচ তিনিও তখন পৌঁছাননি। কার্যকর্তাদের চোখমুখে একটা অসহায় ভাব। কয়েকজন গাড়ি নিয়ে দীনদয়ালজীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ-ছ মাইল যেতেই দেখা গেল, দীনদয়ালজী হেঁটে হেঁটে আসছেন। আসলে যে জীপে করে আসছিলেন, তা রাস্তায় খারাপ হয়ে যাওযাতেই এই বিপত্তি। সময় সচেতন দীনদয়ালজী তখন গন্তব্যস্থলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। শেষপর্যন্ত ঠিক সময়েই মিছিল শুরু হয়েছিল।

দীনদয়ালজী 'রাষ্ট্রধর্ম' মাসিক পত্রিকারও তখন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। একদিন রাতে দেখা গেল, কম্পোজিটার আসেননি। কাগজ ঠিক সময়ে বের করা কঠিন হয়ে উঠবে। এই আশংকার কথা দীনদয়ালজীকে জানাতে তিনি নিজেই তখন কম্পোজ করতে শুরু করে দিলেন। এমন ঘটনা যে এই প্রথম ঘটল তা নয়। একবার প্রেসের কর্মচারী কম থাকার জন্য চাটাইয়ের ওপর বসে তিনি নিজেই কাগজের বাণ্ডিল বেঁধেছেন। বাণ্ডিলের ওপর এজেন্টদের নামধামও লিখেছেন। একবার তো লোডশেডিং-এর জন্য নিজের হাতে মেশিনও চালিয়েছেন। কাগজ ঠিক সময় যাতে প্রকাশিত হয় সেজন্য তিনি বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৬০ সালের আগস্টের একদিনে চন্দৌসী কলেজের ছাত্র সংসদ দীনদয়ালজীকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেছিল। সেদিন তিনি বাইরে থেকে সবে ফিরেছেন। জামাকাপড়ের অবস্থা খুবই কাহিল— বেশ অপরিষ্কার। জুতোটা আবার ছেঁড়া। এরকম পোষাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কী করে দীনদয়ালজীকে নিয়ে যাওয়া যাবে! মনোহরলালজী ছিলেন তখন সঙ্ঘের চন্দৌসী নগরের কার্যবাহ (সেক্রেটারি)। তিনি নতুন জামাকাপড় কিনে এনে দীনদয়ালজীকে তা পরতে বললেন।

দীনদয়ালজীর কিন্তু এসব ভালো লাগলো না। বললেন, আরে ভাই, এ পরেই তো সারা উত্তরপ্রদেশ ঘুরে এলাম। এখানে আবার আলাদা ব্যবস্থা কেন?

যাই হোক, সেই নতুন জামাকাপড় পরে দীনদয়ালজীকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে হল। অনুষ্ঠানের পর ফিরে এসে তিনি আবার তাঁর সেই পুরনো জামাকাপড় পরলেন। এতে তো মনোহরলালজী বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, পণ্ডিতজী, আপনার সঙ্গে আমরা কি ঠাট্টা করছি? আপনি আবার এই পুরনোগুলো পরলেন কেন?

আরে, সত্যিই আপনারা এই নতুন জামাকাপড় আমাকে দিয়ে দিলেন নাকি?

এই প্রশ্নের কী কোনও উত্তর আছে? এমন সরল সাদাসিধে মানুষও হয়?

অথচ এই মানুষই আবার বাছবিচার করে ভিখারিকে ভিক্ষা দিতে বলতেন। একবার তিনি ট্রেনে যাচ্ছিলেন। তাঁর এক সহযাত্রী ভিখারিকে পয়সা দিতে গেলে তিনি বারণ করলেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই এক অন্ধ ভিখারি যখন গান গাইতে গাইতে ভিক্ষে চাইছিল, তখন তিনি নিজে থেকেই সেই সহযাত্রী বন্ধুটিকে ভিক্ষা দেওয়ার কথা বললেন। সহযাত্রী বন্ধু এতে একটু বিস্মিতই হলেন। সহযাত্রী বন্ধুর মনোভাব বুঝতে দীনদয়ালজীর অসুবিধা হলো না। তিনি বললেন, আরে ভাই, আগের ভিখারিটি ছিল বেশ হাড্ডাগাড্ডা। খেটে খেতেই পারে। অথচ তা না করে ভিক্ষা চাইছে। ও আমাদের দেশের কলঙ্ক। আর দ্বিতীয়জন অন্ধ। তবুও শুধু হাতে নয়, গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। সে গান গেয়েও নিজের পঙ্গুত্বকে জয় করার চেষ্টা করেছে। সামর্থ্য থাকলে একে তো সাহায্য করাই উচিত।

অথচ নিজের প্রতি কী কঠোর!

মামাতো ভাই ব্রহ্মানন্দ শুক্ল এম এস সি, এল এল বি পাশ করেছেন। রেলের চাকরি যোগাড় করতে তাঁর তেমন কোনও অসুবিধা ছিল না। তবু তাঁর মনে হয়েছিল, ভাইসাহেবকে বলে যদি আরও একটু ভাল কিছু পাওয়া যায়। ভাইসাহেব তো এখন বড় রাজনৈতিক নেতা।

কিন্তু ফল হলো একেবারে উল্টো। কথাটা বলতেই দীনদয়ালজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, যাদের বাপ-দাদার খুঁটির জোর নেই, তারা কী করে? মনে কর, আমি নেই।

এরপরও কি আর কিছু বলার কারও সাহস হয়?

সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর হবে। ১৯৬৩ সাল সেটা। আমেরিকার ভারতমৈত্রী সঙ্ঘের আমন্ত্রণে দীনদয়ালজী আমেরিকা গিয়েছেন। সেখানে বন্ধুরা ধরে বসলেন, তাঁকে একটা কিছু নিতেই হবে। বলুন, তাঁর কি দরকার। দীনদয়ালজী যতই বোঝান, না বাপু, আমার তেমন কিছুর দরকার নেই, বন্ধুরা ততই নাছোড়বান্দা। শেষমেশ রফা হল, কিছু বই দেওয়া যেতে পারে।

দীনদয়ালজী যে লিখতে পড়তে ভালোবাসেন সেকথা কারোরই অজানা ছিল না। অনেক লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলার কারণে সময় পাওয়া যেত কম। তবু কোনও ভালো বই পেলে অত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি তা শেষ করতেন। পড়াশোনার জন্য একটা উপায়ও বার করেছিলেন। মেল বা এক্সপ্রেসের বদলে প্যাসেঞ্জার গাড়িতে যাতায়াত। বস্তুত তাঁর অনেক লেখালিখি এর ফলেই সম্ভব হয়েছে।

একবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একখানা বই লিখছেন। সেসময় রজ্জু ভাইয়া (পরবর্তীকালে যিনি সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক হয়েছিলেন।) কথা প্রসঙ্গে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা দীনদয়ালজী, অর্থশাস্ত্র তো আপনার বিষয় নয়। তাহলে আপনি এবিষয়ে লিখছেন কিভাবে?

মৃদু হেসে দীনদয়ালজী বলেছিলেন, আসলে জনসঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পর এই বিষয়টার গুরুত্ব যখন বুঝলাম, তখনই পড়াশোনা শুরু করি। টেক্সটবুক থেকে শুরু করে গবেষণা গ্রন্থ— এবিষয়ে এরকম প্রায় পাঁচশো বই এযাবৎ পড়েছি।

'বুকরেঞ্জ' বা স্বাধ্যায়ের এই বিস্তৃতি ও গভীরতা বাস্তবিকই বিস্ময় জাগায়।

বিমানবন্দরে বন্ধুরা দীনদয়ালজীকে বিদায় জানাতে গেছেন। বিমান ছাড়তে তখন আর বেশি দেরিও নেই। হঠাৎই একজন দীনদয়ালজীর পকেটে একটা খাম পুরে দিলেন। দীনদয়ালজী তো অবাক। জিজ্ঞেস করলেন— কি আছে?

বন্ধুটি মুচকি হেসে বললেন, কিছু নেই।

দীনদয়ালজী পকেটে হাত দিতে যাচ্ছেন, বন্ধুটি ধরে ফেললেন। বললেন, না, এখন না। বিমান ছাড়ার পর...

আসলে খামটিতে দশ হাজার টাকার একটা চেক্ ছিল। তা এমনই কপাল, সে টাকা আর খরচ হয়ে ওঠেনি। যাঁর ধাতেই এসব নেই, তা দশ হাজার কেন, লাখ টাকার চেকের ভাগ্যেও এটা ঘটত। দেশে ফিরে দীনদয়ালজী তা গুরুদক্ষিণা হিসেবে সমর্পণ করে দেন।

এপ্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। মথুরার কাছে ফরহতে জনসঙ্ঘেরই একটা মিটিং হচ্ছে। দীনদয়ালজীও সেখানে আছেন। সেখানকার জনসঙ্ঘের সভাপতি বয়সে যুবক। হঠাৎ সে বলল, দীনদয়ালজী, আপনার ভিটেবাড়িটা তো এমনি পড়ে রয়েছে। ওটা আমাদের দিন না। কথাটা শুনেই দীনদয়ালজী বললেন, আমি তো জমিটা তাকেই দেব, যে ওটা বুকে বেঁধে নিয়ে যাবে। তুই নিবি! তাহলে কাগজ নিয়ে আয়। তোর নামে লিখে দিচ্ছি। শুনলে অবাক হতে হয়, দীনদয়ালজী তখনই তা লিখে দিলেন। এরপর একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, দিলেন যদি তবে সঙ্ঘের নামে দিলেন না কেন? একটু নীরব থেকে দীনদয়ালজী প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন— যে সঙ্ঘ মায়া-মোহ সব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে, তাকেই আবার বাঁধানো কেন?

দীনদয়ালজী দেড় মাস মতো আমেরিকায় ছিলেন। সেসময় অস্টিন-এ (টেক্সাস) ভারতীয় বিদ্যার্থী সঙ্ঘ তাঁর সৌজন্যে একটা চায়ের আসরের আয়োজন করে। সেটা ছিল সন্ধ্যে ছ'টায়। স্থানীয় খবরের কাগজে তারা তার বিজ্ঞাপনও দেয়। কিন্তু দৈব প্রতিকূল হলে যা হয়, সেদিন বিমানই পৌঁছাল ছ'টার পর। এর ঠিক পরেই ছিল টেক্সাস ইউনিভার্সিটির একটা প্রোগ্রাম। সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক সেমিনারে দীনদয়ালজী অন্যতম বক্তা। বিভাগের প্রধান সময়ের ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। ফলে চায়ের আসরটা বাতিল করা ছাড়া উপায় রইল না। টেক্সাসের কার্যক্রম সময় মতোই শুরু হলো। জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীনদয়ালজী তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তব্যে শ্রোতারা এতটাই প্রভাবিত যে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই রাত দশটা বেজে গেল। আলগা হয়ে গেল সময়ের বাঁধন।

দেড় মাস ছিলেন বটে, কিন্তু কাজের চাপে স্টেটের দর্শনীয় স্থানের অনেকগুলিই তাঁর দেখা হয়ে ওঠেনি। অথচ আমেরিকার সংশ্লিষ্ট মহলে তিনি একটা ছাপ রেখে আসতে পেরেছিলেন।

এ ধরনেরই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখি লণ্ডন শহরেও। আমেরিকা থেকে ফেরার পথে লণ্ডনে কয়েকদিন ছিল তাঁর যাত্রার বিরতি। তাঁর এই উপস্থিতির সুযোগ লণ্ডন প্রবাসী বন্ধুরা সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি। একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সেসময় ইউরোপে জনসঙ্ঘের আদৌ তেমন কোনও পরিচিতি ছিল না। আর যারা জানতেন, তাদের অনেকের কাছেই জনসঙ্ঘের পরিচিতি ছিল একটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক পার্টি হিসেবে। এর আগে লণ্ডনে জনসঙ্ঘের কোনও নেতা কখনও প্রেস কনফারেন্স করেননি। সেদিক থেকে এই প্রেস কনফারেন্সকে সফল বলতেই হয়, কেননা, এই প্রথম কনফারেন্সেই ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ঘন্টা দেড়েক চলেছিল কনফারেন্স। বেশ জমেই ছিল। পরিণাম— পরের দিন 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান'-এর মন্তব্য : এমন এক ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

এরকম একজন 'পাবলিক ম্যান' অথচ কত ঘরোয়া। লণ্ডনে

নারায়ণস্বরূপ শর্মার বাড়িতে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। শর্মাজীর ছোট্ট মেয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে দীনদয়ালজীর দারুণ দোস্তি হয়ে গিয়েছে। একদিন সকালে চায়ের আসরে গল্প করতে করতে শর্মাজীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা দীনদয়ালজী, আপনি বিয়ে করলেন না কেন?

প্রশ্ন শুনে দীনদয়ালজী হেসে ফেললেন। বললেন, আরে ভাই, তুমি আবার এসব জিজ্ঞাসা করছো কেন? আর বিবাহ করবই বা কেন?

বাঃ রে! আপনার দেখাশুনা কে করবে?

দেখাশোনা করার দরকার হবে না। আর যদি ধরেই নাও, এরকমই একটা অবস্থা হয়, তাহলে আমার মা-বোনেরাই যথেষ্ট। এ নিয়ে তাই ভাবি না।

কিন্তু মা-বোনেরা তো স্ত্রীর মতো দেখাশুনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন শুনে দীনদয়ালজী একটু চুপ করে রইলেন বটে। কিন্তু তার পরেই বললেন, আরে ভাই, বিয়ে করলে অনেকটা সময় ঘরসংসার সামলাতেই চলে যেত। সমাজের কাজে সময় কম পড়ত। আর দেখাশুনার কথা বলছ? ভারত থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে লণ্ডনে বসে তোমার মতো বোনেরা যখন আমার চিন্তা করছ, তখন নিজের দেখাশুনার কথা ভাবার দরকার কি?

।। ৭।।

প্রশংসায় যেমন, পরাজয়েও তেমন। সদাপ্রসন্ন। সে সময় (১৯৬৩) এদেশে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া বইছে। উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তা আরও তুঙ্গে। লোকসভার উপনির্বাচন হচ্ছে কনৌজ, অমরোহা আর জৌনপুরে। জৌনপুরের আসনটি জনসঙ্ঘেরই দখলে। দলীয় এম পি ব্রহ্মজিৎ সিংয়ের মৃত্যুতে এই আসনটি খালি হয়েছে। জনসঙ্ঘের সকলেরই আগ্রহ, এবার সেখানে দীনদয়ালজীই প্রার্থী হোন। কিন্তু তা হলে কি হবে, নিজে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে দীনদয়ালজী মোটেই আগ্রহী নন। তিনি সঙ্ঘের প্রচারক। নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নিলে এক বিকৃত পরম্পরার সৃষ্টি হতে পারে— এই আশংকা তাঁর ছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। প্রার্থী হয়েছিলেন এবং ভোটযুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর কপালে জয়ের তিলক পরিয়ে দেননি। কাশীতে তখন সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ চলছিল। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরের দিনই সেখানে দীনদয়ালজীর কার্যক্রম ছিল। অথচ তাঁর চোখেমুখে বিন্দুমাত্র বেদনার পরাজয়ের কোনও ছাপ ছিল না। সেই বর্গে তখন সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ভাউরাউজী দেওরসও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মন্তব্য, মুঝে অত্যন্ত আশ্চর্য হুয়া — বড় আশ্চর্য হয়েছি।

এমন মানুষ যে লোকসংগ্রহ-এ সক্ষম তা নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। জুনাগড়ে জনসঙ্ঘের তিনদিন ধরে প্রশিক্ষণ বর্গ চলছে। সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারাও সেখানে উপস্থিত। বর্গের শেষদিনে সকলের একসঙ্গে ফটো তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। সেইমতো সবাই চেয়ারে বসেছেন। হঠাৎ দীনদয়ালজী দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে প্রায় জোর করে ধরে এনে পাশের একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি রাজ্য সভাপতি। এ রাজ্যে আমাদের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। ফটোতেও আপনার কেন্দ্রস্থানে থাকা দরকার। যাঁকে নিয়ে এই ঘটনা সেই হরিসিংহ গোহেল নিজেই এক স্মৃতিচারণায় একথা জানিয়েছেন।

মানুষের সহমর্মী হওয়া, তাকে বোঝা, তার ভাবকে বাধা না দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া— ব্যক্তি নির্মাণের এই কলা ছিল দীনদয়ালজীর করায়ত্ত। রামদাস কলসকর ছিলেন জনসঙ্ঘের একজন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা। সঙ্ঘের প্রচারকও। জনসঙ্ঘের কাজের জন্য তাঁকে মাদ্রাজ পাঠানো হবে। দীনদয়ালজী নিজেই তা রামদাসজীকে জানিয়েছেন। কথা হয়েছে, নাগপুরের বৈঠকের পরই রামদাসজী মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের জনসঙ্ঘের কার্যকর্তাদের কাছ থেকে দীনদয়ালজীর কাছে একটি চিঠি এসে পৌঁছেছে। সেই চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, এখন যা অবস্থা তাতে কোনও মারাঠিভাষী কার্যকর্তাকে মাদ্রাজে না পাঠানোই ভালো। সে সময় (১৯৬৮) মহারাষ্ট্রে শিবসেনাদের তাণ্ডব চলছিল। মাদ্রাজের কার্যকর্তাদের অসুবিধা বুঝতে দীনদয়ালজীর দেরি হয়নি। তিনি তখনই রামদাসজীর মাদ্রাজ যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দিলেন।

বাংলার জনসঙ্ঘের এক কার্যকর্তা তখন দীনদয়ালজীর কাছেই বসেছিলেন। অনেকদিন ধরেই তিনি বাংলার জন্য একজন পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাইছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনি নিজের দাবিটা আবার পেশ করলেন।

ঠিক আছে, রামদাসকে আসতে দাও। ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা যাবে।

রামদাসজীর সঙ্গে আর কি কথা বলবেন? উনি তো সঙ্ঘের প্রচারক। আপনি যেখানেই বলবেন, উনি সেখানেই যাবেন। ওর কাছে মাদ্রাজই বা কী আর বাংলাই বা কী! —বাংলার কার্যকর্তার যুক্তি।

আরে ভাই, আমাদের প্রচারক তো আর কোনও নির্জীব বস্তু নয়। যে পোস্টারের মতো তাকে যেখানে ইচ্ছে লাগানো যায়। প্রচারক ঠিক আছে, তাঁরও তো কোনও মতামত থাকতে পারে। আমার তো মনে হয়, কোথায় কাজ করলে তার সুবিধা হয়, এটা তিনিই স্থির করবেন। এই স্বাধীনতা যদি কাউকে না দেন, তাহলে আপনি তাঁর কাছ থেকে কিভাবে স্বাধীন ও স্বাভিমানী সমাজ নির্মাণের আশা করছেন?

কয়েকদিন পর রামদাসজী এলেন। দীনদয়ালজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও হলো। একে অপরের ভাব বুঝলেন এবং দীনদয়ালজীর পরামর্শ মতো রামদাসজী কলকাতায় পৌঁছে গেলেন।

ব্যক্তি মানুষের মনের ভাব বোঝা, তার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর তার মতো করে দেওয়া, সঠিক পথনির্দেশের এমন উদাহরণের সংখ্যা কম নয়। রাজস্থানের উদয়পুরে তখন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ চলছে। দীনদয়ালজী সেই বর্গে গিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই এক প্রশ্নোত্তরের কার্যক্রম

রাখা হয়েছে। সেখানে একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্ন— একের পাশে এক লিখলে এগারো হয়। তাই হিন্দু ও মুসলমানদের যদি এক করার চেষ্টা হয়, তাহলে তো বিশাল শক্তি হবে। তবুও সঙ্ঘ তা করছে না কেন?

স্মিত হেসে দীনদয়ালজীর প্রত্যুত্তর— একথা সত্যি, একের পাশে এক রাখলে এগারো হয়। কিন্তু অর্ধেক এক মিলে কি এগারো হয়! কিংবা একের চার এবং এক মিলে? তাই হিন্দুরা যতক্ষণ না এক হচ্ছে, ততক্ষণ অপর সমাজের সঙ্গে মিলে শক্তি উৎপন্ন হবে এটা কল্পনাবিলাস মাত্র। একথা চিন্তা করেই সঙ্ঘ প্রথম থেকেই হিন্দু সংগঠনের কাজ করে চলেছে। হিন্দুরা সংগঠিত হলেই অন্যেরা অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে নিজেরাই মিলেমিশে থাকতে আগ্রহী হবে।

প্রত্যুত্তর শেষ হতেই আর একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলেন— লোকেরা সব স্বয়ংসেবককেই কেন জনসঙ্ঘী (বিজেপি) বলে? সঙ্ঘের পথসঞ্চলনকেও কেন জনসঙ্ঘের বলে ভাবে?

প্রশ্ন শুনে দীনদয়ালজী হেসে ফেললেন। বললেন, আরে ভাই, জনসঙ্ঘের প্রচার এত বেশি হয়েছে যে লোকে আপনাকেও জনসঙ্ঘী বলে ভাবে। এরকমই লোকে আগে সঙ্ঘকে জানত। সেসময় জনসঙ্ঘ যখন নির্বাচনে প্রার্থী হলো, তখন লোকে বলত, দেখ দেখ, সঙ্ঘের লোকেরা নির্বাচনে লড়ছে। কাজ বাড়ার জন্যই এরকম হয়েছে। সঙ্ঘের কাজের সম্বন্ধে যখন লোকে আরও জানবে, তখন আবার তারা আপনাকে সঙ্ঘী বলবে আর জনসঙ্ঘের (বিজেপি) সব কাজকে সঙ্ঘের কাজ বলেই ভাববে।

বস্তুতঃ দীনদয়ালজী শুধু সর্বস্ব সমর্পণই করেননি, 'আমি কিছু করেছি'— এই ভাবনাও তাঁর ছিল না। যাঁরা তাঁকে অনেকদিন ধরে খুব কাছ থেকেও দেখেছেন, 'আমি' কথাটা তাঁর মুখ থেকে কখনও শোনেননি বললেই হয়। প্রচারক জীবনের প্রথম দিকের একটি ঘটনা। উত্তরপ্রদেশে পিলভিট অঞ্চল পরিভ্রমণ করে তিনি লখিমপুরে এসেছেন। তাঁর জিনিসপত্র লখিমপুর সঙ্ঘ কার্যালয়েই থাকত। বসন্তরাও বৈদ্য তখন কিশোর স্বয়ংসেবক। সেসময় ওই কার্যালয়ে থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন। দীনদয়ালজীর কোনও জিনিস কখনও দরকার হলে এনে দিতেন। একদিন দীনদয়ালজী ঘর থেকে তাঁর কাঠের বাক্সটা আনতে বললেন। সেই বাক্স থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে নিয়ে বললেন, কাগজগুলো পুড়িয়ে দাও, বসন্ত।

কাগজগুলি পোড়াতে গিয়ে বসন্তরাও তো অবাক। এসব যে দীনদয়ালজীর সার্টিফিকেট। উদ্বিগ্ন বসন্তরাওয়ের ব্যগ্র জিজ্ঞাসা— পণ্ডিতজী, এগুলি পোড়াব কেন? এসব তো আপনার সার্টিফিকেট।

আরে ভাই, মাতৃভূমির চরণে তো সারা জীবন সমর্পণ করেছি। এই সার্টিফিকেট এখন কি কাজে লাগবে যে রেখে দেব?

বসন্তরাওয়ের কাছে এরপর আর কি জিজ্ঞাসা থাকতে পারে? এক একটা সার্টিফিকেট তিনি আগুনে দিচ্ছেন আর সমস্ত বুকটা তার মোচড় দিয়ে উঠছে। আর অন্যদিকে একটি একটি করে সার্টিফিকেট যেমন যেমন পুড়ছে, দীনদয়ালজীর মুখ ততই এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

আসলে স্বয়ংসেবকত্ব ছিল তাঁর কাছে ব্রত। 'পদাধিকার' ব্যবস্থা মাত্র। তাই সহ প্রান্ত প্রচারক হয়েও বৈঠকের জন্য আগ্রা নিবাসের ছাদ পরিষ্কার করতে তাঁর কুণ্ঠা হয় না। নিজের স্বয়ংসেবকত্বর সঙ্গে কখনও তিনি আপোষ করেননি। সাতষট্টি সালের ঘটনার কথাটাই ধরা যাক। সে বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত প্রমুখ কার্যকর্তাদের নাগপুরে এক বৈঠক ছিল। ওই সময়েই উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। নতুন সরকার গড়ার তোড়জোড় শুরু হয়। ফলে উত্তরপ্রদেশ থেকে যাঁদের যাওয়ার কথা, তারা আর ওই বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। দীনদয়ালজী কিন্তু এটা মেনে নিতে পারেননি। দৃশ্যতই তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাঁর কথা ছিল— আগে আমরা স্বয়ংসেবক, তারপর অন্য কিছু। যখন সঙ্ঘ ডেকেছে, তখন সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সঙ্ঘের ডাকে সাড়া দেওয়া দরকার।' তাঁর শেষ প্রবাসের ব্যাগটি থেকে কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে খাঁকি হাফ প্যান্টটিও পাওয়া গিয়েছিল।

স্বদেশীর প্রতি আগ্রহ তাঁর স্বয়ংসেবকত্বেরই অঙ্গ। শুধু 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' নয়, সানলাইট সাবানের লভ্যাংশ স্বদেশের স্বার্থে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটাও ছিল তাঁর কাছে বিচার্য। আর স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের মধ্যে কেবল নয়, বেশ-ভূষা, ভাষা, রীতিনীতি যা কিছুই স্বদেশাভিমান জাগায়, এইসব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর অনুরাগ। মৈনপুরীর ডাঃ পুরঙ্গকে দেওয়ার জন্য একটি চিঠির খসড়া তৈরি করেছিলেন গিরিরাজ কিশোর। বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় দীনদয়ালজীকেও তিনি তা দেখালেন। সেসময় দীনদয়ালজী উত্তরপ্রদেশের সহ প্রান্ত প্রচারক। কিন্তু কিশোরজী ভেবেছিলেন এক, হলো আর এক। খসড়া চিঠিটি পড়ে দীনদয়ালজী তা ছিঁড়ে ফেললেন। কিশোরজী অবাক। তাঁর ত্রুটি কোথায় হল? জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকতেই জবাব দিলেন— আপনি আর ডাঃ পুরঙ্গ যখন দুজনেই হিন্দি বলতে, লিখতে পারেন, তখন ইংরাজিতে চিঠি লেখা কেন?

এরকমই আর একটা ঘটনা। হরিয়ানা প্রদেশ তখন গঠিত হয়েছে। রোহ্‌টকে তাই জনসঙ্ঘের নতুন রাজ্য কার্যালয়ের উদ্বোধন হবে। দীনদয়ালজী সেজন্যই সেখানে এসেছেন। নতুন কার্যালয় ভবনটি তাঁকে স্থানীয় কার্যকর্তারা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। ছাদে যাওয়ার পথে দীনদয়ালজীর হঠাৎ চোখে পড়ল— দেওয়ালের গায়ে ইংরাজিতে লেখা : ওয়ে টু রুফ'। পাশে ছাদের দিকে মুখ করে তীর চিহ্ন আঁকা। দীনদয়ালজী থামলেন। স্থানীয় কার্যকর্তাদের এই ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হয়নি। ইংরাজী লেখা মুছে দিয়ে তা হিন্দিতে লেখা হলো। জাগ্রত স্বাভিমান। সুসম্পন্ন গৃহপ্রবেশ।

।। আট ।।

১৯৫২ থেকে ৬৭— একটানা পনের বছর ছিলেন তিনি জনসঙ্ঘের মহামন্ত্রী বা জেনারেল সেক্রেটারি। সভাপতি হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে কেউ কখনও দেখেনি। অথচ কর্মকৃতিত্বে এই

আসনের তিনিই ছিলেন যোগ্য পুরুষ। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কাশ্মীর সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর জীবনের প্রথম জন-আন্দোলন। গোয়া মুক্তি অভিযানে (১৯৫৪) আন্দোলনকারীদের তিনি ছিলেন প্রেরণা পুরুষ। কচ্ছ চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল তাঁরই পথনির্দেশে। কচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষর হয় ৬৫ সালের ১ জুলাই। ভারতবিরোধী এই চুক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল দেশজুড়ে সভা সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল। সংসদ ভবনের সামনে ১৬ আগস্টে ৫ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি নেতৃত্ব দেন। নির্বাচনী রাজনীতিতে ৫২ বা ৫৭ সালে সংসদে যে দলের সংখ্যা ছিল নগন্য, ১৯৬৭-র নির্বাচনে সেই দলই সংসদে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলো। বস্তুত, কর্মীদের কাছে তিনি শুধু একজন শ্রদ্ধেয় নেতাই ছিলেন না, ছিলেন রাজনৈতিক আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। এত সবের পরেও মন্দিরের চূড়া না হয়ে ভিতের পাথর হয়ে থাকতেই তাঁর পছন্দ ছিল।

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে 'আপদধর্ম' হিসেবে ৬৭ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হলো। সারথি রথীতে রূপান্তরিত হলেন।

কালিকটে জনসঙ্ঘের অধিবেশন ছিল জমজমাট। মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই তা স্থান পেয়েছিল। এটা অবশ্য কোনও কাকতলীয় ব্যাপার নয়। আসলে দীনদয়ালজীর 'সভাপতির ভাষণ' (২৮.১২.১৯৬৭) এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল এক নতুন পথনির্দেশ। 'একাত্ম মানববাদ' নামে খ্যাত এই রাজনৈতিক দর্শন পরবর্তীকালে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। কালিকট অধিবেশন দীনদয়ালজীর জীবনে রাজনৈতিক নেতা থেকে রাষ্ট্রপুরুষ-এ উত্তরণের এক স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

একাত্ম মানববাদ-এর চিন্তাধারা দীনদয়ালজীর শ্রেষ্ঠতম অবদান। এটা নতুন কোনও 'বাদ' নয়। আমাদের ধর্মের অর্থাৎ জীবন পদ্ধতির মূল্যবোধ বা বৈশিষ্ট্যগুলোর নামকরণ করলেন 'একাত্ম মানববাদ'। সনাতন সত্যকেই বিশ্বের কাছে নবীন রূপে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে উপস্থাপিত করার প্রয়াস। অন্য চিন্তাধারা খণ্ডন করা দীনদয়ালজীর কখনও অভীষ্ট ছিল না। এককথায় একাত্ম মানববাদের মর্মার্থ— ধর্ম হলো জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, যা মানব জীবনের সকল স্তরকে অনুপ্রাণিত, উন্নীত এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটাই আমাদের জাতীয় সত্তার প্রাণবায়ু। আমাদের দেশে ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, মানবতা এবং চরাচর সৃষ্টির কথা এই সংগঠিত জীবন-রচনার ভিত্তি রূপেই চিন্তা করা হয়েছে। এরই নাম একাত্ম মানববাদ (Integral Humanism)।

'একাত্ম মানববাদ' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ দত্তোপন্ত ঠেংড়ী-র মন্তব্যটি এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—

"Pt. Dindayaljee spelt out Integral Humanism which is the manifestation of Sanatana Dharma in keeping with the requirements of the post second industrial revolution period. That has to be the point of refference for the topic of the Day".

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল। সকলের বোঝার সুবিধার জন্য তিনি 'বাদ' বা 'ইজম' শব্দের ব্যবহার করলেও তিনি নিজে কোন 'বাদ'-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মত ছিল, যা সত্য এবং সনাতন, তা না কোনও বাদের ছাঁচে ঠিকমতো বসতে পারে, আর না কোনও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। আসলে 'বাদ' বা 'ইজম' অর্থাৎ 'ব্লু-প্রিন্ট' কখনও সকল দেশ কালের জন্য উপযোগী হতে পারে না। এটাই ছিল তাঁর চিন্তা। এটাই ছিল তাঁর দৃষ্টি। তিনি যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা হল একটি 'দর্শন'। বিদেশী ভাষার শব্দ 'ফিলজফি' তাকে ব্যক্ত করতে পারে না। এ দর্শন কোনও নতুন বা অপরিচিত দর্শন নয়। এ দর্শন আমাদের এই ভারতভূমিরই দর্শন। এ দর্শন রাষ্ট্র দর্শন। ভারতীয় মনীষীদের মতোই তিনি ছিলেন দ্রষ্টা। রাষ্ট্রদ্রষ্টা দীনদয়াল।

।। নয়।।

দূরে.. দূরে ট্রেনের কামরার পেছনের লাল আলোটা ক্রমে মিলিয়ে গেল।

কে জানতো, ওই আলোর মতো দীনদয়ালজীর পার্থিব দেহটাও আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অনন্তে লীন হয়ে যাবে! এই যাত্রাই অন্তিম যাত্রা!

ওইদিন লক্ষ্ণৌ স্টেশনে দীনদয়ালজীকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী রামপ্রকাশ গুপ্ত আর জনসঙ্ঘের বরিষ্ঠ নেতা পীতাম্বরদাসজী। সেইসঙ্গে আরও কয়েকজন। দীনদয়ালজী প্রবাসে গেলে জিনিসপত্র খুব কমই নিতেন। এবারেও তাঁর সঙ্গে ছিল একটা স্যুটকেস, বিছানা আর বইয়ের একটা ব্যাগ। সর্দির ধাত থাকায় দু-তিনটে সোয়েটার পরার পরও তিনি গরম জামা পরেছিলেন।

ফেব্রুয়ারিতে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তাই ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৮) দিল্লিতে জনসঙ্ঘের সংসদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। আবার ঠিক ওই দিনই বিহারে রাজ্য জনসঙ্ঘের কার্যকারিণীর বৈঠক ছিল পাটনায়। সেসময় দীনদয়ালজী লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে গেলে বোন শ্রীমতী লতা খান্নার বাড়িতেই তিনি উঠতেন।

দশ তারিখের সকালে বিহারের সেসময়কার সংগঠন সম্পাদক অশ্বিনী কুমারের কাছ থেকে ফোন এল। অশ্বিনীজীর আগ্রহ, দীনদয়ালজী পাটনায় আসুন। দীনদয়ালজী তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। সেইমতো সেদিন রাত সাতটায় পাঠানকোট-শিয়ালদা এক্সপ্রেসে তাঁর পাটনা যাওয়া ঠিক হলো। স্টেশনে যারা এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। অন্যান্যবারের মতো এবারও হাসিমুখেই বিদায় নিলেন।

ট্রেনটা জৌনপুরে পৌঁছেছিল রাত বারোটা নাগাদ। জৌনপুরের রাজার ব্যক্তিগত সচিব কানাইয়াজী স্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রাজাসাহেবের একটি চিঠি দীনদয়ালজীকে দিয়েছিলেন তিনি। দীনদয়ালজী সেই চিঠি সেসময়ই পড়েছিলেন। কানাইয়াজীকে

বলেছিলেন, রাজাসাহেবকে শীঘ্রই তিনি তার প্রত্যুত্তর পাঠাবেন। জৌনপুরে ট্রেন থেমেছিল প্রায় দশ-বারো মিনিট।

এরপর ট্রেন ছুটে চলছিল মোঘলসরাইয়ের দিকে তার আপন গতিতে। দীনদয়ালজী জেগে ছিলেন বলে মনে হয় না। যাত্রীরা প্রায় সবাই ঘুমোচ্ছিলেন। দীনদয়ালজীর সহযাত্রী ছিলেন জনৈক মেজর শর্মা। তিনি কণ্ডাক্টারকে আগেই বলে রেখেছিলেন, বেনারসে তাকে যেন জাগিয়ে দেওয়া হয়। বেনারসে সেই কণ্ডাকটার নিয়মমতো জাগিয়ে দিতে এসে দেখেছিলেন, দীনদয়ালজী যে 'ক্যুপ'-এ ছিলেন, তার দরজায় একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাড়ি-গোঁফ কামানো, পরনে পায়জামা, একটু স্মার্ট চেহারার। সেই জানালো, মেজর শর্মা নাকি শাহগঞ্জে নেমে গেছেন।

ওই ক্যুপ-এ দীনদয়ালজীর আর এক সহযাত্রী ছিলেন জনৈক এম পি সিংহ। তিনিও ওই লোকটিকে বেনারস স্টেশনে দেখেছিলেন। শ্রীসিংহ এরপর বাথরুম গিয়ে দেখেন তা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে দীনদয়ালজী আছেন ভেবে তিনি অন্যটিতে যান।

মোঘলসরাই স্টেশনে ট্রেন পৌঁছেছিল রাত দুটো পনেরো মিনিটে। সেইসময় শ্রীসিংহ দেখেন, একজন যুবক দীনদয়ালজীর বিছানা নিয়ে নেমে যাচ্ছে। শ্রীসিংহ তাকে এনিয়ে জিজ্ঞেস করতে সে বলে, আমার বাবা নেমে গিয়েছে। তাই তার জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি।

সেসময় পাঠানকোট-শিয়ালদা এক্সপ্রেস সরাসরি পাটনা যেত না। মোঘলসরাই স্টেশনে পাটনার বগি কেটে নিয়ে তা দিল্লি-হাওড়া এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। এসব করতে আধ ঘন্টারও বেশি সময় যায়। মোঘলসরাই থেকে সেদিন দিল্লি-হাওড়া এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত দুটো পঞ্চাশ মিনিট নাগাদ।

এরপর প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেছে। মোঘলসরাই স্টেশনের একজন লিভার ম্যান সহকারি স্টেশন মাস্টারকে ফোন করে জানায়, স্টেশনের প্রায় ১৫০ গজ দূরে লাইনের ডান দিকে একটা শব পড়ে রয়েছে। কাছেই একটা ল্যাম্পপোস্ট। ল্যাম্প পোস্টের নম্বর ১২৭৫। স্টেশন মাস্টার তা পুলিশকে জানিয়ে লেখেন— 'অলমোস্ট ডেড'।

রেলের ডাক্তার ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন পরের দিন সকালে। দেখেশুনে তিনি 'মৃত' বলেই ঘোষণা করলেন। নিয়মমতো রেলওয়ে পুলিশ সেই শবদেহের ফটোও তুলল। কার শব তখন কেউ চিনতে না পারায় তা 'বেওয়ারিশ লাশ' হয়ে গেল। প্রায় ছ'ঘন্টা পর মোঘলসরাই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তা নিয়ে আসা হলো। শবদেহ দেখতে যেমন ভীড় জমে এখানেও তা হলো। সেই ভীড়ের মধ্যেই জনসঙ্ঘের এক কর্মী ছিলেন। তিনি দেখেই আঁতকে উঠলেন। এ কী! ইনি যে দীনদয়ালজী। ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়!

তারপর আর দেরি হয়নি। বিদ্যুৎবেগে সারা দেশে সেই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশজুড়ে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া।

দীনদয়ালজীকে যে হত্যা করা হয়েছে, আজ আর তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সন্দেহের অবকাশ প্রথম থেকেই ছিল না। বরং,

মামীমার সঙ্গে

প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যা। দীনদয়ালজীর অন্তিম সংস্কারে যোগ দিতে বাংলা থেকে গেছিলেন রামপ্রসাদ দাস। তাঁর কথায়— দীনদয়ালজীর মুখে কোনও বিকৃত ছিল না, সৌম্য শান্ত ছিল তাঁর মূর্তি। এ থেকে মনে হয়, ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁর মাথায় হাতুড়ি বা ওই জাতীয় কোনও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। তখনই হয় তিনি মারা যান, নয়তো অজ্ঞান হয়ে যান। তার দেহ যে রেল কামরা থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করা হয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর পিঠে সর্বত্র ছড়ে গিয়েছিল।

দীনদয়ালজীকে যে হত্যা করেছে সে অভারতীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। এই হত্যা তাই ভারতীয় জীবনবোধের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ।

শ্রীগুরুজী সেসময় উত্তরপ্রদেশে পরিভ্রমণ করছিলেন। ভাউরাওজী (দেওরস)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্র সব কাজ ছেড়ে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন মোঘলসরাইয়ে। সেই ১৯৩৭ সাল থেকে উত্তরপ্রদেশ তাঁর কার্যক্ষেত্র। পরিচয়ের পরিধি বিশাল। মোঘলসরাই স্টেশনের কাছে মঙ্গল নগরে সঙ্ঘের একজন কার্যকর্তা থাকতেন। তিনিই প্রথম বেওয়ারিশ লাশ বলে চিহ্নিত দীনদয়ালজীকে চিনতে পারেন। ভাউরাওজীকে তিনিই নিয়ে গেলেন।

প্রশান্ত চিত্তে দীনদয়ালজী ঘুমোচ্ছেন— ভাউরাওজীর মনে হয়েছিল। রাষ্ট্র জাগরণের কাজে দীনদয়ালজীকে তিনি যুক্ত করেছিলেন

তিনি সোজা বিমানবন্দরেই চলে এসেছেন। চিরনিদ্রায় মগ্ন দীনদয়ালজীকে দেখে তাঁর ভাবরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে শুধু একটি কথাই বেরিয়ে এল— আরে, এটা কি করে হল? দীনদয়ালজীর মুখ থেকে বুক পর্যন্ত দু'হাত দিয়ে বুলিয়ে তিনি নিজের চোখে ঠেকালেন। এরকম পরপর তিনবার।

একটু পরে বললেন, যারা গৃহস্থ, তারা এসব জানে, সহ্য করতে পারে। গৃহস্থ নই, তাই আমার কাছে এই শোক শতগুণ। দীনদয়ালের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নিয়ে তাই কিছু বলব না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, দীনদয়ালকে ঈশ্বর কাছে টেনে নিয়েছেন। পুরনো একটা ইংরাজী প্রবাদবাক্য পড়েছি— 'যাঁকে ঈশ্বর ভালবাসেন, সে অল্প বয়েসেই স্বর্গে চলে যায়।'

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। সমগ্র দিল্লি শোকস্তব্ধ।

অটলজীর সেসময়ের বাসস্থান ৩০ নং রাজেন্দ্র প্রসাদ মার্গে দীনদয়ালজীর শবদেহ গেরুয়া রঙের শয্যায় শায়িত। অসংখ্য মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সারাদিন ধরে এসেছেন। ফুল, মালা, ধূপের গন্ধ, গীতাপাঠ আর চোখের জল— শেষ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাই দেশাই প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

অন্তিম যাত্রা শুরু দুপুর একটায়। দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে পৌঁছাতে সন্ধ্যা ছ'টা হয়ে গেল। দীর্ঘ পথে শোক মিছিল এগিয়েছে ধীরে ধীরে। বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, এলাকা, বাজার প্রভৃতির পক্ষ থেকে চলেছিল শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর পালা।

পৃথিবীর বুকে তখন নেমে এসেছে সন্ধ্যা। দিগন্ত জুড়ে অন্ধকারের রেশ। পাখিরা ফিরে গেছে কুলায়। শান্ত স্তব্ধ এক নীরবতা। মাঝেমধ্যে চাপা কান্না— অনেকটা দূরস্থিত শব্দের মতো কানে আসছে। দীনদয়ালজীর মামাতো ভাই প্রভুদয়াল শুক্ল মন্ত্রোচ্চরণের সঙ্গে সঙ্গে মুখাগ্নি করলেন। হৃদয়মথিত করে জ্বলে উঠল চিতার আগুন। দীনের দয়াল কোটি কোটি মানুষকে দীন করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন।

পর্ণশবরী।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন জনপদে দেবী দুর্গার সন্ধানে

ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ

ভারতবর্ষ মাতৃ সাধনার এক চিরন্তন তীর্থক্ষেত্র। তাই সভ্যতার ঊষালগ্নে ভারতের মাতৃপূজারীরা ঘোষণা করেছেন নিজেকে মায়ের দিব্য সন্তান রূপে। প্রার্থনা করে বলেছেন, হে দেবি, তোমার প্রেমে তোমার স্নেহে, তোমার পুত্রকে তুমিই মানুষ করে তোলো। মাতা বিভর্ষি সচন সামানা। নিষ্ফল সাধনায় বৃথাশ্রমে অবসন্ন সন্তানকে একমাত্র তুমি, হে জননি, আশ্রয় দিতে পার— জনিত্রীব প্রতি হর্যাসি সৃনুম।

ভারতীয় চিন্তনে নারীকে একদিকে মাতৃত্বের প্রতীক, অন্যদিকে শক্তির প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়েছে। নারীর মধ্যে আছে সৃষ্টির ক্ষমতা। এই প্রজননের ক্ষমতাই নারীকে দেবীত্বে উন্নীত করেছে। এমনকি তিনি শস্য সৃষ্টিরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবীই আবার সৃষ্টি বিরুদ্ধ সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন। তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণা। অন্যদিকে এই দেবীই আবার পুরুষের মধ্যে কর্মশক্তি জাগরণ করেন বলেই তিনি পুরুষ দেবতার স্ত্রী অর্থাৎ তাঁর শক্তিরূপে পূজিতা।

এই মাতৃদেবীকে শক্তির দেবী বলে ভারতবর্ষের মাতৃসাধকেরা চিরদিন তাঁর পূজা করেছেন। বন্দনাগীতি রচনা করেছেন। ভক্তেরা ধ্যানযোগে সেই মাতৃশক্তির কল্পনা করে আরাধনার জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিল্পীরা গড়ে তুলেছেন মাতৃদেবীর সেই রূপ। কখনও শাস্ত্রীয় উপাখ্যান অনুসারে, কখনও বা নিজস্ব মনোজগতের শুদ্ধ সাধনায়।

ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্য অনুসারে সারা পৃথিবীতেও মাতৃশক্তি দেবী রূপে পূজিতা হয়েছেন। তাই বিশ্বেও পাওয়া গেছে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার কাল থেকে দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। পূর্ব ভারতের গৌড় পুণ্ড্রবর্ধন ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন জনপদ। এই জনপদের বিভিন্ন প্রান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী বিভিন্নরূপে পূজা হয়েছে বহুকাল ধরে। গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধনের জনপদে মহিষাসুরমর্দিনীর স্বরূপ নানাভাবে পূজিতা। উত্তরবঙ্গের জনপদে দেবীকে পাওয়া গেছে— দুর্গা, মহামায়া, চণ্ডী, পার্বতী, কাদম্বরী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, লক্ষ্মী ইত্যাদি রূপে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে শক্তির উপাসনা গৃহীত হয়। ফলে বৌদ্ধ দেবদেবীদের মধ্যে চণ্ডী বা মহিষাসুরমর্দিনীর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়— এই রূপগুলো হলো— মারীচী, তারা, একজটা, সিওতারা, বজ্রবারাহী, পর্ণশবরী, মঞ্জুশ্রী, ঘদির বনী তারা ইত্যাদি। শক্তিতন্ত্র ও শাস্ত্রের বড় গৌরবজনক তথ্য হলো যে, প্রাচীনে এই শক্তিদেবীর বিভিন্ন রূপে পূজা ও অর্চনা গৌড়বঙ্গের প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হতো। তাই গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব মাতৃমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনকি বিভিন্ন স্থানে দেবীর ভব্য ও সুন্দর মন্দিরের অবস্থান ছিল তারও বর্ণনা পাওয়া যায়।

গৌড়—পুণ্ড্রবর্ধনের দেবী-পীঠ

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস সাধনের পর শিব যখন সতীর দেহ নিয়ে প্রলয়নাচন নাচছেন, সেই সঙ্কট মুহূর্তে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। দেবীর দেহের খণ্ডিত অংশে গড়ে উঠল দেবী-পীঠ বা শক্তিপীঠ। গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনে দেবী-পীঠ ছিল? যদি থাকে, তবে সেই শক্তিপীঠের বর্তমান স্থান কোথায়? গৌড়-পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন ইতিহাস পরিক্রমা করলে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

ভারতবর্ষে ৫১টি পীঠের ধারণা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে দেবীপীঠের ধারণা বিভিন্ন রকম। অষ্টম শতকে বৌদ্ধদের তন্ত্রগ্রন্থ ও হেবজ্রতন্ত্রে ভারতে চারটি পীঠের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো— (১) জলন্ধর, (২) উড্ডিয়ান, (৩) পূর্ণগিরি, (৪) কামরূপ। কালিকাপুরাণেও তাই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আরও তিনটি পীঠের কথা বলা হয়েছে সেখানে।

রুদ্রযামল নামে এক তন্ত্রগ্রন্থে প্রথমে দশটি, পরে আঠারটি পীঠের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে গৌড়ে যে শক্তিপীঠ ছিল তার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ অনুযায়ী আঠারোটি পীঠের নাম হলো — (১) উড্ডিয়ান, (২) দেবীকোট, (৩) হিঙ্গুল বা হিংলাজ, (৪) কোটিমুদ্রা,

(৫) জলন্ধর, (৬) বারাণসী, (৭) অন্তরবেদী, (৮) মায়াবতী, (৯) মিথিলা, (১০) মগধ, (১১) মেখলা, (১২) অঙ্গ, (১৩) বঙ্গ, (১৪) কলিঙ্গ, (১৫) সিংহল, (১৬) শ্রীরাজ্য, (১৭) রাধা, (১৮) গৌড়।

রুদ্র যামল সম্ভবত দশম শতকের শেষের দিকে লেখা। কুলার্ণবতন্ত্রেও গৌড়ে শক্তিপীঠের নাম উল্লেখিত আছে। এই দুটি গ্রন্থেই গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধনে দুটি পীঠের অধিষ্ঠান (১) দেবীকোট যা বর্তমানে গঙ্গারামপুরের কাছে অবস্থিত। দেবকূট, দেবীকোট, কোটীবর্ষ, শোণিতপুর, বাণগড়, সবই একই স্থানের বিভিন্ন নাম। (২) গৌড়— যা ছিল পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠনগর তথা বঙ্গদেশের রাজধানী। দেবীকোট মহাভারতের কাহিনীর বাণ রাজার রাজধানী রূপেও প্রসিদ্ধ ছিল। এইখানেই জন্মেছিলেন জৈন ধর্মের বিখ্যাত সাধক ভদ্রবাহু। প্রাচীন তন্ত্রসাধকেরা এই দুটি পীঠের কথা জানতেন বলেই তা উল্লেখ করেছিলেন।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের একটি অংশে ৫০টি পীঠের নাম (পঞ্চাশত পীঠ সঞ্চয়) উল্লেখ করা আছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিনটি পীঠের কথা বলা হয়েছে— পুণ্ড্রবর্ধন, ত্রিমোতা ও দেবীকোট। শক্তিনন্দ তরঙ্গিনীর পঞ্চদশ অধ্যায়ে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের পীঠের কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলা হয়েছে— ''নেপালশ্চ তথা পীঠম্ তথা বৈ পৌণ্ড্রবর্ধনম্ ত্রিসোত পীঠমনঘং কামকোট্টমতপরম্।''

এতদিন যে পীঠগুলোর বর্ণনা দেওয়া হচ্ছিল, তাতে স্থান উল্লেখ করে তন্ত্রসাধকেরা ইতি টানছিলেন। কিন্তু দেবী ভাগবতে পীঠের সংখ্যা যেমন বেড়ে দাঁড়াল ১০৮টিতে। তেমনই এই গ্রন্থে পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সহ পীঠের বর্ণনাও বিস্তারিত দেওয়া হলো। দেবী ভাগবতের সূচী অনুযায়ী ৩৮ ক্রমাঙ্ক পীঠ বর্ণনায় বলা হলো পুণ্ড্রবর্ধনের পাটলায় দেবীপীঠ আছে। ৪৩ ক্রমাঙ্কে বলা হলো, কোট্টভি কোটিতীর্থে আছে। পুণ্ড্রবর্ধন ও কোটিবর্ষের নাম থাকলেও হারিয়ে গেল ত্রিস্রোতা। এখন প্রশ্ন হলো, পুণ্ড্রবর্ধনের পাটলাপীঠ কোথায়? আদ্যাস্তোত্রমে তার উত্তর পাওয়া গেল 'মহানন্দা অগ্নিকোণে'।

মহানন্দার ধারা একদিন পুণ্ড্রনগরীর পশ্চিমে কৌশিকী ও গঙ্গার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হতো। এই ধারা থেকে পরে কৌশিকী ও গঙ্গা দূরে সরে যায়। মহানন্দা কিন্তু একদিন বর্তমান কাঞ্চনটারের পাশ দিয়ে অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতীর উত্তরপূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। মহানন্দার সেই প্রবাহের অগ্নিকোণে ছিল পাটলাচণ্ডীর মন্দির বা পাটলদেবীর মন্দির যা বর্তমানে কাঞ্চনটারের কাছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে।

'পাটল' শব্দের অর্থ দুর্গা। এই পাটল তীর্থ বা পাটল চণ্ডীর দ্বার দিয়ে লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করা যেত। এখনও এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে বাঘধরা মৌজায় উচ্চ টিবির উপর অজস্র পাথরের স্তম্ভ ও হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। গৌড় প্রাচীর লৌহগড়ের শেষ সীমানায় এখনও আছে সেই স্থান। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই স্থানকে লোকে পাটলা চণ্ডীর মন্দির বলেই জানে। বিশ শতকের প্রথমে লর্ড কার্জন যখন গৌড় ভ্রমণে আসেন সেই উপলক্ষে গৌড়ের যে মানচিত্র করা হয়, তাতেও পাটলা বা পাতাল চণ্ডীর দ্বারের উল্লেখ আছে।

এই পাটল চণ্ডীর তীর্থ পীঠের কথা বহু জনপদে শ্রুত ছিল। বক্তিয়ার খিলজীর গৌড় আক্রমণের সময় পাটলচণ্ডীর মন্দির ধ্বংস করা হয়। বক্তিয়ার গৌড় জয় করে দেবকোটের দিকে এগিয়ে যান। এই দেবকোটেই তিনি সামরিক নিবাস তোলেন। দেবীকোটের পবিত্র পীঠও ধ্বংস হয়ে যায় তাদের আক্রমণে। এর ফলে পরবর্তীতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের পীঠ বর্ণনায় পাটলচণ্ডী বা দেবীকোট দুটোর উল্লেখ পাই। কারণ, তাঁদের সময় এই পীঠগুলোর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্রভূমির দ্বাদশ চণ্ডীর মন্দির

দেবী দুর্গাকে দুর্গ রক্ষাকর্ত্রী রূপেও বন্দনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালের রাজারা তাই তাদের সাম্রাজ্যের বা নগর রাজধানীর চারপাশে দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। এই ঐতিহ্য অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্রভূমির চারপাশে দ্বাদশচণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব মন্দিরে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হতেন। দ্বাদশচণ্ডীর কথা রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেছেন। এইসব প্রাচীন মন্দির বহুদিন যাবৎ মানুষ ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছিল।

শত শত বৎসর পর বর্তমান মালদহ অবিভক্ত দিনাজপুর ও বগুড়া নিয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে দ্বাদশচণ্ডীর অবস্থান নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। এই স্থানগুলো হলো— ক্রোঞ্চশ্বভ্র, মাধাইপুর, আইহোরাণী, আদিনার ফুলবাড়ী, পাথার বাণপুর, ভাইগুর, কোটিবর্ষ, বিন্দোল, মহাস্থানগড়, কোট্টাগ্রাম, কাণ্ডারণ, ভদ্রশীলা।

(১) ক্রোঞ্চশ্বভ্রের বর্তমান নাম কামঞ্চ। পুরাতন মালদহে নারায়ণপুরের কাছে। এখানে কাদম্বরীদেবীর মন্দির ছিল। খালিমপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে— 'শ্রী পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তান্ত পাতি ক্রোঞ্চশ্বভ্র নাম গ্রামোহস্য চ সীমা পশ্চিমেন গঙ্গিনিকা উত্তরেণ কাদম্বরী দেবী কুলিকা....' ইত্যাদি। বর্তমান এই মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কামঞ্চর বিশাল এলাকা জুড়ে অজস্র প্রস্তরমূর্তি ছড়িয়ে ছিল। দুষ্কৃতীরা সেইসব মূর্তি নিয়ে চলে গেছে। এখনও এই জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

(২) মাধাইপুর— মোরগ্রাম থেকে এক মাইল পূর্বে। আজও মাধাইচণ্ডীর পুজো করা হয়। মাধাইপুরের কালীদেবীর প্রাঙ্গণে অজস্র মূর্তি পড়ে আছে। অনেকে এই মন্দিরকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মন্দির বলে অভিহিত করেছেন। মাধাইপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। একে মাধাই সিংয়ের গড় বলা হয়। মাধাই সিং পুণ্ড্রনগরীর অধীনস্থ কোনও সামন্ত বা দুর্গপাল ছিলেন। আজও শিবলিঙ্গ সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায় চারপাশে।

(৩) আইহোরাণী— (এয়োরাণী) এর অবস্থান আদিনা স্টেশন থেকে ডান দিকে দু'মাইলের মধ্যে। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে ৮ মাইল থেকে বাম দিকে মেঠো পথ দিয়ে এক মাইল দূরে এই স্থান।

আগে সতীনদী (বেহুলা নদী) বইতো এর পাশ দিয়ে। আজ নদীর প্রবাহ দূরে সরে গেছে। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। প্রবাদ আছে, বেহুলা তাঁর মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় এই স্থানে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। কিছু ঐতিহাসিকের ধারণা, এখানে রাজা গণেশ পূজিত চণ্ডীমূর্তি ছিল। এখনও বৈশাখে এখানে পূজা করা হয়।

(৪) ফুলবাড়ি— আদিনা মসজিদ (প্রাচীন আদিনাথের মন্দির) থেকে পশ্চিমে দুই মাইল এগিয়ে গেলে পড়বে ফুলবাড়ি গ্রাম। এই গ্রামে ছড়িয়ে আছে হিন্দু রাজত্বের অজস্র পাষাণ চিহ্ন। তারই কাছে উচ্চভূমিতে আছে এর ধ্বংসাবশেষ। বহু স্তম্ভ পোতা আছে মাটিতে। আজও লোকেরা বলেন, এখানে বিশাল চণ্ডী মন্দির ছিল।

(৫) সিঙ্গাবাদ তিলাসনের পুনর্ভবার তীরে রয়েছে পাথার বাণপুর প্রচীন জনপদ। পৌরাণিক কিংবদন্তী প্রচলিত রাজা বাণাসুর এই জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে আছে ঝাপড়িচণ্ডীর বেদী। এখানে বজ্রপটঙ্ক আসনে ত্রিভঙ্গ অবস্থায় পদ্মের ওপর বসা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গেছে। অজস্র ধ্বংসপ্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে পাওয়া গিয়েছে দেবী তারার মূর্তি।

(৬) ডাইওর — তপন থানার ডিখাহার গ্রাম থেকে দেড় মাইল দূরে এর অবস্থান। মালদহের নালাগোলা দিয়ে কুপাদহ গ্রামের পুরনো পুনর্ভবার খাতের পাশেই এই স্থান। এখানে এখনও পড়ে রয়েছে অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি। এইজন্য এই স্থানটিকে মায়ের স্থানও বলে। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ২.৪৪ মিটার। প্রস্থে ১.৩ মিটার। বেলে পাথরের মূর্তি। এত উচ্চতাবিশিষ্ট মহিষাসুর বা দুর্গা মূর্তি বাংলায় সচরাচর দেখা যায়নি। দেবীর শিরোভূষণে মহাদেবের লিঙ্গ খোদিত আছে। অষ্টাদশ ভুজে আয়ুধ। দেবী বরাহ দন্তিকা। কোমর থেকে দেবীর দুটো অংশ ভগ্ন। বরেন্দ্রভূমিতে দেবীর বিশাল মূর্তি ছিল। মুসলমান আক্রমণে এই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। দেবীর বাম পা অসুরের উপর স্থাপিত। স্থানীয় অধিবাসীরা আজও ভক্তিভরে পুজো করেন। মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে ভক্তেরা একটি মন্দির নির্মাণ করেছেন।

(৭) বিন্দোল— এর অবস্থান রায়গঞ্জ থানায়। এখানে ভৈরবী দেবীর মূর্তি ও মন্দির আছে। মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কারিত হয়েছে। মন্দিরটি পাল যুগের তৈরি।

(৮) মহাস্থানগড় — বর্তমানে বগুড়া জেলায়। দেবীর নাম ভবানী। বগুড়া জেলার করতোয়াতটে আজও সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বগুড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (১৯৮৯) এর উল্লেখ আছে— ''ভবানীপুরের আটমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর পাশেই এককালে করতোয়া নদীর খাত ছিল। ভবানীপুর হিন্দু সম্প্রদায়ের এক পবিত্রস্থান। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীর দেহের একাংশ এখানে পতিত হয়েছিল বলে স্থানটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মুসলিম আক্রমণের সময় এখানকার দেবীকে লুকিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৯) কোট্টাগ্রাম — হেমতাবদে। এখানে চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাজা মহেশের আরাধ্যা ছিলেন এই চণ্ডিকা মূর্তি।

(১০) কোটিবর্ষ বা দেবকোট গঙ্গারামপুরে। মহাভারতের যুগে বাণরাজার রাজধানী। এখানে দেবী চণ্ডীকোট্টভি দুর্গা রূপে আরাধ্যা ছিলেন। ১৯৩৮-৪১ অবধি কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী বাণগড়ে খনন কার্য চালান। মৌর্য যুগ থেকে মুসলিম যুগের সভ্যতার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্প্রতি পঞ্চরত্ন মন্দিরের আবিষ্কার ঘটেছে। এই স্থানে প্রাপ্ত অজস্র দেবদেবীর মূর্তি পাশেই সঞ্চিত আছে এই কক্ষে।

(১১) কাণ্ডারণ — বর্তমানে সামসীর কাছে পুণ্ড্রনগরীর পাশে কৌশিকী কচ্ছের অন্তর্গত এই স্থান। মহাভারতের ভীমসেনের সঙ্গে কৌশিকী কচ্ছের নাম যুক্ত। এখানে বারাহী দেবীর মন্দির ছিল। বারাহী বিগ্রহ মালদহ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

(১২) ভদ্রশীলা— উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের কাছে। এখানে অষ্টভুজা চণ্ডীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এখনও তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বরেন্দ্র এবং পুণ্ড্রবর্ধনের এই দ্বাদশ চণ্ডীর বিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরগুলোর অবস্থান ও নাম বিষয়ক মতানৈক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। কালের প্রভাবে আজ অনেক তথ্য ও নিদর্শন নষ্ট হয়ে গেছে।

গৌড়নগরীর সীমারেখায় চারটি চণ্ডীর মন্দির

বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরীর চারপাশে দেবী চণ্ডীর চারটি মন্দির ছিল। একসময় হিন্দু রাজাদের মধ্যে রাজ্য বা রাজধানী রক্ষাকারী বহু দেবদেবীর মন্দির গড়ে ওঠে— যেমন চিতোরেশ্বরী, ত্রিপুরেশ্বরী ইত্যাদি। গৌড় রাজ্যের রক্ষাকারী দেবী গৌড়েশ্বরী বিভিন্ন বংশের রাজাদের আরাধ্য দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল গৌড় নগরীর দক্ষিণ দ্বারে, ভাগীরথীর তীরে। গঙ্গার স্রোত পথ পরিবর্তনে বিলীন হয়ে যায় এই মন্দিরে।

রামপালের সময় গৌড়ের রাজধানী পরিবর্তিত হয়ে রামাবতী নামে এক নগরের প্রতিষ্ঠা করা হয় পিছলি গঙ্গারামপুরের উচ্চ ভূখণ্ডে। ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গলে রামাবতী বা রামতি নামে যে নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা গৌড়ের উত্তর পশ্চিম দিকে স্থাপিত হয়েছিল। এই রামাবতীর ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বল্লাল সেন 'বল্লাল বাড়ি' নির্মাণ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সময়ে গৌড় ও রামাবতী ছাড়া আরেক নগরের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার নাম 'লক্ষ্মণাবতী'। ওই সেন রাজত্বকালে গৌড়ের চারপাশের সুউচ্চদ্বারে চারটি চণ্ডীদেবীর মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বদ্বারে জহরা চণ্ডী, পশ্চিমদ্বারে দ্বারবাসিনী চণ্ডী, উত্তরদ্বারে পাটল বা পাতালচণ্ডী ও দক্ষিণদ্বারে গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির বিরাজিত ছিল।

চণ্ডীপুরের কাছে দ্বারবাসিনী দেবী গৌড়ের চারটি দ্বারের একটি দ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালি রচয়িতা মানিক দত্ত দেবী ভগবতীর স্তবের সময় তাঁকে দ্বারবাসিনী বলে অভিহিত করেছেন। দ্বারবাসিনী দেবীর প্রকৃত নাম কমলাদেবী। কমলা দেবীর নাম অনুসারে গৌড়ের উষাকণ্ঠে কমলাবাড়ি নাম এসেছে। ইনি

গৌড়েরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। পাতালচণ্ডী নামে যে পীঠ পুণ্ড্রবর্ধনের মহানন্দা অগ্নিকোণে অবস্থান করত, তা ছিল গৌড়নগরীর উত্তর সীমায়। এই প্রাচীন মন্দির পূর্ব থেকেই অধিষ্ঠান রকত বলে লক্ষ্মণসেন এই মন্দিরকেই উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে সংস্কারিত করেন।

পূর্বদ্বারে ছিল জহরাচণ্ডীর মন্দির। এই মন্দির বর্তমানে যে দুর্গ প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম চাঁদমুনির গড়। চাঁদমুনি গড়ের পাশে আছে পুরনো পরিখা। আজও এই মন্দিরে মেলা বসে। পূর্বে চাঁদমুনির গড় দিয়ে পাতাল চণ্ডী দ্বারে আসা যেত। বর্তমানে পাতালচণ্ডীর ধ্বংসাবশেষে স্থানীয় সাধকেরা একটি মন্দির নির্মাণ করেছেন।

লক্ষ্মণসেন লক্ষ্ণাবতী নামক যে নতুন শহরের নির্মাণ করেন, অনেকে বলেন, বর্তমান ফুলবাড়ি গ্রামেই সেই রাজধানী ছিল। এই ফুলবাড়িতে যেখানে তিনি গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন, সেই স্থানকে লোকে বলে দেবগ্রাম। চলতি কথায় দেগাঁও। এখনও এই গাঁয়ে বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

কানিংহাম গৌড় পরিদর্শনকালে ফুলবাড়ির দরজা থেকে পাতালচণ্ডীর দরজা পর্যন্ত হিন্দু নামের বহু গ্রাম বা জনপদ পেয়েছেন— বিলাসপুর, রামচন্দ্রপুর, ধমরপুর ইত্যাদি। তিনি লোহাগড়ের এক মাইল দক্ষিণে এক বিশাল মন্দির ধ্বংসাবস্থায় দেখতে পান। জনশ্রুতি আছে, এই মন্দিরই ছিল গৌড়েশ্বরীদেবীর মন্দির। বক্তিয়ারের আক্রমণ-কালে এই মন্দির ধ্বংস করা হয়।

ইংরেজ পর্যটকেরা বিভিন্ন স্থানে গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। তাতে মনে হয়, বিগ্রহকে বাঁচাবার জন্য বহু মন্দিরকে গৌড়েশ্বরীদেবীর মন্দির বলে প্রচার করেন পুরোহিতের দল। তাই ফ্রান্সিস বুকানন দ্বারবাসিনীর মন্দিরকেই গৌড়েশ্বরী বলে অভিহিত করেছেন—"It is called Dwarbasini and there is no temple, 5000 people still meet in Jyaistha to celebrate the diety of the place and the city as the goddness is usually called Goureswari or the Lady of Gour"।

আবার স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম কমলাবাড়িতেই গৌড়েশ্বরী দেবীর অবস্থান বলেছেন--- "The village of Kamalabari, rather more than one mile to the north of city rampart and just beyond of the great Sagardighi Lake, no doubt formed one of the suburbs of the city, as it still possases Goureswari Devi, the special patron of Gour"।

হেনরি ক্রেটন তাঁর "The Ruins of Gour" -এ ছোট সোনা মসজিদে বরাহ, শিবানী, ব্রাহ্মণী ও ভবানী দেবীর মূর্তির বিবরণ সহ ছবিও দিয়েছিলেন। হ্যামিলটন ১৮০৯—১০ সালে শিবগঞ্জে ভ্রমণ করার সময় তিনি শিবগঙ্গা থেকে দুই ক্রোশ দূরে জহরপুরে গৌড়েশ্বরী দেবীর উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, হোসেন শাহের আমলে বাইশগজী প্রাচীরের উত্তর পশ্চিম কোণে যে স্থানটির নাম বাংলা কোট সেই স্থানে গৌড়েশ্বরী দেবীকে স্থাপন করা হয়। আজও এই স্থানের ভগ্নস্তূপকে লোকে গৌড়েশ্বরী দেবীর থান বলে পুজো করেন। রামকেলির মেলার সময় বহু স্থান থেকে হিন্দু নরনারী এসে এখানে পিণ্ডদান করেন। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলাশাসক অশোক মিত্র এই স্থানকেই গৌড়েশ্বরী দেবীর মন্দির রূপে দেখিয়েছেন।

হিমালয়ের পাদদেশে দেবী চণ্ডীর সাধনা

গৌড়েশ্বরীর মতোই কামতা রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন কামতেশ্বরী। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চারদিকের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্ঘা, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বে দিক্করবাসিনী বা দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণদিকে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষানদীর সঙ্গম। এই চতুঃসীমার মধ্যে স্থান রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও শৌমার পীঠে বিভক্ত। এর স্থানের পশ্চিমাংশ শৌমার পীঠ ঐতিহাসিক যুগে কামতারাজ্য রূপে পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খ্যেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কামদা বা কামতা দেবী তাঁর উপাস্য দেবী ছিলেন। দেবীর নাম অনুসারে তিনি রাজ্যের নাম রেখেছিলেন কামতা রাজ্য, রাজধানীর নাম কামতাপুর। সাধারণ মানুষ এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্বাধিকারী বা গোসানী নামে অভিহিত করত। এইজন্য পরবর্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধ্বজের পর চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর কামতা রাজ্যের রাজা হন।

রাজধানী কামতাপুর বহু উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং এই নগর ছিল একরকম দুর্ভেদ্য। দিনহাটা স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে এই গোসানমারি (দেবীস্থান)। ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিল্টন পাঁচ মাইল স্থান জুড়ে ধরলা নদী দিয়ে সুরক্ষিত এই দুর্গ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন অনেকটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম দ্বার দিয়ে প্রাচীর ঘেরা কামতেশ্বরীর মন্দিরে প্রবেশ করতে প্রথমেই পড়ে দোলভিটা, গারোদঘর, (দেবীর ধনাগার) এবং হোমগৃহ। তারপরই মন্দির। মন্দিরের ভিতরে দেবীর পাশেই আছে সূর্যমূর্তি, মহাদেব, নারায়ণ, গোপাল ও ব্রহ্মার মূর্তি। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে মহাদেব ও ভৈরবী, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মহাদেব লক্ষ্মীনারায়ণ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তারকেশ্বর সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিসহ বিভিন্ন মন্দির। চক্রধ্বজ যে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন বুকানন হ্যামিল্টন রাজপাটের উপরে কামতেশ্বরীর সেই আদি মন্দিরের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে মহারাজা প্রাণ নারায়ণ এই স্থানেই কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন।

মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটি শ্লোকে উৎকীর্ণ আছে—

"সমত্যাদিষদেক জিহ্বরভুজাদন্ত প্রতাপার্য্যস
ক্রীড়া কন্দুক কো বর্দ্ধিত যশং শ্রীপাভূমিপতেঃ।
শাকাব্দে নগনাগমার্গত্রাসিত জ্যোতির্ম্মিতে নির্মিতঃ
শ্রীভাদাক বিগুনেন ভবতা ভব্যোভবানী মঠঃ।।"

— অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা সাল ন, গ, নাগ, মার্গন, হিমজ্যোতি = নগ- ৭, নাগ - ৮, মার্গন - ৫, হিমজ্যোতি - ১। শকাব্দ ১ + ৫ + ৮ + ৭

= ১৫৮৭ (১৬৬৫ খৃঃ) তে নির্মিত। এই মন্দির বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী, যাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত আছে অজস্র কিংবদন্তী।

কুচবিহার শহর থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রাচীন। দক্ষিণমুখী অষ্টকোণাকৃতি মন্দির। এটি গর্ভমন্দির। মূল মন্দিরটির প্রবেশদ্বার দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নামলেই দেখা যায় সিদ্ধেশ্বরী দেবীর আসন। মন্দিরের অভ্যন্তরে অপ্রশস্ত আলো। এই আলোকে দেখা যায় চতুর্ভূজা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ধাতুময়ী ক্ষুদ্র মূর্তি। উপর দিকে দুই হাত প্রসারণ করা। উপরের হাতে করমুদ্রাভাদী। নীচের দুই হাতের রাম হাতে যজ্ঞধারিণী ও ডান হাতে বরাভয় মুদ্রা। পদ্মের উপর উপুড় হওয়া শবরূপী শিবের উপর দেবী সিদ্ধেশ্বরী উপবেশন করে আছেন। দেবীর ভৈরব সিদ্ধেশ্বর।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ডান পাশে বৃক্ষরূপিণী কামাখ্যা দেবীর স্থান আছে। ওই কামরাঙ্গা বৃক্ষই দেবীর প্রতীক ও পীঠস্থান রূপে পরিচিত। "Religious ... it is claimed to be a pithasthan of Sakti and the Kamranga tree, which is growing it an enclosure to the east of the temple, is considered symbolic of the Goddness Kamakshya. The temple is dedicated to Bhagarati and in the shrine here is the Gouripatta"।

জনশ্রুতি আছে, এই প্রাচীন মন্দির বাণেশ্বর শিব মন্দিরের সমসাময়িক কালে মহারাজা প্রাণনারায়ণের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই প্রাচীন মন্দিরে নিত্য পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

যে মন্দির কামাখ্যার পরেই পুণ্যস্থল রূপে পরিগণিত সেই মন্দিরের দেবী সিদ্ধেশ্বরীর প্রাচীন বিগ্রহের সঙ্গে শুধু কুচবিহার নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত সেই দেবী সিদ্ধেশ্বরী মূর্তি ৪ জুলাই, ২০১১ চুরি হয়ে গেছে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখদায়ক ঘটনা। উত্তরবঙ্গের এই পুণ্যপীঠ থেকে দেবীর প্রাচীন মূর্তির চুরি ইতিহাসের উপকরণকে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

শত শত বছর ধরে কোটি কোটি ভক্ত দেবী সিদ্ধেশ্বরীর যে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করতেন—

"চতুর্ভূজা তুষাদেবী পীনোন্নত পয়োধর।
কিন্দুরম পূজ্য সংকাশং ধবতি কর্তিষ খজ্ঞাপঠং।।
দক্ষিণে বাম বাহুভ্যাং মাভৈভি বরধারীনিং।
এবং ধ্যাতা সিদ্ধেশ্বরৈ নমঃ।।"

— আজ সেই মূর্তিস্বরূপা দেবী কোথায়?

পঞ্চদশ শতকে বৈকুণ্ঠপুর ছিল কোচবিহারের প্রান্তবর্তী অঞ্চল। কোচ রাজবংশের একটি শাখার নাম রায়কত। রায় কথাটির অর্থ অধিপতি, আর কত (কোট) কথাটির অর্থ দুর্গ। এর অর্থ হলো, দুর্গাধিপতি। জনশ্রুতি আছে যে, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে শিলিগুড়িতে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন এই রায়কতেরা। তখন ত্রিসোতা নদীর তীরে কোনওরূপ গ্রাম বা জনবসতি ছিল না। কুচবিহার রাজবংশের

সিংহবাহিনী

প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিষ্য সিংহের দ্বারাই ওই বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজবংশের সৃষ্টি। জগদেব রায়কত ছিলেন বৈকুণ্ঠপুরের সপ্তম রায়কত। তাঁর দুই পুত্র ছিলেন বিক্রম ও ধর্মদেব। ধর্মদেব রাজধানী পরিবর্তন করে নিয়ে এলেন তীব্র খরস্রোতা করলা নদীর পাশে। ধর্মদেব রাজবাড়ির চারিধারে উঁচু প্রাচীর ঘেরা দুই তৈরি করলেন এবং প্রাচীরের পাশে খনন করলেন বিশাল ও গভীর পরিখা।

ধর্মদেব তাঁর দুর্গে প্রতিষ্ঠা করলেন দুর্গা প্রতিমা। এই পূজা ক্রমে রায়কতদের দুর্গা পূজা নামে খ্যাতি লাভ করল। এই দুর্গা দশহাত উঁচু ও দেহের বর্ণ লাল। আজ এই দুর্গ ও দুর্গা মন্দিরের ভগ্নস্তূপ পড়ে আছে। কিন্তু রাজবাড়ির দুর্গা পূজা প্রচলিত আছে পরবর্তীতে নির্মিত রাজবাড়িতে। পূজার মূর্তিতেও পরিবর্তন এসেছে। এসেছে পূজার আঙ্গিকে। শুধু হারিয়ে গেছে পুরনো দুর্গের দেবীর মন্দির।

বৈকুণ্ঠপুরের গভীর অরণ্যে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এখনও এক ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন মন্দিরের অবস্থান দেখা যায়। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ঋষি বঙ্কিমের ভবানী পাঠক, যিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ছিলেন "rebel outlaw। এই মন্দিরে তিনি কালীমায়ের জাগ্রত উগ্রচণ্ডারূপিণী পাথরের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন ছিল রায়কত দর্পদেবের শাসনকাল। ইংরেজরা ভবানী পাঠককে ধরার জন্য

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হানা দেয়। ভবানী পাঠক এক দৈববাণী শুনতে পান এবং তিনি সাবধান হয়ে যান। মন্দির থেকে কালীমাতার বিগ্রহটি নিয়ে গিয়ে তিনি দর্পদেবের হাতে তুলে দিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান। ঘটনা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের। তখন উত্তরবঙ্গে চলছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

বৌদ্ধধর্মের মনোভূমিতে দেবীচণ্ডীর বিস্তার

বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজা ছিল না। পরে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযানে বিভক্ত হয়ে যায়। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান বস্তু। মহাযানে প্রথমে জগতের সকলের মুক্তি, পরে নিজের মুক্তি। মহাযানে বুদ্ধদেবকে দেবতা রূপে পূজা করা শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মে আরেক মত দ্রুত গড়ে উঠে, তা হলো বজ্রযান। এই সময় বৌদ্ধ ধর্মে তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। হিন্দুদের মতো দেবদেবীর মূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। হিন্দু ধর্মের শক্তি সাধকেরা মহামায়া দেবী দুর্গার জপ ও বীজমন্ত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। হিন্দুদের যেমন মহামায়ার ধ্যানগ্রস্ত রূপ থেকে এসেছেন বিভিন্ন দেবী, তেমনই বজ্রযানীদেরও দেবদেবী দর্শন সাধনা থেকে এসেছেন বুদ্ধ ও বিভিন্ন দেবদেবী। তন্ত্র মতে সম্পূর্ণ ধ্যানতন্ত্র অবস্থায় জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয় এটা সাধক এই সময় প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করেন। বজ্রযানী সাধকেরাও এই সাধন পথেই বিভিন্ন দেবীর দর্শন পান। বজ্রযানী দেবতা মণ্ডলে যে দেবদেবীগণ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ষড়ক্ষরী, লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, প্রজ্ঞাপারমিতা, বসুধারা, মারীচী, বজ্রসত্ত্ব, হেরুক, পর্ণশবরী, বজ্রবারাহী, একজটা, তারা, সিততারা, খদিরবনী তারা ইত্যাদি। পাল যুগে গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে শিল্পীরা এইসব মূর্তি তৈরি করেছেন। মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি মূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ দেবদেবীরও মূর্তি নির্মিত হতো। পাল যুগের শিল্পীরা কি অপূর্ব ধ্যানে সেইসব মূর্তি নির্মাণ করতেন, যা পূজিত হতো মন্দিরে, বৌদ্ধবিহারে, শিক্ষায়তনে। ফলে এইসব অজস্র মূর্তি গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধন থেকে পাওয়া গেছে, যা বিভিন্ন মিউজিয়ামে ও পুলিশ থানায় সঞ্চিত আছে।

গৌড় পাণ্ডুয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসে, কিংবা প্রাচীন ইতিহাসেও এমন কোনও মুদ্রা পাওয়া যায়নি, যাতে দেবীমূর্তি অঙ্কিত আছে। রাজা গণেশ মুসলিম শাসন ছেদ করে গৌড় পুণ্ড্রনগরীর সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি চণ্ডীর উপাসক ছিলেন এবং নিজেকে 'চণ্ডীচরণপরায়ণসা' রূপে অভিহিত করেন। রাজা গণেশের আমলে ইব্রাহিম শকী তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজা গণেশকে সিংহাসনচ্যুত করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জয়মল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নামে পরিণত হোন। তাঁর শাসনকালে তিনি হিন্দুদের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেন, বহু মন্দির বিহার ধ্বংস করেন।

বিচিত্র লাগে, শাসনকালের শেষ দিকে এই যদু বা জালালুদ্দিন এমনই এক মুদ্রা চালু করেন, যার একদিকে দেবী দুর্গার বাহন সিংহমূর্তি খোদিত, অন্যদিকে আরবি অক্ষরে খোদিত 'বিন কানস রাও' অর্থাৎ 'আমি (জালালুদ্দিন) রাজা গণেশেরই পুত্র'। শেষ জীবনে পিতার স্মৃতিকে বোধহয় স্মরণ করে ব্যথিত হয়েছিলেন। এইরূপ মুদ্রা ইসলামের ইতিহাসে অভাবনীয়। এই মুদ্রা তো দুষ্প্রাপ্য বটেই।

গৌড় পুণ্ড্রবর্ধন জুড়ে নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে। বের হয়ে আসছে বিভিন্ন মূর্তি। শিলালিপি। জগজ্জীবনপুরে বের হয়েছে মারীচী মূর্তি। পাওয়া যাচ্ছে অজানা তথ্য। তাতে দেবী পুজোর ব্যাপ্তির ইতিহাস ধরা পড়ছে।

''সদ্রু চিরোমাবলি মহিতাম ব্যস্তা বলীর্দ্দধতীম।
দোষং বিসংদধানা চলেত রা রোহ পরিণাহাম।।''

— বরেন্দ্রী দেবী উমার অপূর্ব পূজা উপলক্ষে উৎসব মুখরিত হয়ে উঠত, যে বরেন্দ্রীতে শাসন করত এমন এক রাজবংশ যা ছিল চিরন্তন, যে রাজবংশ সমস্ত বিপদকে দূরীভূত করেছিল আর বরেন্দ্রী এমন এক দেশ ছিল যার গৌরব যেমন উচ্চ ছিল সেইরূপ ছিল বিস্তার। এই বর্ণনা সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্'-এর। তাই যত ঐতিহাসিক আবিষ্কার ঘটবে, দেবী মহিমার পুণ্য চেতনার পরিব্যাপ্ত কাহিনী, যা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে ছিল তা সূর্যের মতো প্রতিভাত হবে দিনের পর দিন।

বীরুপক্ষ মন্দির শিখর হাম্পি

কিষ্কিন্ধ্যার দেশে

সৌমেন নিয়োগী

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম কর্ণাটকের হসপেট শহরে। বর্তমানে আধুনিক কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত হসপেট অতীতে সমৃদ্ধশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের একটি স্থান। আরও পেছনে তাকালে এই অঞ্চলই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা। সেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট রাজা কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজ্য অভিষেকের ৫০০ বছরের পূর্তি উপলক্ষে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার পক্ষ থেকে এ হেন স্থানে সভার আয়োজন করা হয় যা ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সভার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমি ও আমার কাকা (প্রদীপ চক্রবর্তী) সহ মোট ৫ জন কলকাতা থেকে অমরাবতী এক্সপ্রেসে হসপেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সেখানকার মুখ্য পরিচালক শ্রীনিবাসজীর সাহায্যে আমাদের থাকা-খাওয়া, ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও সভায় ঠিকমত অংশগ্রহণ অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

হসপেট থেকে হাম্পি যা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে পরিচিত, দূরত্ব হলো ১০ কিমি। সুতরাং আমরা প্রথমে ঠিক করলাম এখান থেকে আনুমানিক ১৫৪ কিমি দূরে অবস্থিত উত্তর কর্ণাটকের ঐতিহাসিক প্রিয় পর্যটকদের কাছে তীর্থস্থানস্বরূপ বাদামি আইহোল, পাট্টাডাকাল আগেই দর্শন করব, যেহেতু সময় খুবই অল্প।

পরিকল্পনানুসারে আমরা খুব সকাল সকাল বাদামির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই বাদামি আনুমানিক ১৫০০ বছর আগে ছিল বিস্তীর্ণ চালুক্য রাজত্বের রাজধানী। স্থানটির নামটি একটি পৌরাণিক স্থানের নাম (বাতাপি) থেকেই উদ্ভব হয়েছে। এই বাতাপি হল মহাভারতীয় যুগের দুই দানব ভাই ইল্বল ও বাতাপি।

মহাভারতের গল্প অনুসারে, এই দুই দানব ভাইয়ের মধ্যে একজন মেষরূপ ধারণ করে অতিথি ব্রাহ্মণদের ভক্ষ্য হয়ে যেত এবং

তারপর অন্য ভাইয়ের ডাক শুনে অতিথির পেট চিরে বেরিয়ে এসে অতিথিকে হত্যা করত। কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যমুনিকে হত্যা করতে পারেনি। কারণ তাঁকে খাওয়ানো হলে তিনি সেই দানবকে সঙ্গে সঙ্গে হজম করে ফেলেছিলেন। সুতরাং পৌরাণিক এই দানব রাজার রাজত্বের কাহিনীকে একদমই হেয় করা সম্ভব নয় যখন দেখলাম সেখানকার দুর্গ টিলার নীচে সেই বিশাল সরোবর, যার নাম অগস্ত্যতীর্থ। চালুক্য রাজ প্রথম পুলকেশী বাতাপিকে রাজধানী করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে জায়গাটার পরিচিতি চতুর্থ শতক থেকেই যখন এটি চালুক্যবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। প্রথম পুলকেশীর সুযোগ্য পুত্র কীর্তিবর্মন ও মঙ্গলেশ কোঙ্কন উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্যভারতের কালচুরী ও মালব্য রাজ্য পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। তবে চালুক্য বংশীয় রাজাদের অন্যতম রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর আমলেই রাজত্বের বিস্তৃতি, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও সুদৃঢ় হয়। বর্তমান তামিলনাড়ুর কাঞ্চিতে সেই সময় প্রভূত শক্তিধর পল্লব রাজাদের রাজত্ব। দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে কাঞ্চিরাজ মহেন্দ্রবর্মন পরাজিত হন। ফলে কাঞ্চি ও চালুক্য রাজ্যের অধীনস্থ হয়। পরে অবশ্য মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র নরসিংহ বর্মন পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ স্বরূপ বাদামি আক্রমণ করেন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর তাতে মৃত্যু হয়। ফলে বাদামি পল্লব রাজত্বের অধীনে চলে যায়। এরপর ক্রমাগতই পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং তাদের শক্তিক্ষয়ের ফলে চালুক্যদের সামন্তরাজা মান্যখাটের রাষ্ট্রকূট বংশ প্রাধান্য পেতে থাকে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি অল্পদিনের জন্য বাদামি রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ হয়। তারপর পুনরায় রাজত্ব ফিরে ছিল চালুক্যদের হাতে, কিন্তু পরবর্তী যুগে বিজয়নগর ও বিজাপুর রাজত্বের অধীনস্থে বাদামি রাজধানী হিসেবে গণ্য ছিল না। এরপর একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও বিভিন্ন শাসকমণ্ডলের পরিবর্তনের মধ্যেও বিভিন্ন সময় বাদামির শাসকেরা এখানে শিল্পসুষমামণ্ডিত মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যের স্বাক্ষর রেখে যান। তাদের সেই কীর্তি আজও অমলিন হয়ে রয়েছে বাদামি ও তার সংলগ্ন আইহোল পাট্টাডাকাল অঞ্চলে।

আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম হসপেট থেকে। তাই এ রাস্তায় সর্বপ্রথম দর্শন হয় বনশঙ্করী দেবীর মন্দির। মন্দিরের তোরণ পথের নীচ দিয়ে এসেছে রাস্তা, দ্রাবিড় স্থাপত্যে নির্মিত আরাধ্য দেবী অষ্টভুজা সিংহবাহিনী এবং বনশঙ্করীদেবী হলেন পার্বতীর একটি রূপ যা এখানকার তাঁতী গোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত জাগ্রত। মন্দিরের সামনে একটি পুষ্করিণী এবং তিনদিক মণ্ডপ আকৃতির সৌধের দ্বারা আবৃত।

বনশঙ্করী মন্দির দর্শনের পর কিঞ্চিত জলযোগ সেরে আমাদের মূল বাদামির গুহা মন্দির ও অগস্ত্যতীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলি। বাদামির চারটি গুহার মধ্যে তিনটি হিন্দু ও অন্যটি জৈন ধর্মাবলম্বীদের গুহা, বাদামির মন্দিরগুলি বেশিরভাগই তৈরি হয়েছিল ষষ্ঠ শতকে পুলকেশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তি বর্মনের তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় পুত্র মঙ্গলেশের রাজত্বকালে তৈরি হয় বিখ্যাত পাহাড়ের গুহাগুলি। স্তম্ভ ও ভাস্কর্যে প্রতিটি গুহাই অনন্য।

প্রথম গুহাটি শৈব, অসাধারণ আঠারো হাত বিশিষ্ট একাশি মুদ্রায় প্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুহাটি হচ্ছে বৈষ্ণব গুহা। দ্বিতীয় গুহাটিতে রয়েছে প্রমাণ আকৃতির বরাহমূর্তি এবং শেষ গুহাটি জৈন ধর্মাবলম্বীদের, রয়েছে প্রমাণ আকৃতির তীর্থঙ্করদের মূর্তি। সবচেয়ে উপরে অবস্থিত জৈন গুহা থেকে বাদামি শহর ও অগস্ত্যতীর্থ সরোবরের ধারে অন্যান্য মন্দিরগুলির অবস্থান এক অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রতিস্থাপিত করে। এরপর আমরা অগস্ত্যতীর্থ দেখার সময় সরোবরকে ঘিরে থাকা কয়েকটি দর্শনীয় প্রাচীন শিবমন্দির দেখি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সূর্য মন্দির ও ভূতনাথ মন্দির। স্বল্প সময়ের মধ্যেই যেহেতু সবকিছু দেখার ইচ্ছে, তাই বিলম্ব না করেই এগিয়ে চললাম পাট্টাডাকালের উদ্দেশে। যাবার পথে চালুক্য সম্রাটদের হাতে তৈরি মহাকূটের মন্দির দেখলাম। এ এক চমকপ্রদ শৈবতীর্থ। বিলম্ব না করে মহাকূট দর্শন সেরে এগিয়ে চলি পাট্টাডাকালের উদ্দেশ্যে। পাট্টাডাকালের মন্দিগুলি তৈরি হয়েছে বাদামি আইহোলের মন্দিরের অনেক পরে— অষ্টম শতকে। তবে এ জায়গার বসতি বহু প্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তার প্রমাণ মেলে। বর্তমানে পাট্টাডাকালের সুসংরক্ষিত মন্দির গোষ্ঠী ইউনেস্ক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' সম্মানে ভূষিত। পাট্টাডাকালের মন্দির গোষ্ঠী ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে রেখা, নাগর, প্রসাদ এবং দ্রাবিড় ও বিমান শৈলীর মেলবন্ধনে নির্মিত শিল্প নৈপুণ্যের এক চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

মালপ্রভা তীরবর্তী এই স্থানে বিভিন্ন রাজবংশের রাজন্যবর্গের পট্টঅভিষেক হওয়ার দরুন সেই পট্টবন্ধন মহোৎসবকে কেন্দ্র করেই এই স্থানের নামের সার্থকতা। ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়, পেট্টি গাল নামে। বিরূপাক্ষ, মল্লিকার্জুন, জম্বুলিঙ্গ, সঙ্গমেশ্বর, গলগনাথ ইত্যাদি মন্দিরগুলির স্থাপত্য দেখার মতো। পাট্টাডাকাল কমপ্লেক্সে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য মন্দিরযুগল হল বিরূপাক্ষ ও মল্লিকার্জুন। পল্লব রাজাদের বিরুদ্ধে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের বিজয়কে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ৭৪৫-৭৫৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই শিবমন্দিরগুলির নির্মাণ করান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের দুই বোন। এখানকার বেশকিছু ভাস্কর্য দর্শনীয়। বিশেষ করে পাপানাথ মন্দিরের শিলিং ভাস্কর্য, মল্লিকার্জুন মন্দিরে পাথরে খোদিত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী, নন্দী প্যাভিলিয়ান, বিরূপাক্ষ মন্দিরের থামে ও শিলিংয়ের ভাস্কর্য এবং পূর্ব দিকের বারান্দায় শিব ও বিষ্ণু মূর্তি ইত্যাদি। রীতিমতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এগিয়ে চললাম আইহোলের উদ্দেশ্যে। আইহোলের মন্দির বাদামি পাট্টাডাকালের থেকেও প্রাচীন। আইহোলের চক্রাকার দুর্গা মন্দির এক অভিনব স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানকার লাডখান মন্দির, যা সরল আঙ্গিকে নির্মিত সর্বপ্রথম মন্দির নির্মাণের প্রাচীনতম নিদর্শন। চক্রাকার দুর্গা মন্দিরটি অবশ্য আদতে দুর্গগুন্তি অর্থাৎ দুর্গের মন্দিরের নামের অপভ্রংশ, যেমন কন্টিগুটি মন্দিরচত্বর।

আইহোলে বেশি সময় থাকলে হয়ত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা যেত, কিন্তু তাতেই যা দেখলাম তা এক কথায় অকল্পনীয়। মোটামুটি চতুর্থ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত বাদামি আইহোল

বিজয় ভিট্‌ঠল মন্দিরের রথ, হাম্পি

পাট্টাডাকালের মন্দির গোষ্ঠীগুলির এক একটির গঠনভঙ্গি, কারুকার্য, বিচিত্র স্থাপত্যের আকর্ষণ ইত্যাদি যে কোনও ইতিহাসপ্রিয় ও স্থাপত্যবিদ্যাপ্রিয় পর্যটকদের কাছে এক দুর্লভ তীর্থস্থান।

কলকাতায় ফিরে আসার আগে হাতে রয়েছে গোটা একটি দিন এবং সেটি হাম্পি দর্শনের জন্য বরাদ্দ। হাম্পি হলো রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা ক্ষেত্র। বালী, সুগ্রীব ও বজরঙ্গবলীর দেশ। পুরাণ মতে, পম্পাক্ষেত্র যা যুগ যুগ ধরে আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত। পম্পা তুঙ্গভদ্রা নদীর প্রাচীন নাম। হাম্পি শব্দটি মনে করা হয় পরিবর্তিত কানাড়ী ভাষ্যে পম্পা।

রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের সন্ধানে বেরিয়ে রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সাক্ষাৎ হয় এই কিষ্কিন্ধ্যাতেই। পুষ্পক রথে রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন লঙ্কার উদ্দেশে, তখন এই হাম্পি বা কিষ্কিন্ধ্যার উপর দিয়ে চলাকালীন সীতা তার অলঙ্কার ফেলে দিয়েছিলেন, যা সুগ্রীব কুড়িয়ে রাখেন। এখানে আজও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে অবস্থিত মাতঙ্গ পর্বত যা কিনা রামায়ণ বর্ণিত সুগ্রীবের আশ্রয়স্থল, যখন তিনি বালি কর্তৃক বিতাড়িত ও নিগৃহীত হন। এখানেই বালিকে বধ করে রামচন্দ্র সুগ্রীবের রাজা হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। মলয়বন্তী পাহাড়ে আজও রঘুনাথ মন্দিরটি শ্রীরামচন্দ্রের এই স্থানে থাকার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং হাম্পি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা অত্যন্ত পবিত্র এবং রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে নামাঙ্কিত। এই ভাবেই আমরা হাম্পির প্রধান প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছালাম। পেছনেই মাতঙ্গ পর্বত। আমাদের দর্শন শুরু হল বীরূপাক্ষ মন্দির দর্শনের মধ্য দিয়ে। বহু প্রাচীন মন্দির। ১৬৫ ফুট উঁচু গোপুরম্ পেরিয়ে মূল মন্দিরের প্রবেশ পথ। মূল মন্দিরের সংলগ্ন স্থাপত্যের নানা অংশ বিভিন্ন সময় নির্মিত হয়েছে। পূর্বদিকে যে তোরণ অর্থাৎ গোপুরম্ তা নির্মিত হয় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্ব উল্লেখযোগ্য রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে, বীরূপাক্ষ মন্দিরটির প্রধান আরাধ্য দেবতা শিব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী পম্পাদেবী। হাম্পির যে সকল মন্দিরগুলি বর্তমান তার মধ্যে এখানেই আজও নিত্যপূজা হয়।

মন্দিরের রঙ্গমণ্ডপটি পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমানের হাম্পি। চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্যে একের পর এক অঞ্চল অধিগ্রহণ করতে সক্ষম সেই চূড়ান্ত অস্থিরতার সময় হিন্দু সংস্কৃতি ও তাঁর ঐতিহ্যের গরিমাকে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য গৌরাঙ্গ মঠের আচার্য বিদ্যারণ্য স্বামীর নেতৃত্বে আধ্যাত্মিক উপদেশ এবং সার্বিক সনাতন ঐতিহ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংগম রাজবংশে হরিহর এবং বুক্কা দুই ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্বুদ্ধ করেন এক শক্তিশালী হিন্দুরাষ্ট্র গঠনে, যার ফলস্বরূপ ১৩৩৬ খৃস্টাব্দে বিজয়নগর রাজত্বের স্থাপনা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ স্থানটির একদিকে যেমন প্রশস্ত প্রবাহমান গতিতে বয়ে চলা তুঙ্গভদ্রা, অপরদিকে অনুপ্রবেশে অক্ষম খাড়াই বিশালাকার পাথরের দ্বারা পর্বতশ্রেণী, যা স্বাভাবিক সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম। অর্থাৎ সত্যিকারের কোনও রাজ্যের রাজধানী হবার যোগ্য। অতীতের সেই বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী হাম্পির সমস্ত ধ্বংসাবশেষ প্রায় ২৬

বর্গ কিমি জুড়ে বিস্তৃত। তার মধ্যে দ্রষ্টব্য স্থাপত্যগুলি যেগুলি আমরা দর্শন করলাম এবং যা বর্তমানে ইউনেস্কো স্বীকৃত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' তার সীমাবদ্ধতা দক্ষিণে কামালাপুরাম এবং উত্তরে হাম্পির মধ্যে।

এর পরের অধ্যায় আমরা দর্শন করি হেমকূট পর্বতের খাতে দুটি গণেশমূর্তি, শশিভেকালু (ছোট) ও কাদাভেকালু (বড়)। এই দুটি একটি নিরেট গ্রানাইট পাথর কেটে নির্মিত। হাম্পি যেহেতু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী তাই একের পর এক দ্রষ্টব্য স্থাপত্যগুলি দেখতে অনেকটাই ভ্রমণ করতে হয়। এবার দেখলাম প্রকাণ্ড দুটি মূর্তি। সাতটি সর্পবিশিষ্ট আসনে ৬.৭ মিটার উচ্চ মনোলিথিক লক্ষ্মী নরসীমা আর ৩ মিটার উচ্চ বরাভি লিঙ্গম।

এর পরের দ্রষ্টব্য হাজারারাম মন্দির, মন্দিরের বাহির দেওয়াল রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা নিপুণতার সঙ্গে খচিত। এটি এককালের রাজপরিবারের দেবস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। এরপরে একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের মেলবন্ধনে তৈরি লোটাসমহল। এগারোকক্ষ বিশিষ্ট হস্তিশালা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দশেরা, মহানবমী এবং সামরিক কুচকাওয়াজ ইত্যাদি যে স্থানে অনুষ্ঠিত হোত তা একটি বিশালাকায় সুন্দর কারুকার্যময় বেদী, যার নাম মহানবমী ডিব্যা। এটি একটি পিরামিডশৈলী গঠনের অনুকরণে নির্মিত। সাময়িক কালে খননকার্যে আবিষ্কৃত একশোর ওপর সিঁড়িবিশিষ্ট একটি পুষ্করিণী লক্ষ্য করা যায়। এই পুষ্করিণীর গঠনপ্রণালী এক অত্যন্ত নিপুণ জল সংরক্ষণ ও তা সেচের ব্যবহারে দিকগুলো উন্মেচিত করে।

মহানবমীর ডিব্যার কিছু অদূরে দেখলাম কুইন্স বাথ। বাইরে থেকে অত্যন্ত সাদামাটা মনে হলেও ভিতরে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। একটি পদ্মের আকৃতি কৃত্রিম প্রস্রবনের সাহায্যে সুগন্ধ আতর মিশ্রিত জল রাজকীয় স্নানাগারে প্রবেশ করানো হতো। শুধু তাই নয়, ঘুরতে ঘুরতে এবার আমরা উপস্থিত হাম্পির সর্বোচ্চ স্থাপত্যের নিদর্শন বিজয়ভিঠ্‌ঠল মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে উন্মোচিত হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্যকীর্তির অনুপম নিদর্শনটি। বিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাথরের সেই স্থাপত্যকাব্যের মধ্যে চোখে পড়ল আস্ত একটি গ্রানাইট পাথরে নির্মিত রথ। যার চাকাগুলো পাথরীয় কেন্দ্রের দণ্ডে চারিদিকে ঘুরতে সক্ষম ছিল। রথটির শিল্পগরিমা একটি কাঠের রথের অনুকরণে তৈরি। মন্দিরের চারদিকে রয়েছে লম্বা লম্বা ঢাকা বারান্দার সারি।

মন্দির প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থ রথের ঠিক পিছনেই মূল মন্দিরের অংশ। যার প্রথমেই রয়েছে ছাপান্নটি স্তম্ভবিশিষ্ট মহামণ্ডপ। সম্পূর্ণ গ্রানাইটে তৈরি মন্দিরটি মহামণ্ডপের বাইরের দিকের প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে রয়েছে হাতি ও ঘোড়ার মিত্র মূর্তির ভাস্কর্য।

সামনের দুটি পা তুলে দাঁড়ানো সেই কাল্পনিক পশুটির আরোহীর হাতে রয়েছে বল্গা। মহামণ্ডপের ভেতরের দিকে প্রতিটি থামের মাঝখানের অংশে রয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট স্তম্ভ যা মূল স্তম্ভকে বেষ্টন করে আছে। এই সরু ছোট স্তম্ভগুলির গায়ে আঘাত করলে শুনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের সুরের মূর্চ্ছনা। রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে এই মন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ হয়, মন্দিরটির মূল অংশের দুপাশে রয়েছে দুটো মণ্ডপ, যথাক্রমে কল্যাণ মণ্ডপ ও উৎসব মণ্ডপ। যা রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের আমলে নির্মিত। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে আহামেদ নগর ও বিদরের মুসলমান শাসকের আক্রমণে তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে অবসান ঘটে এই সুবিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের। এরপর শুরু হয় মানুষের ধ্বংসযজ্ঞ। যার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি মানুষের সুকুমার মনের এই অনুপম শিল্পকার্যগুলি, এর সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতার পতন হয়। ভিঠ্‌ঠল মন্দির প্রাঙ্গণ থেকেই এগিয়ে গেলেই দেখা যায়, বিশালাকার গোলপোস্টের ন্যায় দাঁড়িপাল্লা। এই দাঁড়িপাল্লাকে বলা হয় 'কিংস্ ব্যালান্স'। এর সাহায্যে রাজাকে সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথরের সঙ্গে ওজন করে সেইসব বিলিয়ে দেওয়া হত নরনারায়ণের সেবায়। শুধু তাই নয়, চোখে পড়ল চতুর্দশ শতকে দ্বিতীয় হরিহরের সময়ে নির্মিত তুঙ্গভদ্রার উপর একটি পাথরের সেতুর ধ্বংসাবশেষ। অবশেষে পম্পাক্ষেত্র ও দূর থেকে হনুমানের জন্মস্থল দর্শনের সঙ্গে শেষ হয় আমাদের হাম্পিদর্শন। এবার ঘরে ফেরার পালা। এতদিন দেখলাম সেই চতুর্থশতাব্দীর চালুক্য স্থাপত্য থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকের বিজয়নগর স্থাপত্য --- শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-মহাবীর হনুমানের পদধূলিধন্য প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার বর্তমান রূপ। আর শেষের বেলায় দেখে নিলাম আধুনিক স্থাপত্য, তুঙ্গভদ্রার উপর নির্মিত একশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একটি জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। যা সত্যিই আমাদের ভ্রমণকে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে সক্ষম হয়।

গ্রাম-নাম এক রহস্যের জগৎ

চণ্ডী লাহিড়ী

সকালের কাগজ খুললেই নিত্য নতুন গ্রামের নাম পাওয়া যায়। কোথাও মাওবাদীদের হানায় লোক মরছে। গ্রামের নাম অজানা। অজানা কিন্তু বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক নাম। গ্রামের নাম কানে গেলেই মনে হয় সেই নাম বড় এক ইতিহাসের কাহিনী বহন করছে নিঃশব্দে কখনও আভাসে নয়। সরাসরি গ্রামের নাম কথা বলছে। গ্রামের নাম এবং মানুষের পদবী কখনও একাকার হয়ে গেছে। গ্রাম নামেই ভারতে বহু মানুষের পরিচয়। কিন্তু আমাদের এই বঙ্গে এ নিয়ে তেমন কোনও গবেষণামূলক কাজ হয়নি। চিংড়িহাটা শব্দটি বলেই দেয়, চিংড়ির হাট ছিল। পিছনে ছিল চিংড়ি চাষের বিল বা ভেড়ি। দাঁইহাট একটি নিছক রেল স্টেশনের নাম নয়। দৈনন্দিন হাট বসত। সাপ্তাহিক নয়। সেজন্য দাঁইহাট। আশপাশে সাপ্তাহিক হাটের মধ্যে একমাত্র দৈনিক হাট। নদী বারবার খাত্ পাল্টায়। নতুন নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির নিয়মে। দাঁইহাট পার হলেই গঙ্গাতীরের অগ্রদ্বীপ। সেই গঙ্গাতেই নতুন কোনও দ্বীপে নতুন জনবসতির নাম হল নবদ্বীপ। বন্যার পর প্রথম স্থল দেখা দিল। নাম হল পূর্বস্থলী।

মহারাষ্ট্র বা পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সুবিধা হল, পদবীর জন্য তাদের ছোটাছুটি করতে হয় না। কোনও পদবী অপছন্দ হলে আদালতে গিয়ে এফিডেবিটও তারা করে না। সুনীল গাভাসকর যত বড় ক্রিকেটার হোন না কেন, গাভাসকর নামক গ্রামে জন্মেছেন বলে ইচ্ছা থাক বা না থাক, গাভাসকর নামক উপাধিটা তাকে বহন করতেই হবে। যাযাবরের দৃষ্টিপাত নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সবচেয়ে মূল্যবান চরিত্র চারুদত্ত আধারকার। গ্রামের নাম আধার— সব অধিবাসীর একটাই পদবী, আধার। শচীন তেণ্ডুলকারও তাই। তেণ্ডুল নামক গ্রাম থেকে তাঁরা মুম্বাই নামক মহানগরীতে এসেছেন। নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকারও সেই একই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। বিজয় মঞ্জেরেকার এসেছিলেন মঞ্জের নামক এক অখ্যাত গ্রাম থেকে।

গানের জগতে লতাজীও মঙ্গেশ গ্রামে জন্মগ্রহণের ফলে মঙ্গেশকার পদবী গ্রহণ করেছেন।

মহারাষ্ট্রের মতো পাঞ্জাবের অধিবাসীরাও গ্রামের নামকেই উপাধি হিসাবে বংশানুক্রমে গ্রহণ করে থাকে। সুরজিৎ সিং বার্নালা হলেন বার্নালা গ্রামের অধিবাসী। এপর্যন্ত আমি সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত প্রায় এক ডজন সুরজিৎ সিং বার্নালা পেয়েছি। ডাকাত বার্নালা এবং রাজ্যপাল বার্নালা সবাই একই গ্রামের।

উত্তর কলকাতায় খান্না সিনেমা হল খুবই বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক। পাঞ্জাবের খান্না গ্রামের অধিবাসীরা সবাই খান্না উপাধি ধারণ করেন। মেহেরচাঁদ খান্না ছিলেন দেশবিভাগের পর কেন্দ্রের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লোকসভার অধিবেশনে সুযোগ পেলেই মেহেরচাঁদ খান্নাকে এক হাত নিতেন। কারণ, মেহেরচাঁদ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য কিছুই করতেন না, লোকসভায় দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়া ছাড়া।

সুরজিৎ সিং মজিঠিয়া ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। মজিঠিয়া গ্রামের কয়েকজন সুরজিৎ দিল্লিতে এসে নাম করেছেন। সবাই লেখেন সুরজিৎ সিং মজিঠিয়া। পাঞ্জাবে কেবল পদবী নয়, নামেরও খুব আকাল। ঠাকুর দেবতার নাম ধার নিয়ে কতকাল টিকে থাকা যায়! হরদয়াল, হরকিষণ, হরভজন, হরবিন্দর— এসব হল খুব সাধারণ নাম। যে সব পঞ্চনদ-সন্তান সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেন বা এখনও দেন তাঁরা পুত্রদের নামকরণে কোনও ঝুঁকি নিতেন না।

ক্যাপ্টেন সিং, জার্নাইল সিং, সুবেদার সিং, কর্নেল সিং— এসব পাঞ্জাবে খুব চলে। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নৈকট্য হেতু এসব নাম দ্রুত সামাজিক সম্মানও পায়। লেফটেন্যান্ট সিং বলে কাউকে পাওয়া যায় না। মনে হয় খট্‌মটে বানান হওয়ায়।

পাঞ্জাব সাহিত্যের জন্য তেমন খ্যাত নয়। সেজন্য তার নাম-সঙ্কট নেই। তবে সুবিধা এই, নামের ভালমন্দ নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথাও নেই, যেটা সাহিত্যপ্রেমিক বাঙ্গালীর আছে।

পাঁচ লাখ সুনীল, ছয় লাখ বিমল, সাত লাখ অমিতাভ, বিশ লাখ অনিল— এসব নাম এতই সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে যে বাঙ্গালী সমাজে নামকরণ বা নামধারণ একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেলিফোন কোম্পানি যে তাঁদের ডিরেক্টরি তুলে দিয়েছে তার মূলে সম্ভবতঃ কমন নামের এই যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথ এসে বাঙ্গালীর অহংকারকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন যে, তাঁর নাম নির্বাচনেও চিন্তায় ও চেতনায় সাহিত্যবোধ সর্বাগ্রে। অনিল হলেই হল না, মধ্যপদ যোগ করে তাকে অনন্য এবং অগ্রগণ্য হতে হবে। অনিল কুমার, অনিল কৃষ্ণ থেকে হালফ্যাসনের অনিল-মলয়, অনিল-বসন্ত ইত্যাদি অনেক কিছুই এখন প্রাপ্তব্য। শুধু সুনীল হলে একারে চলবে না। সুনীলকৃষ্ণ, সুনীলমাধব, সুনীলবিনীল অনেক কিছু এখন দেখা দিচ্ছে। নাম কানে ঝংকার তোলে কিনা, শ্রোতা শ্রবণমাত্র ঘাবড়ে যান কিনা সেটাই বিবেচ্য। অর্থ কি, কার্যকরী করা যায় কিনা, এসব জানার দরকারই নেই।

বাঙ্গালীর নাম নিয়ে একটু দূর অতীতগামী হতে পারলে দেখা যাবে, এখানেও পাঞ্জাবীদের মতো গ্রাম-নাম পদবীতে জুড়ে আছে। লাহিড়ী, বাগচী, ভাদুড়ী, মৈত্র— এসব বারেন্দ্র উপাধি সবই বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের একদাখ্যাত গ্রাম নাম। উপাধি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চলে এসেছে।

সভ্যতার ইতিহাসে নদীতীরেই প্রথম সমাজ গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে বহু দূরের মানুষ বসতি পত্তন করে। রাঢ় বাংলায় গঙ্গা আছে, আর সেই গঙ্গার সঙ্গে জুড়ে আছে উত্তর ভারতের শাস্ত্রপাঠ। কাটোয়া, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, সবই শাস্ত্রজ্ঞ মানুষদের বসবাসে পুণ্যভূমি। সবার আগে গঙ্গাতীরে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা নিয়ে বসতি স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন, তাঁরা হলেন মুখোপাধ্যায়। বিহারে

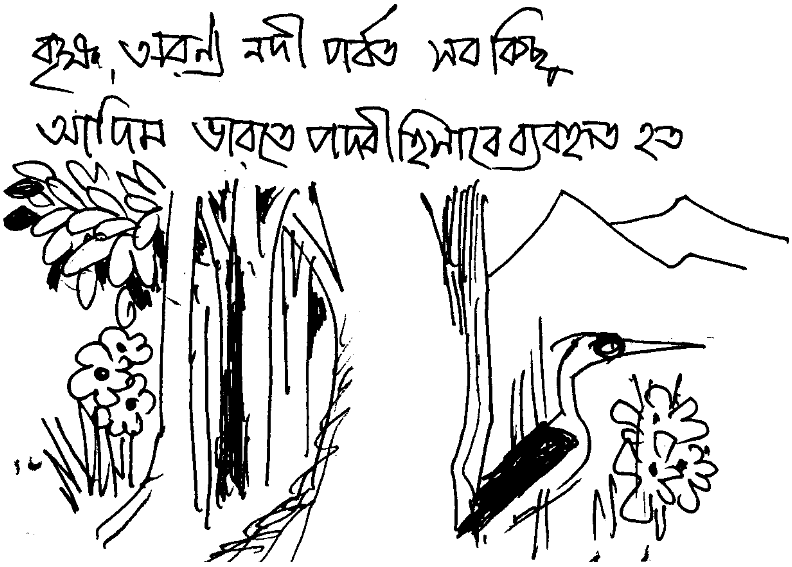

অব্রাহ্মণ অশাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু গ্রামে নেতৃত্ব দেন যিনি তিনি হন মুখিয়া। শাস্ত্রপাঠ করে দেবতাদের নিত্যবন্দনা যিনি করেন, তিনি বন্দ্যো-উপাধ্যায়। গঙ্গাতীরে বাস করেন যিনি তাঁর উপাধি গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তর ভারত ও বিহারে কে কত শাস্ত্র পাঠ করেছেন সেটাও উপাধিতে ধরা পড়ে। সাধারণ ব্রাহ্মণ হলে উপাধ্যায়। তৎসহ দুটি বেদে দক্ষ হলে দ্বিবেদী। তিনটি বেদে অভিজ্ঞ হলে ত্রিবেদী, চারটি বেদে পারঙ্গম হলে চতুর্বেদী— এসব এখনও আছে।

প্রাচীন ভারতে লোকসংখ্যা যখন খুবই কম তখনও গোষ্ঠী পরিচয় প্রয়োজন হতো। হাতের কাছে দু'পাশে প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়ে যেত উপাধি। অরণ্য পর্বত বন এই তিনটি উপাধি হয়ে এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে আছে। নিমের ছাল স্বাস্থ্যবর্ধক। নিম গাছ আশ্রমের চারপাশে লাগিয়ে যে সম্প্রদায় বাস করতেন, তাঁরা নিম্বার্ক সম্প্রদায় হিসাবে আজও প্রতিষ্ঠিত। বালিশ লেপ তোষক এসব যখন তৈরি হয়নি, কাঠে হেলান দিয়েই দিন কাটত মানুষের। কাঠিয়াবাবারা এখন একটি সাধক সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ। বৈদিক যুগে সবাইকেই বর্ষার জ্বালানি হিসাবে কাঠ, নদীতে ভাসার জন্য কাঠ এবং মাথার উপাধা হিসাবে কাঠের ব্যবহার ছিল। পায়ের পাদুকাও তো ছিল কাঠের।

প্রাচীন জাতি বা গোষ্ঠীতে টোটেমের ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন পশু বা পাখি বিভিন্ন জনজাতির টোটেম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালী মায়েরা বিশেষতঃ যাদের একাধিক সন্তান তাঁরা মা ষষ্ঠীর বাহন হিসাবে বিড়ালকে পুজো করেন। কৃষ্ণসার হরিণ রাজস্থানের বিশনই সম্প্রাদায়ের পূজ্য দেবতা। এরা বিষ্ণু উপাসক— কৃষ্ণসার হরিণ এদের টোটেম।

ইউরোপীয় বণিককুলের মধ্যে সবার আগে এসেছিলেন পর্তুগীজরা। মোগলদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করায় মোগল সেনাপতিরাই তাদের কলোনীতে অগ্নিসংযোগ করে। নৌ- ডাকাতি ও নারী অপহরণ ছাড়া অন্য কোনও কাজ তারা করতো না। বহিরঙ্গে অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের একটা রাজকীয় মসদ সঙ্গে রাখতো। ব্যান্ডেল শব্দটির বাংলা অর্থ বন্দর। পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করতে যাবার পথে ব্যান্ডেলে নোঙর করত। হুগলী শব্দটির অথ পথ প্রদর্শনকারী। হুগলী নদী ধরেই পর্তুগীজরা সুন্দরবন থেকে যাত্রা শুরু করত। হুগলী নদী তাদের পথ দেখিয়ে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে যেত। বঙ্গদেশে পর্তুগীজ বোম্বেটেরা খৃষ্টধর্ম যত প্রচার করেছে, তার চেয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করে বহু নতুন শব্দ যুগিয়েছে, যা নবাবী আমলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। পোর্টম্যান্টো অর্থাৎ বাক্সো শব্দটি শৈশবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ব্যবহৃত হত। স্যুটকেস শব্দটি গ্রামে ব্যবহৃত হত না। আলমারি, জানেলা, প্যান্টালুন— এসব পর্তুগীজ শব্দ বহুদিন ধরেই গ্রাম জীবনে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। পাও শব্দের অর্থ রুটি। আমরা পাও এবং রুটি দুটি একত্রে ব্যবহার করি। আনানাস এনেছিল পর্তুগীজরাই। এদেশে আমরা বলি আনারস। পিয়ার্স অর্থাৎ ন্যাসপাতি এনেছিল পর্তুগীজরা। সেজন্য পিয়ার্সের সঙ্গে দেখতে খুব মিল থাকায় ভারতীয় ফলটির নাম দিয়েছিল পেয়ারা।

আমার আসন্ন প্রকাশ বই 'বাঙ্গালীর রঙ্গব্যঙ্গ চর্চা'য় এসব বিষয় নিয়ে একটু গভীরে আলোচনা করেছি গ্রাম-নাম আমাদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে। গবেষকরা যদি এগিয়ে আসেন বহু নতুন তথ্য সংগৃহীত হবে।

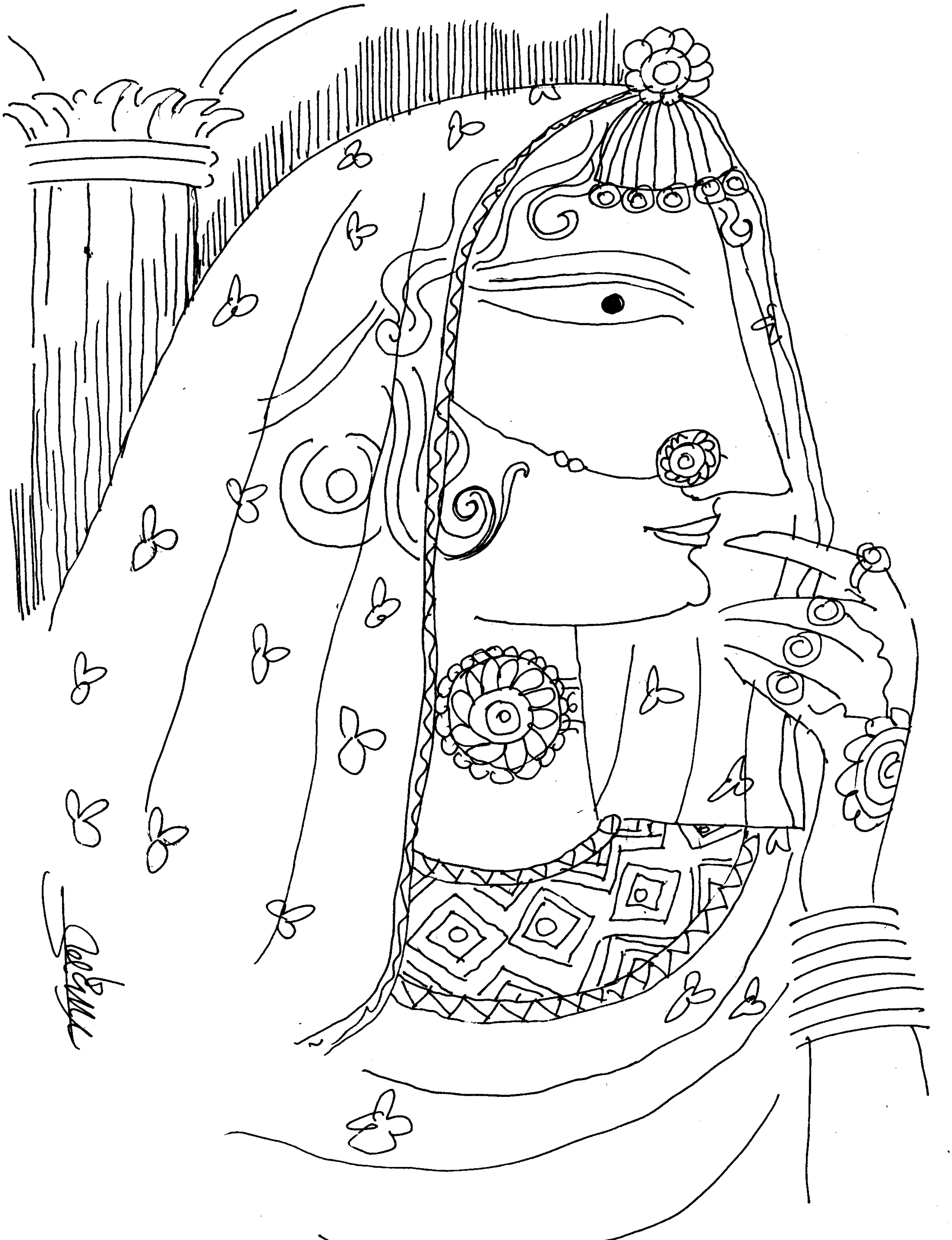

উপন্যাস

সুন্দরী এক নবাবজাদীর পাপ-পুণ্য

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

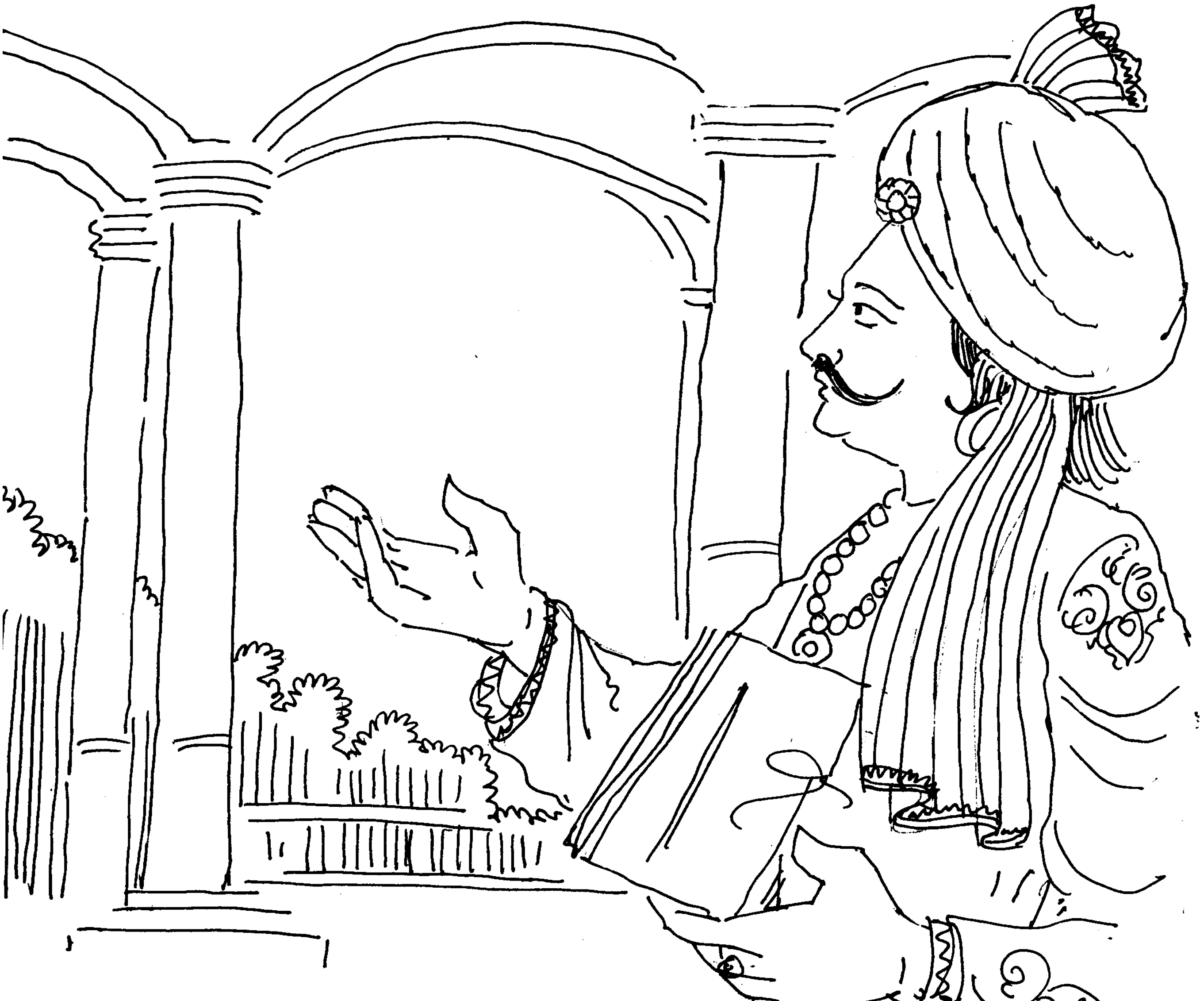

তখন নবাব আলীবর্দির আমল।

নগর মুর্শিদাবাদের এক অপরাহ্ণ বেলা। নিজামত কেল্লার পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। কেল্লার পশ্চিম মহলের কক্ষগুলি অস্তসূর্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত। একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে সেই অস্তসূর্যের আলোয় এক নবাবজাদী গভীর মনঃসংযোগ দিয়ে পড়ে চলেছিলেন একটি কেতাব। —যেমন তেমন কেতাব নয়, একটি রসের কেতাব। সেই রসের কেতাবের রস নবাবজাদীর মনে ও শরীরে জাগিয়ে তুলছিল আশ্চর্য এক রোমাঞ্চ।

এই কেতাব পাঠিকা নবাবজাদী হলেন নবাব আলীবর্দির প্রথমা কন্যা।

ভারি আদরের মেয়ে এই নবাব দুহিতা। নাম, মেহের উন্নিসা। তবে আদরের এই মেয়েটিকে কখনো কখনো 'ঘসেটি' বলে ডাকেন নবাব বাহাদুর। কিছুদিন আগে শাদি দেওয়া হয়েছে। —জামাই নওয়াজিস্ এই নবাবজাদীকে ডাকেন 'ছুটি বেগম' বলে। —এই 'ছুটি' বলে ডাকবার একটি কারণ আছে—জামাই নওয়াজিস্‌কে সকলে 'ছোট নবাব' বলে সম্বোধন করে থাকেন। সুতরাং ছোটে নবাবের বেগমকে 'ছুটি বেগম' বলে ডাকবার হক রাখেন নওয়াজিস্।

তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, 'গোলাপ' চিরকালই গোলাপ—সৌরভ ও সৌন্দর্যে সে সকল ফুলের সেরা।—নবাবজাদীর মহলের ভেতর সেরা সুন্দরী। এই নবাবজাদীর রূপে সকলেই মোহিত।

নবাবজাদী মেহেরের শরীর জুড়ে টলমল করছে এক যৌবনশ্রী। চোখে মোহিনী মায়া। এই মায়ার এমনই টান যে, সে টান কোনো পুরুষই এড়িয়ে চলতে পারে না—নবাবাজাদী মেহেরের একটি বাড়তি গুণ আছে, সে হলো তাঁর কেতাব-পাঠ। কেবল পাঠ নয়, কেতাবের রস তিনি উপভোগ করেন তারিয়ে তারিয়ে। আর তাঁর আচার-আচরণে কেতাব-সুন্দরীদের বেশ প্রভাব দেখা যায়।

নবাব আলীবর্দির অস্ত্রশালায় নানারকমের অস্ত্র আছে বটে, তাঁর নিয়ামত কেল্লায় কিন্তু ভালো ভালো কেতাবের খুবই অভাব। এই কেল্লায় না আছে 'শাহনামা', না উৎকৃষ্ট 'রুবাই'। হারেমের ভেতর যে সব কেতাব ঘোরাফেরা করে তার বেশির ভাগই হলো আরব্য-উপন্যাসের কেচ্ছা- কাহিনীতে ভরা। এসব কেচ্ছা কাহিনী আবার বেহুদা বেগম-বিবিদের গোপন প্রেমের রসে ভরা। এ রস নগ্ন এবং উত্তেজক। এসব কেচ্ছা পড়তে যুবতী নবাবজাদী সহজেই উত্তেজনা উপভোগ করেন। —রসে ডুবে যান।

সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় নবাবজাদী মেহের যে কেতাবটি পাঠ করছিলেন, তাতে এইরকম উত্তেজনার ছিল তীব্রতা। সুলতানি হারেমে খোজাদের নিয়ে চলছে গোপন রতিবিলাস। বেগম নিজেই এই বিলাসে মেতেছেন। এই রতি সুখসার কাহিনী ও বিবরণ পড়তে পড়তে মজে গিয়েছিলেন মেহের। সামিল হয়ে গিয়েছিলেন কাহিনীর অন্দরে—তা এমন সময় ঘটে গেল এক কাণ্ড!

মেহেরের মহলে যেসব পরিচারিকা থাকে, তারা সকলেই হাবশি, সকলেই যুবতী।

হাবশি মহলের দ্বিতল কক্ষে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এল এক যুবতী হাবশি।

সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানাল, 'বেগম সাহেবা, আমাদের নীচের মহলে এক ভারি গোলমাল বেধে গেছে। ভারি বদখত গোলমাল। এমন কাণ্ড কোথাও কখনো ঘটেছে কী না, কে জানে?

হাবশি পরিচারিকার কথা কানেই নিলেন না মেহের। মেহের তখন কিস্‌সার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

পরিচারিকাটি আরো একবার গোলমালের কথাটি বলল।

কিন্তু তাতেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখ গেল না বেগমের। কেতাবটি থেকে মাথা তুললেন না তিনি।

পরিচারিকাটি না-ছোড় বাঁদী—ছাড়বার পাত্রী নয়।

'বেগম সাহেবা, আপনাকে বলতে আমি লাজ পাচ্ছি। নীচের বিবি মহলে এক কুচ্ছিত কাণ্ড ঘটে চলেছে। এমন কাণ্ড যা দেখলে আপনার মাথা কাটা যাবে।'

এরপরে আর থাকা যায় না—মেহের তাঁর হাতের কেতাবটি পাতা মুড়ে রেখে দিলেন। বললেন, 'তোর কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী হয়েছে, খুলে বল?'

'আজ্ঞে, নীচের বিবি মহলে এক পুরুষ চোর ধরা পড়েছে।'

'পুরুষ চোর? হঠাৎ সে এল কোথা থেকে?'

'কোথা থেকে এই পুরুষ চোরটা এল, তা কেউ বলতে পারছে না—তবে অনেকেই মনে করছে, পুরুষটা চোর না হয়ে নাগরও হতে পারে।'

'নাগর?' হেসে উঠলেন বেগম সাহেবা। 'পুরুষটা চোর নয়? বিবি মহলের নাগর? এ তো ভারি আশ্চর্য কথা।'

হাবশি পরিচারিকা আমতা আমতা করে বলল, 'সবই অনুমান বেগম সাহেবা! তবে নাগর হওয়াটাই সম্ভব। ইয়া কেঁদো এক গোঁফ-অলা পুরুষ।'

নাগর, না পুরুষ এই মজার কথা দুটি শুনে নবাবজাদী কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হলেন। হাতের কেতাব খানি তাঁর শয্যার বালিশের তলায় রেখে চোখ তুলে বললেন, 'তা আমাকে এখন কী করতে হবে?'

'আজ্ঞে, কী করতে হবে, তা আমি কী জানি বেগম সাহেবা! যা হোক, একটা বিহিত করতে হবে। এর বিহিত না করলে, মহলটা উচ্ছন্নে যাবে। দোজখ হয়ে যাবে। আরো নাগর আসবে। নাগর দিয়ে ঘরে ঘরে শুরু হবে নাগরানি।'

'তা ঠিক।' নবাবজাদী কেদারা থেকে নেমে পড়লেন। 'চল নীচে গিয়ে ব্যাপারটি দেখি।'

ওপরের তলা থেকে নীচে নামলেন মেহের। নীচে নেমে যা দেখলেন, তাতে তাঁর চোখ কপালে উঠল। সবিস্ময়ে তিনি দেখলেন সেই পুরুষ-নাগরটিকে। দেখলেন সত্যিই এক কাণ্ড ঘটে

গেছে।

বিবি মহলের মাঝখানে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সেটি একটি 'চক'। চক-কে ঘিরে চারপাশে ঘর। বিবিদের আস্তানা, তবে সবটা বিবিদের নয়। বিবিদের পাশে বাঁদীরাও রয়েছে।

এই চকের মাঝখানে বসে রয়েছে এক জোয়ান মরদ। এই মরদকে মেহেরের হাবশি পরিচারিকারা বলছে, 'পুরুষ-নাগর।'

তা তারা খুব একটা ভুল কিন্তু বলেনি। নবাবাজাদী মেহেরের মনে হলো, এই মরদকে পুরুষ ও নাগর দুই-ই বলা যায়। মরদের চেহারায় অবশ্যই পুরুষ পুরুষ ভাব, এবং পোশাকে তার নাগর সুলভ শৌখিনতা।

বিবি মহলে এই নাগর লোকটি কেমন করে এসে ঢুকে গেল এবং কেন-ই বা সে এল, তা নিয়ে সকলেরই সোচ্চার কৌতূহল। কৌতূহল রয়েছে, কিন্তু উত্তর কই? লোকটি বসে রয়েছে স্থিরভাবে। অবিচল।

বিবি মহলের অনেকেই তার মাথায় চাঁটি, চাপাটি চালাচ্ছে। পাগড়ির ওপর ধাঁই ধাঁই।

লোকটি কিন্তু নির্বিকার। যেন সে ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

মাঝে মাঝে লোকটির শৌখিন গোঁফে টান পড়ছে। তবু সে নির্বিকার। যেন ভারি মজার ব্যাপার। এইসব দৃশ্য দেখে মেহেরের মনে হলো, লোকটির এই নির্বিকারভাবের মধ্যে একটা চাতুরি রয়েছে। লোকটি স্রেফ এমন চাতুরি করেই হয়তো কোনো বিবির মন কেড়ে নিয়েছে। ঢুকে পড়েছে জেনানা মহলে। এখন ইঁদুরের মতন কলে পড়েছে। বের হতে পারছে না—কিন্তু সে পরে ওই চাতুরি করেই বের হয়ে যাবে।

সেরকমই সে ফন্দি আঁটছে।

জটলা চলছে। জমে উঠেছে মজা। বাঁদি আর বেগমরা এর ভেতর মজা খুঁজে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে নানান মন্তব্য ভেসে উঠছে। ভেসে উঠছে টিপ্পনি। কোনওটি সোজাসুজি। কোনও কোনওটি তির্যক।

জটলার ভেতর থেকে এক বিবি বলে উঠল, 'নবাব বাহাদুরের কাছে এখনই খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার।'

'কেন?'

'এই আদমিটাকে কোতল করতে হবে।'

নবাবজাদী মেহের সকলকে ধমক দিয়ে উঠলো।

তবু থামে না মন্তব্য, 'মরণ! মিন্‌সেটা কেমন আমাদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে দ্যাখ।'

'মিন্‌সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে তার ভাবের বিবিকে খুঁজছে। ঠাহর করতে পারছে না কোনটা তার ভাবের বিবি।'

আবার ধমক পড়ল নবাবজাদীর। 'আমাকে ওই লোকটার কাছে যেতে দে।'

এই ধমকানিতে কাজ হলো। বিবি-বাঁদিরা সরে গিয়ে নবাবাজাদীকে লোকটির কাছে পৌঁছবার রাস্তা করে দিল। মেহেরকে আসতে দেখে 'পুরুষ-নাগরটি' চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু দাঁড়াতে হলো না। মেহের তাকে ধমক দিলেন। বসে পড়ল 'পুরুষ-নাগরটি'।

'যেখানে বসে রয়েছ সেখানেই বসে থাকো? ওঠবার চেষ্টা কোরো না।'

লোকটি নীরবে পালন করল নবাবজাদীর হুকুম।

'তোমার নাম কী? কোথায় থাকা হয়?'

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। পুরুষ- নাগরটির কানে কোনো শব্দই যেন ঢুকল না।

'আরে, তুমি বোবা না কালা? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নবাবজাদীর এ কথারও কোনো জবাব পাওয়া গেল না, আগের মতই সে তাকিয়ে থাকল, 'ফ্যাল ফ্যাল' করে । যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

এই ভাবে আরো কিছু জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দিয়ে লোকটিকে কথা বলাবার চেষ্টা হলো। কিন্তু পুরুষ-নাগরটির মুখ থেকে টুঁ-শব্দ বার করা গেল না।

শেষে নবাবজাদী মেহের তাঁর মেজাজ হারালো। যে কণ্ঠ থেকে মধুর স্বর বেরিয়ে আসে, সেই কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ শাসানি। 'দেখো বাপু, এই ভাবে বোবা সেজে থেকে তুমি যে রেহাই পাবে, তা একেবারেই নয়। তোমাকে বলতেই হবে, কে তুমি? তুমি কী বর্গীদলের কেউ? কোথায় তোমার থাকা হয়, আর কেমন করে এই বিবি মহলে ঢুকলে, কেন ঢুকলে, এসব জিজ্ঞাসার জবাব এখনই দিতে হবে। জবাব না পেলে কোটালের হাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে। আর তোমাকে পেয়ে কোটাল হুকুম খাঁ যে কী করবে, তা তুমি জিন্দেগিতে ভাবতে পারবে না। তোমার গায়ের ছালখানা টাটকা ছাড়িয়ে নেবে। তা তুমি কী কোটালের কাছে যেতে চাও?'

না, এই শাসানিতেও কোনো কাজ হলো না।

নবাবজাদী এরপর অবাক বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, 'এই লোকটির মনে কী কোনো ভয় নেই? এ লোকটি মানুষ না দানো? তা দানো হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, আরব্য উপন্যাসে তাদের হামেশাই দেখা গেছে। সুন্দরী মেয়েদের ওপর দানোদের খুব টান। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে লোকটিকে খানিক দেখল নবাবজাদী। শেষে মনে হলো, না, লোকটি আরব দেশের দানো নয়। লোকটি পুরুষ-নাগর। এবং চেহারাতে বেশ রকমফের আছে।

'নাগর নাগর' চেহারা, কিন্তু কোনো রা নেই। নাগরেরা কী রা কাড়ে না?

পুরুষ? তা পুরুষের মতো লোকটার একটি পুরুষ গোঁফ আছে বটে, কিন্তু আচরণে পুরুষের অভিব্যক্তি নেই।

'হাবা-গোবা?' তাই বা কী করে বলা যায়? বিবি মহলে হাবা-গোবাদের কী বে-নজর টান থাকে?

লোকটি বিরক্তিকর। তাই পরিস্থিতিটা বেজায় বিরক্তিকর মনে হলো নবাবজাদীর।

এইভাবে কী বসে থাকা যায়? ফয়সালা দরকার। লোকটিকে

সঙ্ সাজিয়ে তাকে ঘিরে প্রহরের পর প্রহর বসে থাকা সম্ভব নয়। ‘নবাবজাদী মেহের কিছু একটা করুন।’ এমনটাই একটা দাবী উঠল। নবাবজাদীর মনে হলো, এই ‘পুরুষ-নাগরটিকে’ তখনই তার অপরাধটা বুঝিয়ে দিয়ে জবর এক সাজা দেওয়া যাক তাকে।

এক হাবশি পরিচারিকা ইতিউতি খুঁজে পেল্লায় এক নাদনা নিয়ে এসে হাজির হল। নাদনা নয়, সেটি দরজা লাগাবার এক হুড়কো। যেমন মোটা, তেমনি ভারি।

‘বেগম সাহেবা যদি অনুরোধ দেন, তা হলে এই হুড়কোর বাড়ি দিয়ে লোকটার মাথা ফাটাই।’

নবাবজাদী কিছু বলবার আগেই এক বিবি পাশ থেকে বলে উঠল, ‘লোকটার মাথায় পেল্যায় যে এক পাগড়ি, এই পাগড়ির ওপর হুড়কোখানা পড়লে লাফিয়ে উঠবে। কিস্‌সুটি হবে না মাথার।’

হাবশি পরিচারিকাটি বলল, ‘তাহলে মাথার পাগড়িখানা টেনে খুলে দি।’

মেহের হাসতে হাসতে বলল, ‘এই প্রস্তাবটা মন্দ না। তবে হুড়কোখানা মাথায় আস্তে করে মারবি, জোরে নয়।’

নবাবজাদীর মুখ থেকে কথাটি খসতে-না খসতে পাশের এক বিবি এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে নাগর-পুরুষের পাগড়ি খানা খুলে দিল।

আশা করা গিয়েছিল, লোকটি বাধা দেবে। না, লোকটির কাছ থেকে কোনো বাধা এল না। লোকটি আগের মতনই নির্বিকার—এ আবার কেমন লোক রে বাবা! হাবশি ক্রীতদাসীটি হুড়কো দিয়ে তার মাথায় মৃদু মৃদু আঘাত আঘাত করে লোকটির যখন পরীক্ষা করতে থাকলেন; আর জিগ্যেস করতে থাকল, ‘এই বিবি মহলে কার টানে ঢুকেছিস রে, সব কথা খুলে বল। না বললে এই নাদনার ঘায়ে তোর মাথা দো-ফাঁক করে দেব।’

না, এই শাসানিতে কোনো কাজ হলো না।

একজন বিবি হঠাৎ বলে বসল, ‘লোকটির কামিজের জেবে নির্ঘাৎ কোনো গোপন চিঠি লুকোনো আছে। তা কামিজটা খুলে পরখ করে দেখা হোক। দেখা যাক, কামিজের জেবে কোনো চিঠি লুকিয়ে রাখা আছে কী না?’

প্রস্তাবটি মন্দ নয়। যদি কোনো চিঠি পত্তর পাওয়া যায়, তাহলে লোকটির পরিচয়ও হাতে হাতে পাওয়া যাবে। লোকটি কথা না বলুক, তার চিঠি তার পরিচয় ফাঁস করে দেবে। এই ‘পুরুষ-নাগরের’ ভেক খুলে যাবে।

নবাবজাদী এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

সম্মতি পাওয়া মাত্র চার-পাঁচজন বিবি ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। খুলে ফেলল কামিজ। লোকটি বাধা দেবার চেষ্টা করল। কামিজটি হয়ে গেল ফর্দাফাই। এবং লোকটি হয়ে গেল অর্ধেক নগ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে রোল উঠল হাসির। হা-হা, হি-হি।

না, নাগরের কামিজ থেকে কিছুই পাওয়া গেল না—কামিজের জেব ফাঁকা।

সমস্যা আরো ঘনীভূত হলো। সমস্যা হয়ে উঠল জটিল।

এখন তা হলে লোকটিকে নিয়ে কী করা! ছেড়ে দিতে হবে? বিনা শাস্তিতে?

হঠাৎ একটি মতলব মাথায় এল নবাবজাদীর। আরব্য উপন্যাসে যে ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়, সেরকম এক শাস্তির বিধান কী করা যায়? সে ভারি মজার সাজা হবে। তা সেই শাস্তির কথা ভাবলেই ভারি কৌতুক অনুভব করলেন নবাবজাদী। তখন কোথায় নিজেকে লুকোবে এই পুরুষ-নাগর!

হুকুম হলো, ‘আর না, এই বদমাসটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক।’

‘ছেড়ে দেওয়া হবে, কোনো সাজা না দিয়ে?’

‘সাজা আর ছেড়ে দেওয়া একই সঙ্গে হবে।’ হুকুম করলেন নবাবজাদী।

‘কী সাজা দেওয়া হবে?’

‘এর বাকি পোশাকটি খুলে একেবারে নাঙ্গা করে পথে নাবিয়ে দাও। পাঠিয়ে দাও কেল্লার বাইরে।’

নবাবজাদীর এই হুকুম ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিবিদের ভেতর হুল্লোড় পরে গেল। অশালীন কর্মে বিবিরা বরাবরই উৎসাহী। তাই হা-হা হাসি, তুমুল উৎসাহ এবং প্রবল কলরব তুলে বিবিরা হাঁপিয়ে পড়ল পুরুষ-নাগরটির ওপর। তাকে মুহূর্তে নাঙ্গা করে ফেলা হলো। তারপর তাকে নিয়ে চলল টানাটানি এবং উৎসারিত হতে থাকল নানা বাক্য।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি কুৎসিত। এই কুৎসিত রঙ্গরস থেকে নবাবজাদী কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন না। বরং বেশ মজা করে কিছুক্ষণ উপভোগ করলেন। করতে থাকলেন।

তা ব্যাপারটা যখন চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছুল, তখন নবাবজাদী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন এবং হুকুম করলেন, ‘অনেক হয়েছে, আর না। এবার ওই পুরুষ-নাগরটিকে লাথি মারতে মারতে মহল থেকে রাস্তায় বের করে দিয়ে আয়। বদমাসটা ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াক। যেমন কর্ম, তেমনি শাস্তি।’

মহলের বিবিরা নবাবজাদীর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

পুরুষ-নাগরটি নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় বের হয়ে ইতিউতি তাকিয়ে দৌড়ে আশ্রয় খুঁজতে থাকল।

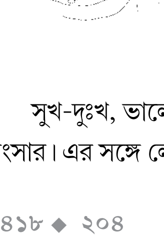

।। দুই।।

সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ— এইসব নিয়ে জগৎ সংসার। এর সঙ্গে লেগে থাকে সমস্যা ও সংকট।

বাংলা মুলুকে নবাব আলীবর্দির যে সংসার, তা ও-সবের থেকে আলাদা কিছু নয়। আলীবর্দির সংসার বলতে কেবল যে তাঁর পারিবারিক সংসারকে বলা হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। বাংলা মুলুকে তাঁর যে শাসন-ব্যবস্থা রয়েছে, তা দেখা, যে রাজস্ব আদায় হচ্ছে তার হিসেব রাখা। বর্গী আর আফগানদের নিয়ে প্রতিনিয়ত লড়াই, মুলুকে শান্তি বজায় রাখা, এবং মুলুকের নাগরিকদের সুখে রাখা। এ সবই হল নবাব আলীবর্দির বৃহৎ সংসারের কর্ম এবং দায়িত্ব—তা এই বাংলা মুলুকটিকে নবাব বাহাদুর হাতের মুঠোয় ধরে রেখে দিয়েছেন। সব দিকে তাঁর নজর। কোনো হেরফের নেই।

নবাব আলীবর্দি হিন্দুস্তানের ছিলেন না। এখানে জন্মাননি। সুতরাং তিনি বাংলা মুলুকেরও কেউ না, হিন্দুস্তানেরও কেউ না।

ওঁর বাবা ছিলের আরব দেশের এক লোক। যা তুর্কি, ইস্পাহানের আফসার উপজাতির কর্তা। হিন্দুস্তানে এসে অনেক দুঃখ-ধান্দার মধ্য দিয়ে মানুষ হতে হয়েছে আলীবর্দিকে। ইনি শৈশব কাটিয়েছেন সুকঠিন দারিদ্র্যে। সেই দারিদ্র্য এবং অসহায় অবস্থা থেকে তাঁকে উঠে আসতে হয়েছিল, দক্ষতা এবং নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে। প্রবল বাধার সঙ্গে তাঁকে পায়ে পায়ে লড়তে হয়েছিল। সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

ওই লড়াইয়ে তেমন কারো সহযোগিতা পাননি আলীবর্দি। তবে পাশে পেয়েছিলেন নিজের বড়ো ভাইকে। এই বড়ো ভাই হলেন, হাজী মহম্মদ। হাজী সাহেব বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভাইয়ের কাজকর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গেছেন।

হাজী সাহেবের তিন ছেলে। পরে এই তিন ছেলেই বড়ো হয়ে কাকা আলীবর্দির বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে দেখা দিল।

এদিকে আলীবর্দির দিকে কোনো পুত্র সন্তান নেই। তাঁর তিন মেয়ে। তিনটি মেয়েই খুব সুন্দরী এবং গুণবতী। এই তিন মেয়েকে আলীবর্দি তাঁর তিন ভাইপোর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে একে একে তাদের জামাই বানিয়ে নিলেন। ইসলাম ধর্মে এই বিবাহ শরিয়তসম্মত। কোনো অসুবিধা হয়নি।

তা এই তিন জামাইকে পেয়ে ভারি উপকার হলো নবাবের। নবাব এঁদের শাসন ব্যবস্থার গাড়িতে জুতে দিলেন।

বড়ো জামাই হল নওয়াজিস্ খাঁ। এই খাঁ সাহেবকে আবার শহমত জং বলে ডাকা হোত। তাঁর শৌখিনতা এবং আড়ম্বর প্রিয়তার জন্য তাকে সম্বোধন করা হয় 'ছোটে নবাব' বলে। এই শৌখিন 'ছোটে নবাব'-ই হলেন নবাবজাদী মেহেরের স্বামী। এই রুচিবান মানুষের সঙ্গে রুচিশীলা এই নবাবজাদীর যেন বন্ধনটি ভালোই হয়েছে। আলীবর্দি এই জামাইকে 'জাহাঙ্গীর নগরে'র দায়িত্বে রেখেছেন। আজ আমরা যাকে 'ঢাকা' বলে থাকি। তখন এই নগরটিকে বলা হোত 'জাহাঙ্গীর নগর'। তা কেবল ঢাকা নয়, জামাই নওয়াজিস্ খাঁয়ের ওপর বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রামেরও। রাজস্ব আদায় থেকে শাসন বিধান, সবই ছিল নওয়াজিসের ঘাড়ে।

নবাব আলীবর্দির দ্বিতীয় নবাবজাদী হলেন 'আয়েশা'। এঁকে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল বড়ো ভাইয়ের মেজ ছেলে আহমদ খাঁয়ের সঙ্গে। আহমদ খাঁ বিশেষ যে নামে পরিচিত ছিলেন, তা হলো শওমত জং। এই জামাইকে প্রথমে রংপুরের ফৌজদার হিসাবে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল, পরে এঁকে করা হয় পূর্ণিয়ার নবাব। পূর্ণিয়া তখন এক সমৃদ্ধ পরগণা। বিপুল রাজস্ব আদায় হোত। নবাব শওনত জং এই রাজস্বের প্রায় সবটাই পাঠিয়ে দিতেন মুর্শিদাবাদের কোষাগারে। কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি।

কনিষ্ঠা নবাবজাদীর নাম হলো 'আমিনা' —এই আমিনার বিয়ে হয়েছিল বড়ো ভাইয়ের ছোটো ছেলে জৈনুদ্দিন আমেদের সঙ্গে। এই জামাইকে রাখা হয়েছিল পাটনায়। এই দম্পতির প্রথম পুত্র, সিরাজউদ্দৌলা।

আলীবর্দি তাঁর সৈনিক জীবন শুরু করেছিলেন একজন অতিসাধারণ পদাতিক হিসেবে। ধীরে ধীরে এবং পায়ে পায়ে উন্নতি লাভ করতে করতে যখন 'আকবরনগর' অর্থাৎ রাজমহলের ফৌজদার হলেন একদিন এবং তারপরই হঠাৎ রাজমহলের ফৌজদার থেকে বিস্ময়করভাবে 'পাটনার' দেওয়ান হয়ে যাওয়া। সেদিনের ভাগ্যোদয়ের কথা নবাব আলীবর্দি আজও ভুলতে পারেননি। কেননা, সেদিনই ছোট মেয়ের বড়ো ছেলে সিরাজের জন্ম হয়েছিল।

সিরাজের এই জন্মক্ষণটিকে আলীবর্দি তাঁর জীবনের ভারি শুভক্ষণ বলে মনে করতেন। এবং এখনো তাই মনে করেন। এই দৌহিত্রটিকে তাই নবাব আলীবর্দি পাটনায় মেয়ের কাছে না রেখে নিজের কাছে প্রথম দিন থেকেই রেখে দিয়েছেন। রেখেছেন মুর্শিদাবাদে।

এই বৃত্তান্ত নগরের সকলেই জানেন।

সিরাজ নিজেও প্রথম শৈশব থেকে জানে, সে হলো নবাব আলীবর্দির পেয়ারের নাতি। তাকে শাসন করবার কেউ নেই। সে হল নবাবের শুভ গ্রহ।

আদরে সোহাগে যা হয়, পেয়ারের নাতিটির তাই হয়েছে। তার নানা খেয়ালিতে নবাবের আত্মীয়স্বজন অতিষ্ঠ। অতিষ্ঠ পাড়াপড়শিরা। পরে যৌবন যখন এল, তখন সিরাজের খেয়ালিপনা আর এক বাঁকা পথ নিল। তখন তার দিশা পায় কে?

নবাব আলীবর্দি তাঁর এই দৌহিত্রটিকে উপদেশ দিয়ে একটু আধটু শাসন করেন বটে, কিন্তু সে হলো প্রবল স্রোতের মুখে বালির বাঁধ মাত্র। সহজেই ভেঙে যায়। সিরাজ খরস্রোতা নদীর মতনই উদার। কোনো বাধা সে মানে না।

যৌবন বয়সে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে নাতির জন্য আলাদা এক প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন নবাব।

ভারি চমৎকার প্রাসাদ। তা সেখানেও নাতির খুঁতখুঁতানি। সিরাজের প্রাসাদের সামনে দেওয়ান মানিকচাঁদের গাড়ি বারান্দা। সিরাজের মনে হলো, ওই গাড়ি বারান্দাটি ভেঙে ফেলা দরকার। এই গাড়ি বারান্দাটি ভাঙার আর্জি নিয়ে দাদুর কাছে গেল সিরাজ। এই গাড়ি বারান্দা না ভাঙাতে প্রাসাদটির শোভা নষ্ট হচ্ছে।

আর্জি শুনে প্রথমে চুপ করে রইলেন নবাব।

পরে বললেন, 'দ্যাখো নাতিভাই, তোমার বাড়ীটি দেওয়ানজীর বাড়ির চারগুণ বড়ো, তাই না?'

'হুঁ।'

'তা তোমার বাড়ির জন্য দেওয়ানের বাড়ির আলো-হাওয়া, দুই-ই বন্ধ। তাই ভেবে দ্যাখো, ছোটো একটি জিনিসের জন্য বড়ো একটা ক্ষতি করা কী ঠিক হবে? মানিকচাঁদকে কী আমি জবাব দেব?'

সিরাজের আর্জি না-মঞ্জুর হয়ে গেল। এরকম যে হতে পারে, তা বুঝতে পারেনি সিরাজ। তাই মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে রইল সিরাজ। এই ক্ষোভ আরেক জায়গায় ফেটে পড়বার সম্ভাবনা রইল।

তা বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজকে বাঈজী-বিলাস চেপে ধরল। যদিও নবাব আলীবর্দির জীবনে এই ধরণের বিলাস তেমন ছিল না। এবং এক বেগমেই তিনি সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু নাতি এবং জামাইয়ের বেলায় তিনি সে আদর্শ আরোপ করতে পারছেন না। তিনি চোখের সামনে দেখছেন অবারিত মদ্যপান, অপরিমিত বাঈজী বিলাস এবং বেহুদা অর্থের অপচয়। তা সারা হিন্দুস্থান জুড়েই এই আবহাওয়া। এই আবহাওয়া ও পরিবেশকে রোধ করবার ক্ষমতা নেই নবাব আলীবর্দির। এসব কাণ্ডে তিনি নীরব দর্শক মাত্র এবং নীরবেই থাকেন।

নবাব দেখছেন, এবং চুপ করে রয়েছেন —কোনো প্রতিবাদ নেই।

একদিন তিনি চোখের সামনেই দেখলেন, ফৈজুবাঈকে নিয়ে সিরাজের এক অভাবিত কাণ্ড!

ফৈজুবাঈ হলো নাচনেওয়ালি। এবং অসাধারণ সুন্দরী। দিল্লিতে এই বাঈজীর খুব নাম ডাক ছিল। তাকে একলাখ টাকা দিয়ে কিনে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছে সিরাজ। তাকে নিয়ে সিরাজ একেবারে পুরো পাগল। তাকে নিয়েই দিন রাত কাটে সিরাজের। বাঈজীর এতটুকু দুঃখও সহ্য করতে পারে না নবাবের নাতি। বাঈজীর দুঃখ হলে, সিরাজের বুক ফাটে।

এই ফৈজুকে নিয়ে এক রাত শেষে ঘটল এক অঘটন।

সিরাজের বাড়িতে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় বাঈজী সেদিন ফিরছিল নিজের ডেরায়। ঢাকা গাড়ি। ওই গাড়িতে ফেরা। নগরের কোতোয়াল সে রাতে নিজে নগর পাহারায় ছিলেন। ঢাকা গাড়িতে কে যায়, তা বুঝতে না পেরে, কোতোয়াল গাড়ি সুদ্ধ বাঈজীকে গারদে ভরে দিলেন।

পরদিন সকালে সিরাজের কাছে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন নবাবের নাতি রাগে অগ্নিশর্মা।

নবাব আলীবর্দির কাছে এসে কোতোয়ালের বিরুদ্ধে এক নালিশ ঠুকে দিল সিরাজ। কোতোয়ালের এই বেয়াদপি সহ্য করা যায় না। নাতির নালিশ শুনে নবাব আলীবর্দি বললেন, 'তা নাতিভাই, তোমার অভিযোগটা খুব জোরালো বটে, কিন্তু এই ঢাকাগাড়িতে ফৈজু আছে না আর কেউ আছে, তা কোতোয়াল বুঝবেন কী করে? কোতোয়াল যদি তোমার ফৈজুকে ছেড়ে দিতেন, তা হলে অর্থাৎ বুঝতাম তিনি রাতের বেলা এই ভাবে চোর-ডাকাতদেরও ছেড়ে দিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমার অভিযোগটা টেঁকে কই?'

সিরাজের থোঁতা মুখ ভোঁতা।

নগরের ভেতর এই রকম গোলমাল নিত্যদিন, আর গোলমালের খবরে নগর উচাটন।

এইসব গোলমালের খবর নগরের ঘরে ঘরে রসালো কাহিনী হয়ে পৌঁছে যায়। লোক সারাদিন ধরে এসব শোনে এবং মজা পায়।

সেবার বর্ষাকাল। ভাগীরথী জলে টলমল। দু'কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী।

খেয়াপারের নৌকাগুলি অতি সাবধানে যাত্রীনিয়ে পারাপার করছে। মাঝিরা অতি সতর্ক।

তা হঠাৎ নবাবের নাতির অনুচরেরা এসে মাঝনদীতে হামলা বাধায়। অদূরে মাঝনদীতে ভাসছে নবাবের নাতির বজরা। সেখান থেকে ভেসে আসছে খুশির হিল্লোল। এবং হুল্লোড়।

হামলাবাজরা এসে মাঝিদের বলল, 'তোমরা পালাও। যাত্রী নৌকো এখনই জলে ডোবাবো সব।'

'কেন?'

'কেন আবার কী! নবাবের নাতির হুকুম। নৌকো ডোবাতে হবে।'

' সে আবার কী! নৌকো ডুবলে সব যাত্রীরা যে ডুবে যাবে যে। নদীর যা স্রোত, কেউ বাঁচবে না, তার ওপর অগাধ জল। দোহাই তোমাদের, এমন সর্বনাশ কোরো না। মেলা কচিকাঁচা রয়েছে নৌকাতে।' হামলাবাজদের আকুতি-মিনতি করতে থাকে মাঝিরা।'

হামলাবাজরা হা-হা করে হেসে ওঠে।

'নদীর জলে হাবুডুবু খেয়ে কেমন করে লোক মরে, সে দৃশ্য দেখবার খুব সাধ নবাবের নাতির। তাই নৌকাডুবি করতে হবে। তোমরা ছেড়ে এখনই পালাও। নইলে এই মাঝনদীতে তোমাদেরও পিটিয়ে মারা হবে।'

মাঝিরা আল্লাহের নাম স্মরণ করতে করতে নৌকো ছেড়ে পালায়।

নবাবের নাতির খেয়াল চরিতার্থ হয়। এবং বিস্তর লোক মাঝনদীতে হাঁকপাঁক করে ডুবে যায়।

তা এই বৃত্তান্ত নবাব আলীবর্দির কাছে গিয়ে পৌঁছয়। নবাব মর্মাহত হন। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারেন না নাতিকে।

এই খবর যথাসময়ে পৌঁছে যায় নগরের ঘরে ঘরে। নগরের লোক আতঙ্কে শিহরিত হয়।

তা এখানেই খবরের শেষ নয়। শিকদার বাড়ির দুই বউ স্নান করতে গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে। তারা সুন্দরী। রূপসী। এবং যুবতীও

বটে। স্নান সেরে তারা আর বাড়ি ফিরল না। তারা কোথায় গেল? তারা কী গঙ্গার জলে তলিয়ে গেল?

শিকদার পাড়ার লোকজন বিস্তর খোঁজখবর করল। না, তাদের হদিশ পাওয়া গেল না।

শোনা গেল, নবাবের নাতি সিরাজের লোকজন তাদের তুলে নিয়ে গেছে। তাদের খোঁজখবর বৃথা।

নবাব আলীবর্দির কানে এখবরও পৌঁছুল। নবাব কিছুই করতে পারলেন না। কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এই হলো নগর মুর্শিদাবাদের হাল- হকিকৎ। অর্থাৎ হালের বিবরণ।

আলীবর্দির বেগম হলেন সরফ উন্নিসা। তিনি আরেক রকম খবর পান। কিন্তু মন্দ খবরের প্রতিবিধান করার ক্ষমতা তাঁরও নেই। ইদানীং তিনি উদ্বিগ্ন রয়েছেন তাঁর বড়ো জামাই নওয়াজিস্ খাঁ এবং তার বড়ো মেয়ে মেহেরকে নিয়ে।

'ঢাকা' নগরে দুজনেরই থাকবার কথা। কিন্তু 'ঢাকা' নগরটি নওয়াজিসের একদম পছন্দ নয়। ঢাকায় রয়েছে বিরাট নবাবী প্রাসাদ। রয়েছে অজস্র দাসদাসী। নবাবী প্রাসাদ সংলগ্ন যে বাগান, তা খুবই সুন্দর। রয়েছে রাশি রাশি ফুল, কৃত্রিম ঝরনা। আরামে ও বিলাসে দিন কাটাবার পক্ষে ঢাকার মতো শহর হিন্দুস্তানে তখন খুবই কম ছিল। চারদিকে সবুজ। অজস্র পাখি- পাখালি। যাই হোক, এমন শোভন সুন্দর নগরটি কেন যে নওয়াজিস খাঁয়ের পছন্দ হলো না, তা নবাব আলীবর্দি এবং বেগম সরফ উন্নিসা বেগমের কাছে এক বিস্ময়।

মুর্শিদাবাদের শাহী কেল্লায় এসে জাঁকিয়ে বসে গেছেন নওয়াজিস্ খাঁ।

এখানকার কেল্লায় প্রাসাদ থেকে আর তিনি নড়তে চান না—এখানেই ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তিনি তাঁর অঢেল আনন্দের। প্রাসাদের জলসাঘরে রয়েছে অঢেল শরাবের ব্যবস্থা। প্রতি রাতেই বসে তার নাচ-গানের আসর। হিন্দুস্তানের সেরা গায়ক এবং নাচনীরা খাঁ সাহেবকে রোজ রাতে আনন্দে মাতিয়ে রাখেন। নিজের সুন্দরী বেগমের প্রতি উদাসীন নন, কিন্তু যুবতী স্ত্রীর থেকে তাঁর টান সুন্দরী নাচওয়ালিদের দিকে একটু বেশি—হিন্দুস্তানে কোথায় সেরা নাচওয়ালি পাওয়া যায়, তার খুঁটিনাটি খবর খাঁ সাহেব রাখেন। তাদের তসবির খাঁ সাহেবের জলসাঘরে হরদম এসে পৌঁছে যায়।

তবে নাচে-গানে গভীর আসক্তি থাকলেও, 'ঢাকা'য় শাসন ব্যবস্থার ওপর তাঁর নজর কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়।

ঢাকা না গেলেও, এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন, ঢাকা থেকে তাঁর কাছে হরদম লোক আসে। ঢাকার বিস্তারিত ফিরিস্তি তাঁর কাছে নিয়মিত পৌঁছে যায়। এই ফিরিস্তি যিনি নিয়ে আসেন, তাঁর নাম হলো হুসেন কুলি খাঁ।

হুসেন কুলি খাঁ ঢাকার শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও নগর মুর্শিদাবাদে তাঁর একটি নিজস্ব আস্তানা রয়েছে।

এই আস্তানাকে একটি প্রাসাদ বললে অতিশয়োক্তি হয় না। ঢাকা থেকে এসে এই প্রাসাদে হুসেন কুলি বেশ আরামে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান। এবং এই নগরে আসবার পরে প্রতিদিন তিনি

যোগাযোগ রাখেন নওয়াজিস্ খাঁয়ের সঙ্গে।

খাঁ সাহেবের কাছে আরেক জন ঢাকা থেকে মাঝে মাঝে আসেন, তিনি হলেন আরেকজন রাজপুরুষ। লোকটা বেশ চালাক চতুর। মাঝারি ধরণের উচ্চতা। শরীরটা বেশ মজবুত। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। লোকটি হিন্দু।

তা হিন্দু হোক। লোকটি খুবই বিশ্বাসী। তেমনই মনে হয় নওয়াজিস খাঁয়ের।

নওয়াজিস্ খাঁ যখন কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন, সেই সময় পরিচয় হয় এই হিন্দু লোকটির সঙ্গে।

হিসেবের জাবেদা নিয়ে লোকটি একদিন এসেছিল হুজুর নওয়াজিস্ খাঁয়ের কাছে।

হিসেবের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে নওয়াজিস খুশি হয়েছিলেন, 'বাহ্, তোমার হিসেব দেখছি নিখুঁত হয়েছে!'

মৃদু হেসে রাজবল্লভ বলেছিল, 'আঁজ্ঞে, এ ব্যাপারটা আমি ভালোই পারি।'

'বটে!' হেসে নওয়াজিস্ বলেছিলেন, 'তা তোমার নামটা কী বাছা?'

'আজ্ঞে রাজবল্লভ। আমি হিন্দু, বৈদ্য। বিক্রমপুর নিবাস।'

'বৈদ্য? সেটা আবার কী?'

'আজ্ঞে, ওটা আমাদের জাতি পরিচয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা চিকিৎসা করতেন। ছিলেন জাতচিকিৎসক।'

'ভালো। আমার এই সেরেস্তায় আসবার আগে, কী কাজ করা হোত? চিকিৎসা?'

'আজ্ঞে না, আমাদের জাতব্যবসা বহুকাল পরিত্যক্ত। এখন কলম-পেষাই হলো জীবিকা। আগে ছিলাম জাহাজি ফৌজে। সেখানে খাতা লিখতাম। এখন পেশকারি করে হুজুরের অধীনে-এখানেও খাতা লিখি।'

'ভালো, খুবই ভালো।'

পেশকার রাজবল্লভ তাঁর কাজের মাধ্যমে মন জিতে নিয়েছিলেন নওয়াজিসের। পরে খুশি হয়ে নওয়াজিস্ খাঁ এই পেশকারকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ছিলেন। ডাকতেন তখন 'রাজা রাজবল্লভ' বলে।

এই রাজবল্লভকে ডেকে নওয়াজিস খাঁ একদিন বললেন, 'আমাদের হুসেন কুলি খাঁকে তোমার কেমন লাগে?'

'আজ্ঞে, উনি হলেন আবার হুজুর। ওঁকে সত্যিকারের একজন হুজুর বলেই আমি বিবেচনা করি।'

হুসেন কুলিকে নওয়াজিস খুব পছন্দ করেন। তার ভেতর যে একটা 'হুজুর হুজুর' ভাব রয়েছে তা অনুভব করেন নওয়াজিস্। বেশ একটা মাতব্বর ভাব হুসেন কুলির। হিসেবের ফিরিস্তি নিয়ে এসে নওয়াজিস খাঁকে প্রতিটি জিনিস না বুঝিয়ে হুসেন কুলি ছাড়তে চায় না। এই হিসেব বোঝানোটা অনেক সময় পীড়াদায়ক লাগে। মনে মনে খুবই বিরক্ত হন নওয়াজিস। বিরক্তি কাটাবার জন্য দু-এক পেয়ালা শরাব পান করতে হয়। তবু বিরক্তি যায় না।

তা শেষে একদিন বলেই ফেললেন, 'আমার বেগমকে তুমি চেনো নাকি?'

'তা চিনি। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'বেগম সাহেবা আমার থেকে মেধাবী, বিচক্ষণ। এবার থেকে ওখানেই হিসেব দাখিল করলে ভালো হয়।'

'এ আবার কী কথা জনাব! আমি কী কোনো অপরাধ করেছি হুজুরের কাছে?'

'না, অপরাধ নয়। আমার বেগম বিস্তর কেতাব পড়েন। সেসব কেতাব রুবাই আর মজার-মজার আরবি মজার গল্পে ভরা। আমি যেমন শরাব পান করে নেশা করি, বেগম তেমনি কেতাব পড়ে নেশা করেন। আমি নেশা করে বেহাল হয়ে যাই। বেগম কিন্তু রাশি রাশি কেতাব পড়ে কখনো বেহাল হয় না বরং তাঁর মেজাজ আরো কড়া হয়। কারো কোনো গাফিলতি তিনি সহ্য করতে পারেন না—তাই হুসেন কুলি, তোমাকে আমি বলি কী, রাজস্বের হিসেব-টিসেব বেগম সাহেবের কাছে পৌঁছে দাও। হিসেব দিতে দিতে কোন গাফিলতি যদি বেরিয়ে পড়ে তা হলে যে সাজা তুমি পাবে, তা জীবনে ভুলতে পারবে না—তুমি খুব সতর্ক থাকবে তখন। ভারি মজা হবে, বাপু।'

'কথা বলতে বলতে হঠাৎ বেগম সাহেবার প্রসঙ্গ আনলেন' —হুসেন কুলি ভেবে আকুল।

হুসেন কুলি মেলা আঁক কষেন। অনেক হিসেব রাখেন। কিন্তু ও হিসেবটা মেলাতে কিছুতেই তিনি পারলেন না—হুজুর কী রাগ করেছেন? সম্ভবত তাই।

রাগ না হলে এমন কথা হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ বলবেন কেন?

'কী হলো, তোমার মুখখানা অমন বিরস হয়ে গেল কেন? বেগমের কথায় খুব ভয় পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে ভয়ের কিছু না, তবে শুনেছি, উনি খুবই মেজাজী। বিবি-বাঁদী, কারোর কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারেন না।'

'তাই নাকি' হাসতে হাসতে এক পেয়ালা শরাব পান করলেন নওয়াজিস্ খাঁ। 'আমাদের বেগম মহলের বিবি-বাঁদীদের সঙ্গে তোমার যোগযোগ আছে নাকি? নইলে তাদের খবর পেলে কী করে?'

'আজ্ঞে, বিবি-বাঁদীদের খবর রাখি না। কিন্তু কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে, যা মহল ছেড়ে রাস্তায় বের হয়ে আসে।'

'বটে!' পেয়ালায় আবার গলা ভেজালেন হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ। 'মহল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে, এসব খবর জানা আছে নাকি, হুসেন কুলি?'

'আছে জনাব।' ভয়ে ভয়ে এবং খাটো গলায় হুসেন কুলি বললেন, 'কয়েকদিন আগে বিবি আর বাঁদী মহল থেকে একটা উলঙ্গ মরদকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে জনাব? মরদের চেহারায় মারের মোটা মোটা দাগ। তার শৌখিন গোঁফজোড়া টেনে টেনে ছিঁড়ে দেওয়া। সে এক বদখত কাণ্ড জনাব। ভারি বে-ইজ্জত ব্যাপার।'

'তা একখানা ভারি খবর শোনালে হে, হুসেন কুলি। বাঁদি আর বিবিরা মরদটাকে বেবাক ল্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ জনাব।'

'মরদটাকে তাহলে ওরা চুটিয়ে ভোগ করেছে বলো।'

'আজ্ঞে লোক সে রকমই বলছে!'

ভ্রূযুগলও ঈষৎ বাঁকিয়ে হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ বললেন, 'তা তোমার কী মনে হয়? লোকটাকে আরো দু-একদিন ধরে রাখলে বিবি আর বাঁদীদের ক'দিন বেশ সুখেই কাটত না!'

'আজ্ঞে, তা হোত। কিন্তু আপনার বেগম তা হতে দেননি। মরদটাকে উলঙ্গ অবস্থাতেই তিনি বের করে দিয়েছেন।'

নওয়াজিস্ খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার বেগম তা হলে খুব কড়া লোক বলো!'

'জী হ্যাঁ।'

'তাহলে বাপু হুসেন কুলি, তুমি সাবধান। তোমাকে আমি রেহাই দেব না—হিসেবের খাতা নিয়ে তোমাকে আমার বেগমের কাছেই যেতে হবে। সেখানে যদি কোনো অঘটন ঘটল, তা হলে কিন্তু বেগমই শাস্তি দেবেন। আমি তোমাকে বাঁচাতে দৌড়ব না।'

এখানেই দুজনের কথা শেষ হল। কথা শেষ হলে হুজুরের কাছ থেকে চলে গেলেন হুসেন কুলি। গম্ভীর মুখে তিনি চলে গেলেন। চিন্তার ভাঁজ দেখা দিল তাঁর কপালে।

হুজুর নওয়াজিস্ খাঁও কিঞ্চিৎ চিন্তিত হলেন। তিনি বসে বসে আরো কয়েক পেয়ালা শরাব পান করলেন। বাঁদী মহল এবং বিবি মহল থেকে বেরিয়ে আসছে ল্যাংটা মরদ! এ আবার কী খবর? বেগম মেহের এখবর জানেন, অথচ বেগম তাঁকে এখবর জানান না! এ সব বিষয়ে হুজুর নওয়াজিস্ কখনো মাথা ঘামান না। আজ কিন্তু মনে হল, বিষয়টা বেগমের কাছ থেকে সরাসরি জানবেন।

প্রতি রাতের মত সে রাতেও চলছিল জব্বর নাচ-গান। পেয়ালার পর পেয়ালা উঠছিল শরাব। খুব খুশি মনেই ছিলেন হুজুর নওয়াজিস খাঁ, কিন্তু মগজে একটুখানি খিচ্‌খিচ্।

নাচ-গানের আসর ছেড়ে হঠাৎ মাঝরাতে চলে এলেন বেগমের শয়ন কক্ষে।

'এ যে দেখছি, অমাবস্যার রাতে সূর্যোদয়। কী আমার সৌভাগ্য।'

'তা সেরকমই বলতে পারো।' বেগমকে সোহাগে ভরিয়ে দিলেন নওয়ারিজস খাঁ। শেষে শোনালেন হুসেন কুলি খাঁয়ের কাছে শোনা বৃত্তান্তটি এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘটনাটা কী সঠিক?'

'হ্যাঁ সঠিক।' হাসতে হাসতে বেগম বললেন, 'তুমি তো সংসারের কোনো খবরই রাখো না। তা তোমাকে এখবরটা শোনাল কে? কী রকম লোক সে?'

নওয়াজিস্ খাঁ বললেন, 'যে শুনিয়েছে, তাকে তোমার কাছে পাঠানো হবে। লোকটির নাম হুসেন কুলি।'

'হঠাৎ সে আবার কাছে আসবে কেন?'

'প্রয়োজন আছে।'

।। তিন।।

নওয়াজিস্ খাঁ হলেন এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ।

তিনি বিধর্মী, শৌখিন। এবং অলস। তা অলস বলে তিনি কিন্তু বুদ্ধিহীন নির্বোধ নন। ইনি সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে থেকে অপরিসীম আনন্দ পান। কিন্তু ওই আনন্দটুকুই সার। স্ত্রী সম্ভোগে তিনি ব্যর্থ, অক্ষম। নওয়াজিস্ খাঁয়ের পৌরুষহীনতা নিয়ে সুন্দরীরা হাসাহাসি করেন। বেগম নিজেও মাঝে মাঝেই তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। বেগমের ভরা যৌবন, এবং এই যৌবনের দিনগুলি ধীরে ধীরে পার হয়ে যাচ্ছে। নওয়াজিসের পৌরুষহীনতার জন্য কোনো সন্তানের মুখ দেখতে পেল না এই দম্পতি।

কিন্তু কোনো সন্তান ছাড়া দাম্পত্য জীবনে সুখ কোথায়?

নবাব আলীবর্দি এবং তার বেগমের পরামর্শে একটা দত্তক সন্তান নেবার ব্যবস্থা হলো। নবাবজাদী আমিনার কনিষ্ঠ সন্তান এক্রামকে ওঁরা দত্তক নিলেন। এই এক্রাম হলো সিরাজের ভাই। তা সিরাজের ভাই হলে কী হয়, মেজাজের দিক থেকে এক্রাম একেবারে বিপরীত। সে শান্ত, নম্র এবং সদাচারী। সিরাজের মত অনাচারী বা স্বেচ্ছাচারী নয়। তাকে সন্তান হিসেবে পেয়ে নওয়াজিস খাঁ খুবই খুশি।

এবং এই খুশিতে খাঁ সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর নাচ-গানের আসর নতুন নতুন নাচওয়ালি নিয়ে এসে চমকিয়ে দিতে থাকলেন। এই ভাবে বেশ কিছু দিন চলল। নগর মুর্শিদাবাদ চলতে থাকল, যেসব চলে। নবাব আলীবর্দি কিন্তু যেমন তেমন করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ নন। তিনি দিনক্ষণ দেখে হঠাৎ বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন তাঁর দুই নাতির। একই সঙ্গে সিরাজ এবং এক্রামের। এবং ঘোষণা করে দিলেন, এই বিবাহ উৎসবে যে সমারোহ করা হোত, তা নগর মুর্শিদাবাদ কখনো দেখেনি—দেখেনি এই নবাবী বংশ।

গোটা নগরটিকে সাজাতে হবে নতুন সাজে। আলোর মালায় সুসজ্জিত করা হবে নবাবী প্রাসাদ। নগরের ঘরে ঘরে নানা রঙের বাতি জ্বালাতে হবে। উৎসবের দিনে যাঁরা সুরাপান করে, আমোদে উৎসবে তাঁদের মতো মণ্ডপের ধারে ধারে বসানো হলো পানশালা। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলকে খুশি করার মতো কয়েক হাজার মিষ্টির দোকান তৈরি হলো। পোশাকেরও প্রয়োজন, তার জন্য ঢাকা শহর থেকে এল তাঁতীরা, তাদের মজলিসের জমজম শাড়ি এবং পোশাক নিয়ে। সুদূর পশ্চিম দেশ থেকে দোকানিরা নিয়ে এলেন নানা রঙের রেশমি কাপড়। তা এই সব কিসিমের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল বিস্তর চোর এবং গাঁটকাটাও।

এবং তাদের সামাল দেবার জন্য হিমসিম খেতে থাকল নগর কোটাল। পাহারা বসল নগরের কোণে কোণে।

এইরকম এক জমকালো উৎসবে নওয়াজিস খাঁ একটি পরিকল্পনা নিয়ে বসলেন। তিনি এই উৎসবে নাচের ব্যবস্থা করলেন।

সেরা নাচওয়ালি কোথায় পাওয়া যায়, তা নিয়ে তিনি খোঁজখবর সংগ্রহ করতে থাকলেন। খোঁজ খোঁজ খোঁজ।

খোঁজাখুঁজি করতে করতে একটি নাম এসে একসময় পৌঁছুল খাঁ সাহেবের কাছে। যে নামটি পাওয়া গেল, সে হলো 'বিশু'।

বিশুর নামটা শুনে নওয়াজিস্ খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশু? শুধু এই ছোট্ট একটি নাম? এই নামের আগে বা পিছনে আর কোনো 'পদবি' নেই? কে তিনি? মহিলা না পুরুষ'?

'এক ক্রীতদাসী মহিলার নাম হলো, বিশু। দিল্লিতে সম্যন আলি খাঁয়ের হারেমে ইনি থাকেন। ইনি পেশাদার নাচনীওয়ালি। এঁর দলে বিস্তর সুন্দরী রয়েছে। বিস্তর'।

'বিস্তর নাচনী মেয়ে রয়েছে?'

যে মানুষটি খবর নিয়ে এসেছিল বিশুর, সে বলল, 'হ্যাঁ জনাব। আপনি যেমন নাচনী চাইবেন, ঠিক তেমনি পাবেন।' যুবতী থেকে কিশোরী, সব আছে।

'বটে! তা আমি কী বেহেস্তের হুরীদের পাবো বিশুর দলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাও পেতে পারেন। বিশুর দলের মণি আর বব্বুকে যদি দেখেন, আর তাদের নাচ যদি এক লহমার জন্য দেখা হয়, তা হলে আপনার মনে হবে আপনি যেন বেহেস্তে রয়েছেন, আর ওই দুজনকে আমাদের বেহেস্তের হুরী বলেই মনে হবে। হুজুরের মাথা ভোঁ ভোঁ করতে থাকবে। দিল্লি-আগ্রা জুড়ে এই সুন্দরীদের নাম ডাক।'

প্রথমেই এ খবরে বিশ্বাস করতে পারেনি খাঁ সাহেব।

পরে নানা সূত্র ধরে আরো খবর নিলেন। এবং খবর নিয়ে জানলেন, বিশু নাচনেওয়ালির খবর ঝুটা নয়।

বিশু নাচনীওয়ালির কাছে প্রস্তাব গেল। টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করতে হবে না। বিশু যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে। তাঁকে নাচের দল নিয়ে সিরাজ এবং এক্রামের বিবাহ উৎসবে আসতে হবে। সঙ্গে আনতে হবে মণি আর বব্বুকে।

বিশু জানালেন, মুর্শিদাবাদ যেতে হলে এবং নাচের আসর বসাতে হলে দশ হাজার টাকা চাই।

নওয়াজিস্ খাঁ তাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

লোকমুখে শোনা গিয়েছিল মণি আর বব্বুর কথা। এখন চোখে দেখে বোঝা গেল, যাঁরা মণি আর বুব্বুর কথা বলেছিলেন, তাঁরা অনেক কম বলেছেন। নওয়াজিসের মনে হল এসব রূপ পৃথিবীতে কোনো মেয়ের কাছে আছে কিনা সন্দেহ। বেগম মেহের সুন্দরী। যৌবনভারে এবং রূপের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যে তিনি অতুলনীয়, কিন্তু মণির কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। নওয়াজিস্ ওই মণি বেগমকে দেখে নতুন করে শাদির কথা ভাবতে শুরু করলেন।

বিবাহের উৎসবে মণিকে দেখে আবেগের কূল তোলপাড়। আত্মহারা। উৎসবের উজ্জ্বলতার থেকে মণির উজ্জ্বলতা নিয়ে মুর্শিদাবাদের ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকল।

কিন্তু ওই রূপকে গিলে খাবার জন্য এগিয়ে এল হাঙর-কুমীরের দল।

এবং সত্যি সত্যিই এক বুড়ো হাঙর এগিয়ে এসে মণি আর বুব্বুকে গিলে খেয়ে ফেলল। প্রথমে খেল মণিকে, পরে বব্বুকে। তা এই হাঙরটি আর কেউ না, মীরজাফর। নবাব আলীবর্দির সিপাহসালার।

নওয়াজিস্ খাঁ এই ঘটনায় একেবারে বেকুব। তাঁর মুখের গ্রাস যে এইভাবে এক বাজপাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই বেচারি নওয়াজিসের কয়েকটি দিন কাটল গভীর হতাশায়।

তাঁর নাচের মজলিসে তেমনভাবে আর আলো জ্বলল না, জমল না নাচ। পেয়ালার পর পেয়ালা শরাব খেলো, কিন্তু নেশায় তিনি মাতোয়ারা হলেন না।

নওয়াজিস্ খানের এই অবস্থা দেখে কেউ কেউ দুঃখ পেলেন। কিন্তু দুঃখ পেলেন না যিনি, তিনি হলেন নবাবজাদী মেহের। বরং তিনি ভারি খুশি হলেন।

তা দমে থাকবার পাত্র নয় নওয়াজিস্ খাঁ। সুন্দরীদের খোঁজে আবার তিনি তেড়েফুঁড়ে লেগে গেলেন। এবং শেষে তামাম হিন্দুস্থান ঢুঁড়ে আমদানী করলেন এক সুন্দরীকে। আহা, কী তার লাবণ্য। কী তার শারীরিক গঠন। কী সুন্দর তার নাম। নওয়াজিসের মনে হল, এমন এক নাচনীই যেন তিনি চেয়েছিলেন—তা কেবল নাচ? এই নাচনীর নাচটিও কত না সুন্দর!

'কী নাম তোমার বেগম সাহেবা?'

'এই অধম বাঁদীর নাম, ভাগবাই।'

'ভাগবাই! এর অর্থ কী? এর অর্থ কী 'ভাগ্যবতী'।

'আমার নামের অর্থটি হজরত ঠিকই ধরেছেন। হজরতের কাছে এসে এই বাঁদী সত্যিই এখন ভাগ্যবতী।'

নওয়াজিস্ খাঁ এবার আর সুযোগ হারাতে চাইলেন না—ভাগ্যবতীর সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে দেওয়াটি জরুরি।

ভাগ্যবতীকে শাদি করে হারেম-জাত করে ফেললেন। নওয়াজিস্ দেখালেন, পৌরুষ কাকে বলে!

খাঁ সাহেবের হারেমে আরো অনেক সুন্দরী ছিল। তারা ছিল বিবি। বেগম নয়। বেগমদের মর্যাদা আলাদা। তাঁদের জন্য অনেক ব্যবস্থা রাখতে হয়। তাঁদের মুখ যেন কথা খসবার আগে বাঁদীদের হাজিরা দরকার হয়। বেগমদের অঙ্গমর্দনের মতো বিশেষ বিশেষ বাঁদীকে রাখতে হয়। হারামের স্নিগ্ধ সুগন্ধী জলে স্নান করায় বাঁদীরা। মোট কথা বেগমদের ঠিক ঠিক রাখার হ্যাপা অনেক।

না, ভাগবাইয়ের সেবার জন্য কোনো ত্রুটি রাখতে দিলেন না নওয়াজিস খাঁ।

ভাগবাঈয়ের হারেমের খবর একটু একটু করে পৌঁছে যায় নবাবজাদী মেহেরের কাছে।

এসব খবর আদৌ ভালো লাগে না নবাবজাদীর। পিত্তি জ্বলে যায়। রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি।

বাঁদীরা এসে বলে, 'তা ভাগ্য ভালো বাপু নাচনী মেয়েটার। খাঁ সাহেব সোহাগ উজাড় করে দিচ্ছেন।'

'তা দেবেন বই কী, মেয়ে ন্যাওটা পুরুষ! তবে যা করবেন, তা এই পর্যন্ত। খাবার শখ ষোলো আনা। কিন্তু খাবার ক্ষমতা নেই।'

'এ কথার কী অর্থ বেগম সাহেবা?'

'সব অর্থ কী ভেঙে বলতে হবে? এত দিন ঘর করছি, ঘুরচি, কই তোদের খাঁ সাহেব কী একটা ছেলে দিতে পারল?'

ভাগবাঈদের ব্যাপারে বেগম মেহের খুবই চটে যায়। এবং স্থির করে এর একটা প্রতিবিধান করতে হবে। নিতে হবে এর শোধ।

।।চার।।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে নবাবজাদীর মহলে তাঁর পেয়ারের হাবশি পরিচারিকাটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, 'বেগম সাহেবা, আপনার সঙ্গে অচেনা 'পুরুষ' দেখা করতে চায়! তাঁকে কোথায় বসতে বলব? নাকি মহলে ডেকে আনব?'

'পুরুষ' কথাটি শুনে হেসে ওঠেন নবাবজাদী। আবার এক পুরুষ?

'পুরুষ? না পুরুষ-নবাব?' জিজ্ঞাসা করনের নবাবজাদী। কণ্ঠস্বরে ঈষৎ কৌতুক।

'ধ্যেৎ! পুরুষটির নাগর-নাগর চেহারা বটে, কিন্তু নাগর কখনোই নয়। দেখে মনে হয়, উনি এক খাঁ সাহেব।'

'তা হঠাৎ ওই খাঁ সাহেব আমার কাছে এসেছে কেন?'

'আজ্ঞে, সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বললেন, 'ছোটে নবাবের হুকুম। তাই আসা।'

'ভালো। আমি যে ঘরে দর্শকদের সঙ্গে দেখা করি, সেখানে নিয়ে গিয়ে বসা। আমি পরে যাচ্ছি।'

তা দর্শকদের ঘরেই দেখা হল খাঁ সাহেবের সঙ্গে। দীর্ঘ দেহটা সবল এক পুরুষের। গায়ের রং খুব একটা উজ্জ্বল নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মনিব বলা যায় না। হাসি হাসি মুখেই খাঁ সাহেব কথা বলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বেগম মেহেরের দিকে তাকিয়ে তার হাসিটি কেমন যেন 'বোকা বোকা' হাসি হয়ে গেল। চোখ দুটি যেন দেখা গেল 'বোকা বোকা' চাহনি। নবাবজাদী মেহের জানেন, তাঁর সামনে পুরুষরা এসে দাঁড়ালে, তাঁদের হাল এরকমই হয়। পুরুষদের এই দশাকে বলে 'ভেকু ভেকু' দশা। খাঁ সাহেবের এখন সেই দশা।

এই দশাটি ভালো উপভোগ করেন নবাবজাদী।

বারকয়েক সেলাম জানিয়ে খাঁ সাহেব বলল, 'আমার নাম, হুসেন কুলি।'

নবাবজাদীর মনে হলো এ নামটা তাঁর পরিচিত। হ্যাঁ, এই লোকটিই নওয়াজিস্ খাঁকে যেন বলেছিলেন, বিবি মহল থেকে এক উলঙ্গ মানুষের বের হয়ে যাবার কথা। নবাবজাদীর কৌতূহল, এই উলঙ্গ মানুষের বৃত্তান্ত এ লোকটি জানল কী করে? আর যদি বা জানে, সে জানা বৃত্তান্তটি ছোটে নবাবের কানে পৌঁছে দিতে গেল কেন? এই হুসেন কুলি নামের লোকটি কী বলতে চেয়েছিল? না কি নাগর সুলভ রসিকতা করে লোকটি মজা লুঠতে চেয়েছিল? যাই হোক, এই খাঁ সাহেবকে এই সুযোগে একটু পরখ করে দেখলে ক্ষতি কী? নবাবজাদীর মগজে দুর্বুদ্ধি চাপল। খাঁ সাহেবকে বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল তাঁর।

'কী নাম যেন বললেন?'

'এই বান্দার নাম হুসেন কুলি খাঁ। ছোটে নবাবের অধীনে আমার কাজ। আমি তাঁর খিদমত খাটি । সেরেস্তার সব হিসেবপত্তর আমাকে করতে হয়। কত রাজস্ব বা খাজনা আদায় হলো, তার খুঁটি-নাটি হিসেব পেশ করতে হয় ছোটে নবাবের কাছে। তা হুজুর এখন তো ঢাকায় যান না, তাই হিসেবের জাবেদা খাতা এখনে এসে বুঝিয়ে দিতে হয়।'

'ভালো কথা। তা আমার সঙ্গে এ জাবেদার কী সম্পর্ক?'

'আজ্ঞে, এসব হিসেবের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিকই। কিন্তু ছোটে নবাবের ইচ্ছে, আপনি এবার থেকে এ জাবেদাখাতা দেখুন। পরখ করুন, ছোটে নবাবের মাথায় নাকি এখন আর হিসেব-টিসেব কিছু ঢুকছে না। তাই হিসেবের জাবেদা আপনার দিকে ঠেলে দিয়েছেন।'

নবাবজাদী মৃদু হেসে বললেন, 'তা ছোটে নবাবের মাথায় এখন কিছু না থাকারই কথা। তাঁর মাথা আর বুক জুড়ে এখন রয়েছেন ভাগবাই। নতুন বেগম, তাই না?'

হুসেন কুলি চতুর ব্যক্তি। তিনি জানেন, তিনি যাই বলুন না কেন, তাতে দুজনের মাঝে যে ফাঁদ, সে ফাঁদে তিনি জড়িয়ে পরতে পারেন। তাই নীরব রয়ে গেলেন। কিন্তু নীরব থেকে কী ভালোমানুষ হওয়া যায়?

না, ভালো মানুষ থাকা যায় না। যায় না রেহাই পাওয়াও।

তবে হোসেন কুলির মুখের দিকে তাকিয়ে নবাবজাদী মেহের বুঝলেন, হোসেন কুলি হিসেবের জাবেদা বগলে যতই দৌড়াদৌড়ি করুক না কেন, আসলে ও একটি ভীরু চরিত্রের মানুষ। নবাবজাদীদের মত সুন্দরীদের গা ঘেঁষে আসতে তার প্রবল আগ্রহ, সে পেতে চায় তাদের সান্নিধ্য এবং অবৈধ প্রেম । কিন্তু ভরসা করে এগিয়ে আসবার কলিজা রাখে না। মেহেরের মনে হলো, এমন

পুরুষ সহজেই মেয়েদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে যেতে পারে।

আরবদেশের মজার মজার গল্প পড়ার অভিজ্ঞতায় নবাবজাদী মেহেরের মনে এই পুতুলটিকে নিয়ে একটি খেলার কথা ভেসে উঠল।

এবং সে খেলা ছোটে নবাবের 'ভাগভাই'কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার একটি জবাব হতে পারে। হতে পারে প্রতিশোধ। তা এই পথেই হাঁটলেন বেগম মেহের। হুসেন কুলির দিকে ঈষৎ বাঁকা চোখে তাকিয়ে নবাবজাদী বলল, 'তা আপনার জাবেদা খাতা ঝুলি থেকে বের করুন। দেখি বস্তুটি কি!'

জাবেদাখাতা ঝুলি থেকে বের করে সামনে মেলে ধরল হুসেন কুলি।

'ও বাব্বা! এ যে গন্ধমাদন!' জাবেদাটা তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন নবাবজাদী। কিন্তু তুলে ধরেই ঠকাস করে নামিয়ে দিলেন। নামিয়ে দিয়ে কবজিতে হাত বুলোতে থাকলেন।

'কী হলো! লাগল নাকি?'

'তা লাগল বই কি! উঃ কী ভারি।' কবজিতে হাত বুলোতে থাকলেন বেগম মেহের।

হুসেন কুলি বেকুব। এই ভারি জাবেদা হুসেন কুলিকে বইতে হয়। তেমন ভারি তার কখনো মনে হয়নি।

'বেগম সাহেবা, জাবেদাখাতা আপনাকে ধরে তুলতে দেওয়া আমার ঠিক হয়নি। আদাব হয়েছে। তা আমি কী আপনার হাতটি একটু টিপে দেব?'

'না। আমার হাত আপনাকে দিয়ে টেপাবো কেন? আমার বাঁদীরা আছে। তারা যা করবার করবে। তা আজ আপনি আসুন। কাল আবার আসবেন, তখন কথা হবে।'

প্রথমদিনে এইভাবেই হুসেনকুলিকে ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে দিলেও, দড়ি ছিঁড়ে দিলেন না।

তাই পরের দিন তাই হুসেনের আবার আবির্ভাব হলো। সেই জাবেদার ঝুলি নিয়ে। হুসেনের চোখেমুখে কেমন যেন এক ভয় ভয় ভাব। বেগম মেহেরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বার বার নিজের অপরাধ স্বীকার। নিজেকেই ধিক্কার।

'বেগম সাহেবা, আপনার হাতে কী আজো ব্যথা রয়েছে? কাল আপনাকে বেফাঁস কথা বলে খুবই আমি লজ্জিত। আপনার হাত টিপে দেবার কথা বলা, আমার ঠিক হয়নি। আমি অপরাধী।'

'না না, আপনি কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধ করেছি আমি। আপনি আমার শুশ্রূষা করতে চেয়েছিলেন, এবং তা আমার নেওয়া উচিত ছিল।' বেগম সাহেবা একটু থেমে বললেন— 'হ্যাঁ ব্যথা আজো আছে, তবে তা অনেকখানি কম। আজও আমি কিন্তু আপনার জাবেদার কাজ করতে পারব না। তবে আপনি যদি আজ আমার হাত টিপে দিতে রাজি হন ; টিপে দিতে পারেন, আমার আপত্তি নেই।'

আপত্তি নেই? বেগমের এই কথায় বিগলিত হুসেন কুলি। প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না হুসেন। তা বেগম যখন নিজেই হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে টেপবার সুযোগ করে দিল, তখন সে হাত হুসেন না ধরে পারল না।

এর আগে আরো অনেকের হাত ধরার সুযোগ পেয়েছে হুসেন। কিন্তু সে সব হাত এমন কোমল নয়। এসব উজ্জ্বল নয়, এমন উষ্ণও নয়। সেসব হাতে হাত দিলে এমন মাদকতার স্বাদ পাওয়া যায় না। এমন করে সারা শরীর জুড়ে কী এক তড়িৎপ্রবাহ কী খেলে যায়? হাত টিপতে টিপতে বেচারি হুসেন কুলি একেবারে বেহাল হয়ে গেল।

হুসেন কুলির এই দশা দেখে ভারি মজা পেতে থাকেন বেগম মেহের।

তা শেষে এক নাটক করে বসল হুসেন কুলি। বেগমের হাতটি সযত্নে মুখের কাছে তুলে নিয়ে একটি চুমু খেল।

'চুমু? হঠাৎ হাতে চুমু কেন?'

'অন্যায় করলাম?'

'অবশ্যই। চুমু খাবার অনেক জায়গা আছে। হাতে কেন?'

কী বলতে চান বেগম সাহেবা। বেচারি হুসেন কুলি পুরোপুরি বেকুব।

কয়েকদিন পরে হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ হুসেন কুলিকে তলব করলেন। তলব করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হলো, তোমার

আজকাল দেখা পাচ্ছি না কেন? কোথায় থাকো?'

'আজ্ঞে, এই নগর মুর্শিদাবাদেই রয়েছি।'

'তা হলে আসো না কেন?'

'আজ্ঞে, হিসেবের জাবেদা খাতা নিয়ে হররোজই হাজিরা দিতে হচ্ছে বেগমের কাছে। আপনার হুকুম মতো কাজ হচ্ছে।'

'বুঝেছি। তা বেগম মেহের কী হিসেবপত্তর বুঝবেন?'

'ঠিক ঠিক এখনো বুঝতে পারছেন না। তবে শীগগির বুঝে যাবেন।'

নওয়াজিস্ খাঁ হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'বেগম সাহেবা তোমার থেকে বুদ্ধিমতী। বোঝাতে গিয়ে ভুলভাল কিছু করলে বিপদে পড়বে। সাধু সাবধান!'

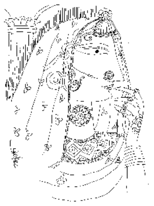

।। পাঁচ।।

দিল্লির বাঈজী। তাই বেগম 'ভাগবাঈ'য়ের চাল-চলন আর সব বেগম বিবিদের থেকে আলাদা।

বেগম 'ভাগবাঈ' যে চোস্ত উর্দুতে কথা বলেন, সেই উর্দু ভাষা অনেকেই ভালো করে বুঝতে পারে না। এমন কী এই ভাষা নওয়াজিস্ খাঁকে বেগ দেয়। নওয়াজিস্ তাঁর প্রিয়তমা 'ভাগবাই'-এর দিকে হাঁ করে অনেক সময় তাকিয়ে থাকেন, পরে তা আন্দাজে বুঝে নেন। বেগম ভাগবাই একদিন বললেন, 'জনাব, আপনাদের এখানকার দরবারি লোকজন একদমই 'তকল্লুফ' জানে না।

'তকল্লুফ? সে আবার কী?'

বেগম ভাগবাঈ হুসেন অবোধ নওয়াজিস্‌কে বুঝিয়ে বলেন, 'এটা আজব কোনো ব্যাপার নয়। হুজুররা যাকে সৌজন্য বলেন, আমরা তাকে বলি 'তকল্লুফ'। যাই হোক, এখানকার লোকেদের বড়ো সৌজন্যের অভাব।'

'হঠাৎ এ কথা কেন?'

'আমি যে এখন 'বেগম' নাচনেওয়ালি নই, তা হুজুরের অনেক কাছের লোক, বিলক্ষণ ভুলে যায়। আমাকে তারা নাচনী বেগম বলে ডাকে। এরা ভারি অসভ্য।'

'ভারি অন্যায়। আমি শাসন করে দেব।'

আর একদিন এই নতুন বেগম এসে অভিযোগ জানাল 'জনাব আমার শোবার ঘরের 'নিহাফ' বিলকুল খারাপ। 'পালংপোশ' বিস্তর নোংরা, আর 'কালীব'খানা বেজায় পুরু। এখনই বদলে দেওয়া দরকার।'

'নাহাফ? সেটা আবার কী!'

বেগম বর্ণনা দিয়ে বোঝানো, তা হল 'লেপ'। বিছানার লেপ। পালং পোষ? প্রথমে বোঝা যায়নি। পরে বোঝা গেল, সেটি হলো পালঙ্কের ওপর বিছাবো চাদর। আর 'কালীব' হল 'গালিচা'।

ভাষার বিভ্রাট। তবে ভাষাটি বোঝার পর হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন, 'এসব ব্যাপারে হারেমের বাঁদিদের বুঝিয়ে বললেই, তারা বেগমকে এই সব জিনিস এনে দেবে। দরকার হবে না হুজুর নওয়াজিস্‌কে বলবার'।

কিন্তু তাতেও বিষয়টির সুরাহা হয় না। জেনানা মহলের 'মহলদার' 'যুগনারী' 'খোয়াস', কারোকেই চিনতে পারেন না 'ভাগবাঈ'। দিল্লিতে যখন তিনি থাকতেন, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পোশাক ছিল, মুর্শিদাবাদের হারেমে সে রকমের ব্যবস্থা নেই। পোশাক দেখেই বোঝা যেত, কে কী কাজ করে।

তাই প্রয়োজনীয়, মানুষটিকে খুঁজতে বেগ পেতে থাকলেন ভাগবাঈ। আর যখন বেগ পেতে থাকেন, তখন মেজাজ যায় এরকম হয়ে। খিটিমিটি বাধে। বাধে গোলমাল।

যেরকম কেতা আর চালচলন নিয়ে ভাগবাঈ এসেছিলেন, তা পদে পদে বাধা পেতে থাকল।

এই মুলুকে যে সব কেতা-কানুন হারেমে চালু রয়েছে, তার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারেন না।

পোশাক-আশাক, প্রসাধন, এবং খাওয়াদাওয়া, কোনোটাই পছন্দ হয় না বেগম ভাগবাঈয়ের। বেচারি অসহায় হয়ে ভাবতে থাকে, এভাবে তিনি কতদিন চালিয়ে যাবেন? অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়। দিল্লির নাচনী সুন্দরীরা এখানে এসে দিব্যি জাঁকিয়ে বসে রয়েছেন। মণি আর বব্বু হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক একবারে ভাবেন। বাংলা মুলুক ছেড়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই হুজুর নওয়াজিস্ খাঁয়ের মুখখানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আহা, অমন মানুষকে ছেড়ে কোথায় যাবেন ভাগবাঈ? কী নিবিড় তাঁর ভালোবাসা কত না সোহাগ ভরা সম্ভাষণ।

রাশি রাশি রত্নালংকারে তিনি খুলে দিয়েছেন হুজুর নওয়াজিস্ খাঁ-কে। সোনার শেকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন। এই ভালোবাসা ও সোহাগ নিয়ে ভাগবাঈ শেষ পর্যন্ত থেকে যান মুর্শিদাবাদে। হারেমের বাঁদী-বিবিদের সঙ্গে নিত্য কলহ। তা হোক, ভাগবাঈ এখানেই থাকবেন।

ইতিমধ্যে হুজুর নওয়াজিস্ খান এক খোজাকে খুঁজে পেয়েছেন। তরুণ খোঁজা। খোঁজাটি পশ্চিমদেশের মহব্বত জানে। জানে উর্দুশায়ের, ভাষা এবং সম্ভাষণে পটু।

সেই খোজাটিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ভাগবাঈয়ের সঙ্গে।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'একে তুমি কাজে লাগাতে পারো। তোমাকে সাহায্য করবে।'

'কিন্তু ওকে কী হারেমে নিয়ে যেতে পারব?'

'পারবে। খোজাদের অবাধ গতি। বেগম মহলে নিয়ে গিয়ে

যে কোনো কাজে লাগাতে পারবে।'

তা খোজাটিকে মহলে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোর নাম কী, কী নামে ডাকব?'

'আজ্ঞে, যে নামে খুশি। তবে আমি আশযান নামে পরিচিত।'

'আশযান? বাঃ, সুন্দর নাম তো! তা এ নামেই তোকে ডাকব।'

'আজ্ঞে, তাই হবে।'

এই খোজা আশযানকে দু-চারদিন ব্যবহার করার পর সুন্দরী ভাগবাঈ দেখলেন খোজাটির এলেম আছে। বেগমদের কী ভাবে খুশিতে রাখতে হয়, তা সে জানে। সে ভালো খিদমত করে। পদসেবা থেকে অঙ্গমার্জনা, সব বিষয়েই পটু। যেন একাজ সে বহুকাল ধরে করে আসছে। কোনোরকম দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

'আশযান, তুমি এর আগে কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে, দিল্লিতে।'

'দিল্লিতে? তা তোমার সেবা দেখে খেতে বুঝতে পারছি, তুমি দিল্লির বান্দা। তা তুমি কী দিল্লির শাহী প্রাসাদে ছিলে নাকি?'

'আজ্ঞে না। আমি ছিলাম বাদশা জাফর খাঁর বেগমের কাছে। তেনার হারেমে।'

জাফর খাঁয়ের নাম শুনে ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত করলেন ভাগভাই। 'জাফর খাঁ, জাঁফর খাঁ নামে কোনো বাদশার নাম আমি শুনিনি। তুমি ঠিক বলছ তো?'

'আজ্ঞে, তাহলে আমার ভুল হচ্ছে। আমরা খোজা বান্দা। মনিবদের নাম ঠিক ঠিক বলতে পারি না। তা জাফর খাঁ বাদশা না হলেন, তিনি নিশ্চয় এক সুলতান ছিলেন। তাঁর সুলতানি প্রাসাদের বেগম মহলেই থাকতাম। বেগমের আমি খুবই প্রিয় ছিলাম।'

'তা তুমি এই হতচ্ছাড়া মুর্শিদাবাদে এলে কী করে?'

'আজ্ঞে গোলেমালে চলে এসেছি। বেগম মহলের এক বিবি আমাকে ফুসলে নিয়ে এসেছে।'

'বটে! তুমি একজন খোজা। খোজা হয়েও তুমি বিবির টানে পড়ে গেলে? তা সে বিবিকে দেখছি না ত? কোথায় সে?'

'তা বলতে পারব না। আমাকে ছেঁড়া পয়মালের মত ফেলে দিয়ে বেটি পালিয়েছে। ভালো নাগর পেলে এই খোজার কাছে কে থাকে বলুন। বিবিরা হলো আশমানি পায়রা। উড়তে উড়তে ভালো খোপ পেলে সেখানে সেঁদিয়ে যায়। পিছন ফিরে তখন তারা আর তাকায় না।'

'হয়ত তাই। বড়ো কোনো আশ্রয় পেলে সকলেই তাই করে। তা তুমি তো বাপু অনেক কলাকৌশল জানো, তোমার হাতে জাদু আছে। তোমার সেবার ভেতর আফিম আছে। এ সব শিখলে কোথায়?'

খোজা আশযান সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'আজ্ঞে, এ সবই দিল্লির জাফর খাঁয়ের বেগমের কাছে শেখা।'

'তা তুমি যে বেগমের সেবা এই ভাবে করতে, তা সুলতান কী তার কোনো খবর রাখতেন না?'

'খবর? বেগমের খবর নেবার ফুরসৎ কোথায় সুলতানের? তাঁর হারেমে বিবি-বেগম মিলে প্রায় পাঁচশ। তিনি প্রতিরাতে নতুন নতুন বেগমকে তাঁর বিছানায় পেতেন। টাট্‌কা নেশা। তাজা গন্ধ। এসব পেলে পুরনোর দিকে কে তাকায় বলুন?'

ভাগবাঈ এসব খবর নানাজনের মুখে শুনেছেন। এখবর আগেভাগে শোনা। তাই যখন তার অভিজ্ঞতার কথা আশযান

বলে গেল, তাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না ভাগবাঈ। তবে যে ব্যাপারে বিস্ময় তা হলো একজন খোজার বেগমকে নিয়ে খেলা।

তা এ খেলাটি বাহ্যত নিন্দনীয় হলেও, এই নিন্দনীয় খেলাটি পুরুষসংগম বঞ্চিত বেগমদের কাছে উপভোগ্য। ভাগভাই ধীরে ধীরে ওই উপভোগের খেলাতে সায় না দিয়ে পারেন না।

বেগম ও বিবি মহলের কোনো খবরই চাপা থাকে না। প্রথমে একটু একটু করে এবং পরে তা বিস্তারিত ভাবে মহলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। তা কেবল বিস্তারিত নয়, তা পৌঁছে যায় নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে।

খবর পৌঁছল বেগম মেহেরের কানেও।

'হা আল্লা, ভাগ্যবতী সুন্দরীর কপালে শেষে একটা খোজা?'

'হ্যাঁ। তা খোজা হোক, ভারি এলেমদার।'

'খোজার আবার এলেম কী রে? খোজারা কী কখনো পুরুষের সমান হয়?'

'তা জানিনা। তবে শোনা যাচ্ছে, এই খোজা পুরুষকে হার মানায়।'

সেদিন রাতে পথ ভুলে এসেছিলেন নওয়াজিস্ খাঁ। বেগমের কক্ষে। বেগম নওয়াজিস্ খাঁ সাহেবকে আপ্যায়ন করে বললেন, 'ভারি তাজ্জব কী বাত জনাব! হুজুরের জায়গায় শেষ পর্যন্ত এক খোজা।'

নওয়াজিস্ খাঁ প্রথমে ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন না। বেগম তাঁকে ইশারা ইঙ্গিতে ভাগবাইয়ের ঘরে খোজার কথা শোনালো।

নওয়াজিস্ কিন্তু মন্তব্য করলেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন।

নবাবজাদী হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, 'একেই বলে তকল্লুফ। জনাব, এ হলো দিল্লিওয়ালীর তকল্লুফ। শিখুন জনাব।'

।। ছয়।।

নওয়াজিস্ খাঁয়ের দীর্ঘদিনের এক আক্ষেপ ছিল।

এই আক্ষেপ হলো একটি মনের মতো রম্য প্রাসাদ। ঢাকার প্রাসাদে তিনি দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। অনেকেই সে প্রাসাদের প্রশংসা করে থাকেন। প্রশংসা করে থাকেন তার বাগিচার। সবুজ গালিচার মত ঘাসের প্রাঙ্গণটিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটিও তারিফ করে থাকেন বড়ো বড়ো খাঁ সাহেবরা। নওয়াজিস্ খাঁ ঢাকার এই প্রাসাদকে তারিফ করেন না যে, তা নয়। কিন্তু এই প্রাসাদটি তাঁর যথেষ্ট নয়।

মুর্শিদাবাদের কেল্লার সৌধটি সুন্দর। এই সুন্দর সৌধে দিনের পর দিন কাটাতে কাটাতে, এই প্রাসাদটির সৌন্দর্য আর চোখে ধরে না নওয়াজিসের। এই সৌধের শিল্প ভাবনাকে নিন্দা করার উপায় নেই, কিন্তু খাঁ সাহেবের মনে ধরে কই? তাই তিনি অনেকদিন ধরেই একটি অভিনব প্রাসাদ তৈরি করতে লেগে গিয়েছেন।

সেই প্রাসাদে তাঁর স্বপ্নের প্রাসাদ।

দীর্ঘদিন কাজের পর সে প্রাসাদ শেষপর্যন্ত সমাপ্ত হল। এক অশ্বক্ষুরাকৃতি ঝিলকে ঘিরে তৈরি হলো এই প্রাসাদ। ঝিলের জলে টলমল করে জল। যেন সুন্দরীদের টলমল যৌবন। সেই টলমল করে প্রবাহিত জলে প্রতিবিম্বিত হয় হর্ম্য শ্রেণি। ঝিলের জলে পদ্মফুল ফোটে। জলচর পাখিরা ঝিলে এসে কলরব করে। আশমান দিয়ে মেঘ ভেসে যায়। তার ছায়া পড়ে জলে। পাখি-পক্ষীরা কিচকিচ করতে করতে উড়ে যায় ওই প্রাসাদের ওপর দিয়ে।

ঝিলটির নাম 'মোতিঝিল'। এই ঝিলের নামেই নওয়াজিস্ খানের স্বপ্নের প্রাসাদ।

ওই স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি হলো, এবং তৈরি হবার পরে আড়ম্বর করে প্রবেশ করা হলো।

প্রাসাদে নওয়াজিস্ খাঁ তাঁর বেগমদের নিয়ে এলেন। নবাবজাদী মেহের ওই প্রাসাদের বিরাট অংশ অধিকার করে জাঁকিয়ে বসে গেলেন। তাঁর বাঁদী মহলে বাঁদীরা এল, বিবি মহলে এল বিবিরা। এলো সেই পেয়ারের বাঁদীটিও। বা ইথিওপিয়ান বাঁদীর দল।

নওয়াজিস্ কেবল বেগমদের আনলেন না। আনলেন তার কোকিলকণ্ঠী মেয়েদের। আনলেন নাচওয়ালিদের।

সৌধটিতে এসে 'ভাগবাঈ'কৈ হীরে বসানো হার দিলেন। দু'হাতে তিনি ইনাম বিলি করলেন।

তা এখানে যখন সবাই এলেন, তখন জাবেদাখাতা এবং সেই যুবক খোজাটিই বা আসবে না কেন? জাবেদাখাতা নিয়ে নবাবজাদীর কাছে নিয়মিত আসতে থাকলেন হুসেন কুলি খাঁ। নায়েব খানার হিসাব অফুরন্ত। এবং সে খাতা নবাবজাদীর কোমল হাতটিকে ধরে শুরু করে সারা শরীর পরিক্রমা করতে থাকল। নবাবজাদী চেয়েছিলেন হুসেন কুলিকে তিনি নিজের মতো করে ব্যবহার করবেন। তার ওপর প্রভুত্ব করবেন। কিন্তু নবাবজাদীর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো না—হুসেন কুলিই এখন নবাবজাদীর প্রভু হয়ে গেলেন। হুসেন কুলির ইচ্ছামতো প্রতিসন্ধ্যায় নবাবজাদীকে বসতে হয় জাবেদা খাতা নিয়ে এবং অনেক রাত পর্যন্ত চলে মিলেমিশে। মোতিঝিলের জলে চাঁদের আলো ছল ছল করে। আশ্চর্য এক মোহিনী মায়া ছড়িয়ে পরে মোতিঝিলের প্রাসাদে। হিসেব নিকেশ আর শেষ হয় না।

বেগম ভাগবাঈকে বেগম হিসেবে নওয়াজিস্ খাঁ গ্রহণ করলেন, প্রায় প্রতিরাতেই বেচারিকে যেতে হয়, খাঁ সাহেবের নাচের মজলিসে। তাঁকে নাচতে হয়। সেখানে নাচের পর অধিক রাতে তাঁর নিজের মহলে যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর সারা শরীর ক্লান্তিতে ভরা। এই ক্লান্ত শরীরটি তিনি তুলে দেন খোজা

আশযানের হাতে।

খোজা আশযান পরম যত্নে বেগম ভাগবাইয়ের ক্লান্তি দূর করে। বেগম ভাগবাই ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে পড়েন।

এই ভাবেই দিন চলে। একই ছন্দে। একই ধারায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বেগমদের এই গোপন প্রেম শেষমেশ চাপা থাকে না। তার খবর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। নবাবের নাতি সিরাজের কানে পৌঁছে যায় এসব বৃত্তান্ত।

তা নবাবের এই নাতি বরাবরই একরোখা। যত রকমের বেলেল্লাপনা সে নিজে করে বেড়ালেও অপরের বেলেল্লাপনা সে বরদাস্ত করতে পারে না। অপরের বেলায় সে ফুঁসে ওঠে। হুঙ্কার ছাড়ে।

সেই হুঙ্কার একদিন এসে পৌঁছয় মোতিঝিলের প্রাসাদে।

নবাবজাদী শঙ্কিত হন, কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পান না। নওয়াজিস্‌কে বলে মোতিঝিলের পাহারাদারি জোরদার করেন। তা এই সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল।

পাটনা থেকে একদল সেপাই এসে হাজির নবাব আলীবর্দির দরবারে।

সেপাইদের মলিন পোশাক। চোখেমুখে আতঙ্ক।

তাদের দেখে নবাব আলীবর্দি জিজ্ঞাস করেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ? পাটনা থেকে না?'

'হ্যাঁ জনাব।' সেপাইরা কথা বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

'তোমরা হাঁফাচ্ছ কেন? কোনো দুঃসংবাদ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ জনাব, বড়ো দুঃসংবাদ।'

কী ধরনের সংবাদ, তা কাঁদতে কাঁদতে এবং কখনো কখনো রুদ্ধ কণ্ঠে তারা খুলে বলতে থাকে। এবং সংবাদটি যে খুবই খারাপ, তা খানিক বলবার পরে বোঝা গেল। পাটনা শহর এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসক হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন আলীবর্দি খাঁয়ের ছোটো জামাই জৈবুদ্দিন আহমদ খাঁ—ইনি হলেন সিরাজ ও এক্রামদের বাবা এবং নবাব আলীবর্দির ছোটো মেয়ে আমিনার স্বামী। বিদ্রোহী আফগানদের হাতে হঠাৎ তিনি নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। লাঞ্ছিতা হয়েছেন নবাবজাদী আমিনা—পাটনা জুড়ে চলেছে বিদ্রোহী আফগানদের দাপাদাপি। ঘরবাড়ি পোড়ানো হচ্ছে, ঘরে ঘরে কান্নার রোল। আগুন জ্বলছে শহরে! নৈরাজ্য আর নৈরাজ্য। হাহাকার আর হাহাকার।

সেপাইদের মুখ থেকে এই ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত শুনে নবাবী প্রাসাদের ঘরে ঘরে, উঠল কান্নার রোল।

মোতিঝিলে সে রাতে আলো জ্বলল না। জৈবুদ্দিন আহমদ ছিলেন সকলের প্রিয়। ভারি অমায়িক মানুষ। তার যে অমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে, তা কে ভেবেছে! আর কে ভেবেছে নবাবজাদী আমিনার এমন দুর্দশা হবে!

ওই সংবাদে নগর মুর্শিদাবাদ তার জৌলুষ হারিয়ে এক বিষাদ নগরে পরিণত হয়ে গেল।

নবাব আলীবর্দি এই গভীর শোকের মধ্যেই তাঁর আশু কর্তব্য কী, তা কিন্তু ভুললেন না।

তিনি তখন বয়সের ভারে কিছুটা দুর্বল, কিন্তু শত্রু নিধনে যেন তরুণ যুবাপুরুষ।

নবাব আলীবর্দি নগর মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাটনা'র উদ্দেশ্যে। এরপর যা যা ঘটল, তা এক ইতিহাস। আফগান বিদ্রোহীদের হটিয়ে পাটনা দখল করে তিনি নগরে ফিরে এলেন কিছুদিন পরে।

সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নবাবজাদী আমিনাকে।

যে আমিনা দিন আনন্দে উজ্জ্বল, সদা হাস্যময়ী, সে আমিনা যেন আর নেই। গভীর শোক তাকে গ্রাস করল। তার চোখে মুখে বিষাদের ছায়া। আতঙ্কে সে কাঁপছে।

মোতিঝিল থেকে অমিনাকে দেখতে দৌড়ে এলেন নবাবজাদী মেহের।

আমিনার হাল দেখে মেহেরও কাঁদতে থাকে।

শেষে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেহের তাকে নিজের মোতিঝিল প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন।

নওয়াজিস্‌ খাঁ খুশি হলেন বেগম মেহেরের এই ব্যবহারে। ঠিক হল, হাসি খুশি পরিবেশে আমিনাকে রেখে তাকে সুস্থ করে তোলা হবে।

নবাবজাদী মেহের তাঁর কনিষ্ঠা সহোদরাকে সর্বদা চোখে-চোখে রাখতে থাকলেন। নানারকম গল্প গাছা করে তার বিষাদ কাটিয়ে, তাকে উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করতে থাকলেন।

হুসেন কুলি যেমন আগে আগে জাবেদা খাতা নিয়ে আসতেন, আজো তেমনই আসেন।

নবাবজাদী মেহেরার কাছে মেলে ধরেন জাবেদা খাতা। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব হয়। যেমনটি আগে হোত। অনেক হাসি মস্করাও হয়। কোনো ব্যত্যয় নেই। তা হঠাৎ একদিন হুসেন বলে বসলেন, 'নবাবজাদী বেগম সাহেবা, আমি কী আপনার ছোটো বোনকে একবার দেখতে পারি?

'তা পারেন। কিন্তু হঠাৎ এ প্রস্তাব কেন?'

'প্রস্তাব? না না, তেমন কিছু না। যদি মজার মজার গল্প করে নবাবজাদীর মনে আনন্দ দিতে পারি তাই।'

হুসেন কুলির প্রস্তাব শুনে রাজি হয়ে গেল হয়ে গেল নবাবজাদী মেহের। আহা, বোনটি যদি একটু সুস্থ হয়।'

জাবেদা খাতা নিয়ে ফেরার সময় কিছুক্ষণের মত আমিনার সঙ্গে সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হলো।

হুসেন কুলি ফেরবার সময় এরপর আমিনার কাছে আসতে থাকেন। খুবই সামান্য সময় থাকেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। গল্প করেন নানা রঙ্গরসের। চেষ্টা করেন আমিনার মনকে সহজে করে তুলতে।

এইভাবে হুসেন কুলির সান্নিধ্যে এসে আমিনা ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে থাকে। এবং হুসেন কুলির সঙ্গে

থাকার জন্য আমিনা আগ্রহ দেখাতে থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা যেভাবে হতে থাকল, তাতে কেমন যেন সন্দেহ দেখা দিল নবাবজাদী মেহেরের মনে।

হুসেন কুলি নামের মানুষটিকে চেনেন নবাবজাদী মেহের। হুসেন কুলির জাদুর সঙ্গে তিনি পরিচিত।

তা সেই জাদুই কি প্রয়োগ করলেন হুসেন কুলি?

হুসেন কুলি যখন আমিনার কক্ষে প্রবেশ করেন, তখন একটি নীল আলো জ্বলে।

সেই নীল আলোটিতে নেশা ধরানো এক জাদুকরী আছে। তা এর মধ্যে রয়েছে হুসেন কুলির হাতের জাদু। সুতরাং অসুস্থ আমিনাকে এই প্রক্রিয়া সহজেই চাঙ্গা করার পক্ষে যথেষ্ট।

নবাবজাদী মেহের নজর রাখতে থাকলেন আমিনা এবং হুসেন কুলির ওপর। দেখা গেল, তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়।

নবাবজাদী মেহের এরপর হাত কচলাতে থাকেন। হুসেন কুলি যে এক আস্ত শয়তান, সে যে এক নারী লোভী পুরুষ তা স্পষ্ট হয়ে যায় নবাবজাদীর কাছে। সে প্রেমিক নয়, সে পুরুষ।

সুতরাং লোকটিকে এখনই জাবেদা খাতা সমেত দোজখে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

তা বসন্তকালে যেমন ফুল ফুটলে বাতাসে বাতাসে তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চারদিক, তেমনি নবাবী প্রাসাদের কেচ্ছা দাসী-বাঁদীদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় মহলে মহলে—এক প্রাসাদ থেকে আরেক প্রাসাদে। প্রথমে গুজগুজ ফিসফিস, তার পর প্রচারিত হয় সোচ্চারে।

নবাবজাদী মেহের ও আমিনাকে জড়িয়ে হুসেন কুলির লাম্পট্যের খবর আলীবর্দি বেগমের কাছেও পৌঁছে গেল। প্রথমে বিশ্বাস করেননি বেগম। পরে যখন বিশ্বাস্য হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুল। তখন তিনি একটাই মন্তব্য করলেন, ‘আমার দুটি মেয়েই হতভাগিনী। এদের প্রতি করুণা হয়।’

নবাবের কাছে যখন নবাবজাদীদের কেচ্ছা পৌঁছুল, তখন তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, ‘আমার এই দুটি কন্যার জন্য দুঃখ হয়। আমার মেয়েরা সুন্দরী, রূপবতী এবং গুণবতী, কিন্তু নিজেদের কুলগৌরব সম্পর্কে সচেতন নয়।’

তা বেগমের কেচ্ছাটি এক সময় নওয়াজিস্ খাঁর কানে পৌঁছল। খাঁ সাহেবে নির্বিকার। তিনি কয়েক পেয়ালা শরাব পান করবার পর বললেন, ‘মেয়েদের চরিত্র চট করে বোঝা যায় না। জাবেদা খাতা বগলে নিয়ে হুসেন কুলি এই অপকর্ম করেছে, তাই এ দোষ যদি কারো হয়ে থাকে, তা হলো ওই জাবেদা খাতার।’

এই খবরটি কয়েকদিন আগে থাকতেই শুনেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, শুনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু এই কষ্টটা কারোকে বলেননি। বুকের ভেতর চেপে রেখে দিয়েছিলেন। অনুভব করছিলেন এক দুঃসহ যন্ত্রণা। এবং যন্ত্রণা ভোলবার জন্য ছুটছিলেন ফৈজুবাঈয়ের কাছে। দু’লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লি থেকে এই ফৈজুকে আনিয়ে ছিলেন, তার মুখের দিকে তাকিয়ে নবাবের নাতি আনন্দে উদ্‌বেল হন। আবার এই মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক দুঃখযন্ত্রণা শোনেন। আজ ফৈজুর কাছে সিরাজ

দৌড়ালেন যন্ত্রণা ভুলতে। মায়ের চরিত্রহীনতার বেচারি সিরাজউদ্দৌলার হৃদয়, দীর্ণ বিদীর্ণ।

কিন্তু ফৈজুর কুঠিতে গিয়ে সিরাজ আরো মর্মাহত হলেন।

গিয়ে শুনলেন, ফৈজু আর একজনের সঙ্গে গোপন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

'গোপন প্রেম? আরেক জনের সঙ্গে? এত ঐশ্বর্য, এত বৈভব এবং এত ভালোবাসা দিয়েও তাকে একনিষ্ঠ করা গেল না?

তা হাতে হাতে গোপন প্রেমের প্রমাণ পাওয়া গেল। কুঠিতে তখন ফৈজুর গোপন প্রেমিক হাজির।

ফৈজুবাঈরের দিকে তাকিয়ে সিরাজ বলে উঠলেন, 'ফৈজু, এই তোমার ভালোবাসা? আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকেই একমাত্র ভালোবাসো। এখন দেখছি, তুমি একজন গণিকা ছাড়া আর কিছু নও।'

'গণিকা' সম্বোধনে ফৈজু অভ্যস্ত নয়। এই শব্দটি শুনে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

'হুজুর জাঁহাপনা, আমি যে সতী মেয়ে নই, তা আপনি জানেন। আমার পেশা গণিকাবৃত্তি। কিন্তু আপনার মা কী করছেন? তিনি গোপনে গোপনে যা করছেন, তা কী এক ধরনের গণিকাবৃত্তি নয়? হুজুর এই 'গণিকা' সম্বোধনটি কী তাঁকে আপনি করতে পারবেন। পারলে বুঝতাম, আপনার বুকের পাটা আছে।'

ফৈজুবাঈয়ের মুখে এ হেন সম্বোধন অপ্রত্যাশিত। কয়েকমাস ধরে তার মুখ থেকে মেলা গান এবং প্রিয় সম্বোধন শুনে এসেছেন। সেই মধুরভাষী ফৈজু তাঁকে এই কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে? সিরাজ স্তম্ভিত।

'কী জবাব দিন, আমি কী ঝুটা কথা বলছি?'

'ঝুটা?' সিরাজ হা-হা করে হেসে উঠলেন। 'তুমি যা বলছ, তা হলো অসম্মানজনক, তুমি আমাকে ইচ্ছা করে অপমান করছ। তা এই অপমানের শাস্তি তোমাকে হাতে হাতে পেতে হবে।'

এরপর সিরাজ যা করলেন, সুন্দরী ফৈজুবাঈ জীবনে তা আশা করতে পারেনি। নবাবের নাতি সিরাজ যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কিছুক্ষণ পরেই সে টের পেল। সিরাজ তাকে ছোট কুঠুরিতে ভরে দিয়ে, কুঠরির চারদিক গেঁথে দিল। বেচারি ফৈজুবাঈ জীবন্ত অবস্থাতেই কবরে চলে গেল।

ফৈজুবাঈ এর এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চারদিকে প্রচারিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক।

সিরাজের মাথা এখন গরম। সে জানিয়ে দিল, পাপের পথে যারা হাঁটছে, তারা কেউ-ই রেহাই পাবে না, তা সে যত বড়ো কেতাব লোক হোক না কেন।'

সিরাজ কারো নাম করলেন না বটে, কিন্তু চারদিকে যে নামটি ছড়িয়ে পড়ল, তা হলো হুসেন কুলি খাঁ।

দিন কয়েক পরে নবাব আলীবর্দির কাছে দৌহিত্র সিরাজ গিয়ে অনুমতি চাইল, 'পাতক হুসেন কুলিকে এখনই আমি খতম করতে চাই, অনুমতি দেওয়া হোক।'

নবাব আলীবর্দি খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'হুসেন কুলি হলো একজন খাঁ সাহেব। আমাদের আশ্রিত। তাকে খতম করা কী ঠিক হবে?'

'সে একজন পাজী। আমাদের কুলে কালি ছেটাচ্ছে। তাকে এই দুনিয়ায় টিঁকে থাকতে দেওয়া যায় না।'

নবাব আলীবর্দি কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'খতম করতে হলে আমাদের জামাই নওয়াজিস্ খাঁ, তোমার দাদি, আর নবাবজাদী মেহেরের সম্মতি দরকার।'

মতামত নেওয়ার ব্যাপারটা যে খুবই জটিল হয়ে গেল, তা সিরাজের বুঝতে অসুবিধা হলো না।

তা অসুবিধাজনক হলেও, সিরাজ সকলের মতামত নিতে দৌড়ুলেন।

নওয়াজিস্ খাঁ নির্বোধ না। তেমন ভাবে সংসারের খবর রাখেন না বটে, কিন্তু তিনি মানুষ চিনতে ভুল করেন না। অনেক দিন ধরেই খাঁ সাহেব হোসেন কুলির ওপর বিরক্ত। জাবেদা খাতা নিয়ে তার ব্যাপারটা তাঁর কাছে অসভ্যতা তাই সিরাজের কথা শুনে খাঁ সাহেব বললেন, 'দুনিয়া পাপমুক্ত হওয়াই ভালো।'

নবাবজাদী মেহের সিরাজের প্রস্তাব শুনে প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দু'দিন আগে হলে তীব্র ভর্ৎসনা করে ফিরিয়ে দিতেন সিরাজকে, কিন্তু বোন আমিনার ওপর হুসেন কুলির অনাচার কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না মেহের। তিনি এর একটা বিহিত চাইছিলেন। লোভী, পুরুষ হুসেনের তিনি শাস্তি চাইলেন। সিরাজকে তিনি অনুমতি দিলেন।

এরপর রইলেন আলীবর্দি বেগম, তা থেকে তাঁরও অনুমতি মিলল।

হুসেনকে খতম করার গোপন একটি চক্রান্ত যে চলছে, সে সংবাদ হুসেন কুলির কাছে গিয়েও পৌঁছুল। -এই সাংঘাতিক খবর পেয়ে চুপচাপ হাতগুটিয়ে বসে থাকা কঠিন। নিজের মৃত্যুকে মেনে নেওয়া আরও কঠিন। -নিজেকে বাঁচাবার মত আর একটা লড়াই শুরু হয়ে গেল হুসেনের।

একবার ঠিক করেন, তিনি গা ঢাকা দেবেন।

কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে কোথায় যাবেন? ঢাকা? পাটনা? কিংবা রাজমহল? এই সব জায়গা হল নবাবের খাস তালুক। গা-ঢাকা দিতে গিয়ে বিপত্তি হবে। হবে হিতে বিপরীত।

বাংলা মুলুক থেকে পালাবেন? না, হুসেন তা পারলেন না। মুর্শিদাবাদে নিজের মোকামেই তিনি রয়ে গেলেন। বাড়িয়ে দিলেন বাড়ির পাহারা। সশস্ত্র কয়েকজন সেপাই রাখলেন গুপ্ত ঘাতকদের এড়াতে।

কিন্তু কিছুতেই রেহাই পাওয়া গেল না।

দিন দুপুরে সিরাজ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে একদিন হুসেন কুলির বাড়ি চড়াও হলেন। তারপর যা হবার, তাই হলো।

ফৈজুবাঈকে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন সিরাজ। এবার সিরাজ দিনদুপুরে সকলের সামনে হুসেন কুলিকে খতম করলেন।

সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখল। কারো মুখ থেকে কোনো টুঁ শব্দ শোনা গেল না।

সিরাজ প্রকাশ্য রাজপথে হুঙ্কার করলেন, 'সব রকম পাপের বিধান এই ভাবেই হবে।'

সিরাজের এই হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়ল নগরের সর্বত্র। ছড়িয়ে পড়ল বাড়ি বাড়িতে। এবং গলি গলিতেও এই ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শোনা গেল।

শোনা যেতে থাকল, হুসেন কুলির মর্মান্তিক আর্তনাদ।

তা এই খবর যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছল মোতিঝিলে এবং বাতাসে বাতাসে এই খবরও গিয়ে পৌঁছল, এবার সিরাজের লক্ষ্য হলো তার মাসি। মাসি মেহেরউন্নিসা। তাঁর মোতিঝিলে রয়েছে রাশি রাশি সম্পদ। রাশি রাশি হীরা-মণি-মাণিক্য। টাকার হিসেবে তো কোটি টাকা। নবাবাজাদী মেহেরের এই সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তাঁকে খুন করা হবে না। কিন্তু খুনের থেকে বেশি যা করা হবে, তা হল সম্মানহানি।

সম্মানহানি? তার মানে বে-ইজ্জৎ করা?

সে আবার কেমন? নবাবজাদী মেহের বরাবরই সাহসী। ডাকাবুকো বলে তার খ্যাতি আছে। কিন্তু ইজ্জৎ হানির কথায় তার বুক থেকে থেকে কেঁপে ওঠে।

তবে নবাবজাদী মেহেরের ভরসার জায়গা রয়েছে। বলে দেন স্বয়ং নওয়াজিস্ খাঁ। গান-বাজনায় মেতে থাকলেও, তিনি হলেন পাহাড়ের মত এক আড়াল। তাঁকে ডিঙিয়ে সিরাজ মোতিঝিলে আসতে পারবে কী? রয়েছেন স্বয়ং আলীবর্দি খাঁ, তাঁর হুকুমে এখনও বাংলা মুলুক কম্পিত। সুতরাং তাঁদের সামনে নবাবজাদী মেহেরের অবমাননা হবে, এমন চিন্তা বাতুলতা।

এই সব আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন নবাবজাদী মেহের। চেষ্টা করলেন মনে বল আনতে।

মোতিঝিলের প্রাসাদে আনন্দের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলেন তিনি।

ঝিলের ধারে পাথর বাঁধানো শিলাসনে বসে তিনি আবার কেতাব পাঠ আয়ত্ত করলেন। বসতে থাকলেন গোলাপ বাগিচায়। মোটকথা, বেগম মেহের স্বস্তিতে থাকতে চান। ফিরে আসতে চান সিরাজের ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে।

কিন্তু বিধি বাম।

হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হলেন নওয়াজিস্ খাঁ। তাঁর সারা শরীর ফুলে উঠল। এবং কয়েক মাসের মধ্যে হয়ে গেল তাঁর এন্তেতাল। নবাব আলীবর্দি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রিয় জামাই নওয়াজিস্‌কে রোগমুক্ত করতে পারলেন না।

তা এখানেই শেষ নয়। বিধাতার কী আশ্চর্য পরিহাস।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নবাব আলীবর্দি নিজেও এই একই রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁরও এন্তেকাল হয়ে গেল।

বাংলা মুলুককে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে তিনি বেহেস্তে চলে গেলেন। দুঃসময় নামল তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর।

নবাবজাদী মেহের এরপর অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন। কী ভাবে তিনি সিরাজের হাত থেকে বাঁচবেন?

বেগম মেহেরের অধীনে অনেক অনুচর। এই সব অনুচরদের বেগম নিয়োগ করলেন খবর সংগ্রহের জন্য।

খবর আসতে থাকল, এবং কোনো খবরটিই সুবিধার নয়। সিরাজউদ্দৌলা তখ্‌তে আসীন হলেন বটে, তাঁকে ঘিরে চলল নানা ঝঞ্ঝাট। নানা ষড়যন্ত্র তাঁকে ঘিরে ফেলল। সিরাজের নাজেহাল
অবস্থা।

কিন্তু এই অবস্থায় ভেতরের বেগম মেহেরকে কিন্তু রেহাই দিলেন না সিরাজ। বেগম মেহেরকে হেনস্থা করার নতুন প্রক্রিয়া চলল।

মোতিঝিল প্রাসাদে হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে একটি লোক এসে হাজির। বেশ কয়েকটি পোশাক। মাঝারি ধরনের উচ্চতা। মজবুত শরীর। মোতিঝিলের পাহারাদার জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আপনি? কাকে চানে?'

'আজ্ঞে, আমি বেগমের সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

'আপনার পরিচয় কী?'

'আমার নাম রাজবল্লভ। তা হুজুরদের কৃপায় আমি রাজ রাজবল্লভ বটে। ঢাকায় যে বিস্তর হিসেব আমিই রাখি।'

'এখানে কী জন্য এসেছেন?'

'বেগম সাহেবকে একটি কথা বলতে। বেগমকে নিজে দেখা করে কথা বলব।'

ঢাকার কথা শুনে বেগম মেহের তার সঙ্গে দেখা করলেন। এই লোকটিকে বেগম কখনো যে দেখা করেছেন, তা কিন্তু মনে হল না। বেগম বললেন, 'আপনি কী কথা বলতে চান?'

'আজ্ঞে, কথা খুবই সামান্য। ঢাকা থেকে হিসেবের জাবেদা খাতা খানা নিয়ে এসেছি। আপনাকে দেখাবার জন্য।' কথা শেষ করেই ঢাকার রাজবল্লভ ভারি খাতাখানি তুলে দিল বেগমের হাতে।'

জাবেদার খাতা দেখামাত্রই মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বেগম খাতাখানা নিয়ে অলিন্দ দিয়ে নীচে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এই জাবদাখাতা হল আমাদের দুঃখের কারণ। এটি আর যেন এখানে না আসে।'

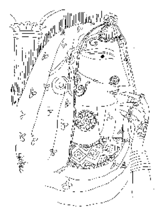

।। সাত।।

দীর্ঘ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর লোকালয়ের যে হাল হয় ইদানীং নগর মুর্শিদাবাদের সেই অবস্থা।

বড়ো বড়ো বটগাছ উৎপাটিত। বড়ো বড়ো ইমারৎ ভেঙে পড়েছে। চালাঘর উবে গেছে। লুঠেরারা দখল নিয়েছে শহরের। গৃহস্থরা শঙ্কিত। তারা লুঠেরাদের ভয়ে নিজের নিজের বাড়িতে খিল লাগিয়ে বসে আছেন। দোকান-পাট বন্ধ। বাজারে খাদ্যশস্য অমিল।

নগর মুর্শিদাবাদের কেমন যেন এক হতচ্ছাড়া চেহারা। এমন কাণ্ড কখনো হয়নি।

এর কারণ হলো ঘোরতর এক বিপর্যয়। ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধে নতুন নবাব সিরাজের পরাজয় হয়েছে। এবং এই পরাজয়ের পর টোপিওয়ালা ইংরেজ সাহেবদের দুরন্ত আগমন, নতুন নবাব হিসেবে মীরজাফরের অভিষেক। নতুন নবাব মীরজাফর নবাবী তখতে বসে আনন্দে মসগুল। চৌষট্টি বছর বয়স হলে কী হয়, তিনি যেন এক ছেলে মানুষ। তেলে ভাজা গোরুর মাংস তাঁর খুব প্রিয়, এখন তিনি ইতরের মত তাই খাচ্ছেন মনের আনন্দে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভাঙ খাওয়া। নেশা আর নেশা।

টোপিওয়ালা সাহেবরা নিঃশব্দে করে চলেছেন তাঁদের কাজ—এ কাজটি হল রাজকোষ লুঠ।

সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ লুঠ করে নৌকা বোঝাই যান চলেছে কলকাতার পানে। রাশি রাশি পাল তোলা নৌকা।

মীরজাফরের ছেলে মীরণ বাপের হয়ে বকলমে বাংলা মুলুকের এখন নবাব। অনেকদিন পরে তার পোশাকি নামটি জনগণের কাছে বেরিয়ে পড়েছে, মীরকাসেম আলি খাঁ—এই খাঁ সাহেবের প্রতাপে মুর্শিদাবাদ তটস্থ।

এই মীর সাহেব আলি খাঁ যেদিকে টাকাপয়সা রয়েছে, সেদিকে হাত বাড়াচ্ছে। লোকে তাকে একজন বড়ো লুঠেরা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। তাকে দেখলে নগরের লোকেরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

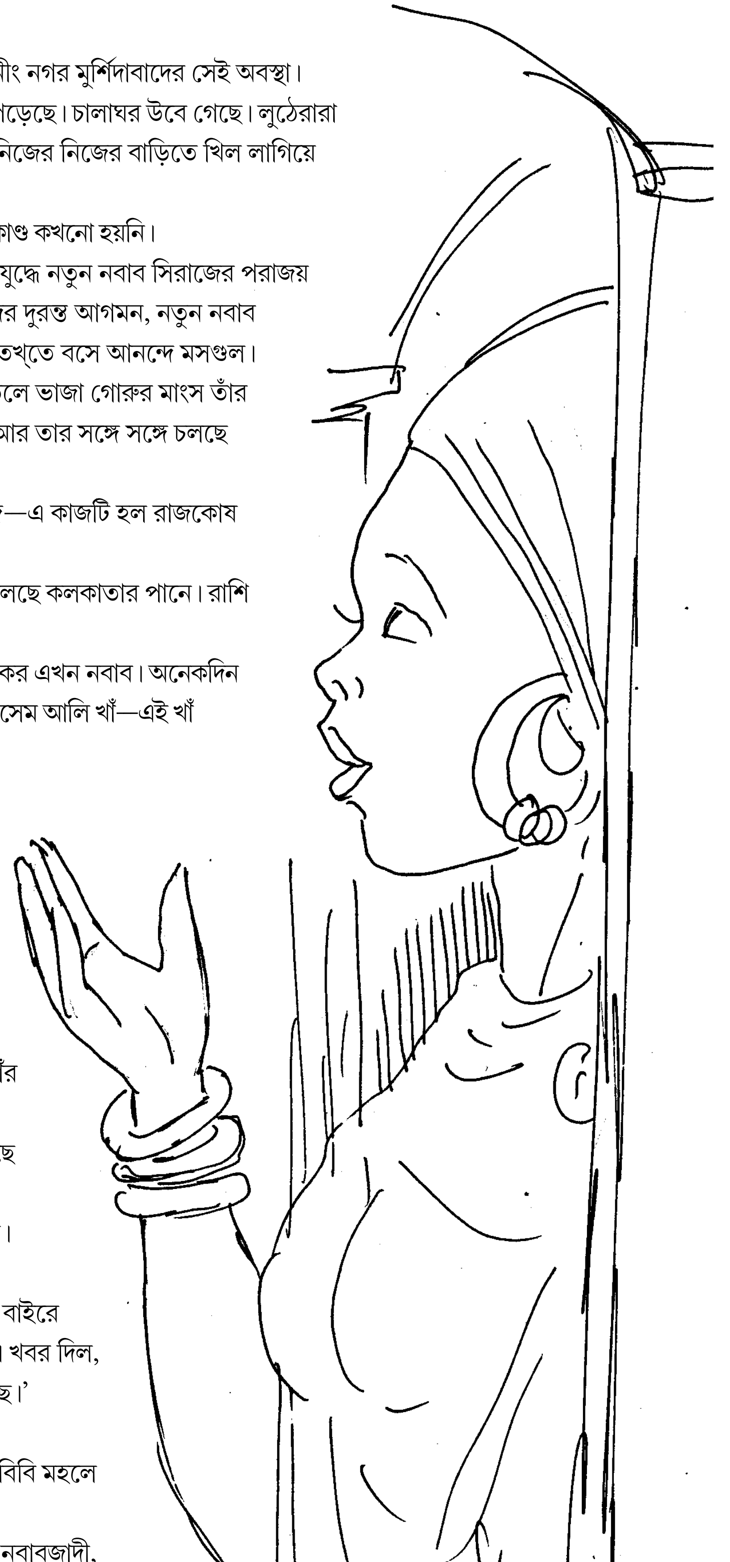

এইরকম যখন নগরের হাল, তখন মোতিঝিলে বসে আতঙ্কে কাঁপছেন নবাবাজাদী মেহের তাঁর ছোটো বোন আমিনাকে নিয়ে। রক্ষী এবং পাহারাদার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা কী শেষ রক্ষা করতে পারবে? ভাগবাই পালিয়েছে তাঁর সেই প্রেমিককে নিয়ে। খোজা প্রেমিক।

মোতিঝিলের ঢোকা বন্ধ। প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তালা। বসিয়ে দেওয়া হয়েছে পাহারাদার।

অন্দরের ভেতর কোনোরকমে দিন কাটাচ্ছেন নবাবাজাদীরা। আতঙ্কে আশঙ্কায়।

বিবি-বাঁদীরাও ভীষণভাবে শঙ্কিত। তবে মাঝে মাঝে তারা বাইরে বের হয়ে গিয়ে খবর নিয়ে হাসছেন। খবর মানে ভয়। দুঃসংবাদ। খবর দিল, বেগম সাহেবা, সেই আদমিটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'সেই আদমি মানে? কোন আদমি?'

'আজ্ঞে, সেই পুরুষ-নাগরটা, যে একদিন নিজামত কেল্লার বিবি মহলে ধরা পড়েছিল।'

'ধ্যেৎ!' হাবশি পরিচারিকার কথাটি হেসেই উড়িয়ে দিলেন নবাবজাদী, 'তাই কী কখনো হয় তা কি?'

'হয়েছে। নইলে বলব কেন? লোকটি নিজেই সেরকম বলে পরিচয় দিল।

'কোথায় তোর সেই পুরুষ নাগর? চল্ দেখি গে।'

নিজের মহলের বাইরে বেরিয়ে এলেন বেগম। দেখলেন

আগন্তুক লোকটিকে। দেখে ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কী চাও? হঠাৎ আমার মোতিঝিলে কেন?'

লোকটি বলল, 'আমার নাম নজর আলি। ছোটে নবাব সাদেক আলি খাঁ এই মোতিঝিল আমাকে পাঠিয়েছেন।' এরপর লোকটি মৃদু হেসে বলল, 'আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন বেগম সাহেবা?'

'তোমাকে আমি চিনতে যাবো কোন দুঃখে? তোমাকে চেনার কোনো ব্যাপার আছে নাকি?'

'হয়ত আছে বেগম। এই নজর আলির দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে দেখুন তো?'

তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল না, তবু কৌতূহলী হয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন নবাবজাদী মেহের।

'আমিই কী সেই আদমি, যাকে বেগম সাহেবা একদিন নিজামত কেল্লার বিবিমহল থেকে বের করে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন, দেখুন তো ভালো করে। এ আদমি সেই কী না?'

সেদিন সেই লোকটি কোনো কথা বলেনি, বা বলতে পারেনি। টুঁশব্দ করেনি। তাই গলার স্বর পরখ করবার সুযোগ পাওয়া গেল না। সেদিন সেই লোকটির শুধু গোঁফ ছিল, দাড়ি ছিল না। এই মানুষটির দাড়ি-গোঁফ, দুটোই রয়েছে। তবু কেমন যেন চেনা চেনা মনে হল। নাকটা খাড়া। হ্যাঁ, সে লোকটির এরকমই ছিল। চোখ দুটি ছিল ড্যাব-ডেবে, এবং তাই। মিল এইটুকু।

লোকটি ভারি গলায় বলে উঠল, 'অত খুঁটিয়ে দেখবার দরকার নেই নবাবজাদী বেগম সাহেবা? আমি আপনাদের গলায় আমার সম্পর্কে যে শব্দটি শুনেছিলাম, তাই মনে করিয়ে দি, 'পুরুষ-নাগর'। এ শব্দটি কি মনে পড়ছে?'

'এসব কথা বিরক্তিকর। শুনতে ভালো লাগছে না। তা তুমি যেই হও না কেন, হঠাৎ আমার কাছে কেন, তা খুলে বলা হোক।'

'ছোটে নবাব—সাদেক আলি খাঁয়ের হুকুম, মোতিঝিল খালি করে আপনাদের 'ঢাকা' যেতে হবে।'

'হঠাৎ 'ঢাকা' কেন? সেখানে কী আছে?'

'কী আছে, তার বিবরণ সাদেক আলি খাঁ দিতে পারেন, তবে তিনি জানিয়েছেন যে সেখানে আপনারা আরাম আর শান্তিতে থাকবেন। নগর মুর্শিদাবাদে এখন যেমন গোলমাল, বিস্তর খুন-খারাপি চলছে, এই নগরে নবাব আলীবর্দির কোনো বংশধরকে রাখা নিরাপদ নয়। সেদিক থেকে 'ঢাকা' অনেক নিরাপদ, শান্তির জায়গা।'

'তা সাদিক আলির হুকুমে কবে 'ঢাকা' যেতে হবে?'

'আজ্ঞে, কাল প্রত্যুষে হলে ভালো হয়। নৌকা নিয়ে আমিই আসব।'

'তা মোতিঝিল থেকে আমায় বের করে দিয়ে যেতে তোমার এত উৎসাহ কেন?'

এই কথার জবাব দিতে গিয়ে নজর আলি নায়েব লোকটি ঠোঁট কুচকে একটি বিশ্রী হাসি হাসল। বলল, 'নিজামত কেল্লা থেকে বেগম একদিন আমাকে নাঙ্গা করে বের করে দিয়েছিলেন।

এটা হলো সেই বের করে দেবার এক প্রতিশোধ। তবে বেগম মেহেরকে আমার মত নাঙ্গা করা যাবে না। তাঁর সংগ্রহ করা হীরা-জহরত আর সোনাদানা সব অবশ্য ফেলে দেওয়া হবে। তা এটাও কী এক ধরনের নাঙ্গা করা নয়।' নজর আলি নায়েব লোকটি আবার বিশ্রী ভাবে হাসল। কুৎসিৎ হাসি।

নবাবজাদীর এই বৃত্তান্ত এরপর কী ভাবে শেষ হলো, তা হলো এক ইতিহাস।

যে নবাবজাদী প্রেমের খেলায় মেতে ছিলেন, যার কোনো অপরাধ ছিল না, সেই নবাবজাদীকে শিকার হতে হলো রাজনীতির। এবং রাজনীতিতে যে টেনে আনল, তাদের কী ভয়ঙ্কর বিধাতার দেওয়া শাস্তি ভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে হলো, তা ইতিহাসের পাতায় ভালেভাবেই লেখা রয়েছে। সুতরাং সেই ইতিহাসটা দিয়ে নবাবজাদীর বৃত্তান্তের উপসংহার টানা যেতে পারে। এবং ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে।

ইতিহাসের সূত্রে যা জানা যায়, তা হলো এই রকম ঃ

নবাব আলীবর্দির দুই মেয়েকে সাদেক আলি মীরণ বন্দী করে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন—মীরণের অনুচরেরা এসে বন্ধুবান্ধবহীন অসহায় এই দুই নারীকে নৌকায় চড়িয়ে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের উজু করতে নির্দেশ দিতেন। বুঝলেন, তাঁদের অনন্তযাত্রার খবর এসে গেছে। কেন এমন হলো? তা তারা জানে না। 'বড়ী' বেগম মেহের ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমিনা তাঁকে সান্ত্বনার দিয়ে বললেন, 'কাঁদ কেন? মরতেও একদিন হবেই। তা সে যদি আজই হয়, তাতে দুঃখ কি?' এরপর পশ্চিম দিক মুখ করে প্রার্থনা করে তাঁরা শুনলেন, 'প্রভু তুমি জানো, আমরা এই জীবনে কারোর কোনো ক্ষতি করিনি। তুমি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তোমার আদেশে তোমার বজ্র যেন মীরণের মাথায় পড়ে। এই আমাদের প্রার্থনা।' দুই বোন এর পরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

কী আশ্চর্য, এই ঘটনার সাতদিনের মধ্যে ঈশ্বরের অস্ত্র বেগমদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে তার শিকারকে খুঁজে পেল—কী আশ্চর্য কাণ্ড।

বজ্র যখন এই শিকারের ওপর পড়ল, তখন শিকার মীরণ শক্ত পোক্ত একটি তাঁবুতে রাত্রিতে আরাম করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি সুন্দরী বিবির সেবা নিচ্ছিলেন। হঠাৎ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের আলো রাতের ঘোর অন্ধকারকে দিনের আলোর মত উজ্জ্বল করে তুলল। তার পরেই বজ্রপাত। কড়াৎ কড়াৎ।

বজ্রপাতের পর মীরণের তাঁবুতে এসে পৌঁছল অনুচরেরা। দেখা গেল, গুলি লাগলে যেমন ফুটো হয়, মীরণের মাথায় পাঁচ-ছয় জায়গায় তেমনি কয়েকটি ফুটো— বুকে পিঠে লম্বা-লম্বা বেশ কয়েকটি লালচে ডোরা দাগ। কে যেন একটি লোহার তারের চাবুক দিয়ে খুব জোরে জোরে পিঠের ওপর কষিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপারটি অলৌকিক। নবাবজাদী মেহেরের করুণ প্রার্থনা কী আল্লাহ শুনে এইভাবে মীরণকে শাস্তি দিলেন। নিশ্চিতভাবে তাই। নবাবজাদী মেহেরের যৌবনলীলাকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখে নরপিশাচকেই কশাঘাত করে এবং বজ্র দিয়ে বধ করলেন।

হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি জি-র রবীন্দ্রনাথ

হরিপদ ভৌমিক

ডি জি-কে বর্তমান প্রজন্মের মানুষ চেনেন না, জানেন না, অথচ এই মানুষটিকে বাংলার বিশেষ করে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলের চেনা উচিত ছিল। কবিগুরুর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর ওপর লেখা গ্রন্থ, প্রবন্ধের সংখ্যা কত তার হিসেব হয়নি, কবির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু ডি জি প্রসঙ্গে অদ্ভুত নীরবতা রয়েছে। ১৯৭৮ সালের ১৮ নভেম্বর নীরবেই ৮৫ বছর বয়সে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন ডি জি। তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, লেখক গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, আমার গোরাদা। ওই গ্রন্থটি আমায় উপহার দেন। ডি জি-কে নিয়ে গোরাদার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছি, নিজেরাই দুঃখ পেয়েছি, সেই দুঃখ ভাগ করে দিতে পারিনি অন্যদের। তাই গ্রন্থের শুরুতে 'স্বীকারোক্তি'তে গোরাদা আবেগ জড়িত ভাষায় তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

'আমি এক ভগ্ন দেবালয় দেখেছিলাম। একালের শৈল্পিক চেতনার রঙে রাঙানো, সমকাল সভ্যতার আলোকরঞ্জিত ঐশ্বর্যের অহঙ্কার খচিত, সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিত্যক্ত সেই দেবালয়ের অভ্যন্তরে হৃদয়হীনতার সহস্র নিদর্শনে চাপা পড়ে যাওয়া, বিবেকহীনতার অজস্র ছোপ ধরা এক শালগ্রাম শিলা দেখেছিলাম।

দু'চোখ ভরে দেখার বদলে হৃদয়ের চোখ দিয়ে যত দেখছিলাম সেই পরিত্যক্ত শিলাখণ্ড, ততই শুনতে পাচ্ছিলাম, দেবালয়ের বাইরে থেকে ভেসে আসা নবজাগরণের গান। দেখছিলাম, শিলাখণ্ডের মলিন মুখে হাসির রেখা। সমকাল সভ্যতার বিদ্রুপের বেত্রাঘাত হজম করে অতীত যেমন করে হাসে, ঠিক তেমনি হাসি। উচ্চবিত্তের কোনও বিবেকহীন পুত্রের নব্য চেতনার চপেটাঘাত ক্ষতবিক্ষত কোনও প্রবীণ পিতার বর্ণনাতীত দীর্ণ-জীর্ণ মুখমণ্ডলে যেমন ক্ষমাসুন্দর হাসির হাসির রেখা দিতে পারে, তেমনি রেখাই আমি দেখেছিলাম শালগ্রাম শিলার বিবর্ণ মুখাবয়বে।

চেতনার গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে যাঁরা সমাজ সংস্করণে শিল্প-সংস্কৃতির নবরূপায়ণে মেতে উঠেছেন, তাঁরা সেই দেবালয় বা শালগ্রাম শিলার সংস্কার সাধনের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে

কত সহজে মুক্ত তা উপলব্ধি করেছি মর্মে মর্মে।

অবশেষে সেই গুরুভার মাথায় নিয়েছি আমি। স্বার্থপর সভ্যতার পাপের ভার কিছুটা লাঘব করার একটা ইচ্ছের জন্ম দিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে। পরিত্যক্ত সেই শালগ্রাম শিলাটিকে সযত্নে তুলে আনার দায়িত্ব পালন করেছি সেই ইচ্ছেরই তাগিদে।

এই শিলাখণ্ডের একদা প্রাণ ছিল। এর মধ্যে এক পরম পুরুষের বাস ছিল। সেই পরম পুরুষ যিনি সর্বকালের প্রবক্তা চিরসুন্দর নটরাজেরই প্রতিনিধি। যিনি অন্ধকার সরিয়ে আলোর সরণি তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁদের জন্য, যাঁরা সমকালের গান গাইবেন। তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন এমন একটি বেদি যার উপরে দাঁড়িয়ে আজকের প্রজন্ম তাঁদের সৃষ্টির অহঙ্কারে উদ্বেল। অথচ সেই শালগ্রাম শিলার মূল্যায়ন আজও হয়নি। মূল্যায়নের তাগিদ নেই কারও।

আমিও তেমন কোনও স্পর্ধা দেখাইনি। শুধুমাত্র পরিত্যক্ত শিলাখণ্ডের যে অপর নাম 'ধীরেন্দ্রনাথ' সেই সত্যের পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র। ধীরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি)। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যিনি 'জনক' হয়েই বেঁচে থাকবেন, যেমন শালগ্রাম শিলা এক ধর্মের প্রতীক।'

ডি জি অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বরিশাল থেকে কলকাতায় 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে' এসে আশ্রয় চান। দীক্ষা নিয়ে 'সমাজ'-এর নির্দেশে বরিশাল থেকে স্ত্রী বিরজামোহিনী দেবীকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং সমাজের উল্টোদিকে ১৩ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে সংসার পাতেন। বামনচন্দ্রের পাঁচ পুত্র— দেবেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথ ছাড়া সকলে জন্মেছিলেন বরিশালে, আর ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এই বাড়িতে জন্মেছেন ১৮৯৩ সালের ২৬ মার্চ।

ধীরেন্দ্রনাথের বড়দা দেবেন্দ্রনাথ খুব অল্প বয়সে জলে ডুবে মারা যায়, সেকারণে উপেন্দ্রনাথই বাড়ির বড় ছেলে বলে চিহ্নিত হয়। ডি জি-র মেজদা নগেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮৯ সালের ২ নভেম্বর তারিখে। এঁর সঙ্গেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর বিবাহ হয়। সেই বিবাহ সুখের হয়নি। গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন— 'বরিশালের বর্ধিষ্ণু পরিবারের (সঙ্গে) ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম শরিক বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিকন্যা মীরা দেবীর বিবাহ সূত্রে, যে মহামিলন ঐতিহাসিক দলিল হতে পারত, যে মধুময় ইতিহাসের পৃষ্ঠা অমলিন থাকতে পারত, মীরা দেবীর বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্যই হোক বা স্বামী নগেন্দ্রনাথের জীবন দর্শনের ধারাই হোক সেই ঐতিহাসিক দলিলের পৃষ্ঠাগুলো অক্ষত থাকতে পারেনি। কবির বহু স্বপ্নের মতোই মীরার স্বামীর ঘরের ইতিবৃত্তের নির্মম সমাপ্তি ঘটেছে। ধীরেন্দ্রনাথের পরিবার এবং ঠাকুর বাড়ির মধ্যে এমন এক প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, যা চূর্ণ করে দিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে মহামিলনের চিরস্থায়ী গ্রন্থি রচনা সম্ভব হয়নি ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষে। নগেন্দ্রনাথ ও মীরা দেবীর সম্পর্কের মধ্যে যে সর্বনাশা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, কবির অন্তরে যে সীমাহীন অশান্তির ঝড় উঠেছিল, বোধকরি সেই ঝড়ই ধীরেন্দ্রনাথের পরিবারের ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় কলঙ্কিত অধ্যায়।

কবিগুরু কন্যা মীরার বিয়ের পর তাঁর স্বামী নগেন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মীরা-নগেন্দ্রর বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। নগেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে মীরা দেবীর বিপর্যস্ত মানসিকতার ও কবিগুরুর প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠিতে—

কল্যাণীয়েষু,

মাঝে নগেন খুব রাগ করে একখানা চিঠি লিখেছিল, সে চিঠি আমি মীরাকে দেখতে পাঠিয়েছিলুম। আজ মীরা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তাকে কি উপদেশ দিই, নগেনের কাছে তাকে কি যেতেই হবে? অর্থাৎ আমি বললেই সে প্রস্তুত হবে। কিন্তু এত বড় নিষ্ঠুর দণ্ড আমি কী মীরাকে দিতে পারি? ওর জীবনের প্রথম দণ্ড ত আমিই ওকে দিয়েছি— ভাল করে না ভেবে না বুঝে আমিই ওর বিয়ে দিয়েছি। যখন দিচ্ছিলুম, তখন মনে খুব একটা উদ্বেগ এনেছি; বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকেছিল, তখন একটা গোখরো সাপ ফস্ করে ফণা ধরে উঠেছিল— আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনই ওকে কাটত তাহলে পরিত্রাণ পেত।

নগেনের মধ্যে একটা দুর্দম বর্বরতা আছে, সেইটাতে মীরা ওকে কেবল ভয় করেছে, ভালবাসতে পারেনি। ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও যদি ওরা কোনও রকমে মিলেমিশে থাকতে পারত তাহলে ভালই হ'ত। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, মীরাও ছলনা করতে পারে না, নগেনও ক্রোধ সংযম করতে জানে না। মাদ্রাজে যে কয়দিন ওরা আমার কাছে ছিল, সে কয়দিনের দুর্যোগ আমি কখনও ভুলতে পারব না। সেই রকম সম্ভব বলার মধ্যে আমি কি ওকে জোর করে বা অনুরোধ করে পাঠাতে পারি? সেই অপমান নিষ্ঠুরতা রাগরাগির মধ্যে ছেলেপুলে নিয়ে সমস্ত জীবন মীরা কাটাবে কি করে? চাকরবাকর বন্ধুবান্ধব অত্মীয়-পরিজন কারও কাছে কোনও আব্রু থাকবে না— তাতে মীরার চেয়ে ওর ছেলেমেয়ের পক্ষে যে বিপদের কারণ হবে। অথচ এও সত্য যে, নগেন ছেলেদের নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে জবরদস্তি করলে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু ঘটনা যখন উপস্থিত হবে তখন সে কথা ভাববে— কিন্তু মীরা যেন কিছুতেই না মনে করে যে আমরা ইচ্ছে করছি ও চলে যাক— তেমনতর বেড়া আগুনের মধ্যে ওকে দগ্ধে মারতে পারব না। ওর সমস্ত জীবন ত ছারখার হয়ে গেছেই— এখন আমার দ্বারা যতটা সম্ভব ওকে রক্ষা করতে এবং সুখী করতে ত হবেই। সেই জন্য এ সম্বন্ধে যতটা দুঃখ সে আমাকে গায়ে পেতেই নিতে হবে— কেননা দুঃখের গোড়াতে আমিই আছি, যাই হোক, তোদের কাছ থেকে মমতা ও সহায়তা থেকে মীরা যেন কিছুমাত্র বঞ্চিত না হয়— অহোরাত্র সে ভয়, ভাবনা ও যন্ত্রণার মধ্যে ও আছে তার মাত্রা ওর যেন না বাড়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নগেন্দ্রনাথ বিয়ের পরই তাঁর ছোট ভাই ধীরেন্দ্রনাথকে শিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের শিক্ষার

শুরু বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের বাবার নামে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত সেখানে। বাল্যস্মৃতির কথায় ডি জি লিখেছেন— 'অল্প বয়স থেকেই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলাম। ... আশ্রমের নিয়মে নিরামিষ আহার, নিজের ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, স্নান করে নিজের বস্ত্র নিজের ধোয়া, নগ্নপদে থাকা আমাদের নিয়ম ছিল। আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী, বাঁধা সময় অনুসারে কাজ করতে হতো। কষ্ট হতো প্রচণ্ড শীতের সময়। ভোর সাড়ে চারটায় বিছানা ছাড়তে হতো। লাইনে দাঁড়াবার ঘন্টা পড়তো। কিন্তু সহজে বিছানা ছাড়া হতো না। লাইনে যেতে দেরি হলে মাস্টারমশাইরা এসে উপস্থিত হতেন। চোখ বন্ধ করেই বলতাম— ভগবানের নাম করছি। মাস্টারমশাই বুঝতেন। বলতেন, তোমার আর ভগবানের নাম করতে হবে না। লাইনে দাঁড়াও গিয়ে। লাইনে দাঁড়িয়ে নম্বর গোনা হলে আমরা 'মাঠাতে' যেতাম। এই মাঠাতে যাওয়ার অর্থ হলো, ফাঁকা মাঠে গাড়ু হাতে বাথরুমে যাওয়া। সেখানেও গাড়ুর ওপরে মাথা ঠেকিয়ে অনেকদিন ঘুমিয়েছি। শীতকালে খালি পায়ে লাল কাঁকরের পথে হাঁটা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ত। এক সময় তাই আমাদের কম্বলের আসন দুটি পায়ে বেঁধে নিয়ে চলতুম। রাস্তার কুষ্ঠ রোগীরা যেমন পা বেঁধে রাখত, আমাদের পাও তেমনি দৃশ্য মনে করিয়ে দিত।

স্নান পর্ব সেরে প্রার্থনায় গোল হয়ে দাঁড়াতাম। গুরুদেব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, আমরা সকলেই সেই সঙ্গে উচ্চারণ করতাম। তারপর টিফিনের সময়ে আমরা লাইন দিয়ে বসে পড়তাম। যেদিন 'বোঁদে পাতে পড়ত সেদিন আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না।'

এর পরই গাছ তলায় ক্লাস আরম্ভ হতো। আমার সহপাঠীদের মধ্যে গুরুদেবের ছোট পুত্র শমীও ছিল। আরও অনেকে। গুরুদেব ইতিহাসের ক্লাস নিতেন। এই ইতিহাস আমাদের মুখস্থ করতে হতো না। অভিনয় করে গুরুদেব শেখাতেন, আমরাও অভিনয় করে বলতাম।

বিকেলে খেলাধূলাতে মেতে থাকতাম। আমাদের চাইতে যারা ছোট তারা তো মাস্টার মশাইদের কাঁধে চড়ে বেড়াত। মাস্টার ছাত্রের এরকম সম্বন্ধ আর কোথাও ছিল বা আছে কিনা আমার জানা নেই।'

শান্তিনিকেতন থেকে সব বিষয়ে প্রাথমিক তালিম নিয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন। আমাদের আমলে শান্তিনিকেতনে কোনও পরীক্ষা দেবার বা নেবার ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হয়েছিল হুগলীতে গিয়ে।

মেজদার বিবাহসূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ডি জি নানান ভাবে দুষ্টুমীতে সকলকে বিব্রত করতেন। একটি ঘটনার কথায় তিনি লিখেছেন — 'আমি গুরুদেবের বড় কন্যাকে দিদি বলে ডাকতুম। একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেছি। গিয়ে দেখি নিচের ঘরে বসে আছেন শরৎদা (শিবকুমার চক্রবর্তী)। শরৎদা হলেন বেলাদিদির (মাধুরীলতার) স্বামী। গুরুদেবের বড় জামাই। এই সময় গুরুদেব থাকতেন তিনতলায়। ওখানেই তিনি ছবি আঁকতেন। কিছু কিছু লিখতেন। যা হোক, বেলা দিদি উপরেই ছিলেন। আমি সোজা উপরে চলে গেলুম। গুরুদেবের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, গুরুদেব লিখছেন। একাগ্র চিত্ত। তাঁর পাশে আছেন বেলাদিদি। হঠাৎ আমার মাথায় একটা দুষ্টুমি খেলা করে গেল। বেলাদিদিকে ভয় দেখাতে হবে। আমি সারা বাড়ি ঘুরে দু'তিনটে আরশোলা জোগাড় করলাম। সেগুলোকে একটা খামে পুরে নিয়ে বেলাদিদির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, তুমি কিছু বলবে ধীরু?

আমি খামটি তাঁর হাতে দিয়ে বললুম— শরৎদা এই চিঠিটা আপনাকে দিয়েছেন—

লক্ষ্য করলুম, তিনি খুবই অবাক হয়েছেন। অবাক হবারই কথা। যিনি নিচের ঘরে আছেন তিনি উপরে এসে চিঠিটা দিতে পারলেন না? একটা ছোট ছেলের হাতে চিঠি। নিজে এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? যাক, বেলাদিদি যেই খামটা খুলেছেন, অমনি আরশোলাগুলো উড়ে তাঁর গায়ে বসল। হাউমাউ করে উঠলেন। সারা বাড়ি চেঁচিয়ে মাৎ করলেন। ততক্ষণে গুরুদেবের লেখাও মাথায় উঠেছে। আমিও ভাগলবা...'

ডি জি শান্তিনিকেতনেই গানের তালিম নিয়েছিলেন— 'যারা গান গাইতে পারত, অভিনয় করার কিছুটা শক্তি যাদের ছিল, সন্ধ্যায় গুরুদেব তাদের নিয়ে নিজেই বসতেন। গান শেখাবার জন্য অজিত চক্রবর্তী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। তিনিই আমাদের কণ্ঠে গান তুলিয়ে দিতেন।'

সঙ্গীতের সঙ্গে অভিনয়ও শিক্ষা শুরু করেন ডি জি। শান্তিনিকেতনে রাজরানী, বিসর্জন, ডাকঘর, বাল্মিকী প্রতিভা অভিনয় করেছেন। অভিনয়ের কথায় তিনি জানিয়েছেন--- 'পরে শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গে অনেক নাটকে অভিনয় করেছি। অধিকাংশ নাটকেই গুরুদেব নিজে অভিনয় করতেন। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় একবার আমি হয়েছিলাম 'মায়া' আর একবার 'লক্ষ্মী'র চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। বাল্মিকী স্বয়ং গুরুদেব। এই 'বাল্মিকী প্রতিভা'র কথা মনে পড়লে এক মজার কথা মনে পড়ে যায়। একদিন রিহার্সালের সময় গুরুদেব বাল্মিকী হয়ে বসে আছেন আর দস্যুরা গাইছে— 'এখন করব কি বল? এখন করব কি বল— হো রাজা হাজির রয়েছে দল, বল রাজা করবো কি বল?'

আমরা খুবই ভাবনায় পড়লাম, কী সর্বনাশ! গুরুদেবকে 'তুই' করে করে বলতে হবে নাকি! কেউ যখন সাহস করে অগ্রসর হচ্ছিল না, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে আরম্ভ করতেই সবাই রাজি হয়ে গেল—'

জোড়াসাঁকোয় অবনঠাকুরের বাড়িতে স্টেজে অভিনয় করা প্রসঙ্গে ডি জি জানিয়েছেন— 'একবার আশ্রম ছুটির কিছু পূর্বে গুরুদেব কলকাতায় ছিলেন এবং সেবার শেক্সপীয়রের একটি নাটক জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের বাড়ির স্টেজে অভিনয় করেছিলেন। সেদিন অনেক লর্ড-লেডি উপস্থিত ছিলেন। এই নাটকে প্রায় হাতখানেক লম্বা একটা ডায়লগ ছিল। তাও আবার আমার ডায়লগ। ডায়লগটি মুখস্থ করা তো দূরের কথা, মাত্র একদিন সেই ডায়লগ পড়ার সময় পেয়েছিলাম। আমিও তেমনি। অভিনয় চলাকালীন খুব আস্তে করে কিছু আজেবাজে কথা বলতে বলতে হঠাৎ 'মাই লর্ড, মাই লর্ড' বলে

চিৎকার করে উঠে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় প্রস্থান করলাম। হাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই। সেই থেকে আমার অভিনয় প্রতিভাকে সবাই তারিফ করতেন।

ডি জি কলেজে ভর্তি হলেও পড়াশুনায় মন বসল না। ছবি আঁকার নেশায় তাঁকে পেয়ে বসলো। শেষপর্যন্ত তিনি বৈঠকখানার জুবিলী আর্ট অকাদেমীতে ভর্তি হন। ডি জি-র কথায়— 'অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে ক্লাসের পর ক্লাসে উঠে আবার ভর্তি হলাম গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। এখানে আমার সঙ্গে ক্লাস করতেন পূর্ণ ঘোষ, যামিনী রায়, গোকুল নাগ আরও অনেকে।' যামিনী রায় প্রসঙ্গে বলেছেন— 'হঠাৎ দেখি যামিনীদা অন্যরকম ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আমি একদিন বললাম, এ কী যামিনীদা! তুমি পোটোপাড়ায় ঢুকলে কেন? সরার ওপরে পোটোরা যেমন লক্ষ্মীর ছবি আঁকে, তুমি আঁকছ কেন? উত্তরে যামিনীদা একটু হেসেছিলেন।'

আঁকা এবং অভিনয় দুই-ই এক সঙ্গে চলতে লাগলো। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে স্টেজ বেঁধে কিছু নাটক করেছিলেন। একবার 'বেজায় রগড়' নাটক করেছিলেন ডি জি, তিনি জানিয়েছেন— 'খবর পেলাম লর্ড কারমাইকেল ও লেডি কারমাইকেল আমাদের নাটক দেখতে আসবেন এবং থাকবেন শেষ পর্যন্ত। যদিও 'বেজায় রগড়' বাংলাতেই হয়েছিল, তবুও লর্ড-লেডির জন্য আমরা নাটকের বিষয়বস্তু ইংরাজিতে লিখে তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অভিনয় চলাকালীনই একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। জানা গেল, পরের সিন আর হবে না। ইন্টারভ্যাল দিতে হবে। কারণ, লেডি কারমাইকেল হাসতে হাসতে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এই নাটকের ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছিল Great Fun। আমি অভিনয় করেছিলাম ভাগ্নে পদ্মলোচনের চরিত্রে।'

ডি জি তখন মনে করেন একটি অভিজাত ক্লাবে জড়িত থেকে নিজেকে অভিনয়ের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে হবে। সেইসময় কলকাতার অভিজাত নাটকের দলের নাম ছিল 'কলিকাতা সঙ্গীত সমাজ'। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ আইনজীবী এই ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। চোরবাগান এ্যাটর্নী নিবারণ দত্তের কাছে ডি জি অভিনয় শিক্ষা নিয়েছিলেন। এখানে বেশ কিছু নাটকে ডি জি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। একবারের নিখুঁত অভিনয় প্রসঙ্গে ডি জি লিখেছেন— 'প্রধান বিচারপতি এস আর দাশের উপস্থিতিতে একটি নাটকে 'কমলা' নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। হঠাৎ দেখি স্টেজের উপরে সেই প্রধান বিচারপতি উপস্থিত! উনি নাকি বিশ্বাসই করেননি 'কমলা' চরিত্রে একটি ছেলে অভিনয় করেছে। তিনি সন্দেহ ভঞ্জন করেছিলেন স্টেজে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে।'

পরবর্তীকালে তিনি কৌতুকশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কথায়— 'আমি কৌতুক জিনিসটা ভালমত আয়ত্তে এনেছিলাম। কৌতুক অভিনেতা হিসেবে গোড়া থেকেই সবার প্রশংসা পেয়েছি। সেই সূত্রে আমি বরাবরই 'স্যাটায়ার' করতে পারতাম। 'উইট' আমার ভাল আসত। এই স্যাটায়ার বা উইট অনেকেই যেমন করতে পারেন না, তেমনই বোঝেন না। তবে এই বিষয়ে গুরুদেবই ছিলেন মহাগুরু। আমি গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) কাছ থেকে এটা পেয়েছিলাম বলতে পারি।'

'এই সময়ে আমার আর এক খেয়াল চেপে বসল। বায়স্কোপের ছবি তোলার খেয়াল। এই বায়স্কোপের ভূত অবশ্য কালীঘাটের কালিকা থিয়েটারে যুক্ত থাকার সময় থেকে আমার ওপরে একটু বেশি মাত্রায় ভর করেছিল।'

নতুন নতুন নেশায় ডুবে আছে দেখে ডি জি-র উপরে বাড়ির লোক ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তখন। ডি জি-র মনে হয়েছে বিদেশ থেকে বায়স্কোপ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে আসা জরুরী। কিন্তু যাবেন কেমন করে? ছুটে গেলেন বন্ধু প্রমথনাথ সরকারের শিয়ালদার রেস্টুরেন্টে। প্রমথ একটি বইয়ের দোকানও দেখাশোনা করতেন। ডি জি জানিয়েছেন--- 'ঠিক এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' আমার মেজদা প্রকাশ করলেন। ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে 'থিস্টিক লাইব্রেরি' নাম দিয়ে একটি দোকান খুললেন। সব কিছু দেখাশোনার ভার দিলেন আমার এক বন্ধু প্রমথনাথ সরকারের ওপর। এখান থেকে 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' ছাড়াও অন্য সব বই কেনাবেচা হ'ত।'

বন্ধু প্রমথের কাছে বিদেশ যাবার তীব্র বাসনার কথা খুলে বললে, প্রমথ ডি জি-কে উৎসাহ দেন। ১৯১৪ সাল, ডি জি কবিগুরুর কাছে গিয়ে একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এই পত্রটি ২৬শে জুনের 'মুভিওলা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, কবি লিখেছেন — "I know Dhirendranath Ganguly who is a Promising young artist of fair ablities. He wants to go to Europe to pursue his studies further and I feel sure any help given to him for this purpose will not go in vain" - Sd. Rabindranath Tagore.

এই সময় ডি জি-র বয়স একুশ, রঙ্গমঞ্চের শক্তিশালী অভিনেতা, অসাধারণ অঙ্কনশিল্পী। কিন্তু বেকার, তাই যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এমন সময় বামরার রাজার কাছ থেকে খবর পেয়ে ডি জি গেলেন ১০৩ পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে দেখা করতে। ছবি আঁকার সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে বলতে সুযোগ বুঝে একটা চাকরি চেয়ে বসলেন ডি জি। পরের কথায় তিনি জানিয়েছেন— 'রাজা মশাই বললেন, আমার কবিতা আমি পড়ে যাব আর সেটা শুনে শুনে তুমি ছবি এঁকে যাবে, পারবে? তখন 'না' কাকে বলে জানতাম না। আমার মুখে 'না' ছিল না। সব কিছুতেই হ্যাঁ। এখানেও তাই। শেষ পর্যন্ত আমি চাকরিতে বহাল হলাম বামরা এস্টেটে। ছবি আঁকার চাকরি।'

চাকরি হলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলেতে গিয়ে বায়স্কোপ প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষা নেওয়া আর হলো না। সেজদা হায়দ্রাবাদে ছিলেন। তিনি ডি জি-কে হায়দ্রাবাদে ডেকে পাঠান। 'ওখানে হাজির হয়েই জানতে পারলাম বৌঠানকে মাদ্রাজ পৌঁছে দিতে হবে। এটা গুরুদেবের নির্দেশ! তিনি এখানে দু-তিনদিন থেকে ইতিমধ্যে মাদ্রাজ রওনা হয়ে

গেছেন। আমি যথারীতি মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেলাম বৌঠানকে নিয়ে।' দাদা নগেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় ডি জি হায়দ্রাবাদের নিজামের আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদ পেয়েছিলেন। সম্মান দক্ষিণা মাসে তেরশ টাকা।

ডি জি যখন বামরা রাজ এস্টেটে কাজ করতেন, তখন ওখান থেকে কলকাতায় এসে শুনলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মেজদা নগেন্দ্রনাথ, মীরা দেবী, ডি জি-র মা বিরজাদেবী আর জগদীশচন্দ্র বসু শিলাইদহে রয়েছেন। ডি জি ১নং সুকিয়া স্ট্রীটে থাকতেন আর ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছে 'মহৎ আশ্রম' নামে হোটেলে খেতেন। তখন তিনি হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হন। ডাঃ হরিধন দত্ত ছিলেন তাঁদের পারিবারিক চিকিৎসক, তাঁর চেষ্টায় ডি জি সুস্থ হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে মেজদা তাঁকে শিলাইদহে যেতে বলেন, তিনি শিলাইদহে রওনা দেন। তাঁর কথায়—

'কুষ্টিয়া স্টেশন থেকে শিলাইদহের ঠাকুরবাড়ি যেতে অনেকটা পথ, তাই আমার জন্য স্টেশনে একটি ঘোড়া থাকবে ঠিক ছিল। জিনিসপত্র 'ভারীতে' নিয়ে যাবে। ঘোড়া থাকবে জেনে আমি যোধপুরী ব্রিচেজ সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওটা গাড়িতে পরে নিলাম। এটি পরতে যত কষ্ট, খুলতেও তত কষ্ট। যা হোক, যথা সময়ে কুষ্টিয়া স্টেশনে পৌঁছেই ঘোড়ার দেখা পেলাম। ঘোড়াটি দেখে মনে হচ্ছিল, বোধহয় বহুদিন ওর পেটে দানাপানি পড়েনি। যেন ধুঁকছিল। পিঠের হাড়গুলি যেন বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। তার ওপর আবার Saddle নেই। ওই পিঠে বসতে হবে। পিঠে তো নয়, ঠিক যেন একখানা কাঠ কাটবার করাত। লাফ দিয়ে তো উঠলাম। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, যেন পশ্চাতে করাত চলছে। শেষপর্যন্ত রক্তারক্তি ব্যাপার। উপায় কী! জমিদার ঠাকুরবাড়ির ঘোড়া, তাকে অবজ্ঞা করলে চলবে কেন? কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য হলাম। এই ওঠা-নামার জন্য ব্রিচেজের মাঝখানের সেলাই খুলে গেল। সর্বনাশ! কাপড় বদলে নেব তারও উপায় নেই। 'ভারী' সব নিয়ে আগে আগে চলে গেছে। অগত্যা সামনে যে একটা ছোট বাজার ছিল সেখানে এক দর্জির কাছ থেকে সেলাই করে নিলাম। দর্জিকে কিছু গোপন কথা ভেঙে বললাম। অগত্যা আমার ব্রিচেজ পরে থাকা অবস্থায় সেলাই করে দিল সে। সেলাই করার আগে বলেছিলাম, দয়া করে সতর্ক থেকো বাবা, সূচটা চালিয়ে দিও না। মুসলমান দরজি আমার কথা উপভোগ করে হেসে ফেলল। শেষপর্যন্ত আর ঘোড়ায় না উঠে, ঘোড়ার সঙ্গে হেঁটেই শিলাইদহের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

শিলাইদহে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যও পেয়েছিলেন। জগদীশ বসু সম্পর্কে ডি জি জানিয়েছেন— 'শুনলাম বাতের ব্যথা সারাতে জগদীশচন্দ্র পদ্মানদীর তীরে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত রোজ কাটান। বালি খুঁড়ে তার মধ্যে গোটা দেহটা চাপা দিয়ে, মুখ বাইরে রেখে, মাথায় জেলেদের বানানো শাল পাতার টুপি দিয়ে শুয়ে থাকতেন। পরে এই বালি চাপা দেবার কাজটি মহা উৎসাহে করতাম আমি। তা ছাড়া কচ্ছপের ডিমের খুব ভক্ত ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র। বালির ওপর দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে গিয়ে কচ্ছপ তার মনের মতো জায়গা বেছে নিয়ে পিংপং বলের মতো ডিম পাড়ত। যেখানে কচ্ছপের পায়ের দাগ থামত তার আশপাশে খুঁড়লেই ডিম পাওয়া যেত। ডিম কুড়িয়ে বেড়ানোও ছিল আমার কাজ।'

ডি জি-র মাথায় বায়স্কোপের ভূত চেপে রয়েছে। তাই তিনি হায়দ্রাবাদ নিজাম আর্ট কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়— '১৯১৬ সালের কথা বলছি। হায়দ্রাবাদ নিজাম আর্ট কলেজের ১৩০০ টাকার পারিশ্রমিক এবং অধ্যক্ষ পদ এক মুহূর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ফিল্ম তোলার ব্যবসায়।... হঠাৎ একদিন হায়দ্রাবাদ থেকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম ম্যাডানের নামে। দিন কয়েকের মধ্যে আমার ডাক এল। যথা দিনে হায়দ্রাবাদ থেকে সোজা গিয়ে হাজির হলাম জে এফ ম্যাডানের সামনে। সামান্য কিছু কথাবার্তা হলো। আমার পরিচয় আবার একবার ভালভাবে ঝালাই করে নিয়ে ম্যাডান সাহেব বললেন— তুমি কি করতে চাও?

— ছায়াছবি তৈরি করতে বিশেষ আগ্রহী— আমি বললাম।

এরপর ম্যাডান যা জানতে চাইছেন আমি তাই জানিয়ে চলেছি সবজান্তার মতো। ম্যাডান যত বলেন, তুমি অমুকটা পারবে, আমি তৎক্ষণাৎ বলি হ্যাঁ। শেষপর্যন্ত মাথাটাকে একেবারে 'হ্যাঁ'-র মতো করে রেখে দিলাম। 'না'র নাম-গন্ধ নেই। ম্যাডান বললন, জানলাম তুমি তো কবি ঠাকুরের রিলেটিভ। তা কবি ঠাকুরের বিসর্জনের পারমিশন এনে দিতে পারবে? 'বিসর্জন' ছায়াছবি তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর কোনও অমত নেই এটা লিখিয়ে আনতে পারবে? আমি বললাম, এ আর বড় কথা কি! তবে লেখা-লেখির মধ্যে গিয়ে লাভ নেই, উনি যখন অতবড় একজন মানুষ, আমি যখন তাঁর আত্মীয় তখন তাঁর মুখের কথাটাই যথেষ্ট—

ম্যাডান কী যেন ভাবলেন। তারপরই বললেন, ঠিক আছে—; উনি ভাবলেন, লেখালেখিতে গেলে টাকার প্রশ্ন উঠবে, ভবিষ্যতেও গন্ডগোল হতে পারে, এটা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর আমি ভাবলাম, যা হয় হবে ভবিষ্যতে, আপাতত অনুমতি জোগাড় করে ঢুকে তো পড়ি।'

আর দেরি নয়, সোজা হাজির জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। নিবেদন করলেন আর্জি, কবিগুরু শুনে বললেন, 'ছবি আঁকা, গানবাজনা সব ছেড়ে তুই কি ফিল্ম-টিলিম করবি নাকি! তা বেশ, আমি তোকে 'বিসর্জন'-এর বায়স্কোপ করতে দিলুম।'

আনন্দে আটখানা হয়ে ডি জি এলেন ম্যাডান সাহেবের কাছে। সাহেব সব কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ডি জি-কে ম্যাডান কোম্পানির ম্যানেজার নীতিশ লাহিড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেন। ম্যাডানরা ফিল্ম ব্যবসায়ী হিসেবে তখন প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্যবহার ছিল অত্যন্ত খারাপ। জে এফ ম্যাডান-এর কাছে যেদিন প্রথম নীতিন বসু এসেছিলেন সেদিন চেম্বার থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার প্রথম পরিচয়ের দিন ডি জি শোনেন ম্যাডান সাহেব কারোর উদ্দেশ্যে বলেছেন— 'শালে কো বোলাও..'

একদিকে বাঙ্গালী প্রসঙ্গে ম্যাডানদের ছিল একটা চাপা বিদ্বেষ,

অন্যদিকে এদের কর্মকুশলতাকে কাজে লাগিয়ে নিতে প্রতিভাধর বাঙ্গালীর পদধূলি নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাড়িয়ে দিতেও সময় নিতেন না। ডি জি-কে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথায় বললেন— 'ম্যানেজারের সঙ্গে অর্থাৎ নীতিশ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করতে বলায় মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলাম। যাক একজন বাঙ্গালীর সন্ধান তো মিলল। আমি নীতিশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা পেলাম আর একজনের সঙ্গে। পরিচিত হতেই মন তৃপ্ত হলো। ... অনেক কথা হলো, এঁরা আমার মতো একজন সদ্য পরিচিতের কাছে ম্যাডান সম্বন্ধে সব উগ্‌রে দিলেন। এতে বুঝলাম, ম্যাডানদের ব্যবহার ওঁদের মনকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। সেই দিন নীতিশ লাহিড়ীর সঙ্গে একটা গুপ্ত পরামর্শ হয়ে গেল। সেই গুপ্ত পরামর্শে স্থির হলো, কয়েকজন বাঙ্গালী মিলে আলাদা একটা কোম্পানি তৈরি করে ফিল্ম তোলার কাজ আরম্ভ করবো। তখন সম্পূর্ণ বাঙ্গালীদের কোনও ফিল্ম প্রতিষ্ঠান ছিল না। আর কথা নয়, আমি দ্রুত ফিরে এলাম হায়দ্রাবাদে। ক'দিনের মধ্যে ১৩০০ টাকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা চলে এলাম কলকাতায়।' তৈরি হলো 'ইন্দো-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানি'। এর পরে সবটাই ইতিহাস।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও চলচ্চিত্রায়ণে ধীরেন্দ্রনাথ' (ডি জি) গ্রন্থের শুরু করেছিলেন এভাবে— 'বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত সোনার বঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে তরতাজা, প্রথম যৌবনের দূত যে কয়েকজন উৎসাহী বাঙ্গালী যুবক, প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাংলা ছবি বা বায়স্কোপ তৈরি করে আজকের 'চলচ্চিত্র' নামক সিংহ দুয়ারটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, উত্তরসূরীদের কর্মময় জীবনের প্রসারতা কামনায় যে ক'জন পূর্বসুরী অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা, শ্রম, ভাবনা-চেতনার তলানিটুকু পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যমণি হিসেবে যিনি চিহ্নিত, কালের মূল্যায়নে যিনি 'জনক' বিশেষণে আখ্যায়িত তিনি ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে জনমানসে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যিনি 'ডি জি' নামেই খ্যাত। যাঁর চোখের আলো সম্পূর্ণ নিভে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের কাছ থেকে একটি বড় রকমের স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশা ছিল, পরিশেষে সেই প্রত্যাশার ফলশ্রুতি হিসেবে যিনি 'পদ্মভূষণ' পরে 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন ইনি সেই ধীরেন্দ্রনাথ।

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের যে সম্পর্ক যে কুটুম্বিতা ছিল তারই সূত্রে দেখা যায়, বায়স্কোপের সঙ্গে কবির প্রাথমিক যোগসূত্র প্রথম ঘটিয়ে দেন ধীরেন্দ্রনাথ। অথচ জানি না কেন, কোন অভিসন্ধিতে রবীন্দ্রচর্চায়, রবীন্দ্রকর্ম পর্যালোচনায় সেই ধীরেন্দ্রনাথই বারবার উপেক্ষিত। শুধু ধীরেন্দ্রনাথ নন, ধীরেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে কবির যে গভীর সম্পর্ক তা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কেউ আলোকপাত করেননি বিশেষভাবে।'

এবছর রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে কবিগুরুর কর্মকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে কত প্রবন্ধ, গ্রন্থ যে প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে, কিন্তু চলচ্চিত্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ ডি জি আজও উপেক্ষিত। এটাই দুঃখের।

বাঙালির ভাঁড়ারঘরের ইতিবৃত্ত

অর্ণব নাগ

"ঘরে কেন আলো? মনে রাখবেন পাঠক, জষ্ঠ্যি মাস; গিন্নী গেছেন বনভোজনে, সবাই আছে ভাল। আবার প্রশ্ন, কপাটের ওধারে— দুয়ারে কেন কাঁটা? গিন্নী বলে উঠলেন ছেলেরা সব লোহার ভাঁটা। কাঠের বড় খিল খুলে গেল। গিন্নী আর তৌলে ঢুকল ভাঁড়ারে। বৈশাখের কাসুন্দির কড়ির জালা, জৈষ্ঠ্যের জয়-মঙ্গলবারের কারণ, পাতা বেছে পুজোর সামগ্রী, আষাঢ়ে ঝাকড়দহ-মাকড়দহের জল ও আদি গঙ্গার পবিত্র গাড়ুভর্তি জল পুবদিকের কুলুঙ্গিতে। শ্রাবণে ঝুলনযাত্রার শোলার পাখী, ফুল,

মাছ কাঠের বাক্সে; ভাদ্রে অরন্ধনের মালসা ও লক্ষীপুজোর পিঁড়ে গোছানো থাকে দক্ষিণের দেওয়ালে, আশ্বিনে দশমী'র বড়ি হাতে বড়ির বাক্সে পাঁচরকমের ডাল, চণ্ডীপাঠের পুঁথি, মহালয়ার তর্পণের কোসাকুসি সব গোছানো আছে একসাথে। কার্তিকে তেলবাতি নিয়মসেবার, পিলসুজের প্রদীপ, শ্যামাপুজোর পেতলের প্রদীপ দান। অঘ্রাণে (অগ্রহায়ণ) বড়ি হাতের জন্য কষ্ঠিপাথরের শ্লেট, আর ডাল ভেজানোর গামলা ও নবান্নের পাথরের বাসন এবং মধুপর্কের ছোট ছোট বাটিগুলি; কুলী মঙ্গলবারের মঙ্গলচণ্ডীর সিঁদুরকৌটো। পৌষে পিঠে পার্বনের চালবাটা, সংক্রান্তিতে কলার থোড় কাটার বঁটি, আবার বড়গিন্নী খোঁজে ঢেঁকি ও কলার পেটো। ছোটগিন্নী তো মাঘে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে বীণাপানি-র পুঁথির বাক্স ও সোনার দোয়াত গুছিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। সেজ এদিকে ফাল্গুনের দোলযাত্রার কাঠের দোলনা ও ফাগের খুড়ি উত্তরের দেওয়াল আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে। চৈত্রের চড়ক সংক্রান্তির গামছায় পাঁচফল বেঁধে কুলুঙ্গিতে রাখা, ঢেঁকিতে যব/ ছাতু কোটা। যবের কৌটো, ছাতুর হাঁড়ি কুলো পিটিয়ে, জল ছিটিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঢেঁকিঘরে। এসবই রয়েছে একটি ঘরে। এ যেন এক ভাণ্ডার; আছে আচার, আছে কাসুন্দি, ছোঁবে না কেউ। আছে মশলা, গুঁড়ো করার হামান-দিস্তা, পোস্ত ও সর্ষেবাটার শিলনোড়া, ছাঁচি পান ছাঁচার পেতলের ঘটি। গিন্নী আরও উচ্চৈস্বরে চেঁচান— ওরে ভগীরথ, সুপুরী নিয়ে আয়। বস্তা খোল, জাঁতি বের কর। নতুন গিন্নীর মিষ্টি স্বর— দিবাকর, নারকেল কুড়ে গুড় মিশিয়ে কাঠের আঁচে জ্বাল দে, ওই ঈশান কোণে সব রাখা আছে। ভাঁড়ারঘরের উত্তরদিকের কড়িতে ঝুলছে কুমড়ো। আছে তক্তাপোশ, কাঁচা আনাজ আর ফল রাখার বেতের ঝুড়ি। কুলুঙ্গিতে আর পিঁড়ের থাকে বিভিন্ন আকারে চীনেমাটির জার। এরই নাম ভাঁড়ারঘর। বধূর অলঙ্কার। ঘরের শোভা। বাড়ির মান, দুই বেয়ানের সম্মান।"

— ভাঁড়ারঘরের বিশ্বকোষ — হীরেন্দ্র মল্লিক।

সেই কবেই রামপ্রসাদ গেয়ে গেছেন,— 'ভাঁড়ার জিম্মা যার আছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।' আর তার বহুযুগ বাদে রসরাজ অমৃতলাল বসু ব্যক্ত করেছেন তাঁর ক্ষোভ— 'বৌমা, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে ছোঁড়া— না হয় মিন্‌সেই হ'ল, এই তো নাকে-মুখে দু'টি গুঁজে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পরের গোলামী করতে ছুটল, এটা কি তোমার রান্নাঘরের, ভাঁড়ারঘরের কর্তৃত্বের অধিকারের চেয়ে বেশি প্রলোভনীয় অধিকার?' বাঙালী'র জীবনে সেটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময়। কালের ব্যাপ্তি উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের গোড়া অবধি। বাইরে নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার রক্ষায় মরিয়া আন্দোলন আর ঘরের ভেতরে একটি স্বতন্ত্র ঘরের রচনা, উওম্যান-টেরিটরি বলে আদতে কিছু থেকে থাকলে সেটি ছিল তাই। এই নারী সাম্রাজ্যটির নামই ভাঁড়ারঘর। হেঁশেলের সঙ্গে যার নিবিড়তম যোগাযোগ। তবে রেনেসাঁ পর্বে বাঙালী সাধারণ নারীর জীবন, শুধু হেঁশেল ঠেলতেই বেরিয়ে গিয়েছিল— এহেন চিরকালীন অভিযোগের মাঝেও একটা অন্যরকমের জীবনের স্পন্দন যে ভাঁড়ারঘরে সেই সময়ই পরিলক্ষিত হোত তা আশাকরি পাঠক এই প্রবন্ধে অনুধাবন করতে পারবেন।

অথ ঃ ভাঁড়ার-কথা

খাদ্যরসিক বাঙালীর কাছে ভাঁড়ারের আদর ও কদর সম্ভবত সেই রামপ্রসাদের বা তারও আগের আমল থেকেই। সাধুভাষায় এরই নাম ভাণ্ডার। তবে ভাণ্ডার শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধনভাণ্ডার, অর্থভাণ্ডার ইত্যাদি, মায় খনিজ ভাণ্ডার অবধি। আপাতত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাক ভাঁড়ারঘরের ওপর। সংসদ বাংলা অভিধান জানাচ্ছে, যেখানে খাবার ও রান্নার জিনিস মজুত থাকে তার নাম-ই ভাঁড়রঘর। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এরও বক্তব্য— ভাঁড়ারঘর মানে খাদ্যাদি সঞ্চয়ের গৃহ। সুকুমার সেনের "Etymological Dictionary of Bengali" এবং আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "Origin & Development of Bengaly Language" এক্ষেত্রে যুগপৎ বলছে, ভাঁড়ারঘর মানে আসলে সঞ্চয়-গৃহ (স্টোর হাউস)।

চলতি অর্থে ভাঁড়ার-ঘর সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি যে, এখানে রান্নার উপকরণ ও অন্যান্য জিনিসই মজুত থাকে। রন্ধনকৃত দ্রব্য প্রায়ই ঠাঁই পায় না ভাঁড়ারে। অবশ্য, আচার জাতীয় টাকনা (টাকরা-য় লাগিয়ে দিব্যি খেতে লাগে বলেই কিনা কে জানে খাঁটি কলকাত্তাইয়া ভাষায় এ জাতীয় খাদ্যবস্তুর এহেন নামকরণ) থাকাতে সেখানে কোনও অসুবিধে নেই। আচার থাকে বলেই সম্ভবত, ভাঁড়ারের আচার-ব্যবস্থা এমনই কড়া যে ঠাকুর-ঘর তার কাছে কোথায় লাগে? বাসি কিংবা আঁশ (আমিষ) কাপড়ে ভাঁড়ারে কিছু ছুঁয়েই দেখুন না, হুলুস্থূলু পড়ে যাবে একেবারে! অথচ রগড় দেখুন— শুচিতার এতটা বাড়াবাড়ি যেখানে, সেখানেই কেমন ইঁদুর কিংবা আরশোলা-মাকড়সা-টিকটিকি জাতীয় জন্তুর অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে নির্বিকার চিত্তে!

তখন মাগ্গীগণ্ডার বাজার। এখন এক টাকায় একটা লজেন্সও পাওয়া না গেলেও তখন এক টাকাতেই মিলত দশ সের তেল, কিংবা চার-পাঁচ সের গাওয়া ঘি, বা দেড়-দু'মন চাল। সুতরাং এতসব জিনিসপত্র মজুত করার জন্য প্রত্যেক বাঙালী গৃহে অনিবার্যভাবেই অস্তিত্ব থাকত ভাঁড়ারঘরের। কল্যাণী দত্ত তাঁর 'থোড়-বড়ি-খাড়া' বইতে ভাঁড়ারঘরে রক্ষিত দ্রব্যাদির একটি সুখপাঠ্য বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ''সিন্দুকে থাকত তিন রকমের চাল, বোয়েমে আমসি, আমচুর, আমসত্ত্ব, আর হরেক রকমের বড়িও বাদ যেত না। কুলচুর, রসকুলের সঙ্গে ছড়া আর গোলা তেঁতুল, সারা বছর খরচের জন্য বিচি কেটে সরষের তেল মাখিয়ে ঠেসে রাখা কমপক্ষে মনখানেক বাছাই তেঁতুল, শক্ত কাঠকয়লার মতো পুরনো তেঁতুল প্রায় প্রতি সংসারেই থাকত। বোয়েমে ঢ্যালা পাকানো পুরনো ঘিও অবশ্যই রক্ষিত হোত। অরুচির জারক নেবু, পোয়াতির ঝালমরিচ, কচি ছেলের

জন্য হাতের নোয়া, কোমরের ঘুনশি, সর্দিকাশির ত্রিকটু চূর্ণ, বেলশুঁট, সন্ধব নুন সবসময় মজুত থাকত। এছাড়া মাখা আমলকি, গোটা হত্তুকি, ফালাকাটা সুপুরি, নারকোলখণ্ড, কুষ্মান্ড খন্ড, কবরেজি মশলা, ঘেঁচি কড়ি, সমুদ্দুরের ফেনা, হরিনের শিং, বাঘের নখ, কুমিরের দাঁত, সজারুর কাঁটা, শেকড়-বাকড়, আট আঙুল মাপে কাটা হোমের বেলকাঠ, গঙ্গামাটি, গেরিমাটি, অর্জুন গাছের ছাল, সুপুরির শেকড়, মুথো যোয়ান, নেবুর হজমিগুলি, মাজনের মশলা হিসেবে খয়ের কাঠকয়লা, উনুনের পোড়ামাটি, খড়ি-ফটকিরি, বাদাম, ডালিম-বেদানার খোসা, মাথা ঘষা মশলা, জটামাংসী, ধূপের মশলা, ধুনো গুগগুগলও সংগ্রহ করে রাখা হোত। ছোট-বড় ঝিনুক, কড়ি, সোনা-রুপোর কুচি, কুঁচফল, লাল আর সাদা চন্দন কাঠের টুকরো, ধনেশ পাখির তেল, বাতারি তেল, মহাভৃঙ্গরাজ, বিষ্ণুতেল, দামি রুদ্রাক্ষ, সোলার ছিপি, 'কাকইসকুরুপ', বাড়তি গোছা গোছা চাবিও থাকত। এছাড়া থাকত টোটকা চিকিচ্ছের মেয়েদের খাতা, মেয়েদের রূপটানের ফর্দ, গোটা মশলার সাড়ে বত্রিশ ভাজার রান্নার খাতা, বরণডালার ফর্দ, বিয়ের নিয়ম, শ্রাদ্ধের দান সাজানোর কথা— এমনকী শেলেটে খড়ি ইত্যাদি।"

ভাঁড়ারঘরের একটা স্বতন্ত্র 'কোড ল্যাংগোয়েজ' ছিল। কোনও কিছু নিঃশেষ হয়ে গেলে, বলা হোত না ফুরিয়ে গেছে। বলা হোত, অমুক জিনিসটা বাড়ন্ত। কোনই কিছুই একেবারে নিঃশেষ করে ফেলার রীতি ছিল না। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানের চিহ্নস্বরূপ তলানীটুকু অন্ততঃ রেখে দেওয়া হোত। ভাঁড়ার ঘরের সেদিন আর নেই। বাড়ির গৃহিনীর সাতসকালেই 'ভাঁড়ার বার করে দেওয়া' কথাটা এখনকার যুগে রূপকথার মতোই শোনাতে পারে। তীব্র স্থানাভাব আর কালের অমোঘ নিয়মে ভাঁড়ারঘর এখন অনেক বাড়িতেই ভাঁড়ার আলমারিতে পর্যবসিত। বড় বাড়ি যদি ভেঙে পায়রার খোপের মতো ফ্ল্যাট হতে পারে, তবে ঘর আলমারি হলে দোষ কোথায়?

ভাঁড়ার-ঘরের স্বদেশীয়ানা

ভাঁড়ারঘরের জয় সর্বত্র। পৃথিবীর কোন দেশেই আর স্টোররুমের চাহিদা নেই বলুন! তবে কিনা বাঙালীর ভাঁড়ারঘরের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টোররুম মাথা খুঁড়ে মরলেও ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি পাচ্ছেন না। সে যুগের নাম স্বদেশী। হিড়িকও বলতে পারেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উত্তাল বঙ্গভূমিতে ভাঁড়ারঘরের মুকুটে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি সোনালী পালক। সময়কাল--- ১৯০৩-১৯১১ খৃস্টাব্দ। বৃটিশ-বিরোধী সেই লড়াইয়ে গোলাগুলির খুব বেশি দরকার ছিল না। দরকার ছিল কেবল দেশের মানুষের মনে জাত্যাভিমান সৃষ্টি করা, রক্তের মধ্যে স্বাদেশিকতার স্রোত বইয়ে দেওয়া। আর একাজে তৎকালীন দেশনেতাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল স্বদেশী দ্রব্যের মজুতদার ভাঁড়ারগুলি।

এবিষয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় মধ্য কলকাতার বউবাজারের ইন্ডিয়ান স্টোর্সের। স্বদেশী শিল্পের অন্যতম আদি পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারক ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই এই স্বদেশী ভাঁড়ারঘরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে সব ধরনের স্বদেশজাত দ্রব্যের মজুতদারী ও বিক্রি করা হোত। স্বদেশী শিল্প প্রচারের পুরোধাপুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' পরিচালিত 'স্বদেশী স্টোর্স' বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাক-মুহূর্তে ১৯০৩-০৪ সাল নাগাদ সেই বাজারেও প্রায় ১০,০০০ টাকার মতো স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে কেদারনাথ দাশগুপ্তের উৎসাহে ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলাদেবী চৌধুরাণী স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচার-কল্পে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (অধুনা বিধান সরণি) প্রতিষ্ঠা করেন 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'। সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে উদ্ধৃত করে হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত অসাধারণ গ্রন্থ 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' জানাচ্ছে, তৎকালীন সময়ে বউবাজার ও লালবাজারের সংযোগস্থলে আবদুল হালিম গাজনাভি পরিচালিত স্বদেশী শিল্পের আরেকটি বিক্রয়কেন্দ্র ছিল, নাম 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স'।

স্বদেশীয়ানার সেই ব্রহ্মমুহূর্তে শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব জোয়ার আনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, গোটা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িরই একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা মিলে ওইসময় গড়ে তুলেছিলেন 'স্বদেশী ভান্ডার'। রানী চন্দ অনুলিখিত 'ঘরোয়া'য় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছেন, '... আমাদের দলের পান্ডা ছিলেন রবি কাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম, বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁত খুঁত করতে লাগল। বলে, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না— জুতোর দোকান খোলা, ও সব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হলো দোকানের সামনে— 'স্বদেশী ভাণ্ডার'। ঠিক হলো স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। বলু (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ) খুব খেটেছিল— নানা দেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়, মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো— সবকিছু জোগাড় করেছিল, তার ওই শখ ছিল।'

বাগবাজারে পশুপতি বসু-নন্দলাল বসুর বাড়িতে স্থাপিত হয়েছিল মাতৃভান্ডার। সেইসঙ্গে অর্থ ভান্ডারও। এক্ষেত্রে অর্থ ভান্ডার মানে আর্থিক স্টোররুম নয়; ফান্ড। পোষাকি নাম ছিল ন্যাশনাল ফান্ড। অবন ঠাকুরের অনুপম বর্ণনা— 'পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে, ন্যাশনাল ফন্ড— টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের ওপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা— মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে, একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে।'

স্বদেশী যুগের এই ভাঁড়ারগুলিতে অন্দরের আবডাল ছিল না, বরং একটা বারোয়ারী স্বাদ ছিল। প্রচলিত ভাঁড়ারঘরের সঙ্গে হয়তো এই স্বদেশী ভাঁড়ারগুলোকে মেলাতে অসুবিধা হবে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই প্রচলিত ভাঁড়ারঘরের পরম্পরারই সার্থক ধারক ও বাহক ছিল ওই স্বদেশী ভাঁড়ারগুলো।

উপরন্তু সেইসব ভাঁড়ারের স্বদেশীয়ানা সামগ্রিকভাবেই বাঙালীর ভাঁড়ারঘরকে অধিষ্ঠিত করেছিল স্বতন্ত্র মর্যাদায়।

জগতের শ্রেষ্ঠ ভাঁড়ারঘর

এমন ভাঁড়ার কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল ভাঁড়ারের সেরা সে যে ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ারঘর। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। রবিঠাকুরের ধাত্রীভূমি। অসংখ্য প্রতিভার আঁতুড়ঘর। নারীশিক্ষার পীঠস্থান। নারীপ্রগতির শেষ দিগন্ত। উনিশ শতকের রেনেসাঁর অনেকটা কৃতিত্বই ৫ ও ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ওই বাড়িটার ওপর বর্তায়। আপাতত আমাদের গন্তব্য ৬ নম্বর বাড়িটায়। ঢুকে পড়ছি সরাসরি ভাঁড়ারঘরে।

বড়লোকের ভাঁড়ার বলে কথা! রকমফের বিশাল। 'জীবনের ঝরাপাতায়' রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাদেবী ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার নিয়ে যে অমূল্য স্মৃতিচারণা করে গেছেন, তা নস্ট্যালজিক পাঠকের কাছে চিরসমাদৃত। তিনি লিখেছেন, 'ঘি, তেল, নুন, চিনির ভাঁড়ার বারবাড়িতে অন্যত্র, তাও সরকারদের হাতে। তারাই প্রয়োজনমতো সব জিনিস বামুনদের বের করে দিত। বাড়ির ভেতরে গিন্নীদের হাতে ছিল শুধু তরকারি ও ফল-মিষ্টির ভাঁড়ার।' ব্রহ্ম উপাসক পরিবারের কাছে তরকারি ও ফল-মিষ্টির সেই ভাঁড়ারে মনের শুদ্ধতা ও শুচিতা রক্ষা অবশ্য-পালনীয়। সরলাদেবী চৌধুরাণীর অসাধারণ বর্ণনা— 'সকাল বেলায় ৭টার সময় ঘন্টা বাজে দালানে উপাসনায় যাওয়ার জন্য। বউ-ঝিয়েরা বিবাহের সময় অর্জিত স্ব স্ব চেলি পরে সেখানে যান। নাত্নীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ থেকে একখানি করে যে চেলি উপহার পায়, তাই পরে তাদের দালানে যেতে হয়। ... সেখানে থেকে এসে, যে যার ঘরে গিয়ে পট্টবস্ত্রখানি খুলে তুলে রেখে সাদাসিধে কাপড় পরে ভাঁড়ারঘরে আসেন।'

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউদের উপস্থিতিতে বঙ্গজ রেনেসাঁর দ্যুতি যেন আচমকাই ছড়িয়ে পড়ে সেই ভাঁড়ারঘরে। সেখানে নিত্য-উপস্থিতির যে তালিকা সরলাদেবী দিয়েছেন, তাতে চোখ বোলানো যাক। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাত্রয়, তথা জেষ্ঠ্য কন্যা ও 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের রচয়িতা সৌদামিনী দেবী, তৃতীয়া কন্যা রন্ধনপটীয়সী শরৎকুমারী দেবী এবং পঞ্চম তথা কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী দেবী। বউদের মধ্যে থাকতেন মহর্ষির পুত্রবধূগণ তথা জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী সর্বসুন্দরী দেবী, চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পত্নী ও 'আমাদের কথা' ('প্রবাসী', বৈশাখ, ১৩৩৭) স্মৃতিকথার লেখিকা প্রফুল্লময়ী দেবী, পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জায়া রবীন্দ্রনাথের বহুস্তুতা কাদম্বরী দেবী। মহর্ষির পৌত্রীদের মধ্যে থাকতেন তাঁর বিবাহিতা বড় নাতনী দ্বিজেন্দ্রদুহিতা সরোজাদেবী, আর দৌহিত্রীদের মধ্যে থাকতেন শরৎকুমারী দেবীর জেষ্ঠ্যা কন্যা সুশীলা। মধ্যে মধ্যে আসতেন সরলাদেবীর অগ্রজা আজীবন সাহিত্যসেবী হিরন্ময়ী দেবী (স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা)। এত গুণীজনের সমাবেশে ওপরতলার ভাঁড়ারঘরে বসে যেত প্রাতঃকালীন মজলিশ। এথেকে বঙ্গদেশে তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় প্রস্ফুটিত নবধারার অঙ্গিকের রেশ যে সেই ভাঁড়ারেও ছড়িয়ে পড়ত, এটুকু স্বীকার করে নেওয়া আশা করা যায় অত্যুক্তির পর্যায়ে পড়বে না। সেই ভাঁড়ারঘরেই এঁদের কুটনো (তরকারি) কোটা একান্নবর্তী পরিবারের (মহর্ষির জ্যেষ্ঠ নাতি দ্বিপেন্দ্রনাথ-জায়া হেমলতাদেবী ১৮৮৯ সালে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এসে দেখেছিলেন তাঁর শ্বশুরের সংখ্যা সাত, পিসশাশুড়ি চার, পিসশ্বশুর সকলেই ঘর-জামাই এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১৬) সুখী গৃহকোণের এযুগের দুর্মূল্য প্রতিচ্ছবি এঁকে দিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাইঝি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন কথায়' ঠাকুরবাড়ির মেয়ে ও বউদের স্বভাবগত পার্থক্য নিয়ে কিছু দুর্লভ মন্তব্য করে গেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো যে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বউদের মতো অতটা দরাজ-হস্ত ছিলেন না। যার সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেছেন যেহেতু মেয়েরা মনে করেন স্বামীভাগ্যেই তাঁরা সৌভাগ্যবতী, সেই কারণে ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের সূত্রে বউদের খরচের যে অধিকারটা ছিল, ঘরজামাই বরেদের (একে পিরালী ব্রাহ্মণ, তায় ব্রাহ্ম— এ দু'য়ের মাহেন্দ্রযোগে মহর্ষি যাদের ঘরেই নিজের মেয়েদের দান করতে চেয়েছেন, সেই বাড়ির পাত্রটিকে ঘরছাড়া হতে বিশেষ দেরি হয়নি। সুতরাং পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে 'ঘরজামাই' হওয়াই ছিল মহর্ষির জামাইদের ভবিতব্য) জন্য বড়লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও খরচ করবার সেই অধিকারটা প্রয়োগ করতে স্বাভাবিকভাবেই কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হতেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। ইন্দিরাদেবী'র কৌতুককর মন্তব্য— 'তেমনি এক পিসি (দেবেন ঠাকুরের কোনও এক দুহিতা) শুনেছি, হলুদ গুণে গুণে ভাঁড়ার বের করতেন। সুতরাং নন্দে-ভাজে (ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউ) কাটাকাটি হয়ে গেল।'

তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন সৌদামিনীদেবী। কারণ, মামাতো-পিসতুতো দুই বোন সরলাদেবী ও ইন্দিরাদেবী যুগপৎ জানাচ্ছেন যে, সৌদামিনীদেবীর আজীবন মটোই ছিল, 'কারো কোরো না বঞ্চিত, সবারে দিও কিঞ্চিৎ'। আর এই কিঞ্চিৎ পাবার আশাতেই ঠাকুরবাড়ির ছোটদেরও ছিল সেই ভাঁড়ারীয় মজলিশে অবাধ প্রবেশ। সেখানকার ভাঁড়ারঘরে ছিল দুটো ভাগ। কেউ কাজ করতেই যান বা কেউ সেই ভাঁড়ারে স্রেফ মজলিশের আকর্ষণেই যান, সবাই বসতেন বহির্ভাগের ভাঁড়ারে, যেখানে সাজানো থাকত তরকারি এবং সেটা ওখান থেকেই বন্টনও করা হোত। অন্তর্ভাগের ভাঁড়ারের কর্তৃত্ব পুরোটাই ছিল সৌদামিনী দেবীর হাতে। সরলাদেবী লিখেছেন, 'অন্তর্ভাগে (ভাঁড়ারের) শুধু বড় মাসিমা (সৌদামিনী দেবী) প্রবেশ করতেন। আমরা ছোটরাও বাইরে বড়দের কোল ঘেঁষে এসে বসে পড়তুম। সিমলে বাড়িতে মা-র মজলিশের মতো এখানে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, এখানে আকৃষ্টচিত্তে বড়দের কার্যকলাপ দেখতুম ও তাঁদের গল্পগুজব শুনতুম। ওদিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ-পরায়ণা

বড় মাসিমা'র দিকেও আমাদের চোখ থাকত। সেখানে থাকের পর থাকে, ভাঁড়ের পর ভাঁড়ে নানারকম চর্বচোষ্য লুকোন থাকত। এক একদিন এক একটি কিছু বের করে এনে— আমসত্ত্ব, তিলকুটা, আনন্দ নাড়ু, সুজির নাড়ু, সন্দেশ বা যা হয় কিছু আমাদের হাতে একটু একটু করে দিয়ে বড় মাসিমা আমাদের সবার হৃদয় কেড়ে নিতেন।... তাই সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ি থাকলে তাঁর জন্য দু'একটি বিশেষ রান্না এবং শুক্ত যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের হাতে সেই ভাঁড়ারঘরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেই হোত সেকথাও জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ভাগিনীটি। তাঁর আর ইন্দিরাদেবীর কল্যাণে আমরা জানি, শরৎকুমারী দেবী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুপাচিকা।

তবে ঠাকুরবাড়ির এহেন রেনেসাঁর আলোকোদ্ভাসিত ভাঁড়ারঘরের সূচনা সম্ভবত উনিশ শতকের ছ'য়ের দশকের শেষে। কারণ, ১৮৫৯ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে মহর্ষির মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর আত্মজা ইন্দিরাদেবী অনুলিখিত 'পুরাতনী'তে জানিয়েছেন, '... সংসারের কাজ আমাদের কিছু করতে হ'ত না। ভাঁড়ারাদির কাজ বোধহয় দপ্তরখানা থেকেই করা হ'ত। ...একবার আমাদের জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন— বউদের রাঁধতে শেখাও।' 'পুরাতনী'তে জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, দেবেনঠাকুরের বউদের রাঁধানোর এই হুকুম তাঁর বিয়ের দু'তিন বছর পরের অর্থাৎ ১৮৬১-৬২ সালের কথা। অনুমান করা যেতে পারে, সেই সময় থেকে হেঁশেল সামলানোর পাশাপাশি তার পরবর্তী পর্যায়ে ভাঁড়ারও সামলাতে হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউদের। এদিকে ১৮৭২ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মের পর জীবনের প্রথম ৫টা বছর উত্তর কলকাতায় সিমলার বাড়িতে কাটিয়ে ১৮৭৭ সাল নাগাদ মা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে পুনরায় ঠাকুরবাড়িতে থাকতে শুরু করেন সেখানকার ভাঁড়ারের অনন্যসাধারণ স্মৃতিচারিণী সরলাদেবী। এই সূত্রে বলা যায়, সেই ভাঁড়ারীয় মজলিশে তাঁর বড় মামি (সর্বসুন্দরী দেবী)-কে বেশিদিন দেখতে পারেননি তিনি। কারণ মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূটি ১৮৭৮ সালেই পরলোকগতা হন। এর ক'বছর বাদেই ১৮৮৪ সালে চলে যান রবিঠাকুরের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীরও। ভাঁড়ারে এঁদের অভাব পূরণ করার মতো মানুষী ঠাকুরবাড়িতে নেহাত কম ছিলেন না। সেটা হতে পারেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী (যিনি একাধিক খণ্ডে 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' শিরোনামে রন্ধনশিল্প সংক্রান্ত বাঙালির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি রচনা করেছেন) কিংবা কবি-পত্নী মৃণালিনীদেবী বা আর কেউ। তবে এনিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য চোখে পড়েনি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাঁড়ার মানে না কোনও ঘরের বন্ধন। রবীন্দ্র-স্মৃতিধন্য জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছাদের দিগন্তে বিলীন হয়ে যায় ভাঁড়ারীয় আবেশ। 'ছেলেবেলা'য় গুরুদেবের অসামান্য বর্ণনা— 'বাড়ি ভেতরের এই ছাতটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি। জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ওইখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলাভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্ টপ্ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে। ... কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হ'ত। ছোটো-বড়ো নানা সাইজের নানা কাজ করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হ'ত, রোদ খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হ'ত সাবধানে...।' ভাঁড়ারঘরের শ্রেষ্ঠত্ব তো এমনীতে আসে না, সেখানে শ্রেষ্ঠ মানুষের বাঞ্ছয় উপস্থিতির প্রয়োজনও অবশ্যম্ভাবী। বাড়ির সুনাম বজায় রাখার স্বার্থে দু'একটা কেয়াখয়ের অপহরণ করে (ব্যাপারটাকে চুরি বলার চাইতে অপহরণ বলারই পক্ষপাতী তিনি) ইস্কুলের পণ্ডিতমশায়কে দেওয়া, বউঠাকরুন (কাদম্বরীদেবী)-র আমসত্ত্ব পাহারা, সেখানেই তাঁকে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পড়ে শোনানো, জাঁতি হাতে সুনিপুণভাবে সরু করে সুপুরী কাটা— এসবই করতেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করে দেওয়া ঠাকুরবাড়ির সেই ছাদের ভাঁড়ারঘরে!

শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা রাজকৃষ্ণের অংশে অধুনা ভাঁড়ার কাম ভিয়েন ঘর। ছবি : শিবু ঘোষ

তবে ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ির ভাঁড়ারটাকেই মনে রাখবেন, আর ৫ নম্বর বাড়িটার ভাঁড়ারটিকে পাত্তাই দেবেন না, এই মারাত্মক ভুলটা ভুলেও করবেন না কিন্তু! গগন ঠাকুর-অবন ঠাকুরের বাড়িতেও তো আর গুণীজনের অভাব ছিল না। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর' বইয়ে ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের চকমিলানো রান্নাবাড়ির অসাধারণ

বর্ণনা দিয়েছেন। যার সঙ্গে 'জীবনের ঝরাপাতায়' সরলাদেবী বর্ণিত ৬ নম্বর বাড়িটার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাঁড়ারঘরের অদ্ভুতরকমের মিল। অবন ঠাকুরের কথাটাই বোধহয় সত্যি— 'জোড়াসাঁকো নাম ছিল বাড়ির, দুটো বাড়িও ছিল বটে, কিন্তু ওই দুই সাঁকোর তলা দিয়ে এক নদীর স্রোত বইত'। পূর্ণিমাদেবী জানিয়েছেন, '...সামনে লম্বা ভাঁড়ারঘর ছিল।' তবে তাঁর স্মৃতিচারণে ভাঁড়ারের প্রসঙ্গ প্রায় নেই-ই, রয়েছে রান্নাবাড়ি সম্পর্কে অনন্যসাধারণ কিছু স্মৃতিচারণা। আর সেই স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গেই তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে 'মেজকাকী (সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) ওদিকে চালডাল মেপে দিতেন। এত ধামা ধামা দফায় দফায় চাল মাপতে হোত, একলা পারতেন না। অম্বিকা দাসী সঙ্গে থাকত।' এটা যে ভাঁড়ারেরই স্মৃতি-গন্ধবাহী তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। স্মরণে রাখা দরকার, এই রান্নাবাড়িরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ওই সুদীর্ঘ ভাঁড়ারঘরটি। তবে পূর্ণিমা ঠাকুর বা ৫ নম্বর বাড়ির আর কারুর রচনায় (যেমন অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর কন্যা উমা দেবীর লেখায়) রান্নাবাড়ির প্রসঙ্গ এলেও ভাঁড়ারের প্রসঙ্গটি আলাদা করে না আসায় বিষয়টি আপাতত এখানেই মুলতুবি রাখতে হলো।

গৃহস্থের ভাঁড়ার

বাঙালির যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়া নিয়ে ইদানীং হা-হুতাশের প্রেক্ষিতে প্রায় বছর চল্লিশ আগেই পারিবারিক বিবাদে সর্বস্বান্ত হওয়ার মর্মান্তিক পরিণতির ভুক্তভোগী হওয়ার সুবাদে স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করে গিয়েছেন, 'ব্যবসায়িক ও শিল্পনীতিক সমাজে এই প্রথা এখন অচল। বর্তমান সমাজে এই প্রথা চালু রাখার স্বপক্ষে কোনও কারণই থাকতে পারে না।' তবু একসময় বাঙালীর যৌথ পরিবার বলে একটা প্রথা ছিল। ভেতর ভেতর যে চোরাস্রোতই চলুক না কেন, এক হাঁড়িতে গুষ্টিসুদ্ধু সবার জন্য রান্না চাপানোয় শুধু লোকদেখানির গ্লানি ছিল না; সবার সঙ্গে পারিবারিক সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবার একটা মানসিকতাও কাজ করত বোধহয়। ভাঁড়ারের আয়োজন সেই যৌথ পরিবারের সদস্য সংখ্যার পরিচায়ক হলে আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ থাকে না। কল্যাণী দত্ত জানাচ্ছেন, 'একান্নবর্তী পরিবারের অন্ধকার ভাঁড়ারঘরে যে কতগুলো হাঁড়ি বোয়েম থাকত তা কোনওদিন গুণে দেখা হয়নি, কী ধরনের জিনিসপত্তর থাকত সেকথা এইভাবে একটু আধটু মনে পড়ছে। সব বাসন ছিল কাঠ, মাটি, কড়ি আর পেতলের, কাচ এসেছিল কিছু পরে। ছাতের থেকে ঝুলত দড়ি আর রেশমের শিকে, তাতে আবার কড়ির ঝালর দেওয়া। দেয়ালে টাঙানো থাকত নানা ধরনের ধামাকুলো সরুমোটা চালুনি।'

ভাঁড়ারের হাজারো জিনিসের বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার ভীড়ে দরকারের সময় সঠিক জিনিসটি খুঁজে পাওয়া রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তাই ঠাকুর-বংশের চোরবাগান শাখার বংশধর শ্রীনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে শিখিয়েছিলেন, ভাঁড়ারঘরে যে সমস্ত জিনিস রাখা থাকবে, সে সমস্ত বস্তুগুলির নাম ছোট কাগজে লিখে নির্দিষ্ট পাত্রের গায়ে আটকে দিতে। কারণ যিনি প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র বের করে দেন, কোনওদিন তিনি না পারলে অন্য কারুর ভাঁড়ার দিতে গিয়ে কোথায় কি আছে বলে হাতড়াতে অন্তত হবে না **(আমার খাতা, ইন্দিরা দেবী)**। কেবল বৃহৎ যৌথ পরিবারেই ভাঁড়ারঘর থাকবে, ছোট পরিবার (আজকের নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির সঙ্গে একে গুলোলে চলবে না)-এ থাকবে না, এমন তো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি! তাই বাবার ছোট্ট সংসারে মায়ের কাছ থেকে ভাঁড়ার ম্যানেজমেন্টের মহৎ শিক্ষাটা পেয়েছিলেন ছোট্ট ইন্দিরা। তবে এই শিক্ষাটা বোধহয় বৃহৎ পরিবারের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রযোজ্য। আসলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গেরস্থ বাড়িতে তো আর বড়লোকের বাড়ির মতো বাজার-সরকার ব্যাপারটা ছিল না। ভাঁড়ারটা আগাগোড়াই বাড়ির মেয়েদের স্বহস্তেই সামলাতে হোত।

ভাঁড়ারঘর অনেক সময় বোধহয় কোনও বিশেষ স্থানের একটা নির্দিষ্ট সময়েরও দর্পণ হয়ে ওঠে। 'সেকালের ঢাকা শহর' প্রবন্ধে উনিশ শতকের শেষদিকের ঢাকা শহর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সজলনয়নাদেবী লিখেছেন, 'বিধবাদের অত্যন্ত শুচিবাই ছিল, ভাঁড়ার কিংবা ঠাকুরঘরে চুণকাম করার দরকার হলে নিজেরাই করত, মুসলমান রাজমিস্ত্রি যেতে দিত না।' আসলে স্থানাভাবে অনেক বাড়ির ভাঁড়ারেই কুলুঙ্গির ওপর ঠাঁই পেত ঠাকুরমূর্তি। সেখানেই নিত্যি পূজা পেতেন ভগবান। বরানগরে সুরেন্দ্রনাথ কর প্রতিষ্ঠিত 'হৃদয়াশীষে'র ভাঁড়ারঘরে আরশোলা আর ইঁদুরের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই এক-আধটা অবিষাক্ত সাপকেও সহাবস্থান করতে দেখা যেত (বোধহয় খাদ্য-খাদক সম্পর্কের জন্যই)। সুতরাং অচিরেই সেই একান্নবর্তী গৃহে ভাঁড়ারের দেওয়ালে অধিকার করে নিয়েছিল মা মনসার একটি ফটো। ঠাকুর থাকুন আর নাই থাকুন ভাঁড়ারে ছোঁয়াছুঁয়ি বা অন্য বাদ-বিচারের বহর কিন্তু ঠাকুরঘরের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। শৈশবে পিতা শশীভূষণ বসু'র কর্মোপলক্ষে লাহোরে যাওয়ার জন্য জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'লাহোরিনী' নামে সুপরিচিতা শরৎকুমারী চৌধুরাণী রবীন্দ্র প্রশংসাধন্য 'শুভবিবাহ' উপন্যাসে 'নীরুর মামী'কে দিয়ে বলিয়েছেন— 'বাড়ির মেয়ে-বউদের আঁশ হাত ভাঁড়ারে না দেবার শিক্ষা দরকার'। তবে ভাঁড়ার ঘরে বাড়ির মেয়ে-বউদের চেয়ে ঠাকুরের (এখানে ঠাকুর মানে রাঁধুনী) গতিবিধিই যে অনেক বেশি অবাধ ও স্বচ্ছন্দ্য তা অস্বীকার করে কার সাধ্যি?

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বইতে কাজের বাড়ির ভাঁড়ার সংক্রান্ত একটু কু-প্রথার উল্লেখ করেছেন। যার মাধ্যমে তৎকালীন কলকাতার সামাজিক চালচিত্রের কিছুটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'যাহারা মিঠাই পরিবেশন করিত তাহারা অধিকাংশ সময় ভাঁড়ার থেকে মিঠাই আনিয়া উড়া পাচার করিত। পাড়ার প্রতিবেশী এই কাজ করিতেন, দেখিলেও কিছু বলিতে পারা যাইত না, আমার চোখের সামনে এমন হয়েছে। আমি কর্তাদের বলে দিয়েছি, তাঁরা চুপ করে থাকতে আদেশ দিয়েছেন'।

কিন্তু ভাঁড়ারঘরের শুচিতা নিয়ে সেকালের রমণীরা সচেতন থাকলেও হাইজিন সম্পর্কে তাঁরা কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। 'কলকাতার স্ত্রী-সমাজ' প্রবন্ধে শরৎকুমারী চৌধুরাণী একটি বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন— 'যেখানে পালকি নামালে, সে একটা ভারি সরু গলি-অন্ধকার, পালকি থেকে নেমে সম্মুখেই দু'তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দালানে পড়লুম— দালানের একদিকে রান্নাঘর, সেখানে এক রাশ ভাত রাঁধা, মাটির গামলায় ঢালা— তার উপর এত মাছি বসেছে যে, ভাত মোটেই দেখা যাচ্ছে না, কলাপাতে কতক রাঁধা তরকারি, কতক বা কাঁচা; মালসায় করা ডাল, সারি সারি চার-পাঁচটা উনুন, কোনটায় হাঁড়ি চড়ানো, কোনটায় কিছু নেই, আগুন জ্বলছে। দালানে জল সপ্ সপ্ করছে— ভয়ানক পিছল— বাঁ দিকে ভাঁড়ারঘর, কতকগুলো হাঁড়ি সাজানো আছে, কতকগুলো হাঁড়িতে দই, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি আছে।'

সেকালের রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঁড়ারঘর যে প্রেমের মিলনক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করত, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার প্রমাণও। যেমন 'আদর, না অনাদরের' প্রবন্ধে শরৎকুমারী চৌধুরাণী জানিয়েছেন, আগেকার দিনে অনেক বাড়িতে দিনের বেলা কিংবা ছেলে হলে ছ'মাস স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করায় মানা ছিল বাড়ির বউদের। এমতাবস্থায় স্বামীরা সকলের অগোচরে স্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত রান্না কিংবা ভাঁড়ারঘরে।

ভাঁড়ারের বনেদীয়ানা

উনিশ শতকের কলকাতা। রেনেসাঁর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে বাবু-কালচারের মলিনতা সব সত্যকে সব সময় উদ্‌ঘাটিত করতে দেয়নি। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক কিংবা রাজা নবকৃষ্ণ দেবকে ইতিহাস কতটা সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছে— তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। রাজেন্দ্র মল্লিকের মৃত্যুতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র শোক করেছিলেন— 'কলকাতার দরিদ্র লোকেরা পিতৃহারা হইল বলিলেও চলে।' ঠিকই তো, রোজ শ'পাঁচেক নিরন্ন মানুষকে ভরদুপুরে অন্নসেবা করার মতো একটা পুণ্যকর্মের পথিকৃৎ তো তিনিই। সেই ট্র্যাডিশান আজও পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছেন তাঁর উত্তরসূরীরা। শুনলে আশ্চর্য হবেন, রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেসে সম্পূর্ণভাবে বাড়ির মহিলা পরিচালিত ভাঁড়ারঘর থেকেই চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে সেই দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য রান্নার সমস্ত জিনিসপত্র নিত্য সরবরাহ হয়ে আসছে আজও। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্র মল্লিকের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষ হীরেন্দ্র মল্লিকের অনন্যসাধারণ বর্ণনায় সেই ভাঁড়ারঘরের সৌন্দর্যের সঙ্গে এই প্রবন্ধের গোড়াতেই পরিচিত হয়েছেন পাঠক। রাজা নবকৃষ্ণ

দেব বঙ্গমানসে এমন কতগুলো ব্যাপার চালু করে দিয়ে গেছেন যে আজকে সেই জিনিসগুলো বাদ দিলে বঙ্গ-জীবনটাই অচল হয়ে পড়ার একটা নিদারুণ সম্ভাবনা থেকে যায়। এর একটা যদি হয় কুমোরটুলিতে নদীয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিমাশিল্পীদের এনে স্থায়ীভাবে বসানো; তো দ্বিতীয়টা অবশ্যই উড়িষ্যা থেকে সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন গৃহস্থালী কাজের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা।

এই ব্যাপারগুলো দীর্ঘ দু'শতকেরও বেশি ব্যবধানে আমাদের হাড়ে-মজ্জায় থেকে গেছে। নবকৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত শোভাবাজার রাজবাড়ির গোপীমোহন দেবের অংশে ঠাকুরদালানের পূর্বপ্রান্তে রান্নাঘর সংলগ্ন ভাঁড়ারঘর নিয়ন্ত্রণ করতেন বাড়ির বয়স্কা মহিলারাই এবং বলা বাহুল্য সেই ভাঁড়ারে ভাঁড়ারী'র কাজটা সামলাত উৎকলবাসীরাই। বাড়ির সরকারমশাই ভাঁড়ারের খরচ-খরচাগুলো দেখতেন। 'চিক-প্রথা'র কড়াকড়ি পরবর্তীকালে শোভাবাজার রাজবাড়ির অন্দরমহল সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাঁড়ারের দেখভাল বাড়ির বয়স্কারা করলেও 'চিক-প্রথা'র কোনও ব্যত্যয় সেখানেও হয়নি। শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজকৃষ্ণ দেবের অংশে 'ঠাকুরবাড়ি' (যেখানে বর্তমানে দুর্গাপুজো হয়)-র ভাঁড়ারে ছোঁয়াছুঁয়ির বাদবিচার আজও অত্যন্ত প্রবল। কেবল ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। এমনকী বাড়ির লোকজনও 'কায়স্থ' হওয়ার জন্য সেই ভাঁড়ারে প্রবেশ পর্যন্ত করতে পারেন না। তবে কোনও অ-ব্রাহ্মণ ভুল করে সেখানে ঢুকে পড়লে গোবর জল-টল, ছড়া-টড়া দিয়ে শুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা অবশ্য একটা আছে। কালের চাহিদায় সেই ভাঁড়ারঘর আজ ভাঁড়ার কাম ভিয়েনে পরিণত হলেও 'ব্রাহ্মণ্যবাদে'র সেই পুরনো নিয়ম এখনও বলবৎ রয়েছে।

আগেকার দিনে কলকাতায় বড়লোক বা পয়সাওলা লোকেদের বাড়িতে কতগুলো যে পাত পড়ত তা দেবা না জানন্তি, কুতো মনুষ্য! কারণ পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও দাস-দাসী, চাকর-বাকর, আশ্রিত-আশ্রিতা, দূর সম্পর্ক আর নিকট সম্পর্ক আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়ে সে এক এলাহি কাণ্ড। কেমন হোত সে সমস্ত বাড়ির ভাঁড়ারঘরের চেহারা? পাথুরেঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ধনী খেলাৎ ঘোষের বাড়ির কন্যা স্মৃতি মিত্র (স্বামী মিহির মিত্র) তাঁর 'বড়বাড়ির ছোট স্মৃতি' বইয়ে ছেলেবেলায় নিজের চোখে দেখা এক রূপকথাকে লিপিবদ্ধ করেছেন— ''..এরই একটি বা দু'টি করে ঘর ছিল ভাঁড়ারঘর বা রসদ কর। সেইসব ঘরের সামনে দেখেছি, ওপরে কড়ি থেকে ঝোলানো এক বিরাট দাঁড়িপাল্লা, যা বড়ো ধান-চাল মাপার দোকানে আগে দেখা যেত। রোজ সকালে নানা বিভাগের লোকজন, ঠাকুর, চাকর, ঝিয়েরা এসে দাঁড়াত। আর চেয়ারে বসে ভাঁড়ারি সরকারমশাই সবাইকে যার যার যেমন নিত্য প্রয়োজন গুণেগেঁথে বিলি করতেন। সেখানে যেমন তেল, ঘি, চাল, ডাল, মশলা ও আটা থাকত, তেমনি ঘোড়ার দানা, গোরুর খাদ্য সবই মজুত থাকত।''

তবে বড়লোকের ভাঁড়ারঘরের সংখ্যা কখনও একটি হোত না। রকমফের অনুযায়ী একাধিক হোত। আর পাল্লা দিয়ে এ নিয়ে বিধিনিষেধও থাকত ঢের। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা সরলাবালা সরকার 'আমার ঠাকুরমা' প্রবন্ধে (পরিশিষ্ট, আমার জীবন, রাসসুন্দরী দাসী, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত) উল্লেখ করেছেন। বুঝতেই পারছেন, সরলাবালা সরকারের ঠাকুমা হলেন প্রথম মহিলা আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দাসী। ফরিদপুরের রামদিয়ার শ্বশুরবাড়ির হেঁশেলেই যাঁর 'চৈতন্য ভাগবত'-এর শিক্ষা হয়েছিল সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে। এই রামদিয়াতেই রাসসুন্দরীর পুত্র কিশোরীলাল সরকার তাঁর ছেলে বাঁশরীর মুখে-ভাত উপলক্ষে কলকাতা থেকে কয়েকবস্তা আলু, ফুলকপি ও মটরশুঁটি, চিনি, ময়দা, ঘিয়ের টিন এবং আরও অনেক জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে সটান তুলে দিলেন বাইরের ভাঁড়ারে। রাসসুন্দরীর তো মাথায় হাত। গৃহদেবতা মদনগোপালের ভাঁড়ারে ওগুলো না তুলে কিনা তোলা হলো বাইরের ভাঁড়ারে! অনুষ্ঠানের পুরোহিত দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর মা-র পরামর্শ— ওসব জিনিস তো আর মদনগোপালের ভাঁড়ারে তোলা যাবে না, সুতরাং বহরমপুরের হাট থেকে নতুন করে জিনিস কিনে মদনগোপালের ভাঁড়ারে তা ঢোকানোর বন্দোবস্ত হোক। এবার আইনী চাল চাললেন পেশায় আইনজীবী কিশোরীলাল। মাকে বললেন— 'মা বাড়ি কার? মদনগোপালেরই তো বাড়ি! বাইরের ভান্ডারও মদনগোপালের, ভিতরের ভান্ডারও তাঁরই। একটাতে না তুলে যদি আরেকটাতে জিনিস তোলা হয়ে থাকে, তাতে দোষ হলো কি?' সুতরাং রাসসুন্দরীকে মানতেই হলো যে এতে বিন্দুমাত্র দোষ হয়নি। ধর্মভীরু সেই সামান্যা নারীর অসাধারণ যুক্তিবোধই সেদিন সাহায্য করেছিল আনন্দের ভেতর উৎসব সমাধা করতে।

কালীনাথ বসুর মেয়ে এবং ব্রাহ্ম-নেতা শিবচন্দ্র দেবের পুত্রবধূ শরৎকুমারী দেবী 'আমার সংসার' নামক নাতিদীর্ঘ পুস্তকে, সত্যপ্রিয় দেবের সঙ্গে তাঁর ব্রাহ্ম-বিবাহের কথা জানাজানি হয়ে গেলে নিজের পরিবারের লোকেদের আক্রমণে বিয়ের আগের দিন রাতে ২/৩ ভান্ডার পোরা খাদ্যসামগ্রী, মায় ভাঁড়, খুরি, কলাপাতা অবধি সব ছেড়েছুড়ে বাগবাজারের পৈতৃক বাড়ি থেকে যে সার্কুলার রোডের ভাড়াবড়িতে উঠে যেতে হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি করুণ বর্ণনা 'ভাঁড়ার স্মৃতি রোমন্থক' পাঠকবর্গের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথী ঠাকুর 'পিতৃস্মৃতি'তে ভাঁড়ার নিয়ে একটি মনমাতানো স্মৃতিচারণা করেছেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে সেই স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকতেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ। সেখানকার পাচকদের বিশ্রী রান্না গলাধঃকরণের হাত থেকে রেহাই পেতে মায়ের (মৃণালিনী দেবী) কাছে বুধবার ছুটির দিনে আশ মিটিয়ে খেতে আসতেন রথীন্দ্রনাথ আর তাঁর সহপাঠীরা। তিনি লিখেছেন... 'এই নিয়মিত খাওয়াতে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি হোত না। বেশি ভাল লাগত যখন দল বেঁধে অসময়ে এসে মায়ের ভাঁড়ারঘর লুঠ করে নিয়ে যেতুম। তিনি পরে জানতে পেলেও আমাদের কিছু বলতেন না।'

পবিত্র ভাঁড়ার

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে ভাঁড়ারঘর আসৃষ্ট পবিত্র। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের পরশ সেই পবিত্রতাকে এক অনির্বচনীয় রূপ দিয়েছিল। এ নিয়ে দুটি বর্ণনা পাঠকের মন কাড়ে। প্রথমটির উপলক্ষ্য ঠাকুরের সর্বস্বত্যাগী শিষ্যদের তপস্যাদীপ্ত বরাহনগর মঠ (১৯ অক্টোবর, ১৯৮৬— ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২)। স্বামী বিরজানন্দ 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যেমন দেখেছি' প্রবন্ধে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) 'ধূপধুনা খোল-করতাল বাদ্যের মধ্যে আরতির শেষভাগে চামর ব্যঞ্জন করা'র অনন্যসাধারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দর্শকরা পাশে ঠাকুরের ভাঁড়ারঘর (বরানগর মঠের) হতে তাঁর (রামকৃষ্ণানন্দের) সঙ্গে সমস্বরে 'জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব' উচ্চারণ করতে করতে আবেগে নৃত্য করতেন।' দ্বিতীয় বর্ণনাটির জন্য আমরা ঋণী মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজী'র জীবনের ঘটনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি স্বামীজীর সমসাময়িক পাঠী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 'আলমবাজার মঠে'র ভাঁড়ারঘরের বর্ণনা দিয়েছেন— 'ইনি (সতীশচন্দ্র) কখনও কখনও ভিতর বাড়ির (আলমবাজার মঠের) পূর্বে উত্তর কোণের ঘরটিতে যেখানে ঠাকুরের ভাণ্ডার ছিল অর্থাৎ পূজার দ্রব্যাদি থাকিত, তথায় বসিয়া বেশ ভক্তিভাবে ঠাকুরের ফুলের মালা তৈয়ারি করিতেন, কখনও কখনও চন্দন ঘষিতেন, কখনও বা তাঁহাকে দিয়া যাহা হইতে পারিত এরূপ কার্য করিতেন।"

গোলাবাড়ি

ঊনিশ শতকের সূচনালগ্ন। কলকাতা তখন নেহাতই এক গন্ডগ্রাম। তবে ইতিহাসের দিব্যি, এই গেঁয়ো গন্ধটা কিন্তু পরবর্তীকালে কলকাতার বনেদীয়ানাকে বেশ পোক্তই করেছিল। ওরকমই কোনও এক সময়কে ছুঁয়ে রবিঠাকুরের আক্ষেপ— 'তখন শহর ও পল্লী অল্প বয়সের ভাই-ভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত, এখন দিদির সঙ্গে ভাইয়ের মিল খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।' সেই সময় বা তারও আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অস্তিত্ব ছিল বিশালাকৃতি এক ভাঁড়ারের। সাবেকী নাম গোলাবাড়ি। রবীন্দ্রবর্ণনা— "দালানঘরের উত্তরদিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিনে পাড়া-গাঁ-টাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে বসেনি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহুরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত। খাসজমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ" (**ছেলেবেলা**)। সরলাদেবীও জানাচ্ছেন— 'বাড়ির উত্তরে অনেকখানি খোলা জায়গা ছিল, সেটা হলো গোলাবাড়ি। অর্থাৎ সেখানে ধান-গম প্রভৃতি শস্যরাজি সঞ্চিত থাকত।' তবে রবিঠাকুর বা তাঁর চেয়ে ১১ বছরের ছোট ভাগ্নী সরলাদেবী কেউই স্বচক্ষে ভাঁড়ার সমৃদ্ধ গোলাবাড়ি দেখার সুযোগ সম্ভবত পাননি। কারণ 'জীবনস্মৃতি'তে ছেলেবেলার স্মৃতিচারণে কবিগুরু গোলাবাড়ি-র জায়গাটাকে পোড়ো বলার পাশাপাশি অবহেলা আর অনাদরের স্থানটির প্রতি নিজের ভাললাগার কথাটাও ব্যক্ত করেছেন।

বাংলা ১৩০৮ সালের (ইংরেজি ১৯০১) জ্যৈষ্ঠ মাসে 'অন্তপুর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সেকালের কথা'য় নিজের ছোটবেলাকার কাহিনী বা তারও আগেকার কথা (লেখিকার ভাষায় শতবর্ষ পূর্বেকার) বলতে গিয়ে গোলাবাড়ির একটি অভূতপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন প্রসন্নময়ী দেবী (জন্ম– ১৮৫৭)। বর্ণনাটি একারণেই অভূতপূর্ব যেহেতু গোলাবাড়ি যে একটা পুরোদস্তুর ভাঁড়ারের কাজও করতে পারে তা ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। তিনি লিখেছেন— "বৈঠকখানার আঙিনার এক পার্শ্বে দিব্য বড় একখানি ঘর থাকিত, তাহাতে একজন বিজ্ঞ ভৃত্য ভান্ডার রক্ষা করিত। সেই ঘর 'গোলাঘর' ও ভৃত্য 'গোলাদার' নামে কথিত হইত। সে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিত্যকর্ম 'সিধা' মাপিতে বসিত। তাহার হাতের ও মুখের বিরাম থাকিত না, ক্রমাগত লোকসংখ্যা গণনা করিয়া দ্রব্যাদি যোগাইত। গৃহদেবতার ভোগের সহিত বিধবাগণের, গৃহস্বামীর অন্তঃপুরের আত্মীয় স্বজনের 'সিধা' ভিতরে পাঠান হইত, তাহার পর যে সকল অতিথি বাড়িতে রন্ধন করিয়া খাইবে তাহাদের যোগ্যরূপ অযাচিতে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইত। ... ইতিমধ্যে মুষ্ঠিভিক্ষা, অন্দরের দৈনিক দানের চাউল ইত্যাদিও দিতে হইত। বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত গোলাদার অবসর মাত্র পাইত না। ইহা ব্যতীত কোনও কিছু কম পড়িলে গৃহিনী প্রেরিতা প্রাচীনা দাসীর ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করিয়া কার্য সমাধা করিত। মাসিক ভান্ডারের ব্যয়ের হিসাব তাহার হস্তে, সে ব্যক্তি প্রতি মাসের শেষে সন্তোষজনক হিসাব নায়েব মহাশয়ের নিকট দাখিল করিয়া পুনর্বার দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে পারিত।"

তবে সময়ের বয়স যত বেড়েছে, বাঙালির গৃহ থেকে গোলাবাড়ির অন্তর্হিত হবার পথ ততই যেন সুগম হয়েছে। সৈয়দ মনোয়ারা খাতুন (জন্ম ১৯০৯) তাঁর স্মৃতিকথা 'স্মৃতির পাতা'য় যশোরে নিজের বাপের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে 'দাদা'র (ঠাকুর্দার) আমলের গোলাবাড়ির স্মৃতিচারণাও করেছেন। তিনি শুনেছিলেন তাঁদের পুরনো বাড়ির গল্প '..... আর একদিকে ছিল গোলাবাড়ি। সেখানে মিছরি, সাবু, মিহিচাল ইত্যাদি মজুত থাকত। দরিদ্র প্রজাদের কারও অসুখ হলে সেখান থেকে সাহায্য করা হোত।'

পুনশ্চ, প্রচলিত প্রবচন, 'কাঁড়ারী, ভাঁড়ারী, রাঁধনী, বামন, যশ পায় না এই ক'জন'। — এটা কতটা খাঁটি না কি নির্ভরযোগ্য নয়, অন্তত ভাঁড়ারের ক্ষেত্রে, সে বিচারের ভার রইল পাঠকদের ওপর।

কৃতজ্ঞতা ঃ— হীরেন্দ্র মল্লিক, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, অশোক উপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ, হরিপদ ভৌমিক, অমলকৃষ্ণ দেব, নন্দিনী দেব, প্রতীপ দেব ও নবকুমার ভট্টাচার্য।